বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

নবম খণ্ড
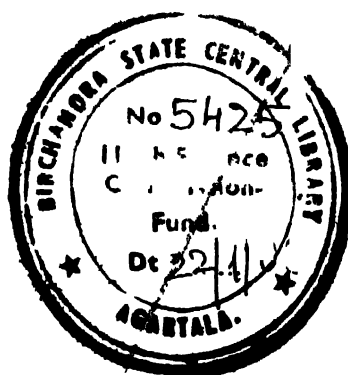
সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

BANGLAR CHHOTO GALPA

Collection of Bengali Short Stories

9th Volume

Edited by

Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ISBN 81 7332 381 4

দাম ১০০ টাকা

পুনশ্চ ১১৪ এন ডা এস সি. ব্যানার্জী রোড, কলকাতা ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৯ এন ডা এস সি ব্যানার্জী রোড কলকাতা ৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'তবু মনে রেখো'

আমার একান্ত স্নেহের
অপর্ণা ভাস্কর-জ্যোৎস্না কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ নবম খণ্ড

নবম খণ্ড শুরু করেছি এ-কালের নবীন কথাসাহিত্যিক হর্ষ দত্তের 'কামাদি কুসুম সকলে' নামের একটি শ্রমমান গল্প দিয়ে। তাঁর 'আঁধার করে আসে', 'অমল ও অভিজিৎ' গল্পগুলিও উল্লেখযোগ্য। এই খণ্ডের লেখকদের নির্বাচিত গল্পগুলি ছাড়াও তাঁদের উল্লেখযোগ্য আরো অনেক গল্পই আছে। তার মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ছে স্বপন সেনের 'ঝুপড়ির বাসিন্দা', 'সাদা রুমাল', রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'মাদলে নতুন বোল', 'মৌতা ডোমপাটি', অনিল ঘড়াইয়ের 'চৌকিদার', 'কাক', 'পরীযান', 'শস্যকুমারীর চর্যাপদ', 'কাঠবাদামের ফুল', বিনতা রায়চৌধুরীর 'চিনি নাই তারে' সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্তের 'দেওয়াল-সুন্দরী', আফসার আমেদের 'শিলালেখ,' 'গোণাহ', 'পাথর পাথর', 'জিন্নতবেগমের বিরহ মিলন', সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বত্নাকরের বাড়ির ঠিকানা', রবিশংকর বলের 'আঙুরবালা', 'বিপ্রবীর সোনারূপা', 'দারুনিরঞ্জন', 'দেবতাদের দিনরাত্রি' 'লেবু পাতার গন্ধ', অনিন্দ্য ভট্টাচার্যের 'মৌনী', 'হাপুঅলা', 'খড়ের মানুষ, অনিশ্চয় চক্রবর্তীর 'জন্মের অসুখ', তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অপরাজিত গুর্ভজিৎ' প্রভৃতি গল্পগুলির কথা।

এই খণ্ডে গল্পের সংখ্যা ৪০। খণ্ডটি শেষ করেছি তরুণতম গল্পকার নীহারুল ইসলামকে দিয়ে। সেই প্রেক্ষিতে এই খণ্ডের সময়সীমা ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫।
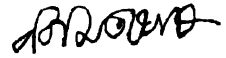
পুনশ্চ ঃ বিশেষ উৎসাহী/আগ্রহী সহৃদয় পাঠকদের জ্ঞাতার্থে কয়েকটি কথা। দশ খণ্ডের 'বাংলার ছোটগল্প' গ্রন্থের **কেবলমাত্র প্রথম খণ্ডেই রয়েছে বাইশ পৃষ্ঠার একটি তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ ভূমিকা**। সেখানে আছে বাংলা **গদ্যের সূচনা, গদ্যগ্রন্থ, গদ্য-সাহিত্য, আদি-গল্প, গল্প, ছোটগল্পের আবির্ভাব** - তার **জন্ম ও উৎস** সন্ধান, **সংজ্ঞা** ইত্যাদি বিষয়ের উপর দীর্ঘ আলোচনা। আছে অসংখ্য ছোটগল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে অপরিহার্য পটভূমি সমূহের (ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, নানা ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-সংঘাত সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ, স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা, সংকট ইত্যাদি) তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে বিস্তৃত বিশ্লেষণ।

বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামন্বন্তরে ভেঙে পড়া বাংলার সমাজ-অর্থনীতি, **দেশভাগ, খণ্ডিত-স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু স্রোত**, সেই মহা প্রলয়ের সময়ের জীবন্ত ছবিও (এক একটি কালজয়ী গল্পের সঙ্গে যে পটভূমির অঙ্গাঙ্গী যোগ) প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় আমি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

আগস্ট অন্দোলন, ১৯৪৬-এর ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা তথা '**গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং**' আর ঠিক তার পরই **তেভাগা আন্দোলন**, পরবর্তীকালে '**নকশাল আন্দোলন**', 'জরুরী **অবস্থা**', বার বার বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উত্থান, -- এ সব কিছুই বাংলার গল্পকে দিয়েছে নতুন প্রাণ। তারও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সেখানে করেছি আমি।

আবার বিভিন্ন সাহিত্য-আন্দোলন (**'কল্লোল'**, **'শ্রুতি'**, **'হাংরি জেনারেশন'**, **'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন,'** **'এই দশক'**, **'নিম সাহিত্য-আন্দোলন'**, **'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'** ইত্যাদি), লেখক-পাঠক-সম্পাদক-প্রকাশকের ছোটগল্প ব্যাপারে দায়িত্বহীনতা ও দায়িত্বের কথা, সর্বোপরি পাঠকের কাছে সে-কাল ও এ-কালের ছোটগল্পের প্রতি আকর্ষণ-বিকর্ষণের সম্ভাব্য কারণগুলিও বিশ্লেষিত হয়েছে সেই ভূমিকায়।

তাই, উৎসুক শ্রদ্ধেয় পাঠক সেটি একবার দেখে/পড়ে নিলে সম্পাদকের শ্রমের ভার কিছুটা লাঘব হবে।

(ড বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

কামাদি কুসুম সকলে

হর্ষ দত্ত

কৃষ্ণকামিনী মরিতেছে।

সীমন্তে সিঁদুর লইয়া তাহার মরিবার সাধ ছিল। সে আহ্লাদ পূর্ণ হইতেছে না। স্বামী বিনোদচন্দ্র পূর্বেই গত হইয়াছেন। বৎসরের হিসাবে তাহা অনেক দিনের কথা। কৃষ্ণকামিনীর শিয়রে বিনোদচন্দ্রের যে ছবিখানি দৃশ্যপটের ন্যায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, ছবিটি নিতান্তই পুরাতন। কাঁচের উপর ধোঁয়ার মালিন্য স্পর্শ করিয়াছে, উর্ণনাভতন্তুর সবিশেষ চিহ্ন বর্তমান এবং একটি অথবা দুইটি চন্দনের ফোঁটা বিনোদচন্দ্রের ললাটে প্রতীয়মান।

পুরাকালিক বোম্বাই খাট নামক সুবিশাল পালঙ্কে কৃষ্ণকামিনী বেঘোরে পড়িয়া আছে। পদদ্বয় যথেষ্ট ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। চক্ষু দুইটি পূর্ণরূপে মুদ্রিত হয় নাই। তাহার বাম হস্তটি কনিষ্ঠা কন্যার করতলগত। কন্যা নীরবে অশ্রু ফেলিতেছে ও হস্তমথিত করিতেছে। কৃষ্ণকামিনীর বাম হস্তটি বড়ই মূল্যবান। তিনখানি সোনার চুড়িতে মৃতপ্রায় হস্তটির শোভা এখনও পর্যন্ত কিছুমাত্র কমে নাই। দক্ষিণ হস্তটি সেই তুলনায় আপাতত বড়ই নগণ্যবৎ শয্যার উপর চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সামান্য এই হস্তটি, স্যালাইন ওয়াটার শরীরে প্রবেশ করাইবার দ্বার হিসাবে পূর্বে ব্যবহৃত হইতেছিল। এই হস্তে স্বর্ণনির্মিত যে রুলি দুইখানি ছিল তাহা কৃষ্ণকামিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনীতার শক্ত মুঠিতে ধরা রহিয়াছে। মধ্যমা কন্যা নবনীতা আড়চোখে দিদি ও ভগিনী পরিণীতার উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া আছে। এমতাবস্থায় পড়শিরা তাহাকে দেখিয়া অবশ্যই ভাবিতেছে, আহা, কন্যা মাতৃশোকে বড় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। চক্ষের জল পর্যন্ত ফেলিতে পারিতেছে না।

কৃষ্ণকামিনী বিগত প্রায় একশ' দিন ধরিয়া শেষ শয্যা নিয়াছে। স্নান করিতে গিয়া কলঘরে পতন ও তাহা হইতে পক্ষাঘাতের উৎপত্তি। বিনোদচন্দ্রের বড় সাধের এই সুবৃহৎ গৃহের দ্বিতলে কৃষ্ণকামিনী ও তাহার কাজের মেয়ে চঞ্চলা বস্তুত একাই থাকিত। একতলায় তাহার নকুল নামীয় স্কুল-শিক্ষক চতুর্থ পুত্রের বসবাস। কৃষ্ণকামিনীর পঞ্চপুত্রের মধ্যে নকুলের অবস্থাই কিঞ্চিৎ দারিদ্র্যলাঞ্ছিত। তাহার অর্থ-ভাণ্ডারের অবস্থা—পূর্ণ হইতে পূর্ণ চলিয়া গেলে যাহা থাকে, তেমনিই। অন্যান্য ভ্রাতৃগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সে এখনও পর্যন্ত নিউআলিপুর, লেকটাউটন অথবা লবণহ্রদে নিজ গৃহ নির্মাণ করিয়া তথা পৈতৃক ভিটার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক চলিয়া যাইতে পারে নাই। যদিও নিয়ত স্বপ্ন দেখিতেছে। নকুল, নকুলের স্ত্রী শমিতা ও তাহাদের একমাত্র কন্যা-সন্তান সেঁজুতি নিকটে ছিল বলিয়া বুড়ি শয্যা ও সেবালাভের প্রাথমিক পর্বটুকু লাভ করিতে পারিয়াছিল। ইহারা না থাকিলে কৃষ্ণকামিনী কলঘরে মরিয়া পড়িয়া থাকিত বলিয়া অন্যান্য ভ্রাতারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল। বড়দাদা যুধিষ্ঠির প্রকাশ্যেই বলিয়াছে, নাণ্টু না থাকলে কী যে হত! ভাগ্যিস মায়ের কাছাকাছি তুই আছিস! নকুলের স্ত্রী উক্ত প্রশংসাবাক্যটিকে নিংড়াইয়া যাহা বাহির

করিয়াছিল তাহার সারমর্ম এই—তুমি যে এখনও এ বাড়ি ছাড়তে পারনি, সে কথাটাই বট্‌ঠাকুর ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছে। তুমি তো হদ্দবুদ্ধ, তাই বুঝতে পারনি। নকুল এতদূর ভাবিয়া দেখে নাই। নকুলের রাগ হইয়া গিয়াছিল—দাদার উপরে নহে, অসুস্থা কৃষ্ণকামিনীর উপর। আর একটি ভয় তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। মাতৃদেবীর অঞ্চলচ্ছায়ে থাকিয়া তাহার গৃহ সমস্যার সুরাহা হইতেছিল। বুড়ি চোখ বুজিলেই এই দ্বিতল বাড়িখানিতে তাহার আর কোনো অধিকার থাকিবে না। ভাগাভাগির কথা অচিরাৎ আসিয়া পড়িবে। উইল অনুযায়ী তাহার ভাগে দুইখানি ঘর ও বারান্দার অংশবিশেষ পড়িবে মাত্র। সেদিন আসিতে আর দেরি নাই। নকুলকে এই মুহূর্তে শয্যা-পার্শ্বে দেখা যাইতেছে না। আসন্ন গৃহচ্যুতির বেদনা ভুলিতে সে ভ্রাতাদের কাছ হইতে টাকা তুলিয়া শ্মশানযাত্রার আয়োজন করিতেছে।

বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে বহুসন্তানবতী করিয়া ছাড়িয়াছিলেন। তিনি চাহিতেন, তাঁহার সংসার পুত্র-কন্যায় ভরিয়া উঠুক, খাইবার অর্থের যখন অভাব নাই, তখন পুত্র-কন্যাদের লইয়াই পঙক্তি-ভোজনের সমারোহ হউক। কৃষ্ণকামিনী স্বামীর এই উৎকট স্বপ্ন সফল করিবার জন্য সপ্তদশ বৎসরে প্রথম সন্তানের মা হইয়াছিল এবং বত্রিশ বৎসরে অষ্টম তথা শেষ সন্তানের জন্মদান সুসম্পন্ন করিয়াছিল। সর্বশেষটি জন্মিবার পর বিনোদচন্দ্র কৃষ্ণকামিনীকে মাঝখানে বসাইয়া পুত্রকন্যাদের সহিত ছবি তুলাইযাছিলেন। তাহার পর ছবিটির তলায় অতি পরিচিত একটি গানের কলি লিখিয়া দিয়াছিলেন—'তোমার ভুবনে ফুলের মেলা'। সে ছবি আজ হারাইয়া গিয়াছে।

প্রথম দানে পুত্র। পূর্বাপর কিছু না ভাবিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল যুধিষ্ঠির। দ্বিতীয়বারেও যখন পুত্র হইল, তখন ছন্দ মিলাইয়া সেটির নাম রাখা হইল ভীমদেব। ভীমদেবের জন্মের সময় কৃষ্ণকামিনীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল। বৃহদাকাব শিশুটি যখন তাহার নাড়ী ছিঁড়িয়া ভূমিষ্ঠ হইল, তখন কৃষ্ণকামিনীর বাঁচিবার আশা বিনোদচন্দ্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশ্য সে যাত্রা কৃষ্ণকামিনী অদৃশ্য দৈব-আশীর্বাদে বাঁচিয়া গেল। ভীম তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল বলিয়া কৃষ্ণকামিনী এই পুত্রটিকে একটু ভিন্ন চোখে দেখিত। ইহাকে অধিক স্নেহ দান করিত তাহাও নহে, ভীমদেব সম্পর্কে তাহার একটি গোপন ভীতি ছিল। মৃত্যুর দ্বার হইতে তাহাকে যে ঘুরাইয়া আনিয়াছে, তাহার শক্তি উপেক্ষা করিবার নহে। ভীমদেব বড় হইয়াও ইহা বুঝিতে পারে নাই। কেবল তাহাব আশ্চর্য লাগিয়াছিল, মা তাহার বিবাহ দিবার জন্য জোরাজুরি করে নাই। একবারই মাত্র সে বলিয়াছিল, বিয়ে আমি করব না মা। কৃষ্ণকামিনী পুনরায় বিবাহের কথা ভুলিয়াও তুলেন নাই। শুরুতেই এই নির্লিপ্ত যবনিকা পতনের ফলে ভীমদেবের আর বিবাহ হয় নাই। কৃষ্ণকামিনীর আজ মৃত্যু হইবেই—এমন সংবাদ পাইয়া ভীমদেব মাতাকে শেষবারের মতো জীবিতাবস্থায় দর্শন করিবার জন্য আসিয়া জুটিয়াছে। ইহাতে তাহার কাজের অবশ্যই ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক ডঃ বি ডি মুখার্জী নামে তাহার যে খ্যাতি, তাহা অদ্য কৃষ্ণকামিনীর শেষ যাত্রা উপলক্ষে ব্যাহত ও ধূসরিত হইতেছে—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। গতরাত্রে অকস্মাৎ কৃষ্ণকামিনী যখন যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময় তৃতীয় পুত্র অর্জুনকুমাব ভীমদেবকে ফোন করিয়াছিল। ভীমদেবকে নিশ্চিত ও অবধারিতভাবে পাওয়া যায় নাই। তাহার সাদার্ন অ্যাভিন্যু-এর ফ্ল্যাটে ফোন ধরিয়াছিলেন কোনো এক অঙ্গনা মিস গীতালি, যিনি পুরা সেপ্টেম্বর মাসটি ভীমদেবের সহিত গভরনেস ও শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে দিবারাত্র থাকিতে চুক্তিবদ্ধ। প্রবল মদ্যপানের ঘোরে মহিলা ইংবাজি বাংলা মিশাইয়া এমত আত্মপরিচয় দিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আগামী সকালেই ডঃ মুখার্জীকে পাঠাইয়া

দিবেন। মা মরিতেছে বলিয়া কথা! ভীমদেব বেলা আট ঘটিকা নাগাদ নৈশ অত্যাচারেব চিহ্ন মুখে নিয়া আসিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নাই। তাহাকে দেখা যাইতেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সহদেবের সহিত কথা বলিতে। অলিন্দে দাঁড়াইয়া।

বাঙ্গালোর তোর কেমন লাগছে?

খারাপ না মেজদা। ভালোই। তবে খাওয়ার খুব কষ্ট।

ডোণ্ট ফরগেট, কষ্ট না করলে—আই মিন কেষ্ট পাবি কি করে?

তা ঠিক। তবে হঠাৎ এইভাবে বদলি হয়ে যাব ভাবিনি। তুমি যদি একটু ঘোষরায়কে বলতে—

মিঃ ঘোষরায় মানে তোদের ঐ হামবাগ সেলস্ ম্যানেজার! নো ব্রাদার। তুই ভাবলি কী করে এ কথা! তুই কি জানিস না, ঐ লুম্পেনটা দু-পেটি রিয়েল ইটালিয়ান অলিভ অয়েল নিয়ে আমার সঙ্গে কি ব্যবহারটা করেছিল?

ভীষণ বাজে ব্যাপার—আমি জানি।

তবে! নো, নো, তুই আমাকে এমন রিকোয়েস্ট করতে পারিস না।

আচ্ছা, মাকে তোমার নার্সিংহোমে রাখলে হয়তো এত তাড়াতাড়ি—

হয়তো, তবে আমি আনড়ান। নার্সিংহোমে কেউ জায়গা জুড়ে থাকবে—এমন জায়গা নেই। সবচেয়ে বড় কথা মাদার ইজ ডাইং। আউট অফ হ্যাণ্ড।

না, আমি বলছিলাম, ছোড়দার উপর দিয়ে তাহলে এত ধকল যেত না, তাছাড়া তুমিও মায়ের শুশ্রূষা করতে পারতে।

আঃ, একটা কথা তুই কিছুতেই বুঝছিস না যে, আমার তেমন সময়ও নেই অ্যাণ্ড আই ওয়ান্ট টু সে, আমার তেমন কারুকে মরতে দেবার জায়গাও নেই। ইজ্ নট্ ইট?

হ্যাঁ মানে—

নো, কোনো মানে নয়, অল থিঙ্গস্ আর ভেরি ক্লিয়ার। বাই দ্য বাই, তুই মায়ের ট্রিটমেন্টের জন্যে যে সব ওষুধ ডোনেট করেছিস, সেগুলোর দাম আমার থেকে নিয়ে নিস। দ্যাট্ পুওর নান্টুর কাছ থেকে চাইবি না কিছু। দাদা আউট অব কোশ্চেন। অর্জুন দেবে কিনা জানি না। বাট আই উইল পে, ইয়েস আই হ্যাভ টু পে, রিমেমবার।

বাহিরে প্রকাশ না পাইলেও, সহদেবের অন্তরাত্মা ভীমদেবের কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেছিল। তাহার এই দাদাটি কাহাকেও আপন জ্ঞান করে না। সহদেব জ্ঞানপ্রাপ্তির সময় হইতে দেখিয়া আসিতেছে, ভীমদেব অন্যান্য ভ্রাতা-ভগিনী হইতে স্বতন্ত্র। প্রবল মেধাকে সম্বল করিয়া স্বকীয়ভাবে বড় হইয়াছে। চিকিৎসক হিসাবে আজ অর্থ ও খ্যাতির শিখরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সহদেব বাল্যকালে ভীমদেবকে অনুসরণ করিয়া চলিত। কিন্তু কৈশোর ও প্রাক্‌যৌবনে আসিয়া সে অনুভব করিয়ছিল, মধ্যম ভ্রাতা তাহাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনিতে চাহে না। বরং কৃপা প্রদর্শন করে।

সহদেব জীবনের সোপান অতিক্রম করিয়া আজ যে-স্থানে উঠিয়াছে, তাহার পিছনে ভীমদেবের কিছুমাত্র ভূমিকা নাই, তাহা বলিলে ভুল হইবে। সহদেব সে-কথা প্রকাশ্যে অস্বীকার করিলেও, মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সহদেব একবার স্ত্রীকে বলিয়াছিল, মেজদার মতো ডাক্তার কলকাতায় খুব কম আছে! জয়া বিন্দুমাত্র সময় না দিয়া মুখের উপর উত্তর দিয়াছিল, তোমার মতো ওষুধ বিক্রি-করা লোকেরাই সে কথা ভালো বলতে পারবে। সহদেব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ শব্দদ্বয়ের এতদ্দৃশ অনুবাদ তাহার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। সেদিন হইতে সহদেব এই ধারণা পোষণ করে --ভীমদেবের জনাই তাহার কিছু হইল না। মানুষটি এই মুহূর্তেও তাহাকে কৃপা প্রদর্শন করিতেছে। তাহার ইচ্ছা হইল ভ্রাতাকে কঠোর ভাষায় বলে, তোমার টাকায় আমি ইয়ে করি ...। সহদেব পারিল

না। তাহার অপ্রকাশ্য ক্রোধ নিষ্ফল অস্ত্রের ন্যায় তাহাকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। সহদেব মাতার শায়িত ও নিঃস্পন্দ দেহখানির দিকে ফিরিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল।

যুধিষ্ঠির বারংবার কৃষ্ণকামিনীর কপালে হাত দিয়া জীবনের উত্তাপ অনুভব করিতেছিল। পিতার মৃত্যুর দিন সে নিকটে থাকিতে পারে নাই। শ্বশ্রূমাতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিলাসপুরে যাইতে হইয়াছিল। পিতা প্রায়শই পরমানন্দে বলিতেন যাহাকে তাহাকে, বড়খোকার বৌ এনেছি বিলাসপুর থেকে। বৌমার অমন রূপের সন্ধান কসবা-ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জে গোয়েন্দা লাগালেও খুঁজে পাবে না। সেই বিলাসপুরই তাহার কাল হইল। মৃত্যুর সময় জ্যেষ্ঠপুত্রের হাত হইতে গঙ্গাজল পাইলেন না; পুত্রমুখ সন্দর্শন বিনা তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে একটি কাষ্ঠাসনে বসিয়া আছে তাহার স্ত্রী কমলা। বিলাসপুরের কন্যার তনুলতায় সেই বহুকথিত লাবণ্যের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কাল আদ্যন্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। নিয়তদৃশ্য বয়স্কা বঙ্গমহিলা বিনা তাহাকে আজকাল আর কিছুই মনে হয় না। পলিতকেশ একষট্টি বৎসর বয়স্ক যুধিষ্ঠির কমলাকে এখনও সেই ষোড়শী সুন্দরী বলিয়া মনে করে। ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকেই দেখিতেছিল যুধিষ্ঠির অদ্যকার এই একাধারে দুর্বিষহ ও করুণাঘন আবহাওয়ার মধ্যেও স্ত্রীরত্নটিকে পার্শ্বে লইয়া বসিতে ভুলে নাই। চিরদিন সে যে-ভাবে এই ধনটিকে আগলাইয়া রাখিয়াছে, আজও তাহার ব্যত্যয় হইতে দিতেছে না। কমলা যুধিষ্ঠিরকে কিছু বলিতে চাহিতেছে, কিন্তু সেজ দেওরের অধ্যাপিকা-স্ত্রী তাহাকে মাঝে মাঝে বড় কঠিন দৃষ্টিতে লক্ষ করিতেছে দেখিয়া সুযোগ পাইতেছে না। অর্জুনের স্ত্রী রমা চোখের জল রুখিতে পারিতেছিল না। সে কাল রাত হইতেই কৃষ্ণকামিনীর কাছে রহিয়াছে। রমার চক্ষু দুইটি রীতিমত রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। দ্বিপ্রহরে যুধিষ্ঠির ও কমলা আসিবার পর তাহার কান্না পুরাপুরি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। কমলাকে সে চোখে চোখে রাখিয়াছে। কী মনে করিয়া রমা উঠিয়া গেল। তাহার অশ্রুসিক্ত রুমালখানি মেঝেতে সতরঞ্জির উপর পড়িয়া রহিল। রুমালটির দিকে একবার রোষপূর্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া কমলা আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া চুপিচুপি যুধিষ্ঠিরকে বলিল, আমার কাঁকাল ব্যথা করছে। আর বসে থাকতে পারছি না!

সে কি, এই সময় উঠে যাবে। নিন্দে হবে যে—

হোক নিন্দে, আমি আর পারছি না। তোমার মা, তুমি বসে থাক। বুড়ি যাচ্ছেও না, নিস্তারও দিচ্ছে না। যতদিন কাছে ছিলাম জ্বালিয়েছে, মরণকালেও জ্বালাচ্ছে।

ছিঃ ছিঃ তুমি এমন কথা বলবে ভাবতে পারছি না।

ভাবাভাবির কী আছে? যা সত্যি, তাই বলছি।

আঃ চেঁচিও না, সবাই শুনতে পাবে।

আমি চেঁচিয়েছি! তুমি তো চেঁচাচ্ছ। মায়ের প্রতি দরদ দেখানোর জন্যে জোরে জোরে কথা বলতে চাইছ। আমি বুঝি না, আমাকে সবার সামনে ছোট করার চেষ্টা।

আজকের দিনেও তুমি মায়ের উপর এমন রেগে থাকবে! সব ভুলে যাও, এসো দুজনে মিলে মায়ের জন্যে একটু কাঁদি। মা শান্তিতে যেতে পারবেন।

রমাদের মতো দেখন-কান্না কাঁদতে আমি পারি না। সে তুমি ভালোই জানো। আর যার জন্য কাঁদব তিনি কী আর .

কমলার কথা শেষ হয় নাই। রমা কাহাকে কী নির্দেশ দিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিল। কমলা চুপ করিয়া গেল এবং মুখে কাপড় চাপা দিয়া গুম মারিয়া বসিয়া রহিল।

কমলা নক্সাপুষ্ট হইয়া এই বাড়িতে প্রবেশ করিবার পরপরই কৃষ্ণকামিনী তিনজন ঝির মধ্যে একজনকে বলিয়াছিল, তোমাকে আর দরকার নেই মঙ্গলার মা। ছেলের বউ এনেছি, এখন থেকে সে-ই সব দেখাশোনা করবে। তুমি টাকাপয়সা বুঝে নাও কালই দেশে চলে

যেও। কৃষ্ণকামিনীর এই বধূবরণের অভিনব প্রথায় কমলার অন্তঃস্থলে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহার পর হইতে বৃহৎ সংসারের কর্মহীন চক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে কমলা লুকাইয়া চোখের জল ফেলিত।

কৃষ্ণকামিনী রূপবতী কমলাকে খাতির করিত না। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী হিসাবে কৃষ্ণকামিনী কমলাকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করিয়াছে। প্রাচীনা শ্বশ্রূমাতাটি বুঝিতেও পারে নাই যে, পুত্রবধূর ভিতরে নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায় অগণন ক্ষত জন্মিতেছিল। যুধিষ্ঠির যেদিন নিজগৃহ নির্মাণ করিয়া পিতৃগৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সেইদিন কমলা স্পষ্টতই অনুভব করিল দীর্ঘদিনের ক্ষতগুলি বিষাক্ত হইয়া তাহার সমগ্র দেহমন গ্রাস করিয়াছে। এবং কৃষ্ণকামিনী সম্পর্কে তাহার সত্তা শূন্যপ্রাণ বৃক্ষের ন্যায় কাষ্ঠবৎ হইয়া পড়িয়াছে। আপন সংসারে আজ পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়াও কমলা তাহার বধূজীবনের প্রাথমিকপর্বের দিনগুলিকে ভুলিতে পারে নাই। কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ও বিরাগ আজ বড় নিষ্ঠুর আকার ধারণ করিয়াছে। বিশেষ অনিচ্ছায় অর্ধমৃতা কৃষ্ণকামিনীকে সে দেখিতে আসিয়াছে এবং বুড়ি মরিতেছে না দেখিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কেবল রমার চোখে তাহার এই অস্বাভাবিক নিঃস্পৃহ মনোভাব ধরা পড়িয়া গেছে। কমলা ইহাতেই কিছুটা বিব্রত।

অর্জুন ঘরের কোণায় দাঁড়াইয়া তাহার এক বাল্যবন্ধুর সহিত কথা বলিতেছে। কথা বলিলেও তাহার দৃষ্টি বারংবার কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যুব্যথাতুর বিশুষ্ক মুখখানির দিকে চলিয়া যাইতেছিল। সেখান হইতে দৃষ্টিরশ্মি অন্তঃস্থলে ফিরিয়া আসিবার পথে এমন একটি স্থানে ধাবিত হইতেছিল যে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়া অর্জুন মরমে মরিয়া যাইতেছে। অথচ তাহা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবার কোনো প্রচেষ্টাও তাহার চিত্ত গ্রহণ করিতেছে না। ভিতরবাড়ি হইতে কৃষ্ণকামিনীর ঘরখানিতে ঢুকিবার যে দরজাটি আছে, সেখানে সহদেবের যুবতী শ্যালিকা দাঁড়াইয়া আছে। সহদেবের স্ত্রী সম্প্রতি গর্ভবতী হইয়া পিত্রালয়ে আছে। সে তাহার ভগিনীকে আজিকার মৃত্যু-উৎসবে তাহার প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছে। যুবতীটি এমনভাবে দণ্ডায়মান যে তাহার পীনোন্নত স্তনের ডৌল সুস্পষ্ট আকারে প্রতিভাত। তাহার নাভিপদ্ম হইতে স্তনদ্বয় পর্যন্ত উদরের অনাবৃত অংশ, অঙ্গবস্ত্র সরিয়া যাওয়ায়, লোভন হইয়া উঠিয়াছে। যুবতীর ভ্রূক্ষেপ নাই। সম্ভবত সে তাহার এই কামোদ্রেকী রূপবিভঙ্গ সম্বন্ধে অবহিত নহে। অর্জুনের নিকট নারীদেহ নতুন নহে। তাহার স্ত্রী রহিয়াছে। নগ্ন সৌন্দর্যের ভয়ঙ্করতা সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। তথাপি তাহার দৃষ্টি পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি সমীপে ধাবমান। এখন মাতৃশোকে তাহার চিত্ত বিবশ হইয়া যাইবার কথা। অথচ এই সম্পূর্ণ বিপরীত খেলার গণ্ডী হইতে সে বাহির হইতে পারিতেছে না। পলাইয়া যাইবারও ক্ষমতা নাই। অর্জুন নিজের কাছে পরাজিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বাল্যবন্ধুটি হঠাৎ বলিয়া বসিল, হ্যাঁ রে, তোর বৌয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলি না। অর্জুন যেন বাঁচিয়া গেল। রমাকে ডাকিয়া আনিয়া চক্ষের সম্মুখে দাঁড় করাইল। মামুলি কথাবার্তার অবকাশে অর্জুন পুনরায় অনুভব করিল, রমার দেহখানি তাহার সম্মুখে যে প্রাচীর সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া আঁখিপাখি দরজার নিকটে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অর্জুন শত চেষ্টা করিয়াও নিজেকে দমন করিতে পারিল না। কৌশলের আশ্রয় লইয়া দ্রষ্টব্য স্থলে তাকাইল। ততক্ষণে যুবতীটি সেখানে হইতে অন্য কোথাও সরিয়া গিয়েছে।

দেহপিঞ্জরে আত্মা আর কিছুক্ষণ হয়তো আবদ্ধ থাকিবে। সময় যতই অগ্রবর্তী হইতেছে, ততই কৃষ্ণকামিনীর বোধশক্তি অবসিত হইয়া আসিতেছে। প্রাতঃকালেও তাহার সামান্য জ্ঞান ছিল। কোনো এক পুত্রবধূ তাহাকে আশ্বাস দিয়াছিল, মা আপনার সব ছেলেমেয়ে

আসবে. সবাইকে খবর দেওয়া হয়েছে। কৃষ্ণকামিনী পুত্রবধূটিকে চিনিতে পারে নাই। সে রমা। লোক চিনিবার ক্ষমতা তখন হইতেই বিলুপ্ত হইতেছিল। বর্তমানে সে-ক্ষমতাব কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। কৃষ্ণকামিনীর পরিণীতা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যাটি শোকোচ্ছ্বাসের মধ্যে লক্ষ করিল, মায়ের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু নড়িতেছে। সে প্রায় আর্তনাদ করিয়া উঠিল. মা কি যেন বলছে, বড়দা মা কি যেন বলছে। বুড়ির সমগ্র নিকট আত্মীয়দের দল বিধবার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। কৃষ্ণকামিনী কিছুই বলিল না। প্রত্যেকেই হতাশ হইল। কৃষ্ণকামিনীর এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া কেবল করুণ সুরে বলিল, দিদি মনে হয় গঙ্গাজল চাইছেন। বাবা যুধিষ্ঠির, একটু গঙ্গাজল দে বাবা। কৃষ্ণকামিনীর ঠাকুরঘর হইতে গঙ্গাজল আনিতে গেল নকুলের স্ত্রী।

নবনীতা হতাশ হইল। সে আশা করিয়াছিল এই ডামাডোলের মাঝখানে পরিণীতা হয়তো মায়ের হাতখানি ছাড়িয়া দিবে এবং সে ঐ হাতখানির উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবে। পরিণীতা হাত ছাড়িল না। আরও দ্বিগুণ উদ্যমে মথিত করিতে লাগিল। নবনীতা বিনোদচন্দ্রের মুখে চুনকালি নাখাইয়া প্রেম করিয়া এক কায়স্থ সন্তানকে বিবাহ করিয়াছিল। ফলত. পিতা তাহাকে বিবাহোপলক্ষে কানাকড়িও দেয় নাই। বিনোদচন্দ্র কন্যাটিকে ত্যাজ্য করিতেই কেবল বাকি রাখিয়াছিলেন। পিতা যারপরনাই বঞ্চনা করিলেও মাতা তাহাকে গোপনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়াছে। নবনীতার স্বামী একটি প্রাইভেট কোম্পানির মেজকর্তা। তাহারা সংসারে সুখী হইয়াছে। কিন্তু নবনীতার মনে ততোধিক শান্তি নাই। তাহার দুই বোনের প্রত্যেকের গাড়ি আছে, সমাজে এক জাতীয় প্রতিষ্ঠা আছে, সর্বোপরি নিজস্ব বাড়ি রহিয়াছে। তাহাকে এখনও ভাড়া বাড়িতে থাকিতে হইতেছে। তাহার স্বামী গত পনেরো বৎসর ধরিয়া 'বাড়ি করব, বাড়ি করব' বলিয়া নাচিতেছে; হয়তো আগামী বৎসরগুলিতেও নাচিবে। স্বপ্নের বাড়ি স্বপ্নেই বিলীন হইতেছে। পিতৃবঞ্চনার কারণে নবনীতা যত না কাতর. তাহার অধিক কাতরতা জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠার বৈভবের ক্রমবর্ধমান বহর দেখিয়া। নবনীতা অবশ্য একটি দিকে তাহার ভগিনীদের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালিনী। তাহা হইল তাহার দুই পুত্র মানুষ হইয়াছে। বড়টি সম্প্রতি ব্যাঙ্কে চাকুরি পাইয়াছে; ছোটটি ডব্লু বি সি এসের জন্য প্রস্তুতি লইতেছে। অপর দিকে দুই ভগিনীর পুত্রকন্যারা নিজদিগকে অকালকুষ্মাণ্ড ও মাকাল ফলরূপে সংসাব-উদ্যানে পরিচিত করাইয়াছে। নবনীতা মাতার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সুখ-দুঃখ, প্রবঞ্চনা-প্রাপ্তির বহুতর কথা ভাবিতেছিল। শমিতা গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া নবনীতার কাছে আসিল। উদাস স্বরে বলিল, তুমি সারাদিন কিছু মুখে দিলে না। চল, এখন একটু চা অন্তত খাও।

না ভাই, কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না। এই ভালো আছি। তুমি বরং কিছু খেয়ে নাও। সেই কাল রাত থেকে চরকির মতো ঘুরছ. খাটছ।

শমিতা কিছু বলিল না। সে বিলক্ষণ বুঝিল তাহার এই ননদটি 'এ বাড়ির জলস্পর্শ করব না' বলিয়া পূর্ব-প্রতিজ্ঞা করিযা ছিল. তাহাই আপ্রাণ চেষ্টায় জিয়াইয়া রাখিতেছে। শমিতা অন্য কাজে চলিয়া গেল।

ভীমদেব মাতার নাড়ি-স্পন্দন একবার অনুভব করিয়া গেল। তাহার মুখ দেখিয়া ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইল যে. কৃষ্ণকামিনীব চরম সঙ্কটকাল উপস্থিত। যে-কোনো মুহূর্তেই চলিয়া যাইতে পারেন। পুত্রের দিক হইতে কনিষ্ঠ সহদেব ও কন্যার দিক হইতে সর্বশেষ পরিণীতা— উভয়ের মধ্যে চোখে চোখে কি যেন কথা হইয়া গেল। মায়ের হস্তসেবা ছাড়িয়া সে উঠিতে পারিতেছে না। বড়ই বিচিত্র ফাসাদ! অথচ সহদেব পরিণীতার নিকট হইতে যাহা জানিতে চাহিতেছে তাহা না জানিলে সে স্বস্তি পাইতেছে না। অবশেষে সহদেব সাতপাঁচ ভাবিয়া বড়দিদি বিনীতাকে বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গেল। বিনীতা মাতার বলি দুইটিকে

জামার তলায় চালান করিয়া সহদেবের সকাশে বাহিরে আসিল। সহদেব ইতস্তত করিয়া দিদিকে জিজ্ঞাসা করিল, বাড়ি নিয়ে তোর সঙ্গে সেজদার কোনো কথা হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে তুই কিছু শুনিসনি।

না, পরি সামান্য কিছু বলেছে, পুরোটা শুনিনি।

ও। হ্যাঁ, সেজদা এই বাড়ি কিনতে চাইছে। আমরা তো আর এই বাড়িতে থাকব না। আমাদের যদি কোনো আপত্তি না থাকে। তোর কী মত?

আমার কোনো মত নেই। তোরা যা বলবি তাই হবে। তোব মত কী?

আমি অনেকদিন থেকেই ভেবেছিলাম বাড়িটা আমি কিনব। এত বড়, এত ভালো, এমন পজিশনে কোনো বাড়ি এ তল্লাটে নেই। তোর জামাইবাবুর অবশ্য ইচ্ছা নেই। ও বলছিল, কী সব আইনের ঝামেলা হবে।

ছোড়দাকে আমরা যদি লিখে দিই ....

সেখানেও তো সবার মত চাই। আমি কিনলে অবশ্য নান্টুকে থাকতে দিতাম। যা ভাড়া দিত—দিত। বাড়িটার প্রতি আমার মায়া মমতা কতদূব তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না!—এই বলিয়া বিনীতা অন্যমনস্কভাবে তাহার সম্মুখেব বাবান্দার বাহাবি বেলিঙগুলিতে হাত বুলাইল।

ছোড়দা এসব ব্যাপার জানে?

জানে না বোধহয়। তুই এখনই কিছু ওকে বলিস না। মায়ের কাজকর্ম ভালোয় ভালোয় হয়ে যাক। নইলে নান্টু মুষড়ে পড়বে।

সহদেব বিনীতার সাবধানবাণীতে সম্মতি জানাইল। এবং তৎসহ সে তাহার লবণহ্রদস্থিত ওনারশিপ ফ্ল্যাটটির কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে খুবই আনন্দিত হইল।

সন্ধ্যা নামিতে আর বাকি নাই। সূর্যদেবতা পাটে যাইতেছেন। আকাশ গোধুলির রঙে রঙিন হইয়া আছে। চতুর্দিকে একপ্রকার মায়াবী আলোয় ভরিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার অপরাহ্নে কালেভদ্রে এজাতীয় আলো দৃষ্ট হয়। ইহাই কনে-দেখা-আলো বলিয়া খ্যাত। বিনোদচন্দ্রের বাড়িটি ক্রমে ক্রমে পাড়া-প্রতিবেশীদের আগমনে ভরিয়া উঠিয়াছে। সকলেই যেন অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে কৃষ্ণকামিনী কখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিবে। বুড়ির পুত্র ও কন্যা ভাগ্য দেখিয়া কোনো কোনো প্রবীণ মানুষ অল্প ঈর্ষান্বিত হইয়াছে। একজন ব্যতীত সকলেই কৃষ্ণকামিনীকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, অথচ সুখের বিষয় তাহারা মৃত্যুলগ্নে সবাই উপস্থিত। মহিলাটিকে ভাগ্যবতী বলিতে হইবে!

ইহাকে কাকতালীয় বলিলেই যথার্থ বলা হয়। ঘটনাটি হইল নান্টু পুষ্প-ধূপ-খৈ-ধামা ইত্যাদি লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল আর কৃষ্ণকামিনীর প্রাণবায়ু নির্গত হইল। মৃত্যুর সঙ্গে দীর্ঘ সংগ্রামে অবশেষে অষ্টসন্তানবতী মাতাটি হার স্বীকার করিল। মুহূর্তের মধ্যে কৃষ্ণকামিনীর ঘর হইতে মডাকান্নার রোল উত্থিত হইযা বাতাস ভারি করিয়া তুলিল। নান্টু নিচতলা হইতেই বুঝিল, মা চলিয়া গেলেন এবং তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটুকু সরিয়া গেল।

কন্যা এবং পুত্রবধূরাই তারস্বরে কাঁদিতেছে। পুত্রেরা নীরবে চোখের জল ফেলিল। ভীমদেবের অকস্মাৎ মনে হইল, সমগ্র পৃথিবীতে তাহার আর আপনজন বলিয়া কেহ রহিল না। অর্জুন মায়ের কোমল পা দুইটি ধরিয়া চক্ষের জল লুকাইতে চেষ্টা করিতে করিতে দেখিল সহদেবের শ্যালিকা বাহিরের অলিন্দে বিরস বদনে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চোখ অশ্রুশূন্য। কৃষ্ণকামিনীর মৃত্যু তাহার অন্তরে কিছুমাত্র আলোড়ন তুলিতে পারে নাই। সে যেন এখান হইতে যাইতে পারিলে বাঁচে! কমলা কাঁদিতে কাঁদিতে এমনই বিবশা হইয়া

পড়িল যে, টাল সামলাইতে না পারিয়া শ্বশুরের ছবিখানির উপর পড়িয়া গেল। ছবিখানি পালঙ্ক হইতে ভূমিতে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইল।

অশ্রুমোচনের গতি স্তিমিত হইয়া আসিল। সকলেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। যাহা ঘটিল, সে-সম্বন্ধে এখনও কেহই ধাতস্থ হইতে পারে নাই। মাঝে মাঝে কেবল কৃষ্ণকামিনীর চন্দনা পাখিটি ট্যাঁ-ট্যাঁ করিয়া নিজের অস্তিত্ব প্রচার করিতেছে। ভিতর বাড়ির উঠানে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখিটি তারস্বরে কৃষ্ণকামিনীকে ডাকিতেছে—সাড়া পাইতেছে না। এই সময়ে তাহার দুগ্ধ সহযোগে ভিজা মুগ ডাল খাইবার কথা। পাখি শোকস্তব্ধ পরিবেশকে উপেক্ষা করিয়া চেঁচাইতেছে। ঘরের মধ্যে বিনীতা কিয়ৎক্ষণ ইতস্তত করিয়া বেদনা-বিজড়িত কণ্ঠে, কনিষ্ঠাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, পরি, মায়ের হাত থেকে চুড়ি তিনটে খুলে নে। হাত শক্ত হয়ে গেলে আর পারবি না। পরিণীতা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় জ্যেষ্ঠার নির্দেশ পালন করিল। সহদেব এই কাজে আদরণীয়া ছোটবোনটিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিল! তাহার সহায়তার অবশ্য দরকার হইল না। নবনীতা সমগ্র দৃশ্যটি দেখিয়া তীব্রস্বরে আর একবার কাঁদিয়া ফেলিল। কেহই তাহার এই আচরণের ব্যাখ্যা খুঁজিতে তৎপর হইল না। সকলেই ভাবিল ইহা নিদারুণ শোকের বহির্প্রকাশ।

যাত্রাপর্বের সূচনা করিতে অনেক রাত হইয়া গেল। পুত্র-কন্যারা পরমস্নেহময়ী মাতাকে সযত্নে অজস্র শ্বেতপুষ্পে সাজাইয়াছে। অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক পূর্ণ। রমা শ্বশ্রূমাতার পা-দু-খানি অলক্তকে রাঙাইয়া স্মৃতিচিহ্ন লইয়াছে। যুধিষ্ঠির আর অপেক্ষা করিতে রাজি হইতেছে না। রাত বাড়িয়া যাইতেছে।

অবশেষে শ্মশানযাত্রার সমস্ত পর্ব সমাপ্ত হইল। কৃষ্ণকামিনীর দেহখানি রাস্তায় আনা হইয়াছে। রাত্রি হইলেও প্রতিবেশীদের ভিড় কম নয়। নান্টু ছবি তুলিবার যে লোকটিকে আনিয়াছে সে সুযোগ খুঁজিতেছে আরও কয়েকটি ছবি গ্রহণের। সুযোগ পাইতেছে না দেখিয়া সামনের বাড়ির রোয়াকে উঠিয়া যন্ত্রখানি তাক্ করিতেছে। লোকটি বড়ই রসিক। সে হাসিতে হাসিতে বলিল, দিদিমার মেয়েরা দয়া করে এগিয়ে আসুন। খাটের বাঁ দিকে বসে একটু কাঁদুন —আমি একটা শট নিয়ে নি। নবনীতা অবাক হইয়া ভাবিতেছিল, লোকটি ছবি তুলিবার কালে যাহা বলা হয় ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে। অথচ এই পরিস্থিতিতে তাহা সাযুজ্যহীন নহে। কন্যারা কেহই ছবি তুলিতে আগ্রহী হইল না।

পুষ্পচন্দনে সজ্জিতা কৃষ্ণকামিনীকে বিসর্জনলগ্নের সহাস্য দেবী প্রতিমার ন্যায় লাগিতেছে। কিন্তু রমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, অজস্র ফুলের ভারে কৃষ্ণকামিনী ক্লিষ্ট হইয়া আছেন। পুত্রেরা হরিধ্বনি দিয়া মাতাকে স্কন্ধে চাপাইবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া রমা সবার অলক্ষ্যে কৃষ্ণকামিনীর বুক হইতে একটি পদ্ম তুলিয়া লইল। ফুলটি কৃষ্ণকামিনীর প্রতি তাহার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার দ্যোতক। ইহা শ্মশানের আগুনে পুড়িতে দিবার নহে।

থুতু ছিটাবার পর

ইমদাদুল হক মিলন

তারপর যেন নিজেকে চিনতে পারল নূরজাহান, এবার যেন নিজের মধ্যে ফিরে এল।

ছোবল মারার আগে ভয়ংকর গোখরো যেমন করে ফণা তোলে, যেমন করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শিকারের দিকে, মান্নান মাওলানার মুখের দিকে তেমন করে তাকিয়ে থেকে, ওই ঘৃণিত মুখ দেখতে দেখতে যেন বা আশ্চর্য এক ঘোর লেগে গিয়েছিল নূরজাহানের চোখে। যেন বা নিজের অজান্তেই থুতুটা সে ছিটিয়ে দিয়েছিল। যার জন্য এই ঘৃণা-ক্রোধ, সেই মানুষটির কথা পর্যন্ত তার মনে ছিল না। মাকুন্দা কাশেম।

কিন্তু মানুষজন স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঘোর কেটে যায় নূরজাহানের। বুকের ভেতর ফুঁসে ওঠা গোখরো বুকের ভেতরই মুখ লুকোয়। শরীর হিম হয়ে আসে।

খানিক আগে, এই শীত সকালেও নূরজাহানের শরীর জুড়ে ছিল চুলোর ভেতরকার নাড়ার তলায় লুকিয়ে থাকা আগুনের মতো ধিকিধিকি উষ্ণতা। ধেনো মরিচ চিবিয়ে খেলে কান মুখ যেমন ঝাঁ ঝাঁ করে, বুক জুড়ে নূরজাহানেব ছিল তেমন হাসফাঁসানি। হাত পায়ের তলা ছিল তার ওমে বসা মুরগির পেটের মত। গরম জল ঢেলে দেওয়ার পর গর্ত থেকে যেমন করে বেরিয়ে আসে বিষাক্ত কালজাত, মাথার তালু ফুটো করে তেমন করে তার বেরুতে চেয়েছিল মগজের কোষে আটকে পড়া ভয়াবহ এক উষ্ণতা। পাখির ডিমের মতো ফেটে যেতে চাইছিল দু'চোখ। নদীর চোরাস্রোতের মতো শিরায় শিরায় বইছিল যে রক্তস্রোত, আশ্চর্য কোন এক মন্ত্রবলে যেন রুদ্ধ হয়েছিল সেই স্রোতধারা।

এখন মুহূর্তেই উধাও হয়েছে সব।

এই এতক্ষণ প্রকৃতি ছিল প্রকৃতির মতো উদাস, নির্বিকার। কিন্তু এখন নূরজাহানের মনে হয় প্রকৃতি আর উদাস, নির্বিকার হয়ে নেই। প্রকৃতির শিরায় শিরায় বহতা রক্তস্রোত যেন জটিল এক জলস্রোতে রূপান্তরিত হয়েছে। হিমশীতল সেই জলস্রোত যেন গভীর জলের তলায় ডুবিয়ে দিচ্ছে প্রকৃতিকে। শীতের বেলা তেজাল হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ রোদ উষ্ণ করে তুলছিল দেশগ্রাম কিন্তু নূরজাহানের মনে হয় বেলা অবেলা বলে কিছুই যেন নেই, রোদ বুঝি উঠেইনি। উষ্ণতা বলেও কিছু যেন নেই কোথাও। চারদিক জলতলার কাদার মতো থিকথিকে, হিম।

স্বচ্ছ আকাশ ছুঁয়ে দূর নদীচরের দিকে উড়ে যাচ্ছিল যে সব ভিনদেশী পাখি, নূরজাহানের মনে হয়, ডানা যেন অবশ হয়েছে তাদের। ওড়ার শক্তি হারিয়ে আকাশেই যেন স্থির হয়েছে তারা।

পথপাশের হিজল ছায়ায় বসে একাকী ডাকছিল যে ডাহুক, এই মাত্র যেন তার স্বরনালী কামড়ে ধরেছে চতুর এক পাতিশেয়াল।

আর বহুদূরের অচিনলোক থেকে আসছিল যে উত্তুরে হাওয়া, হু হু করে বইছিল, আচমকাই যেন বন্ধ হয়েছে তার চলাচল। পৃথিবীর কোথাও যেন এখন কোনও হাওয়া নেই। পৃথিবীর সর্বত্রই যেন এখন এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

হাওয়াহীন পৃথিবীতে কেমন করে বাঁচে মানুষ।

শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় কেমন করে বাঁচে।

হাওয়ার আশায়, বাঁচার আশায় নূরজাহান তারপর শস্যের মাঠ ভেঙে ছুটতে থাকে। মাকুন্দা কাশেমের কথা শুনে যেমন করে ছুটে এসেছিল ঠিক তেমন করেই ছুটে যায় সে। পেছনে স্তব্ধ হয়ে থাকে সারা গ্রামের মানুষ, থানার পুলিশ আর কুকুরের মতো মার খাওযা মাকুন্দা কাশেম।

ছোকরিটা কে?

স্তব্ধ হয়ে থাকা মান্নান মাওলানা বুঝতেই পারলেন না প্রশ্নটা কে করেছে। তবে এই প্রথম মাথাটা নড়ল তাঁর। ফ্যাল ফ্যাল করে এর ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি। দুঠোঁটের ঠিক মাঝখানে তখনও লেগে আছে নূরজাহানের ছিটিয়ে দেয়া থুতু।

একজন কথা বলেছে দেখে সবারই যেন স্তব্ধতা ভেঙেছে। মোতালেব ছিল মান্নান মাওলানার কাছাকাছি। আরও কাছে এগিয়ে সে খুবই সহানুভূতির গলায় বলল, মোকে অহনতরি ছ্যাপ (থুতু) লাইগ্যা রইছে হুজুর। আমার কাছে নুমাইল (রুমাল) আছে। ধোয়া নুমাইল। কাইল ঐ আপনেগ বউ সাপান দিয়া ধুইয়া দিছে। দিমু আপনেরে? মোকখানা পোছেন।

এবার ঘটনাটা যেন মনে পড়ল মান্নান মাওলানার। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠলেন তিনি, ছটফট করে উঠলেন। যেন পায়ের কড়ে আঙুলে আচমকা কামড দিয়েছে বিষাক্ত চ্যালা। কিন্তু কথা বললেন না তিনি। ডানহাতের চেটোয় ঠোঁটে লেগে থাকা থুতু দুতিনখানা ঘষায় মুছলেন।

আতাহার ছিল দলের পিছন দিকে। তার সঙ্গে আলী আমজাদ, সুরুজ, আলমগীর, নিখিল। যেন ভারী একখানা আমোদ আহ্লাদের কাণ্ড হচ্ছে গ্রামে এমন ভঙ্গিতে ইয়ার দোস্তদের সঙ্গে চাপা গলায় ঠাট্টা মশকরা করতে করতে, আলী আমজাদের টানতে থাকা সিগ্রেট তার হাত থেকে নিয়ে গোপনে টানছিল সে, গোপনে ধোঁয়া ছাড়ছিল। আতাহার জানে মান্নান মাওলানা জানে তার ছেলে সিগ্রেট তো বেদম খায়ই, মদও খায়। তবু এত লোকজনের মধ্যে তার সিগ্রেট খাওয়াটা বাবার চোখে যাতে না পড়ে সেই চেষ্টা আতাহার প্রাণপণে করছিল।

কাণ্ডটা ঘটে যাওয়ার পর অন্য সবার মতো আতাহারও এতক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল। এখন লোকজনের কথা শুনে, বিশেষ করে মোতালেবের কথায় সিগ্রেট খাওয়ার কথা ভুলে, ইয়ার দোস্তদের ফেলে বাবার কাছে এগিয়ে এল। যেন হঠাৎ করেই বাবার বাবা হয়ে গেছে এমন গুরুগম্ভীর স্বরে বলল, পুকঐরে গিয়া মোক ধুইয়াহেন বাবা। তাড়াতাড়ি যান।

সড়কপারে জাহিদ খাঁর ছোট্ট পুকুর। আতাহারের কথা শুনে মনমরা ভঙ্গিতে সেই পুকুরেব দিকে নেমে গেলেন মান্নান মাওলানা। আঁজলা ভরা জলে তিন-চারবার মুখখানা বেশ ভাল করে ধুলেন। তারপর পাঞ্জাবির খুঁটে মুখ মুছতে মুছতে আগের জায়গায় ফিরে এলেন। তখুনি তাঁব পাশে পাশে চলা পুলিশটি হাতের সিগ্রেটে শেষটান দিয়ে বলল, কথার উত্তর দিলেন না যে।

তারপর সিগ্রেট পায়ের কাছে ফেলে বুট দিয়ে চেপে দিল।

মান্নান মাওলানা যেন কিছুই মনে নেই এমন দিশেহারা গলায় বললেন, কোন কথার?

জিজ্ঞেস করলাম না, ছোকরিটা কে?

এবার যেন সবকিছুই মনে পড়ল মান্নান মাওলানার। সামান্য লজ্জিত হলেন তিনি। কথাডা তাইলে আপনে জিগাইছেন?

তবে কে?
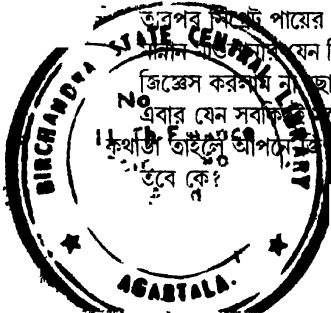
আমি বোজতে পারি নাই।

পুলিশ অফিসার ঠাট্টার গলায় বললেন, এখন পারছেন তো?

অফিসারের ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না মান্নান মাওলানা। সরল গলায় বললেন, জি হ্, পারছি।

তাহলে বলেন।

ছেমড়ির নাম নূরজাহান।

নূরজাহান! বা বা বা, একেবারে মোগল সম্রাজ্ঞী! বাপের নাম কী? থাকে কোথায়? তারপরই ঠাট্টার সুর বদলালেন তিনি।

আমগ গেরামের মাইয়া ঐ। বাপের নাম দবির। দবির গাছি।

চলুন ধরে নিয়াসি।

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না মান্নান মাওলানা। অবাক গলায় বললেন? ক্যা?

মান্নান মাওলানার কথা শুনে তার চেয়েও বেশি অবাক হলেন পুলিশ অফিসার। আপনি বুঝতে পারছেন না, কেন? ওর মেয়ে একটি চোরের জন্য গ্রামের সব লোকের সামনে আপনার মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়েছে। অতিবড় অপমান করেছে আপনাকে। বাপটাকে বেঁধে নিয়েসে ভাল করে পিটানি দিলে মেয়েটা সোজা হয়ে যাবে।

অফিসারের কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মোতালেব অতি উৎসাহের গলায় বলল, পুলিশ সাহেব ঠিক কথাঐ কইছে। লন, ধইরা লইয়াছি শালার পো শালারে।

মান্নান মাওলানা ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, অরে ধইরা লাব কী? অরে মাইরা লাব কী?

পুলিশ অফিসার বললেন, কিন্তু অতটুকু মেয়েকে তো ধরা সম্ভব না। মারা সম্ভব না।

ক্যা?

আইনের প্যাঁচ আছে। আপনি বুঝবেন না।

সামান্য সময় কিছু ভাবলেন মান্নান মাওলানা। তারপর শান্ত গলায় বললেন, তাহলে বাদ দেন।

মোতালেব কিছু একটা বলতে চাইল তার আগেই আতাহার বলল, বাদ দিব ক্যা? এমুন একখানা কাম করছে ছেমড়ি ...।

আতাহারের কথা শেষ হওয়ার আগেই হাত তুলে তাকে থামালেন মান্নান মাওলানা। শীতল চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বুক হিম করা জলদগম্ভীর গলায় বললেন, কী করছে না করছে হেইডা পাওয়া যাইবোনে। অহন এই হুগল লইয়া চিন্তা করনের কাম নাই। টাইম আছে।

তারপর অফিসারের দিকে তাকালেন তিনি। গলার স্বর একেবারেই বদলে, হাসি হাসি মুখ করে বললেন, নাদান মাইয়া। কিছু না বুইজ্জা কামডা করছে। আল্লায় কইছে নাদানের মাপ কইরা দিও। অরা অবুজ। আমি আল্লাপাকের খাসবান্দা। এর লেইগা আমি অরে মাপ কইরা দিলাম। আপনেরা অহন আপনেগ কাম করেন। গরুচোররে লইয়া যান। মেদিনমোন্ডল গেরামে চোরছ্যাচরের জাগা নাই।

মান্নান মাওলানার শেষ কথায় মাকুন্দা কাশেমের কথা মনে পড়ল সবার। এতক্ষণ যেন সবাই তার কথা ভুলে ছিল। সবাই তারপর একসঙ্গেই যেন সড়কের মাটিতে লেছড়ে পেছড়ে বসে থাকা কাশেমের দিকে তাকাল। কাশেম তখন মরণদশায় আচ্ছন্ন ঘেয়ো কুকুরের মতো ঝিম মেরে আছে। জগৎ সংসারের কোথায় কী ঘটছে কিছুই যেন টের পাচ্ছে না সে।

দাঁড়কাকের মুখ থেকে ছিনিয়ে রাখা মুরগির ছাটা বেশ গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। বুকের ক্ষত একেবারেই মিলিয়ে গেছে। ক্ষতের জায়গায় সাদা কালোয় মেশানো ফুরফুরে সুন্দর ফইর (পালক) গজিয়েছে। দেখতে বেশ লাগে। বাড়ির অন্যান্য মোরগ মুরগির তুলনায় সে খুবই অন্যরকম। অন্যগুলোর সঙ্গে খুবই অমিল। সাধারণ মোরগ মুরগির তুলনায় সে একটু

বেশি পরিপাটি। একটু বেশি ছিমছাম। একটু যেন বেশি লম্বা। ঠোঁট দু'খানা একটু বেশি লাল, পা দুখানা একটু বেশি ফর্সা। লেজের গঠনটাও অন্যরকম। হঠাৎ করে তাকালে মুরগি মনে হয় না। মনে হয় অচেনা কোনও পাখি। দূর কোনও বনভূমি থেকে আচমকাই যেন এসে নেমেছে গৃহস্থ বাড়ির নির্জন আঙিনায়।

দেখতে যেমন অন্যরকম স্বভাব চরিত্রও তেমন অন্যরকম ছাটার। মোরগ নয় সে, মুরগি, তবু এই বয়সেই সে বেশ ডাকাবুকো। নিজের বয়সীগুলোকে তো নয়ই, বাড়ির ধাড়িগুলোকে পর্যন্ত তোয়াক্কা করে না, পাত্তা দেয় না। বেশ মেজাজী, বেশ রাশভারি ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। অন্যান্য মোরগ মুরগির সঙ্গে বিন্দুমাত্র বনিবনা নেই। কারও দিকেই ফিরে তাকায় না সে, কাউকেই পছন্দ করে না। একা, নিজের মেজাজ মর্জিমতো চরে বেড়ায়। একাকী আহার খায়। অন্যান্য মোরগ মুরগিগুলো তাকে বেশ সমীহ করে।

ভোরবেলা আগেরদিন রাখা ফ্যানের সঙ্গে কুরো মিশিয়ে খাদ্য ভর্তি করে মোরগ মুরগিদের খেতে দেয় মরনি। গোলা ছাতুর মতো থকথকে সেই খাবার দেখেই ঝাঁপিয়ে পড়ে মোরগ মুরগিগুলো। অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে গলা পেট ফুলিয়ে ফেলে। খাবারটি যেন খুবই পছন্দ তাদের। রাতভর যেন এই খাবারের অপেক্ষায়ই থাকে। কখন সকাল হবে, কখন ফ্যানে গোলা কুরো খাবে তারা।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, সেই ছাটা কুরো মুখে দেয় না। তাকে দিতে হয় খুদ কিংবা ধান কাউন। কুরোর খাদার অদূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। সে বেশ রাজকীয় ভঙ্গিতে একাকী খুটে খুটে খায়। অন্যানাদের কেউ যদি কুরোর খাদা পেলে ভুল করে তার খাবারে ভাগ বসাতে আসে, যদি ঠোঁটে তুলে নেয় একটি দানা, বড় কিংবা ছোট, তার আর রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে সে। ঠোকরে ঠোকরে এবং জোড় পায়ের লাথিতে লাথিতে নাস্তানাবুদ করে দেবে তার খাবারে ভাগ বসাতে আসা শত্রুকে।

দিনে দিনে তার এই স্বভাবের কথা জেনে গেছে বাড়ির অন্য মোরগ মুরগিগুলো। ফলে তারা ভয়ে তার ছায়া মাড়ায় না। তারা সব এককাট্টা হয়ে চরে বেড়ায়। সে চরে তার মতো একা।

অন্যান্যদের সঙ্গে খোয়াড়েও থাকে না সে। থাকে বড় ঘরে। মরনির সঙ্গে। মরনি চৌকিতে আর সে পাটাতনের এককোণে, পলোর ঘেরে।

প্রথমদিন মরো মরো অবস্থা দেখে ছাটিকে মরনি খোয়াড়ে রাখেনি। এমনিতেই নড়াচড়ার শক্তি নেই, একপাল মোরগ মুরগির সঙ্গে খোয়াড়ে রাখলে জান যেটুকুই বা আছে, ড্যাকরাগুলোর পায়ের চাপে সেটুকুও থাকবে না ভেবে তাকে মরনি ঘরে এনে রেখেছিল। অতিযত্নে পাটাতন ঘরের এককোণে বসিয়ে পলো দিয়ে আটকে রেখেছিল। যদিও হাঁটাচলার শক্তি ছিল না তার তবু রেখেছিল মরনি। যেন বা নিজের অজান্তেই রেখেছিল।

পরদিন সকালে দেখা গেল দশা একটু ভালর দিকে। ঠিকঠাক মতো দাঁড়াতে পারে না ঠিকই, তবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। বুকের ক্ষতে হলুদ চুন বেশ চেপে বসেছে। শুকিয়ে ঘুটে লাগবার দশা।

মরনির মনটা ভাল হয়ে গিয়েছিল। দু'হাতে কোলের কাছে ধরে, অথর্ব ছেলেমেয়েকে যেমন করে ঘর থেকে বাইরে আনে মা ঠিক সেই কায়দায় বাইরে এনে রান্নাচালার সামনে আবার আটকে দিয়েছিল পলোর ঘেরে। মুখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছিল একমুঠ চাল। কোনওরকম খুটে খুটে তাই খেয়েছিল ছাটা। একইভাবে কয়েকদিনের চেষ্টায়, মরনির সেবাযত্নে প্রাণ ফিরে পেল সে। গা ঝাড়া দিল, উঠে দাঁড়াল।

মরনি তখন ভেবেছে এবার দলের সঙ্গে মিশে যাবে ছাটা। দলের সঙ্গে কুরো খাবে, দলের সঙ্গে খোয়াড়ে থাকবে। ড্যাকরী হয়ে ওঠার পর নিয়ম মতো ডিম দেবে।

কিন্তু মরনির ভাবনা উল্টোপাল্টা করে দিল সে। কুরোর খাদায় কিছুতেই মুখ দিল না, খোয়াড়ে কিছুতেই ঢুকল না।

সন্ধের মুখে মুখে অন্যান্য মোরগ মুরগিগুলো যখন খোয়াড়মুখো হয়ে, আপন ইচ্ছেয় খোয়াড়ে ঢোকে কোনওটা, কোনওটাকে তাড়া দিয়ে ঢোকাতে হয় তখন। ও চলে যায় বড়ঘরের সামনে। লাফ দিয়ে ওঠে ঘরের সামনের তক্তায়, সবাধানী ভঙ্গিতে অন্ধকাব জমে ওঠা ঘরেব ভেতর গলা বাড়িয়ে দেখে তারপর খোলা দরজা দিয়ে পায়ে পায়ে ঢুকে যায় ঘবে।

প্রথম দু'তিনদিন এই দেখে কী রকম এক অপত্যস্নেহ যেন নিজের অজান্তেই নিজের ভেতর জেগে উঠতে দেখল মরনি। ছাটাকে আর খোয়াড়ে রাখার কথা ভাবল না সে। ঘরেই রাখল। সন্ধের মুখে মুখে অন্যান্য মোরগ মুরগি খোয়াড়ে আটকে ঘরে এসে কুপি জ্বালে। জ্বালিয়ে দেখে পাটাতন ঘরের অন্ধকার কোণে নিজের জায়গায় বেশ গুছিয়ে বসে আছে সে। দেখে বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে মরনিব। বুকের শিশুটির মতো তার সঙ্গে আধো স্বরে কথা বলে। ওলে আমাল সোনালে, কুনসুম ঘরে আইছো তুমি? আমি দিহি তোমারে দেখলাম না।

ছাটা কুনকুন করে মৃদু একটা শব্দ করে। আর মরনির মনে হয় সে যেন তার কথার উত্তর দিচ্ছে।

তারপর উঠোনে ফেলে রাখা পলো ঘরে এনে পলোর ঘেরে তাকে আটকে রাখে মরনি। পলোর মুখে বসিয়ে দেয় একখানা জলচৌকি। কী জানি কখন পাটাতনের ভাঙাচোরা দিয়ে ঘরে এসে ঢুকবে আততায়ী হুলো। পলোর মুখ বন্ধ না কবলে সেই মুখ দিয়ে ভেতরে ঢুকে পলোর ঘরের ভেতর বসেই হয়ত নিঃশব্দে সাবাড় করবে ছাটাকে। এক শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আরেক শত্রুর হাতে তুলে দেয়া হবে অবোলা একটি প্রাণ।

এখন কোনও কোনওদিন পলোটা ঘর থেকে বের করবার কথা মনেই থাকে না মরনির। ভোরবেলা ছাটাকে ছেড়ে দেওয়ার পর যেমন থাকে পলো তেমনই পড়ে থাকে। শুধু মুখ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় জলচৌকিটা। সন্ধেবেলা দেখা যায়, ঘরে ঢুকে নিজেই সে লাফিয়ে ওঠে পলোর মুখে। তারপর পলোর মুখ গলে নিজেই লাফিয়ে নামে নীচে। জায়গা মতো গুছিয়ে বসে। মরনি শুধু জলচৌকি দিয়ে মুখটা আটকে দেয়। দু'চারটি আদুরে কথা বলে।

এই কারণেই কিনা কে জানে, আশ্চর্য এক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে দুটি প্রাণীর। একজন মা আর একজন যেন শিশু। বাড়ির অন্যান্য মোরগ মুরগির সঙ্গে না মিশে ছাটা ঘুরে বেড়ায় মরনির পায়ে পায়ে। বাড়ির যেখানেই যাক মরনি সে আছে তার সঙ্গে। বাধুক কুকুর বেড়াল কিংবা ছাগলছানার মতো!

এই যেমন এখনও মরনির পায়ের কাছে ঘুরঘুব কবছে সে। কিন্তু মরনি তার দিকে তাকিয়েও দেখছে না।

কোনও কোনওদিন সকাল গড়িয়ে যাওয়ার পরও, দুপুর হয়ে আসা অব্দিও সংসারের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছে করে না মরনির। সকাল হওয়ার পর, ঘুম ভাঙাব পর পলো তুলে ছাটাকে সে ছেড়ে দেয় ঠিকই, ঘব থেকে বেরয়, সকালবেলার জরুরি কাজগুলোও সারে কিন্তু কোনও কিছুতেই যেন প্রাণ থাকে না। একেবারেই নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে কাজগুলো সে করে যায় তারপর উদাস হয়ে ঘরের সামনের তক্তার ওপর বসে থাকে।

আজও তেমন করে বসে আছে।

এই বাড়িতে যে আরেকজন মানুষ থাকে, পুরুষমানুষ তার কথা যেন মনেই থাকে না মরনির। মানুষটা দূরের কেউ নয়, কাছেরই। তার বড়বোনের জামাই, মজনুর বাপ। মরনি নিজেই তাকে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে। সড়কে মাটি কাটার কাজ করতে এসেছিল, এসে একখানা য়োড়ার আশায় এসেছিল মরনির কাছে। সেই ফাঁকে বলেছিল নিজের দুর্দশার

কথা। শুনে মায়া-মমতায় বুক ভেসে গিয়েছিল মরনির। য়োড়া তো দিয়েই ছিল, সব ভুলে বাড়িতে থাকার জায়গাও দিয়েছে।

সেই মানুষের নাম আদিলউদ্দিন। কামাড়গাঁওয়ের সচ্ছল গেরস্ত, কপালের ফেড়ে (চক্রে) আজ মাটিয়াল। বাড়ির দক্ষিণের ভিটির দোচালা ঘরখানায় থাকে। মাটির ওপর খড়নাড়া, তার ওপর একখানা ছেঁড়াখোড়া মোটা কাঁথা ফেলে আরেকখানা গায়ে দিয়ে রাত কাটায় সে। রাতের অন্ধকারে কখন সে ওই ঘরে ঢোকে, ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে কখন বেরিয়ে যায় টের পায় না মরনি। কোথায় খায়, কোথায় গোসল করে কিচ্ছু জানে না। এত কাছে থেকেও যেন বা ইচ্ছে করেই মরনির চোখের আড়ালে থাকতে চাইছে আদিলউদ্দিন। যেন বা একদার গৃহস্থ মুখ মাটিয়াল হওয়ার লজ্জায় এতটাই ম্লান হয়েছে, এই মুখ মরনিকে সে দেখাতে চায় না।

আজ ঘরের সামনের তক্তায় বসে মরনি কি সেই মানুষটির কথা ভাবছিল? নাকি ভাবছিল তার ফেলে আসা জীবনের কথা, তার নিজের মানুষটির কথা। নাম ছিল নুরু হাওলাদার। নাকি পেটের না হয়েও যে পেটের ছেলে, নাড়িছেঁড়া ধন না হয়েও যে জড়িয়ে আছে পেটের ভেতরকার সব নাড়ি, শরীরের পরতে পরতে লেগে আছে যে হৃদয় মন, জীবন-মরণ, স্বপ্ন এবং বাস্তব মাখামাখি করে আছে যে, সেই মজনুর কথা ভাবছে মরনি?

তখনই পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে হাওলাদার বাড়িতে এসে উঠল নূরজাহান। কখন, কোন ফাঁকে যে মজনুদের সীমানায় এল, টের পেল না।

নূরজাহানকে ছুটে আসতে দেখে মগ্নতা ভাঙল মরনির। কিন্তু নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে নূরজাহানকে দেখতে পেল না। তার মনে পড়ল কতক্ষণ ধরে এইভাবে বসে আছে, বেলা কতটা হল! দুপুর হয়ে আসা রোদ বাড়ির আঙিনায় ঘরের চালায় এবং গাছগাছড়ার ডালপালায় কী রঙ মেলে বসেছে, উত্তুরে হাওয়া আছে কী নেই, এসব মনে পড়ল মরনির।

এখনই দুপুরের রান্না চড়ানো দরকার।

এখন চড়ালেও শেষ হতে হতে মধ্য দুপুর। এমন কী দুপুর গড়িয়েও যেতে পারে।

যদিও একজন মানুষের রান্না। কিন্তু রান্না তো! পোয়াখানেক চালের ভাত ঠিকই, কিন্তু চালটা তো মেপে তুলতে হবে। ভাল করে ধুয়ে হাড়িতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে চড়াতে হবে।

তারপর আছে তরকারি। তরকারি ছাড়া ভাত লোকে কেমন করে খায়!

যদিও সকালবেলায় উঠেই তরকারির ভাবনাটা আজ ভেবে রেখেছিল মরনি। সেচি শাক আর টাকিমাছ। বাড়ির নামার দিকে ছোট্ট একখানা কোলা (টুকরো গলি) আছে। কোলার চারপাশে বেশ ঘন হয়ে সেচি শাক জন্মেছে। একমুঠ তুলে আনলেই হবে। তারপর সেই সেচি শাক সেদ্দ করে, কয়েক ফোটা সরিষার তেল আর এক দু'খানা শুকনো মরিচের সঙ্গে কড়াইতে নিয়ে কাঠের হাতায় খানিক থেতলে নিলেই শাকটা হয়ে গেল। তারপর থাকে মাছ্বড়ঘরের কোণে, মুরগির ছাটা থাকে যেখানে তার পাশে মাটির বড় একখানা খোয়াপে জিয়ানো আছে দু'তিনটে টাকিমাছ। তার একটি কুটে, খাদায় করে ঘাটপারে ধুতে গিয়ে, ফেরার সময় বাড়ির নামার দিকফার, ঝাকা থেকে কয়েকটি বাত্তি (পরিণতি) আবাত্তি (অপরিণতি) যাই হোক উস্সি (সিম) ছিঁড়ে এনে সেই উস্সি দিয়ে চচ্চড়ি, তাহলে মাছটাও হয়ে গেল।

ভাত আর শাক মাছ হলে হয়েই তো গেল রান্না।

রান্না শেষ হলে থাকে গোসল করা, খাওয়া। সে আর এমন কী কাজ!

রান্না শেষ করে শাড়ি গামছা একহাতে আরেক হাতে বহুকালের পুরনো, ভারী ধরনের তেলের বদনাখানা নিয়ে ঘাটপার যাবে মরনি। পাঁচসাত বদনা জল তুলে মাথায় দেবে। শীতকাল বলে, পুকুরের জল বেজায় ঠাণ্ডা বলে ওই পাঁচসাত বদনায়ই গোসল শেষ।

তারপর পরনের শাড়ি বদল, সেই শাড়ি ধুয়ে চিপড়ে, বাড়ি ফিরে উঠোনে টাঙানো তারে মেলে দেবে। ভেজাচুলে জড়ানো থাকবে গা-মাথা মোছার পর চিপড়ে নেয়া গামছাখানি।

তারপর ঘরে এসে একা একা ভাতটা খাবে মরনি। দিনের বেশির ভাগ কাজের এই তো চেহারা।

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে সংসার কর্মের এই চেহারাটাও যেন দেখতে শুরু করেছিল মরনি।

কেন কে জানে!

নূরজাহান তখন এমন ভঙ্গিতে হাপাচ্ছে যেন সে কোনও মানুষ নয়। যেন সে কোনও অবলা জীব। যেন গৃহস্থের আথাল (গোয়াল) থেকে হঠাৎ করেই ছুটে যাওয়া কোনও দামড়ি (বকনা) বাছুর সে। হঠাৎ মুক্তি পাওয়ার আনন্দে যেন বা বিভোর ছিল। যখন চারপাশ থেকে জাপটে ধরার জন্য ছুটে এসেছে গৃহস্থ বাড়ির ছেলেপান, ভয় পেয়ে মাঠ পাথালে ছুটতে শুরু করেছে সে। ছুটতে ছুটতে এক সময় যেন পড়েছে চতুর মানুষের কব্জায়। ধরা পড়ার পর ক্লান্তিতে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে তার। কামার বাড়ির উঠোনের কোণে দিনমান পড়ে থাকা ব্যস্ত হাপরের মতো যেন বুক তার ওঠানামা করছে। এ যেন অদৃশ্য এক কামার অবিরাম টেনে যাচ্ছে তার হাপর।

সড়কপার থেকে হাওলাদার বাড়ির এই পথখানি ছুটে আসার কোন ফাঁকে যে এলোমেলো হয়েছে নূরজাহানের মাথার চুল, চোখের দৃষ্টি কোন ফাঁকে যে হয়েছে বিষাক্ত সাপ ছোবল দিয়ে ধরার পর কিংবা সাপের মুখে অর্ধেক শরীর ঢুকে যাওয়ার পর যেমন চোখ হয় মেঠো ইঁদুর কিংবা কোলাব্যাঙের, তেমন। নাকের তলায়, ঘাড়ে গলায় কখন যে তার জমেছে নদীতীরে বালুকণার মতো ঘামকণা, শীতের তেজালো রোদে বালুকণার মতোই ঝিলিক দিচ্ছে যা, নূরজাহান জানে না।

পা দুখানি তার ধুলোয় ধূসর। শুকনো, কালচে। যেন ঠোঁট নেই নূরজাহানের। যেন ঠোঁট দুখানি তার শুকনো গাবের বিচি।

নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের সংসার কর্মের চেহারা দেখা শেষ করেই যেন নূরজাহানের চেহারাটা দেখতে পেল মরনি। দেখে চমকে উঠল। নিজের অজান্তে কখন যে তক্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, টের পেল না। আকুল গলায় বলল, কী হইছে রে? এমুন করতাছস ক্যা? কই থিকা আইলি?

যেন বহুকাল জনমনিষ্যিহীন কোনও প্রান্তরে নির্বাসিত থাকার পর মানুষের সমাজে ফিরে এসেছে নূরজাহান। যেন বহুকাল পর মানুষের শব্দ পাচ্ছে এমন উতলা হয়ে মরনির দিকে তাকাল সে। তারপর থাবা দিয়ে মরনির হাত ধরল।

ঘরে লন। কইতাছি।

মরনি অবাক হল। ঘরে যামু ক্যা? এহেনে কইতে অসুবিধা কী?

এবার দুহাতে মরনির হাত ধরল নূরজাহান। গায়ের সব শক্তি এক করে পাগলের মতো টানতে লাগল। অসুবিধা আছে। আপনে ঘরে লন। কইতাছি।

মরনি তবু নড়ল না। যেন তার বয়সও নূরজাহানের মতোই, যেন সেও হঠাৎ করে নূরজাহান হয়ে গেছে এমন জেদি গলায় বলল, না তুই আগে ক।

এবার নূরজাহান কেমন ভেঙে পড়ল। মরনির হাত ছেড়ে দিয়ে অসহায়, কাতর চোখে তার দিকে তাকাল। জলে চোখ ভরে এল তার। তখনও হাঁপাচ্ছিল। তবে ছলছল চোখ আর মুখময় অসহায়ত্বের ছায়ায় ঢাকা পড়ে গেছে হাঁপানো।

কান্নাকাতর গলায় নূরজাহান বলল, আমার খুব বিপদ। বিপদ কথাটা শুনে বুকটা ধ্বক করে উঠল মরনির। তীক্ষ্ণ চোখে নূরজাহানের দিকে তাকিয়ে বলল, কিয়ের বিপদ? কী হইছে তর?

এহেনে খাড়াইয়া কইতে পারুম না। ঘরে লন, কইতাছি।

ক্যা, এহেনে খাড়াইয়া কইলে কী হইবে?

তারা মনে হয় আমার পিছে পিছে দৌড়াইয়া আইতাছে। এহেনে খাড়াইয়া থাকতে দেখলে ধইরা লইয়া যাইবে।

মরনি তবু নড়ল না। বলল, কারা তর পিছে দৌড়াইয়া আইতেছে? কারা তরে ধইরা লইয়া যাইব?

এবার শিশুর মতো ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল নূরজাহান। ঘরে লন। বেবাক কথা আপনেরে আমি কইতাছি।

নূরজাহানের কান্না দেখে বুকটা হু হু করে উঠল মরনির। কেমন যেন দিশেহারা হল সে। নূরজাহানের পিঠের কাছটা একহাতে জড়িয়ে গভীর মমতার গলায় বলল, ল।

ঘরে ঢুকে নূরজাহান বলল, দুয়ারডা লাগায় দেন।

মরনি বলল, দুয়ার লাগান লাগব না। তুই ক।

না, আপনে লাগান। নাইলে আমারে বাঁচাইতে পারবেন না।

মৃত্যুর কথা শুনলে বুকটা হঠাৎ করেই গ্রাম প্রান্তরের নির্জনে একাকী পড়ে থাকা মাঠের মতো হয়ে যায় মরনির। মজনুর মায়ের কথা মনে পড়ে, নুরু হাওলাদারের কথা মনে পড়ে। কিছুদিন ধরে এই দু'জন মানুষের পাশাপাশি মনে পড়ে আরেকজন মানুষের কথা। ছনুবুড়ি। একমুঠ ভাতের আশায় গ্রামের এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরে বেড়াত। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে বলে কূটনামো করত। সে ওই ভাতের আশায়। ছোটখাট চুরিচামারি করত, সেও ওই ভাতের আশায়।

ছনুবুড়ি নেই। মৃত্যু তাকে কোথাকার কোন অচিন জগতে নিয়ে গেছে। সেই জগতে ভাতের আশায় এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরতে হয় না। এর কথা ওকে, ওর কথা তাকে বলে কূটনামো করে ভাত জোটাতে হয় না। ভাতই যদি না জোটাতে হয় তাহলে আর চুরিচামারি কেন? ছনুবুড়ি নেই, মরনির মতো মেদিনীমণ্ডলের আরও অনেকেরই কি যখন তখন মনে পড়ে না তার কথা? ছনুবুড়ির কথা ভেবে কি দীর্ঘশ্বাস ফেলে না কেউ? মনে মনে বলে না, আহারে, বুড়িটা একদিন ছিল, বুড়িটা আজ নেই।

ছনুবুড়ির মতো নূরজাহানও যদি মরে যায়, নূরজাহানও যদি না বাঁচে তাহলে কি মরনির হঠাৎ মনে পড়বে না তার কথা? এই যে তার কাছে এসে এমন অনুনয়ের স্বরে বলছে বাঁচা মরার কথা, এমন করে আর কে বলবে!

মরনি আনমনা হয়ে আছে দেখে নূরজাহান কাতর গলায় ডাকল, আম্মা।

মরনি যেন নিজের মধ্যে ফিরল। উঁ

দুয়ারডা লাগান।

এবার আর কথা বাড়াল না মরনি। দরজা লাগাল। ভয়ার্ত ভাব তখনও আছে নূরজাহানের চেহারায়। চোখের ছলছলানো অবস্থাটা নেই। তবে শরীরটা যেন কী রকম কাঁপছে। যেন হু হু করা উত্তুরে হাওয়ায় আকুল হয়ে কাঁপছে পেয়ারার কচি পাতা।

নিজেকে সামলাবার জন্যে যেন চৌকিতে বসল নূরজাহান।

নূরজাহানের চোখের দিকে তাকিয়ে মরনি বলল, এইবার ক আমারে কী হইছে? কারা তর পিছে পিছে দৌড়াইয়া আইতাছে? কারা তরে মাইরা ফালাইব? কী করছস তুই?

নূরজাহান কোনও রকমে বলল, মাওলানা সাবের মোকে আমি ছ্যাপ ছিডাইয়া দিছি!

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মরনি। বলল, কী করছস?

নূরজাহান আবার বলল।

শুনে মরনি হতভম্ব হয়ে গেল। কোন মাওলানা সাবের মোকে?

মান্নান মাওলানার।

এবার এতটাই দিশেহারা হল মরনি, যেন ভাতের ফ্যান গালতে বসে গরম ফ্যান তার পায়ে পড়েছে। এমন আচমকা পড়েছে, মরনি ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী করবে।

ফ্যাল ফ্যাল করে নূরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ছটফট ভঙ্গিতে নূরজাহানের একটা হাত থাবা দিয়ে ধরল। হায় হায়. করছস কী তুই? ক্যান করছস এমন কাম?

মরনির আচরণে ভয়টা যেন আরও বেড়ে গেল নূরজাহানের। শরীরের কাঁপুনিটা বেড়ে গেল। চোখ ফেটে জোয়ার জলের মতো নামল কান্না। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে কান্না কাতর জড়ানো গলায়, ভেঙে ভেঙে নূরজাহান বলল, কাশেম কাকার কথা হুইন্না, কাশেম কাকারে দেইক্কা। আমার আর কিছু খ্যাল (খেয়াল) আছিল না। আমি য্যান পাগল হইয়া গেছিলাম।

মরনি উতলা গলায় বলল, কোন কাশেমের কথা কচ তুই?

মাকুন্দা কাশেম।

তার আবার কী হইছে?

দু'হাতে চোখ মুছতে মুছতে নূরজাহান বলল, আপনে জানেন না?

না।

কান্নার মাঝখানে বড় করে একটা শ্বাস ফেলল নূরজাহান। আগের মতোই কাঁপছে সে, আগের মতোই কান্নায় জড়িয়ে যাচ্ছে তার গলা। তবু মাকুন্দা কাশেমের কথা মরনিকে বলল সে। যতটা সম্ভব খুলেই বলল। শুনে মরনি তেমন ভারাক্রান্ত হল না। যদিও খুবই নরম মনের মানুষ সে, মানুষের জন্যে খুব মায়া। তবু যেন মাকুন্দা কাশেমের জন্যে তার তেমন মায়া হল না। বহুদিনের পরিচিত হওয়ার পরও মাকুন্দা কাশেমের মুখটাও যেন তার মনে পড়ল না। সে উতলা হল কেবল নূরজাহানের জন্যে।

বোধহয় দূরের মানুষের চে চোখের সামনের কষ্ট বেদনা মানুষকে বেশি নাড়া দেয়। মাকুন্দা কাশেমের কষ্ট বেদনার চে নূরজাহানের ভয়টা যেন, কান্নায় ভেঙে পড়াটা যেন বেশি কষ্ট দিচ্ছে মরনিকে। নূরজাহানের মতো সেও যেন আচ্ছন্ন হচ্ছে গভীর কোনও আতঙ্কে।

সব শুনে মরনি আবার বলল, করছস কী তুই? সব্বনাশ তো কইরা লাইছস (ফেলেছিস) এত মাইনষের সামনে, দারগা পুলিশের সামনে মান্নান মাওলানার মোকে দিছস ছ্যাপ ছিডাইয়া। মান্নান মাওলানা তো তরে ছাড়ব না। হ্যায় ছাড়লেও তার পোলা আতাহার তরে ছাড়ব না। তর মাবাপের ক্ষতি কবব, তর ক্ষতি করব। কোন ভূত সোয়ার (সওয়ার) হইছিল তর মাথায়? এমুন কাম তুই করলি?

নূরজাহানের কাঁপুনি তখন আরও বেড়েছে। কান্না আরও বেড়েছে। কাঁদছে সে পৃথিবীতে সবেচেয়ে দুঃখী কিংবা অসহায় মানুষের মতো। কান্নায় বিকৃতি হয়েছে তার শ্যামল বরণ মিষ্টি মুখখানি। গলার স্বর গেছে পেছন থেকে কালজাত সাপ থাবা দিয়ে ধরার পর অসহায় ব্যাঙের গলার স্বর যেমন হয় তেমন হয়ে।

নূরজাহানের এই অবস্থা দেখে বুকটা উথাল পাথাল করে উঠল মরনির। যেন নূরজাহানের মতো অসহায় এখন সে নিজেও, কী করবে মরনি এখন নূরজাহানের জন্যে কী করার আছে তার।

এদিকে ঘরের বাইরে তর তর করে বাড়ছিল শীতের বেলা। গাঁদাফুলের পাঁপড়ির মতো রঙধরা রোদ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছিল। উঠোনের শীতল মাটি উষ্ণ হচ্ছিল। পেয়ারার ডালে বসে থেকে থেকে শিস দিচ্ছিল এক অচিন পাখি। আর কোথাও কোনও শব্দ ছিল না। সংসারের

কাজ সবই পড়েছিল মরনির। সে সব কথা এখন তার মনে নেই। এখন তার মন জুড়ে নূরজাহান। এখন তার চোখ জুড়ে নূরজাহান। নূরজাহানকে নিয়ে কী করবে সে এখন?

নূরজাহানের শরীরের কাঁপন কি তখন আরও বেড়েছে! যেন হঠাৎ করেই ব্যাপারটা তারপর খেয়াল করল মরনি।

সব ভুলে বলল, এমনে কাঁপতাছস ক্যা?

কান্নার হেঁচকি তুলে নূরজাহান বলল, কইতে পারি না।

শীত করতাছে?

হ। শীতটা যেন শইল্লের ভিতরে হইতছে। বাইরে না। হাত পাও য্যান বেঁকা হইয়া আইতাছে। কথা বলার ফাঁকে দাঁতে দাঁত ঠুকে গেল নূরজাহানের। ঠোঁট বাঁকা হয়ে এল।

হায় হায় শীতে মরে যাবে না কী মেয়েটি!

মরনি তার পর পাগলের মতো জড়িয়ে ধরল নূরজাহানকে। শিশুর মতো পাঁজাকোলে করে নূরজাহানকে তুলল চৌকিতে। কোনও রকমে তাকে শুইয়ে দিয়ে মাথার কাছ থেকে হাছড় পাছড় করে টেনে আনল ভাঁজ করে রাখা পুরনো মোটা কাঁথা। কাঁথায় ঢেকে দু'হাতে চেপে ধরল নূরজাহানকে। কাঁপিয়ে জ্বর আসার পর সন্তানকে কাঁথা কাপড়ে ঢেকে যেমন করে জড়িয়ে ধরেন মা, কিংবা ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে অসহায় ছানাকে গলা জড়িয়ে যেমন করে রক্ষা করে মা-পাখি তেমন করে যেন নূরজাহানকে রক্ষা করতে চাইল মরনি। ভুলে গেল কী করেছে নূরজাহান। কোন অপরাধে অপরাধী সে। কী শাস্তি হবে তার।

কাঁথার তলায়ও নূরজাহান তখন ঠকঠক করে কাঁপছে। কান্নাটা এখন আর নেই। শরীরের ভেতর তার প্রবল কাঁপুনি যেন চোখের জল শুষে নিয়েছে তার।

নিজের অজান্তেই তারপর নূরজাহানের পাশে শুয়ে পড়ল মরনি। কাঁথার আবরণে ঢাকা নূরজাহানকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে টেনে আনল বুকের কাছে। কাঁথার উষ্ণতার সঙ্গে নিজের বুকের উষ্ণতা মিলিয়ে আরও উষ্ণ করে তুলতে চাইল নূরজাহানকে। কাঁপুনি বন্ধ করতে চাইল তার।

কতক্ষণ, এভাবে কতক্ষণ কে জানে!

এক সময় কাঁপুনি বুঝি কমে এল নূরজাহানের। কাঁথার ভেতর থেকে একটি হাত বের করে অসহায় শিশু যেমন করে আঁকড়ে ধরে মায়ের গলা, তেমন করে মরনির গলা আঁকড়ে ধরল সে। কোত্থেকে আগের সেই কান্নাটা ফিরে এল তার। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ভাঙাচোরা গলায় নূরজাহান বলল, আম্মা, আম্মা গো, আপনে আমারে বাঁচান আম্মা। আপনে আমারে বাঁচান। তারা আমারে মাইরা ফালাইব।

নূরজাহানের কথা শুনে অদ্ভুত এক ঘোরের মধ্যে যেন পড়ে গেল মরনি। তার মনে হল নূরজাহান যেন নূরজাহান নয়, নূরজাহান যেন তার সেই মুরগি ছানাটি। আততায়ী দাঁড়কাকের মতো মান্নান মাওলানা যেন থাবা দিয়ে ধরেছে তাকে। ঠোকরে ঠোকরে তীক্ষ্ণ নখের আঁচড়ে আঁচড়ে নূরজাহানকে যেন ফালা ফালা করছে। বুকের কচি মাংস যেন খাবলে খাবলে তুলছে। এই আততায়ীর হাত থেকে কেমন করে নূরজাহানকে বাঁচাবে মরনি! কেমন করে রক্ষা করবে?

কতটা সময় এসব ভাবে মরনি কে জানে! তারপর নিজের অজান্তেই এক সময় আরও গভীর করে বুকে জড়িয়ে ধরে নূরজাহানকে। যেন বহু চেষ্টার পর এইমাত্র দাঁড়কাকের তীক্ষ্ণ ঠোঁট থেকে, ধারালো নখের থাবা থেকে ছিনিয়ে নিতে পেরেছে মুরগি ছানাটিকে।

এখন বুকের ক্ষতে হলুদ বাটার সঙ্গে চুন মিশিয়ে প্রলেপ দিলেই যেন সেরে উঠবে সে।

সম্ভবত অন্ধ বলেই

স্বপন সেন

'কে খো কা এ লি?'

পায়ের কোনো শব্দের সঙ্গে ঠাকুরমার এই জিজ্ঞাসা গত কুড়ি বছর শুনে শুনে অনেকটাই আজ দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে আমাদের। অন্ধ হওয়ার পর থেকে প্রথম প্রথম ঠাকুরমার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেও আজ আর প্রয়োজন বোধ করে না কেউ। কেননা এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। মা সারাক্ষণ বাড়িতে থাকেন। সুতরাং এই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তিনিও আজ ক্লান্ত। বিরক্তও হন মাঝে মাঝে। কিন্তু ঠাকুরমার জিজ্ঞাসা থামে না। আর উত্তর না-পাওয়ায় দিনকে দিন বাড়তে থাকে ঠাকুরমার চিৎকার। সঙ্গে নানান রকম কথা, কখনো নিজের মনে, কখনো অন্যকে শুনিয়ে। ঠাকুরমার এসব কথা এই প্রথম শুনছি বা আমাদের কাছে অজানা এমন নয়। কিন্তু ঠাকুরমা একটাই স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন আজ বিশ বছর। মাঝে মাঝে উত্তর না পেয়ে গালাগাল দেন, মাকে উদ্দেশ্য করে। আবার কখনো নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন এমনভাবে বলেন, 'ও বৌ উত্তর দিস না কেন? ও না, না, তোরা জানবি কি করে? তোরা তো ছেলেমানুষ। ছেলেমানুষদের কি এসব বলতে আছে? খোকা আমার বুদ্ধিমান, সে শুধু আমাকেই বলে গেছে কবে ফিরবে। আমারও ভুল দেখ, যাকে তাকে খোকা ভেবে বসি।' আবার কখনো বলেন, 'তোরা উত্তর দিবি কি করে? উত্তর দেবার মুখ কি তোদের আছে? তোরাই তো শয়তানি করে ধরিয়ে দিলি আমার ছেলেটাকে। পুলিশে সেই যে নিয়ে গেল আর তো ফিরে এল না। কেন তোরা আমার এ সব্বোনাশ করলি? ও বৌ, খোকা তো আমার থেকেও তোকে বেশি ভালোবাসত।' আবার ঠাকুরমার কথার সুর বদলে যায়, ভাষা বদলে যায়, 'জানিস বৌ, তোর যখন বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলুম খোকার সে কি আহ্লাদ। মাত্র আট বছরের ছেলে তখন। বৌদি, বৌদি করে তোকে কম জ্বালাতন করত-না। তুই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিস তাকে। আর এমন শয়তান তুই, তাকে ধরিয়ে দিলি! বুক ধরে থাকতে পারলি কি করে? পেটের সন্তান নয় বলে কি এতই নিষ্ঠুর হতে হয়।' ঠাকুরমার এই সব বিলাপ বহু এবং দীর্ঘ ব্যবহারে শব্দ তার গূঢ়ত্ব হারিয়ে কতকগুলো প্রলাপধ্বনিতে রূপান্তরিত, আজ আর এইসব শব্দ কোনো পারিবারিক শোক, হতাশা বা বিপর্যয়ের হাহাকার বহন করতে অক্ষম। নির্ভার সব শব্দ তার মাধুর্য হারালেও ঠাকুরমা এই শব্দকে ঘিরেই বেঁচে থাকেন। এই সব প্রলাপধ্বনির মধ্যে।

'সে এক দিন গেছে, জানিস বৌ, আমি তো সবসময় ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতুম, আর অতটুকু ছেলের কি সাহস! কতই বা বয়স হবে তখন? খোকার তখন কত বয়স লা বৌ?' মা সাড়া দেন না, কাঁহাতক আর বকা যায় এই অর্ধোন্মাদ বৃদ্ধার সঙ্গে? 'সাড়া দিস না কেন? মনে নেই, এই তো সেদিনের কথা, এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিলি? এত তাড়াতাড়ি তোরা সবকিছু ভুলে যাস কি করে? কত যেন বয়স ছিল?' ঠাকুরমা স্মৃতির পাতা হাতড়ান। 'আমারও পোড়া কপাল, কেউ আমাকে সাহায্য করে না একটু', তারপরই ঠাকুরমা ফোকলা তোবড়ানো গালে হেসে ওঠেন। 'ওই গো মনে পড়েছে, মাত্র আঠারো বছর বয়স।' ঠাকুরমা

কথার খেই হারিয়ে ফেলেন। যা বলতে যাচ্ছিলেন তা আর মনে নেই। স্বভাবতই কথা বলার সাময়িক বিরতি ঘটে। তাও কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে আবার শুরু করেন, 'জানিস বৌ, একদিন রাতে, অনেক রাতে, তোরা তখন ঘুমিয়ে পড়েছিস, খোকা তো অনেক রাত পর্যন্ত পড়ত, তাই আমি ভাবলুম বুঝি পড়ছে। কলঘরে যাব বলে উঠেছি, ভাবলুম অনেক রাত হয়েছে শুয়ে পড়তে বলি, গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি ছোট ছোট কাগজে লাল আর কালো কালি দিয়ে বড় বড় করে কি সব লিখছে। খোকার হাতের লেখাটা তো বেশ ভালো ছিল। তুই জানিস তো, দেখিসনি খোকার হাতের লেখা? ভালো ছিল না? ও হারামজাদী সাড়া দিস না কেন? আমার কথায় সাড়া দিলে কি মুখে কুট হবে?' সাময়িক বিরতির পর ঠাকুরমার ভাষা আবার বদলে যায়। 'রাগ করেছিস? না মা রাগ করিস না। তুই তো জানিস মা, বুড়ো হয়েছি, কি বলতে কি বলে ফেলি। আয় মা আয়, দু-দণ্ড আমার কাছে বসবি আয়। আমি জানি, বুঝতে পারি, খোকা চলে যাওয়ায় তোরও কত কষ্ট হয়।' ঠাকুরমার চোখের কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

ঠাকুরমা একদলা কফ ফেলেন রকের কোনে। মা সকালবেলা ঠাকুরমাকে ধরে ধরে এনে বসিয়ে দেয় রকের কোণে। কেননা ইদানিং হাঁটতে পারেন না ঠাকুরমা। তবু কিন্তু ঠাকুরমা এক জায়গায় বসে থাকেন না। পাছা ঘসটে ঘসটে ঘুরে বেড়ান রকময়। কখনো উঠানেও নেমে যান ওই রকমই পাছা ঘসে ঘসে। ঠাকুরমা ক্রমশ অথর্ব হয়ে যাচ্ছেন। পঙ্গুত্ব বাসা বাঁধছে একটা একটা প্রত্যঙ্গে। বাসা বাঁধছে ক্রমশ দেহ-মনে-স্মৃতিতে যেন কোনো অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে একটা জনপদ-প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন, একটা শিলালিপি যার বুকে ধারণ করে আছে একটা যুগের ইতিহাস।

ছবিতে দেখেছি ঠাকুরমা তাঁর যুবতী বয়সে বেশ সুন্দরী ছিলেন। অথচ কালের গহ্বরে হারিয়ে গেছে সেসব রূপ-যৌবন। আর ইদানিং রূপ-যৌবন ছাড়িয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সেই আক্রমণ। বেশ কয়েকমাস আগে ঠাকুরমাকে নেড়া করে দেওয়া হয়েছে। কেননা ঠাকুরমার মাথার লম্বা চুলের জন্যে মাথায় জল বসছিল, নিজে চুলের পরিচর্যা করতে পারেন না বলে। তবে ঠাকুরমার হাত দুটো এখনো বেশ সচল। হাতের কাছে যা পান সংগ্রহ করে রাখেন, সে কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়া, আলুর খোলা, বিড়ির টুকরো যা কিছু হোক না কেন। মানুষের মধ্যে এই সংগ্রহের প্রবণতা আসে কোথা থেকে, কী ভাবে?

ঠাকুরমা এতক্ষণ বেদম কাশছিলেন। কাশিতে দম আটকে যাওয়ার উপক্রম। মা বুকে পিঠে তেল মালিশ করে দিতে এখন কিছুটা স্বস্তি বোধ করায় আবার শুরু হয় তাঁর বকবকানি। 'ও মা কত রাত হল, তোরা খেয়েছিস?'

মায়ের পরিবর্তে আমি উত্তর দিই, 'এখন রাত নয় দিন।'

ঠাকুরমার ফোকলা গালে আবার হাসি ছড়িয়ে পড়ে, 'ও দাদুভাই, আমার ভুল হয়ে যায় যে। তোরা খেয়েছিস দাদুভাই?'

ঠাকুরমার সঙ্গে মজা করার ইচ্ছে হয়। বলি, 'হ্যাঁ খেয়েছি।'

'কি দিয়ে ভাত খেয়েছ দাদুভাই?'

'রসগোল্লার ঝাল আর ভাত।'

'এই মুখ পোড়া, হারামজাদা, তোর বাবা কোনোদিন রসগোল্লার ঝাল দিয়ে ভাত খেয়েছে?'

'না আমার বাবা খায়নি কিন্তু আমি খেয়েছি।'

ঠাকুরমা আমার কথার আর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না।

আবার মাকে জিজ্ঞেস করেন, 'ও মা তোরা ভাত খেয়েছিস?'

মা বলেন, 'আপনি খাননি আর আমরা খেয়ে নেবো?'

'আমি খাইনি না? তাহলে আমাকে খেতে দিবি মা? বড্ড খিদে পেয়েছে।'

'এখন তো সকাল দশটা। এর মধ্যেই আপনার খিদে পেয়ে গেল? এই কিছুক্ষণ আগে তো জল-খাবার খেলেন।'

'ও তাই বল, আমি ভেবেছি কত বেলা হল বুঝি। ও মা খোকার জন্যে ভাত রেখেছিস? ও যে ভাত খাবে বলে এল। অনেক দিন পরে, রাতের অন্ধকারে। তোর কাছে ভাত চাইল। কেমন রোগা হয়ে গেছে, গালে একগাল দাড়ি। আমি তো ভয়ে আতঙ্কে কেঁদে জিজ্ঞেস করলাম, ও খোকা এতদিন কোথায় ছিলি বাবা? আমার কথার উত্তর দেবার সময় পেলে না। ওঁত পাতা শয়তানগুলো অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে ছিল, দরজার কড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর তুই এমন শয়তান, দরজা খুলে দিলি! আমার ছেলেটাকে তুলে দিলি পুলিশের হাতে? মা হলে বুঝতিস আমার কি কষ্ট। আর আমার দাদু-ভাই তখন সেয়ানা হয়নি তাই। এই এতটুকু ছেলে তখন। না হলে এত সহজে কি ছেড়ে দিত ওর কাকাকে। কাকাকে খুব ভালোবাসত তো। ওর কোলে পিঠেই তো বড় হচ্ছিল দাদুভাই। কত যেন বয়স ছিল তখন দাদুভাইয়ের?'

আমি বলি 'পঁচিশ'।

'না, না, পঁচিশ হতে যাবে কেন? এই এতটুকু ছেলে তখন। এই শয়তানের বাচ্চা, আমি তোকে জিজ্ঞেস করেছি? তুই কি ভেবেছিস ঠাম্মার মাথা খারাপ হয়ে গেছে? ও বৌ, বৌ, তোর ছেলেটা এমন শয়তান হল কেন রে? ভীষণ শয়তান। কেমন গব্বো দেখতে হবে তো। ও বৌ তোর ছেলেটার কত বয়স ছিল যেন তখন? কত বয়স ছিল? কত বয়স? কত?'

'আট বছর।' মা বিরক্ত হন। গজগজ করেন, 'রোজ রোজ এক কথা। কাজ করব না এই এক কথার উত্তর দেবো।'

'হ্যা, হ্যা, আট বছর। পোড়া কপালে সব ভুল হয়ে যায় যে মা। তুই রাগ করিস না। আমি কি যেন বলছিলুম? ও দাদুভাই আমি কি বলছিলুম?' ঠাকুরমার আবার কথার খেই হারিয়ে যায়।

আমি বলি, 'আমার কথা'।

'এই পোড়ার মুখো, মুখে নুড়ো জ্বেলে দেবো। তোর কথা বলব কেন? আমি খোকার কথা বলছিলুম। জানিস মা, খোকাটাও ছিল তোর ছেলের মতো শয়তান। মুখ টেপা শয়তান। কোনো কথা বলত না। রাতের অন্ধকারে চলে যেত চুপি চুপি পোস্টার লাগাতে, দেওয়াল লিখতে। আর বৌ তুই সব জানতিস, তোকে সব বলত খোকা, তুইও এমন নেমকহারাম আমাকে কিছু বলতিস না। কিন্তু মায়ের মন তো, সব বুঝতে পারতুম আমি।'

ঠাকুরমা আবার চুপ করে যান। সম্ভবত ভুলে যান যা বলতে যাচ্ছিলেন। পাছা ঘসে ঘসে রকের এক দিক থেকে অন্য দিকে যেতে যেতে মাকে ডাকেন, 'বৌ, ও বৌ, আমায় খুলে দেনা মা, কেন এমন করে বেঁধে রেখেছিস? আমি যে হাঁটতে পারি না।'

ঠাকুরমার ইদানিং বিশ্বাস হয়েছে তাঁকে সবাই মিলে বেঁধে রেখেছি আমরা, তাই তিনি হাঁটতে পারেন না। পাছা ঘসে যেতে যেতেই বাঁধন খোলার চেষ্টা করেন। সেই ভঙ্গিতে হাঁটুর কাছে বাঁধা গিঁট খুলতে থাকেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য বাঁধন তিনি কিছুতেই খুলতে পারেন না।

সুতরাং পাছা ঘসে ঘসেই তিনি রকের অন্য প্রান্তে গিয়ে আবার শুরু করেন, 'পুলিশে সেই যে নিয়ে গেল ছেলেটাকে, তা তোরা একবার খোঁজও নিলি না, তা নিবি কেন? নিলে যে তোদের বাড়া ভাতে ছাই পড়বে। ও যে তোদের শত্তুর ছিল।'

এই সব কথা বলতে বলতেই ঠাকুরমা রকের কোনায় পড়ে থাকা একটা বিড়ির পোড়া টুকরো তুলে মুখে দিয়ে চিবোতে থাকেন। বাবাই হয়তো কখন ফেলেছিলেন। মা দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এসে ঠাকুরমার মুখের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে বিড়ির টুকরোটা বার করে ফেলে দিতে দিতে গজগজ করেন, 'যা পাবেন তাই মুখে দেবেন?' ঠাকুরমারও বকবকানি

শুরু হয়, 'কিছু দিবি না? কিচ্ছু খেতে দিবি না? সব নিজেরা খাবি? মুখের গ্রাস কেড়ে নিলি? খোকাটারও মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল ওই শয়তানগুলো। এখন কোথায় আছে, কি করছে কে জানে। তবে তোরা দেখিস একদিন সে ফিরে আসবেই। তখন কি আর এত সহজে অন্যের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে পারবি! এখন সে নেই বলে তোরা সব সাপের পাঁচ পা দেখেছিস, না!' ঠাকুরমা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, 'ওমা, মা, আমার যে বড্ড খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দে না, মা।' ঠাকুরমা কিছুক্ষণ আগেই খেয়েছেন যে, সে কথা স্মরণে নেই। আর বুড়ো মানুষকে এমন ওপর ওপর খেতে দেওয়া ঠিক নয়। তবু ঠাকুরমার কথায় মা একমুঠো মুড়ি ঠাকুরমার মুখে দিয়ে দেন। ঠাকুরমা থু থু করে সেগুলো রকময় ছড়িয়ে ফেলেন, মুখে আঙুল ঢুকিয়ে নিজেই বার করে নাল মাখানো মুড়ি কাপড়ে মোছেন। 'বিষ, বিষ, তোরা আমাকে বিষ খাওয়াতে চাস।'

ঠাকুরমা এইসব অসংলগ্ন কথার মধ্যেই তাঁর অদৃশ্য বাঁধন খোলার প্রয়াস পান আবার। কিন্তু কিছুতেই খুলতে না পেরে চিৎকার করেন, 'তোরা আমাকে বেঁধে রেখেছিস কেন? আমাকে খুলে দে। আমি যে হাঁটতে পারি না। খোকা এলে আমাকে ঠিক খুলে দেবে, তোরা দেখিস। খোকা তোদের মতো শয়তান নয়। তোরা আমাকে চুষে খেয়ে শেষ করে দিলি। আমাকে দেখার সময় পর্যন্ত নেই তোদের। আমার দিকে তাকাবার সময় নেই। তাকাবি কি ডাকলে সাড়া পর্যন্ত দিস না। তোরা সব নেমকহারাম। খোকা ফিরে এসে ...

ঠাকুরমা এই স্বপ্নকে ঘিরে বেঁচে থাকেন।

সম্ভবত অন্ধ বলেই।

উপকথার জন্মবৃত্তান্ত

কামাল হোসেন

'জীবনটা যদি গোড়া থেকে আবার শুরু করা যেত .... ' এ রকমই কিছু ভেবে হয়তো মাথা নাড়ল মনসুর কোচোয়ান।

বস্তুত মাঝে মাঝে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে চলতে সে অভ্যস্ত। লোকে বলে তার বয়সের গাছ পাথর নেই। তাই হয়তো পরিবর্তিত সময়ের বঞ্চনা ও শূন্যতা তাকে বিচলিত করে। সে কথা বলে কম। পরনে কালো-রঙের ছেঁড়া-ফাটা পাঞ্জাবি। ময়লা লুঙ্গি। মাথার চুলে তুষারের শুভ্রতা। ভুরু, দাড়ি-গোঁফেও তাই। রোগা সিড়িঙ্গে মতো। হঠাৎ দেখলে ভয় লাগতে পারে। স্থির চাউনি। পলকহীন। আধো অন্ধকারে প্রেতাত্মা মনে হয়।

যেমন 'কোচোয়ান', তেমনি তার জরাজীর্ণ গাড়ি। তেমনি ঘোড়ার অবস্থা। একেবারে পরস্পরের জন্য প্রত্যেকে সাজানো। কোনো সন্ধেবেলায় এদের ছুটতে দেখলে হঠাৎ যদি কারুর মনে হয় কোনো হিমশীতল কবরের অভ্যন্তর থেকে আচমকা ঘুম ভেঙে ছুটতে শুরু করেছে এরা, দোষ দেওয়া যাবে না। আধিদৈবিক কিছু ঘটবার অপেক্ষাতেই হয়তো আমরা অপেক্ষা করে থাকি। অসম্ভব কিছু। অবাস্তব কিছু।

তো লালবাগ মানেই একটা মৃত শহর। কবে ছিল রাজধানী। বিশাল জাঁকজমক-অলা নগরী। প্রাসাদ ঐশ্বর্য সৈন্যবাহিনী। তারপর কালপ্রবাহে রাজনীতির মানদণ্ড হাত বদলের সঙ্গে সঙ্গে কখন যেন লিখিত হয়ে যায় এক একটি নগরীর মৃত্যুদণ্ড। তখন হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে সবাই চোখ মেলে দেখে ভাঙাচোরা প্রাসাদের নিঃশব্দ উপস্থিতি, ধ্বংসস্তূপ লতাগুল্ম আগাছার ঝোপ, ছোট বড় গাছপালার জঙ্গল। শান্ত প্রাণহীন। আর ভাঙা দালান বাড়ির পাশাপাশি কবর আর কবর। পাথর ইট সব কে কোথায় চুরি করে নিয়ে গেছে। সেই চিরকালের নির্জনতায় ছায়ার মধ্যে শুয়ে থাকেন মৃতরা। এমনটাই হয়। এবং জীবনের নিয়মে মৃত নগরীর অন্যপ্রান্তে নতুনকালের মানুষরা ঘর বাঁধে, স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া হয়, হাসপাতালে চিকিৎসা হয়। সময় ঠিক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যায়।

মনসুর কোচোয়ানের নিজস্ব সময় হামাগুড়ি দিয়ে চলে। খুব দ্রুত না। ধিমিয়ে ধিমিয়ে। জাতীয় মহাসড়ক দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে যায় ট্রাক, বাস, প্রাইভেট কারের যন্ত্র-ঘোষিত আধুনিক বিজয়রথ। সারথি মনসুর কোচোয়ানের ঘোড়ার গাড়ি রাস্তার একপাশ ধরে মন্থর গতিতে পথ অতিক্রম করে। কবেকার আঁকা লতাপাতাগুলো গাড়ির গায়ে আবছা ক্যালিগ্রাফির আদল আর ফোটাতে পারে না। রোগা হাড্ডিসার ঘোড়াটা খানিকক্ষণ ছুটে হাঁপিয়ে পড়ে। পিচের মসৃণ রাস্তায় আওয়াজ ওঠে ঘোড়ার গাড়ির। দূর থেকে পাড়াগাঁয়ের ন্যাংটো ছেলে-মেয়ে ছুটে এসে দেখে এই আজব রথ। আচমকা ঝাঁকুনিতে ভেতর থেকে সওয়ারী হয়তো শুধায়, 'তোমার গাড়ি উল্টে যাবে না তো কোচোয়ান?'

কথার উত্তর দিতে বেশি পছন্দ করে না মনসুর কোচোয়ান। এখনকার লোকেরা বড় বেশি ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করে। 'ও কোচোয়ান, তোমার বউ বেঁচে আছে? ছেলে-মেয়ে আছে? ছেলে গাড়ি চালায় না কেন? তুমি বুড়ো হয়েছে ....' ধমনীর প্রাচীন রক্তে তখন ক্রোধের জোয়ার আসে। বুকে ব্যথা হয়। উইঢিবি, ব্যাঙের ছাতা আর রাজ্যের আবর্জনায়

ভর্তি তার অস্তিত্বে কে যেন নাড়া দেয়। তার পূর্বপুরুষ মকসুদ কোচোয়ান একদিন বড়লাট হেস্টিংস সাহেবকে কাশিমবাজারে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। সেই যে কান্তিমুদির সঙ্গে যার দোস্তি হয়েছিল। বহরমপুর ক্যান্টনমেন্ট তৈরি হবার সময় সম্ভ্রান্ত মানুষদের নতুন শহরে পৌঁছে দিয়েছে সেইকালের সব থেকে শৌখিন ঘোড়ার গাড়ি। সব গল্প ছোটবেলা থেকে জানে মনসুর। ঠিক বাস্তবের মতো। মনে পড়লে অভিভূত হয়ে যায়। স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি মনে হয়। কে যেন হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় শুধু পেছনের দিকে। লালবাগ, কাশিমবাজার, সৈদাবাদ, কাদাই, ঘাটবন্দর, গোরাবাজার, বহরমপুর ...

মনসুর কোচোয়ানের গাড়িতে আজকাল আর কেউ চড়তে চায় না। এখনকার মানুষ স্পিড বোঝে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে চায় গন্তব্যে।

তবু দেশটা তো ভারতবর্ষ। জেটযুগে রেলগাড়ির পাশে গরুর গাড়িও চলে। গাঁয়ের মানুষজন আরাম করে বসে। অল্পবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকারা মাঝে মাঝে পছন্দ করে তার ঢিমে তালে চলা গাড়ির অন্দরমহলের উত্তাপ।

তাই যখন কেউ প্রশ্ন করে, 'তোমার ছেলে আছে কোচোয়ান? সে গাড়ি চালায় না?' তখন বুকের ভেতর রক্ত ছলকিয়ে ওঠে। মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায়। এক জোয়ান বলিষ্ঠ ঘোড়ার ক্ষুরধ্বনি বুকের মধ্যে দাপিয়ে বেড়ায়। খান খান হয়ে যায় বেঁচে থাকার এই স্থবির ছায়া-ভরা দিনগুলি।

ছেলে মনজুর আলি ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়ির ভক্ত। তার মা নফিজা নিশ্চয়ই তা চাইত। ঘোড়ার গাড়িকে বলত শয়তানের চাকা। নবাবী আমল থেকে আজ পর্যন্ত বংশপরম্পরায় শুধু শয়তানের চাকার মায়ায় তারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। শুধু ছুটে চলো আর ছুটে চলো। এই কি একটা জীবন নাকি? নাক সিঁটকোত নফিজা। গা থেকে শুধু ঘোড়ার নাদির গন্ধ। আর ঘামের আর ধুলোবালির। রাস্তাভর্তি ময়লা গায়ে আশ্রয় নেয়। এমন 'কাম' ইজ্জতদার আদমি করে?

শরম কি বাত, খুবই লজ্জার কথা, তার একমাত্র ছেলে মনজুর আলি এখন মেটিয়াবুরুজে জামা সেলাই করে। খলিফা হয়েছেন তিনি। কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটে। ছ্যা, ছ্যা, জওয়ান্ মরদের এই দুর্দশা। মনসুরের চাবুক আছড়ে ওঠে ঘোড়ার পিঠে। হ্রেষাধ্বনিতে শিহরিত হয় প্রেক্ষাপট, তীব্র গতিতে দু'পা একবার ওপরে তুলে আবার ছুটতে থাকে পক্ষীরাজ ঘোড়া। গতির স্পন্দন শিরায় শিরায় অনুভব করতে পারে মনসুর কোচোয়ান। কৈশোর কেটে যায়। যৌবনও কেটে যায়। বার্ধক্যও এমনি করে কেটে যায়। এক বিচিত্র উপকথার খোলসে খোলসে বদলাতে থাকে তার সমস্ত অস্তিত্ব। আলকাপের মেয়েসাজা পুরুষ হিমের রাত্তিরে খোলা মঞ্চে গ্রাম্য দর্শকের সামনে বায়না করে ... মনসুর কোচোয়ানের ঘোড়ার গাড়িতে চেপে শ্বশুরবাড়ি যাবে ...

সুতরাং আদ্যিকালের বটগাছের ঝুরি নামে চতুর্দিকে। মুর্শিদাবাদের নবাবী ঘরানায়। ঐতিহ্যের রেশটুকু বুঝি রয়ে গেছে তার রোগা হাড় পাঁজরা চর্মসার ঘোড়ার শিথিল ক্ষুরধ্বনিতে।

জাফরাগঞ্জের কবরখানার পাশে এক আমগাছের তলায় দুপুরে শুয়ে শুয়ে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। সেলাই মেশিনের ধাতব আওয়াজ আর তার স্নেহের পুত্র মনজুর আলির শৈশবের মুখটা একসঙ্গে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। চিৎকার করে উঠেছিল মনসুর কোচোয়ান—'ওরে শুয়ার, পাজি, হারামজাদা—তুই মর্দানা না আওরত? তোর বাপ দাদার হাতের চাবুক নিয়ে ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শিখলি না বাপ?'

অশ্রুতে ভরে গিয়েছিল বৃদ্ধের ঘোলাটে চোখ। চারপাশ আঁধার লেগেছিল। তীব্র একটা জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছিল তার শিথিল স্নায়ুপুঞ্জে।

আর তখন একটু দূরে দেখতে পেল তাদের।

দুজন যুবক যুবতী। তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটির সিঁথির দিকে তাকিয়ে ঠিক বুঝতে পারল না মনসুর, সিঁদুর আছে কি নেই। ববচুল সালোয়ার কামিজ পরা মেয়ে। সার্ট

পাৎলুন পরা ছেলে। মেয়েটাকে দেখে হঠাৎ তার নিজের নাতনী লায়লির কথা কেন মনে পড়ল বুঝতে পারল না বুড়ো।

'যাবে নাকি দাদু?' যুবকটি শুধাল।

আলস্য দূর করতে একবার আড়িমুড়ি ভেঙে মনসুর গম্ভীর গলায় বলল, 'কুথায় যাবেন আপনারা?'

'বহরমপুর। লালদীঘির কাছে আমাদের ছেড়ে দিলেই হবে।' মেয়েটি কল কল করে আদুরে গলায় বলল।

জাফরাগঞ্জ থেকে বহরমপুর যাবে ঘোড়ার গাড়িতে? বাসের তো কোনো অভাব নেই। ট্রেনও আছে। ভ্রম ঘোচাতে দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে মনসুর বলে, 'আমার গাড়িতে যাবেন বলছেন?'

'তা না হলে এত ডাক হাঁক করে তোমায় ঘুম থেকে তুলি আমরা? ট্রেন বাসে কোনো রোমান্স নেই বুঝলে? টগ বগ টগ বগ করে ঘোড়া ছুটবে। গাড়ির মধ্যে আমরা বাদশা বেগম বসে থাকব, একেবারে নভেল থেকে উঠে আসা মধ্যযুগীয় রোমান্স।'

মনসুর কী বুঝল কে জানে। বেলা শেষে একটা খদ্দের যখন পাওয়া গেছে, এই ভরসায় আর কথা বাড়াল না।

কিছুটা দূরে ঘাস খেতে ব্যস্ত বুড়ো ঘোড়া লাট্টু সাহেবকে ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিল সে।

ঘোড়ার অবস্থা দেখে খিল খিল করে হেসে ওঠে সেই মেয়ে। বলে, 'হ্যাগো, বহরমপুর পৌঁছোতে পারব তো?'

'আলবৎ!' জোর দিয়ে বলে যুবক। আইডিয়াটা তার। হা হা করে হেসে বলে, 'সারাদিন ধরে শুধু পুরোনো ধ্বংসস্তূপ দেখে বেড়ালাম। এখন এই কবরের দেশ থেকে জীবনে ফিরব, এই ভাঙাচোরা ঘোড়ার গাড়ির মতো আশ্চর্য বাহন ছাড়া মানায় কখনো?'

হাসতে হাসতে যুবতী বলে, 'উঃ তোমার মাথায় আসেও বটে এত রকম মজার মজার কথা। কফি হাউসে সবাই শুনলে নির্ঘাৎ হৈ চৈ করে উঠবে। সত্যি, তুমি না, একটা জিনিয়াস।'

'তাহলে প্রতিভার স্বীকৃতি দিচ্ছ?'

'না দিয়ে উপায় আছে?'

'কিন্তু শুকনো প্রশংসাপত্র নিয়ে আমার কী লাভ বল? সত্যিকারের নজরানা কিছু না দিলে বেগম সাহেবাকে মানায় না।'

'দূর, তোমার মুখে কিছু আটকায় না। দিন দিন অসভ্য হচ্ছ। লোকে শুনলে ভাববে --'

'ভাবাভাবির কিছু নেই। ঢুকে পড়ো ঢুকে পড়ো গাড়ির মধ্যে।' একরকম তাড়াহুড়ো করে দুজনে গাড়ির মধ্যে বসে পড়ে। নারীর লাস্যময় হাসির ধ্বনি পাখির পালকের মতো চতুর্দিকে উড়তে থাকে। মৃতদের আত্মারা সচকিত হয় কবরের মধ্যে। কেউ কেউ নিশ্চয়ই দেহ খুঁজে ফেরে। প্রতিধ্বনির মতো সেই আর্ত বিলাপধ্বনি কান পেতে শুনতে পায় মনসুর কোচোয়ান। কুকুরের মতো কোঁৎ কোঁৎ করে নিঃশ্বাস টেনে কিছুর গন্ধ শোঁকে। নারী অঙ্গের বিচিত্র সুরভি বিহ্বল করে এই পরিবেশ। আকাশে ঘন হয়ে মেঘ করেছে। সবকিছু ধূসর হয়ে এসেছে। দিনের আলো আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে।

যুবক বলে, 'দাদু, বেশি তাড়াতাড়ির কিছু নেই। আমরা ট্রেন ধরতে যাচ্ছি না। আরাম করে চালাও।'

ট্রেন ধরার কথায় কখন হঠাৎ লাইলির কথা মনে পড়ল বুড়োর। লাইলি তার নাতনী। সেই সকালে কলকাতায় গেছে। রাতের ট্রেনে ফিরবে। স্টেশন থেকে নিয়ে আসতে হবে। এ এক ভারী ঝামেলা।

ঘোড়ার পিঠে চাবুক বসাল। তারপর ঢিমে তালে ঘুরতে থাকল শয়তানের চাকা।

পেছনে গাড়ির ভেতর থেকে পুরুষ ও নারীর অন্তরঙ্গ কথাবার্তার টুকরো টুকরো অংশ ভেসে আসছিল। ও সব গ্রাহ্য করছিল না মনসুর। জওয়ানী থাকলে ওই রকম পাগলের মতো হয়ে যায় সবাই।

লাইলির জন্য ভারী দুঃখ হয় তার। তার ব্যাটা মনজুর আলির পাঁচটা ছেলেমেয়ে। লাইলি দেখতে মন্দ নয়। বয়স খুব বেশি না। তিরিশের কাছাকাছি হবে। কিন্তু এর মধ্যে বিধবা হয়েছে। ছেলেপিলে হয়নি। সবাই ধরে নিয়েছে বাঁজা মাগী। বাড়িতে বাপের সঙ্গে খুব 'কাজিয়া' করেছে। তারপর রাগ করে একদিন পালিয়ে এসেছে দাদুর কাছে।

মনসুরের কোনো আপত্তি নেই নাতনী কাছে থাকাতে। কিন্তু তার রোজগারপাতিও তো তেমন কিছু নয়। নিজের পেট খেয়ে না খেয়ে চলে যায়। 'লাট্টু সাহেব'-এর দানাপানির ব্যবস্থাও তেমন হয় না। কিন্তু আর একটা জোয়ান আওরতের দেখাশুনা করার মতো সাধ্য তার নেই।

ক'দিন আধপেটা থেকে লাইলি বুঝে গেল তার দাদুর সামর্থ্য। শেষে নিজে কাম-কাজের ধান্দায় বের হল। পরের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ তার মোটেই ভাল লাগে না। স্বাধীনচেতা মেয়ে সে। ঠিক যোগাযোগ হয়ে গেল বেলডাঙার কতকগুলো মেয়ের সঙ্গে। বস্তাভর্তি চাল নিয়ে যায় কলকাতায় ভোরের ট্রেনে। দালালের কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে সন্ধের ট্রেনে। মুর্শিদাবাদ স্টেশনে গাড়ি ঢুকতে ঢুকতে মাঝরাত হয়ে যায়। মনসুর গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করে স্টেশনের বাইরে। রূপকথার রাজকন্যার মতো গাড়িতে গিয়ে বসে লাইলি। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোতে নির্জনতা বাড়িয়ে তোলে ঘোড়ার খট্ খট্ ...... বাতাসে কান পেতে তখন বুড়ো শুনতে পায় ফিস ফিস ধ্বনি ... 'বেঁচে আছি, বেঁচে আছি ...' মনসুর কোচোয়ান সে সময় নিশ্চয় বলে, 'জীবনটা যদি গোড়া থেকে আবার শুরু করা যেত ..'

বাতাসে বুড়োর দাড়ি ওড়ে। ধূসর চোখদুটি সামনের দিকে। নির্লিপ্ত। চোখের কোণায় প্রকৃতির অজস্র প্রহারের চিহ্ন। ছেঁড়া পাঞ্জাবির ভিতর থেকে বুকের পাঁজরা দেখা যায়।

ধীরে ধীরে একটা পুরোনো গান গাইতে থাকে সে—

আমুবা কে ডারা ডারা
নাওরি ভামারা ডালি মালিয়া
কাদারা পিয়া বিনে শূন্যা বাগানা ....

এক সময় হয়তো গলায় সুর ছিল, এখন এই বার্ধক্যজড়িত ভাঙা গলায় শব্দগুলো আর্তধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়ছিল বাতাসে। মেঘে, রোদে, গাছপালায়। রাস্তার কেউ কেউ অবাক চোখে তাকায় তার মুখে দুর্বোধ্য উচ্চারণে গানের কলি শুনে।

গাড়ির ভেতর থেকে যুবক শুধায়, 'দাদু, গানটা তো ফাসক্লাশ। কোথা থেকে শিখেছ?'

গম্ভীর গলায় মনসুর জবাব দিল, 'মুর্শিদাবাদের সব থেকে রইস উস্তাদ কাদের বক্স সাহেবের গান।'

'ওস্তাদ মানে ক্ল্যাসিকাল গান গাইতেন বুঝি?'

যুবকটির উপহাস কিনা বোঝবার চেষ্টা করে মনসুর। তারপর শান্ত গলায় বলল, 'উস্তাদ মঞ্জু সাহাবের গুরু। মঞ্জু সাহাব কে ছিলেন জানেন তো? নবাব সৈয়দ বাকার আলি মির্জার সাহেবজাদা। আহ্, মঞ্জু সাহাবের গলায় গান যদি একবার শুনতেন! মানুষের গলায় অমন গান হতে পারে, না শুনলে বিশ্বাস হবে না।'

তার স্বভাবের বিরুদ্ধে অনেকখানি কথা সে বলে ফেলেছে, এটা টের পাওয়া মাত্র চুপ করে গেল বুড়ো। গম্ভীর মুখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। রাস্তার চারপাশের ভূগোল কত পাল্টে যাচ্ছে দিনে দিনে। বাড়ি ঘর বানাচ্ছে লোকজন। মানুষের বেঁচে থাকার কী উৎসাহ। মোটর সাইকেলে আওয়াজ তুলে ভয়ংকর গতিতে ছুটে গেল লুঙ্গিপরা এক সুদর্শন তরুণ। একবার দেখেই মনসুর বুঝতে পারে চাষী ঘরের ছেলে। নতুন পাট উঠেছে। মহাজনকে বিক্রি করেই, খেতে পাক না পাক ঝকঝকে মোটর সাইকেল কিনে ফেলেছে। গ্রামে আলপথে

চালাতে গিয়ে কয়েকবার আছাড় খাবে, ঠ্যাং ভাঙবে, সদরে বহরমপুর হাসপাতালে পড়ে থাকবে তিনমাস, তবু তো মোটর সাইকেলে চাপা হচ্ছে ...

টি. ভি. অ্যান্টেনার জঙ্গল ধীরে ধীরে গ্রাস করছে বাড়ির ছাদগুলো। বহরমপুরে রিলে স্টেশন হয়ে গেছে।

ততক্ষণে আকাশের মেঘ ঘনকৃষ্ণবর্ণ হয়েছে। বাতাসের গতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অচঞ্চল ভঙ্গিতে বুড়ো গাড়ি চালায়।

'আরে আমি কোথায় চলেছি? লাট্টু সাহেবের মাথা খারাপ হল নাকি? যাব বহরমপুরে, এ কোন রাস্তা দিয়ে গড়িয়ে চলেছে শয়তানের চাকা?' নিজেকে জিজ্ঞেস করল মনসুর কোচোয়ান।

আবার সে ঘোড়াটা ঘুরিয়ে কষে চাবুক মারল। রোগা ঘোড়া লাট্টু সাহেব চিঁহি চিঁহি ডাক ছেড়ে জোর কদমে ছুটতে থাকল।

ভেতর থেকে যুবক জিজ্ঞেস করল, 'এত জোর ছুটছ কেন দাদু? আমাদের তো তাড়া নেই কিছু।'

'ঝড় উঠছে। বারিষ হবে।' মনসুর বলল।

মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা হোক না ঝড়, পড়ুক না বৃষ্টি। কী রোম্যান্টিক পারস্পেকটিভ!' গুন গুন করে মেয়েটি গাইতে থাকে,

'মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈ থৈ, তাতা থৈ থৈ, ...'

হুঁ, রসে ডুবে আছে দু'জনে। জোয়ান বয়স। শাদী হয়নি বোঝাই যাচ্ছে। পীরিতের ব্যাপার। কুছ পরোয়া নেই। চলুক গাড়ি ধীরে সুস্থে। তেমন বারিষ হলে কোনো গাছতলায় দাঁড়ালে হবে। উপায় কী? সারাদিনে এই একটামাত্র খদ্দের পাওয়া গেছে। এ সব পার্টি ভাল। ফুর্তি করে বখশিস দেবে প্রাণভরে। ঝড়ের ঝাপটা বুড়োর দাড়ি, মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছিল। জীবনে ঘটনাগুলো কী তাড়াতাড়িই না ঘটে গেল। ইচ্ছে মতো সাজানো হল না কিছু।

যুবকের গলার স্বর ভেসে এল, 'দাদু, বৃষ্টি খুব জোরে পড়ছে?'

'না।'

'ঝড় হচ্ছে তাহলে?'

'হুঁ, বিজলিও চমকাচ্ছে।'

'একটা কথা বলব, দাদু?'

'বলুন।'

'তোমার জোয়ান বয়সে কোনো মেয়েছেলে নিয়ে ঘোরনি মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায়?'

'আমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ঘুরেছ। ... অস্বীকার কোরো না বাপু।'

'এ শহর তো মুর্দা আদমির শহর বাবু। বচপনসে দেখে আসছি, শুধু ভাঙাচোবা দালান ইমারত আর কবর। শুধু নবাবদের কবর না। সাহেবদের নোকরদের। আমার মতো ছোটলোকদের।'

'সাহেব মানে বিলিতি সাহেব?' মেয়েটি জিজ্ঞেস করে।

মনসুর দুর্বলতা অনুভব করছিল। অস্বস্তি হচ্ছিল। আজকাল বেশি বক-বক করতে ইচ্ছে করে না। সমুদ্দুর পেরিয়ে কত সাহেব এসেছে মুর্শিদাবাদে, কাশিমবাজারে, জিয়াগঞ্জে। ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার, আর্মেনিয়ান কত কত সব। এ সব 'নাদান' লেড়কা-লেড়কি কী করে বুঝবে ভগ্নপ্রায় কবরে শায়িত সে-সব মানুষের অতৃপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

সে যেন কী বলবে বুঝতে পারল না। ভাবতে ভাবতে চারদিকে চেয়ে হঠাৎ একমুখ হাসি নিয়ে বলল, 'বারিষ এসে গেছে বাবু।'

সেই প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি আর বজ্রপাতের মধ্যে মনসুর কোচোয়ানের রথ গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

চাপা গলায় যুবক-যুবতী কী যেন গল্প করছিল। কথা যেন ফুরোয় না। ওদিকে এক অন্ধ প্রকৃতির প্রচণ্ড মত্ততার মধ্যে গাড়ি নিয়ে যায় সেই বৃদ্ধ কোচোয়ান।

অনেক অনেক জনের টুকরো টুকরো স্মৃতি মনে পড়ে তার। এক নারীকে গাড়িতে বসিয়ে লালবাগ কাশিমবাজারের রাস্তায় সান্ধ্য ভ্রমণ, বাতাসে ঘরফেরা পাখিদের পাখনার আওয়াজ, কুয়াশার আস্তরণে নিঃঝুম নক্ষত্রমণ্ডলীর আবছা ছায়াছবি।

যুবতী হঠাৎ আদুরে গলায় বলল, 'আমি কোচোয়ানের পাশে বসে বৃষ্টিতে ভিজব।'

যুবক বলল, 'কী ছেলেমানুষী করছ।'

যুবতী বলল, 'আমি জীবনে কোনোদিন এ রকম ঘোড়ার গাড়িতে চাপিনি। তার উপর বৃষ্টি হচ্ছে, হাওয়া হচ্ছে, দারুণ!' হাততালি দিয়ে ওঠে সে।

'তাই বলে ওই বুড়োর পাশে বসে যাবে, আমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকব?'

'ওমা, হিংসে হচ্ছে বুঝি দাদুকে? আহা পাঁচ মিনিটের তো ব্যাপাব। খানিক বাদেই নেমে আসব!' নিজেই মনসুর কোচোয়ানকে ডাক দিল মেয়েটি, 'ও দাদু, একটু গাড়িটা দাঁড় করাও না বাবা। আমি খানিকক্ষণ তোমার পাশে বসে বৃষ্টিতে ভিজব।'

গাড়ি থামাল মনসুর। মেয়েটি তার পাশে উঠে বসে। গাড়ি চলতে শুরু করে। ভেতর থেকে যুবক চ্যাঁচায়, 'তাড়াতাড়ি নেমে এসো। বৃষ্টিতে বেশি ভিজলে নিউমোনিয়া হবে।'

মনে মনে হাসে মনসুর। জোয়ান লেড়কার মনে লেগেছে। কিন্তু এই বয়সের আওরতও হয় আচ্ছা বেসবুব। যখন যা ইচ্ছে হয়, করে ফেলে।

আড়চোখে পাশে বসা মেয়েটির দিকে তাকায় সে। সেই আশ্চর্য সুঘ্রাণ ভেসে আসছে বুঝি যুবতীর দেহ থেকে। আধো অন্ধকারে চলন্ত গাড়িতে মেয়েটিব চোখ মুখ ভাল মতো ঠাহর করতে পারে না সে।

গুন গুন করে উস্তাদ কাদের বক্সেব গানখানা ভাঙা গলায় গাইতে থাকে বুড়ো ..

আমুবা কে ডারা ডারা
নাওরি ভামারা ডালি মালিয়া
কাদারা পিয়া বিনে শূন্যা বাগানা .

ঝড-বৃষ্টির প্রাবল্যে কী একটা আশঙ্কা করে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডাক ছাড়ে লাট্টু সাহেব। কড় কড় করে বাজ পড়ে। অন্ধকার রাস্তায় এক ভয়ংকর সময়ের সাথী হয়ে স্থির হয়ে যায় সেই বৃদ্ধ কোচোয়ানেব অনন্ত যাত্রা। ..

সেই রাত্রে ট্রেনে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ফেরবাব সময় ঝড় বাদলার মধ্যে ট্রেনেব জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছিল লাইলি। পরে অনেকবার হলফ করে সে বলেছিল, তার দাদু একটা ঝকঝকে নতুন ঘোড়াব গাড়ি ছুটিয়ে পাল্লা দিয়ে চলছিল রেলগাড়ির সঙ্গে। ঘোড়ার নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছিল উজ্জ্বল ধোয়া। তাজ্জব কি বাৎ, দাদুর পাশে বসেছিল এক খুবসুরৎ আওরত। ...

এমনি করে গল্পের পর গল্প জমা হয়। বজ্রপাতে হত মনসুর কোচোয়ানের বুঝি মৃত্যু নেই। ইতিহাস আর কিংবদন্তীর আড়ত এই মুর্শিদাবাদে জন্ম নেয় আর একটি উপকথা। মাঝে মাঝে কেউ কেউ নাকি লালবাগ, কাশিমবাজার, সৈদাবাদ, বহরমপুরের পথে পথে মাঝরাত্তিরে ছুটতে দেখে সেই আশ্চর্য ঘোড়া-গাড়িকে। কোচোয়ানের পাশে বসে থাকে এক সুন্দরী যুবতী। যেন অনেক দেরীতে হলেও সেই বৃদ্ধ শকটচালক বুঝতে পেরেছিল এক নতুন ও সুন্দর জীবন সে ইচ্ছে করলেই আবার শুরু করতে পারে। আর এ ভাবেই পৃথিবীর জীবিত মানুষেরা বুঝি তাদের কল্পনায় কিংবা স্বপ্নে ছুটতে দেখে সেই বৃদ্ধকে রাতের পর রাত। কোন দূরে দূরান্তরে তাদের রথ ছুটে চলে এক চিরকালের নারীকে পাশে বসিয়ে।

নীল প্রজাপতি

দেবর্ষি সারণী

আতঙ্কিত মুখে বিরাশি বছর বয়স্ক ঠাকুর্দা গোধূলির আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল সে আবার বুঝতে পারছে যে দেবতা তাকে স্বপ্নে দেখছেন। মোষের পিঠে বসে দক্ষিণদিক থেকে আসা এই দেবতার গায়ের রঙ সবুজ কিন্তু ভয়ঙ্কর মুখটা এমন শান্ত যে ভয়ে শরীর বরফ হয়ে যায়। গত তিনদিন ধরে ঠাকুর্দা বলে যাচ্ছে এই কথাগুলো। এটা সবাই জানে যে ওই দেবতা কাউকে স্বপ্নে দেখলে সে আর বাঁচে না।

ঠাকুর্দা যখন বুঝতে পারে যে দেবতা তাকে স্বপ্নে দেখছেন, তার অবস্থা জালে আটকে পড়া মাছের মত হয়ে যায়। বিরাশি বছর বয়সেও তার মুখটা সাদা হয়ে ওঠে, ভয়ে কাঁপতে থাকে শরীর প্রবল জ্বর ওঠে এবং আমি তাকে ধরে আস্তে আস্তে বিছানায় শুইয়ে দিই। ভয় একটু কমার পর, বিশেষত বৃদ্ধ যখন বুঝতে পারে যে দেবতা এই মুহূর্তে আর তাকে স্বপ্নে দেখছেন না সে আবার বিছানায় উঠে বসে। অনেক সময় ঘরের মেঝেয় বা আমাদের প্রাচীন দোতলা বাড়ির বিশাল বারান্দায় চাদরমুড়ি দিয়ে পায়চারি করে

কিন্তু আজকের গোধূলির আকাশে তাকিয়ে দেবতাকে দেখার পর ঠাকুর্দা এমন ভয় পেয়ে গেল যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। বিছানায় শুয়ে একবার সাদাটে চোখ দিয়ে উঁচু সিলিংয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকাল তারপর চোখ বুজে আর চোখ খুলল না। এখনও মারা যায় নি। চিকিৎসকের মতে অবশ্য যখন তখন মারা যেতে পারে আবার দু চার মাস বেঁচেও থাকতে পারে। আমার বয়স আঠারো, আমি সারাক্ষণ ঠাকুর্দার কাছাকাছি থাকি গত তিনদিন ধরে বাইরে খেলাধুলো করতেও যাচ্ছি না। একটু রাতের দিকে, রাতের খাবারের জন্য বিড়ালটা যখন বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে করুণ কান্নার সুরে আবদার করছিল ঠাকুর্দার মুখ হঠাৎ হাঁ হয়ে যায়, কালচে জিভটা কোনও জলচর প্রাণীর কুৎসিত লেজের মত পাক খেতে থাকে এবং ভয় পেয়ে আমি ছুটে যাই ঠাকুমার কাছে, যে খাটে বসে পান চিবোতে চিবোতে পান সাজছিল আর বাবার সঙ্গে গল্প করছিল।

আতঙ্কিত মুখে আমি জানালাম যে ঠাকুদার অবস্থা আরও খারাপ।

যাঁতি দিয়ে সুপুরি ভাঙতে ভাঙতে ঠাকুমা বাবার দিকে তাকান, বাবা ঠাকুমার দিকে তারপর যে যেমন ভঙ্গিতে বসেছিল তেমন ভঙ্গিতেই বসে থাকল যতক্ষণ না বিড়ালটা হঠাৎ এ ঘরে ঢুকে পড়ে দুজনকেই ভৎসনা করে।

'বর মারা যাচ্ছে আর তুমি বসে বসে পান চিবোচ্ছ?' বিড়ালটা ঠাকুমাকে বলে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে বাবাকে বলে, 'আর তুমি? শুয়ে শুয়ে গল্প করছ?'

'চুপ হতচ্ছাড়ি!' ঠাকুমা হঠাৎ যাঁতিটা ছোঁড়ে বিড়ালটার উদ্দেশে। 'কেন বর ত মারা যাচ্ছে না? পালা এখান থেকে।'

ভয় পেয়ে বিড়ালটা সত্যি বেরিয়ে যায় ঘর থেকে, এমন কি বাইরে গিয়ে সে তার খাবারের জন্য আর করুণ ডাকও ছাড়ে না। ঠাকুমাকে এ বাড়িতে সবাই ভয় পায়।

আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঠাকুমা ওঠে। যাঁতিটা বন্ধ করে পানের পাত্রে রেখে বারান্দা দিয়ে ধীরে সুস্থে হাঁটতে থাকে অসুস্থ ঠাকুর্দার ঘরের দিকে এবং পাশাপাশি হাঁটতে থাকে — দেওয়ালের ফোঁকর থেকে বেরিয়ে এসে — আমাদেব বাড়িতে বংশপরম্পরায় থাকা একটা সাপও, যার ধূসর চামড়া প্রায় ঠাকুর্দার চামড়ার মত। সাপটা আমাদের প্রাচীন বাড়িটায় বেড়াল কুকুর বা পায়রাদের মতই পরিবারের একজন। আমরা তাকে ভয় পাই না, সেও আমাদের কোন ক্ষতি করে না।

'মৃত্যুমুখী বরকে এভাবে অবহেলা করতে এ বাড়িতে এর আগে আমি কাউকে দেখি নি। তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।' সাপটা বলল।

'চুপ কর মুখপোড়া! বেশি কথা বললে তোকে আজ খেতেই দেব না।' বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে ঠাকুমা বলে। এবং দু-হাত তুলে মুখে হিসহিস শব্দ করে বাবা সাপটাকে ভয় দেখায়। সাপটা মুখ বন্ধ করে। হয়ত খাবার না পাওয়ার দুশ্চিন্তাতেই। তাকে আজকাল রোজ খাবার দেওয়া হয় না। সে অবশ্য বিড়ালটার মত — খাবারের জন্য ঘ্যানঘ্যান করে না, হয়ত বয়স হয়েছে বলে তার খিদে কমে গেছে। ধূসর, বিষণ্ণ, সম্ভবত অন্ধ চোখদুটো দিয়ে সাপটা হয়ত বাবার মুখটা একটু দেখার চেষ্টা করল, তারপর তেজহীন ফণাটা নামিয়ে মেঝেয় মুখ ছুঁইয়ে ধীরে ধীরে দেওয়ালের ফোঁকরে ঢুকে পড়ল।

'কী হয়েছে অ্যাঁ? কিসের কষ্ট হচ্ছে তোমার আবার?' ঠাকুর্দার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ঠাকুমা চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করে। 'কিছু বলছ না যে? আরে কোথায় কষ্ট বলবে ত? বিরক্তির এক শেষ!'

ঠাকুর্দার মুখ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে ঠাকুমা বিরক্তিতে কোঁচকাল নিজের সুন্দর, ফর্সা, পান চিবানো মুখটাকে, তারপর পাশে দাঁড়ানো বাবার মুখের দিকে তাকাল, যাতে তার বিরক্ত হবার যে যথেষ্ট কারণ আছে বাবা তা বুঝতে পারে।

বিরক্ত অবশ্য বাবাও, যদিও বাবার বিরক্তি একটু চাপা, ঠাকুমার মত মুখে প্রকাশ করে না। হয়ত লজ্জা পায়। হয়ত লজ্জাও নয়, বাবা চুপ করে থাকে কারণ বাবার স্বভাবটা একটু গম্ভীর। অন্তত ঠাকুর্দার ব্যাপারে। এবং ঠাকুর্দার ব্যাপারে ঠাকুমার সব অভিযোগ বাবা একবাক্যে সমর্থন করে। ঠাকুর্দাকে কখনও মানুষ বলেই মনে করে নি ঠাকুমা এবং ছোটবেলা থেকে বাবাকেও শিখিয়েছে যাতে বাবাও মানুষ বলে না মনে করে। তাদের দুজনেরই অভিযোগ যে জীবনে কিছু না করে ঠাকুর্দা দিব্যি এত বছর বেঁচে থাকল। এটা ঠিক যে ঠাকুর্দা জীবনে বড় কোনও কাজ বা রোজগারপাতি করে নি। ছোটখাটো নানা কাজ করেছে, আবার খারাপ লাগলে ছেড়ে দিয়েছে। কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেমন তার ছিল না, তেমনি জীবন নিয়ে কোনও অভিযোগও।

ঘরে মা ঢুকল চোখে এক-জঙ্গল ঘুম নিয়ে। মা ঘুমোতে খুব ভালবাসে, ফলে সুযোগ পেলেই ঘুমিয়ে নেয়, আর মায়ের চোখেব পল্লব কালো ও ঘন বলে তার ঘুমমাখা চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে আমাব অনেকসময় মনে হয় যেন রাতের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছি।

'দেখছিস? মুখে কিছুই বলছে না?' ঠাকুমা বলল বাবাকে। মায়ের সামনে ঠাকুমা নিজের দাপট দেখাতে একটু বেশিই ভালবাসে এবং মাকে এটা বুঝিয়ে দিতে যে তার বরের ওপর তারই বেশি প্রভাব। এটা ঠিক যে মায়ের চেয়ে ঠাকুমাকেই বাবা বেশি গুরুত্ব দেয়। কাজের শেষে বাড়ি ফিরে আসার পর ঠাকুমার সঙ্গেই গল্পগুজব করে।

'বলবে কী করে? আর জ্ঞানই ত নেই মনে হচ্ছে।' মা বলল ঠাকুর্দার মুখের দিকে তাকিয়ে।

'তুমি চুপ করো!' ঠাকুমা মায়ের উদ্দেশে বলে। 'ওকে আমি চিনি। সারাজীবন ত এভাবে শুয়েই কাটাল। জ্ঞান চলে যায়। আবার ফিরে আসে। কালই দেখবে উঠে দাঁড়িয়ে হিলহিল করে হাঁটছে।'

এর আগে অবশ্য ঠাকুমার কথা ফলেছে, অর্থাৎ দুদিন দুরাত টানা শুয়ে থাকা ঠাকুর্দাকে তৃতীয় দিন ভোরে বাড়ির সবার আগে ঘুম থেকে উঠে লম্বা, অত্যন্ত রোগা শরীর নিয়ে বারান্দায় হিল হিল করে হাঁটতে দেখা গেছে। কিন্তু এবার পাঁচদিনের মাথায়ও ঠাকুর্দা উঠে দাঁড়াল না।

আমি আতঙ্কিত, দুঃখী ও অস্থির হয়ে উঠলাম। বৃদ্ধের প্রতি সকলের বিরক্তি ও উদাসীনতা থাকলেও আমার কোথাও একটা টান ছিল। সেটা হয়ত এ কারণেই যে ঠাকুর্দা খুব কেজো, ব্যস্ত ও দাপুটে মানুষ ছিল না। মানুষেব চেয়ে অনেকসময একটা গাছকে আমি বেশি ভালবাসি। ঠাকুর্দা আর বাঁচবে না জানতাম। মাবা গেলে যে কারও কোনও ক্ষতি হবে না সেটাও জানতাম। তবু মৃত্যু জিনিসটাকে মন মেনে নিতে চায় না। ওটায় কেমন একটা আতঙ্ক আছে, দুর্বোধ্যতা আছে, অপূরণযোগ্য শূন্যতা আছে।

ষষ্ঠ দিনের দুপুর বেলায়, সবাই যখন ঘুমোচ্ছে আর খাটে শুয়ে মুখ হাঁ কবে ঠাকুর্দা এক একটা শ্বাসপ্রশ্বাস নিচ্ছে, আমি দেখা করলাম আমাদের গৃহদেবতার সঙ্গে, যিনি হাতে বাঁশি ধরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ছাদেব এক ছায়াকোণে দাঁড়িয়ে একটা নীল প্রজাপতিকে নৃত্য শেখাচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি অদৃশ্য হবাব চেষ্টা করলেন কিন্তু আমাব কাতব, ভাঙ্গা, শুকনো মুখ তাঁকে হয়ত একটু বিচলিত কবল, ফলে অদৃশ্য না হয়ে আমার দিকে তাকিযে থাকলেন, ঠোঁটে হাসি, যা এত সূক্ষ্ম যে মর্মোদ্ধার কবা দুরূহ। নীল প্রজাপতিটা, স্তব্ধ দুপুবেব বাতাসে, আপনমনে নেচে যাচ্ছিল।

'ঠাকুর্দা মনে হয মারা গেল।' আমি তাঁর হাত ধবে বললাম। 'তাকে আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে বাখো না!' আমাব অশ্রুকে প্রাণপণ সম্বরণ কর্বছিলাম আমি।

দেবতা নিজের আঙুল আমার কপাল ও চুলে বুলিয়ে দিলেন। তিনি বাজাচ্ছিলেন না, তবু, বাঁশিব ধ্বনি বাতাসে ভাসছিল।

'আমার সবচেয়ে বড দুঃখ কোথায় জানো?' আমি অস্ফুটস্বরে বললাম। 'ঠাকুর্দাকে কেউ ভালবাসে নি।'

দেবতার মুখে একইরকম সূক্ষ্ম হাসি। বাঁশির প্রগাঢ়তর ধ্বনিতে বাতাস ভারি হযে গেল।

'যাকে কেউই ভালবাসে না সে ত বাঁচতেই পারবে না।'

'আমি মিথ্যে বলছি না। ঠাকুর্দাকে কেউই ভালোবাসে নি।'

'তোমার ঠাকুর্দার বাবা মা কিন্তু তাকে খুবই ভালবাসত।'

আমি দেবতাব মুখেব দিকে তাকিযে থাকি, আমার চোখে এখন অনর্গল অশ্রু, এবং আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না তাঁর কথা, মনে হচ্ছিল যে মিথ্যে প্রবোধ দিচ্ছেন আমাকে। ছাদেব উঁচু বাঁশটায় একটা চিল এসে বসেছিল। সে একমনে শুনছিল আমাদেব কথা, তাবপর হয়ত বুঝতে পারল আমার সংশয়।

'তিনি ঠিকই বলছেন। তোমার ঠাকুর্দার বাবা মা নিশ্চযই তাকে খুব ভালবাসত।'

চিলটার কথা আমি আমল দিলাম না, কারণ আমার মনে হল যে সে নিজের কোনও জরুরি স্বার্থের জন্য তোষামোদ করতে চাইছে দেবতাকে, অন্তত তার তাকানোর ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে সেরকমই একটা আভাস ছিল। চিলটা আর বেশিক্ষণ বসল না। বাঁকা দৃষ্টিতে নিচে তাকিয়ে হয়ত একটা ব্যাঙ দেখল আমাদের বাড়ির পেছনের জলাশয়ে। এবং হঠাৎ নিঃশব্দে উড়ে গেল।

ঠাকুর্দাও যে সত্যি কখনও ভালবাসা ও গুরুত্ব পেয়েছে সেটা নিজের চোখে দেখার এত তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করলাম যে আমি ১৮৯৫ সালের আমগুড়ি জেলার সেই গ্রামটায় গিয়ে উপস্থিত হলাম, যেখানে ঠাকুর্দা জন্মেছিল। গ্রামটা এত শান্ত যে নিজের ভাবনার শব্দও শোনা যায়। একটা দিঘি দেখলাম, যার জল আয়না দিয়ে তৈরি। ফাঁকা মাঠের ওপর একটা এত উঁচু তালগাছ দেখলাম যে আমার মনে হল ওটার যূথবদ্ধ পাতাগুলোয় নিশ্চয়ই নক্ষত্রের আলো এসে পড়ে, গ্রামটায় অনেকগুলো পাকা বাড়ি, যাদের একটা ঠাকুর্দার বাবার। শিশু ঠাকুর্দাকে দেখলাম নিজের বাবার ঠোঁট চুষছে। দশ বারো বছর বয়সের ঠাকুর্দা যখন পা-দুটো চৈত্রের আগুনে পুড়িয়ে টোল থেকে বাড়ি ফিরল তার মা কুয়ো থেকে তোলা ঠাণ্ডা জলে তার পা-দুটো অনেকক্ষণ ধরে ধুইয়ে দিল, তারপর তাকে সামনে বসিয়ে নিজের হাতে খাওয়াল। আরও বেশি বয়সে জ্বরাক্রান্ত ঠাকুর্দার পায়ের কাছে তার মা এবং শিয়রের কাছে তার বাবা সারারাত ধরে বসে থাকল। ঠাকুর্দার বিয়ের পরদিন নববধূকে জড়িয়ে ঠাকুর্দার মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আজ থেকে ও যত না আমার তার চেয়ে বেশি তোমার। ওকে যত্ন কোরো।' ঠাকুর্দা তখন এমন তৃপ্ত, নিশ্চিন্ত ও স্বপ্নগ্রস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল নিজের স্ত্রীর দিকে যে আমার চোখে জ্বালা অনুভব করলাম। আমি ঠাকুর্দাকে একটু ছোঁবার চেষ্টা করলাম, যেভাবে কেউ কাচের দেওয়ালে হাতদিয়ে কাচের ওপারের জিনিসকে ছোবার চেষ্টা করে।

'কিন্তু বিয়ের পর ঠাকুমা আর তাকে ভালবাসে নি।' গ্রামটা থেকে ফিরে এসে আমি গৃহদেবতাকে বললাম। এতক্ষণ তিনি আগের মতই বাঁশি হাতে ধরে এবং পায়ে ঘুঙুর বেধে ছাদটায় দাঁড়িয়েছিলেন। হয়ত জানতেন যে ফিরে এসে আমি আবার তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাইব। তাই অদৃশ্য হন নি।

তিনি না বাজালেও বাতাসে বাঁশির ধ্বনি।

'আমি কি ঠিক বলছি না? তারপর এত দীর্ঘ জীবন বাঁচল ঠাকুর্দা। কিন্তু কেউই তাকে আর ভালবাসে নি।'

উত্তর না দিয়ে দেবতা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন, যার মর্মোদ্ধার করা শক্ত।

'কেউ না কেউ ও নিশ্চয়ই খুব ভালবেসেছে। নইলে এতকাল বাচল কী করে?'

'কে?' ক্রোধ ও অভিমানের সঙ্গে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

গৃহদেবতা এবার একটু শব্দ করে হেসে উঠলেন, নীল প্রজাপতিটা তখনও নাচছিল শূন্য বাতাসে, তার সঙ্গে নাচছিল ছাদে পড়া তার ক্ষুদ্র ছায়াটাও, এবং বাতাসে আপনিই বাঁশির শব্দ। গৃহদেবতা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। হয়ত একটা রঙিন বুদ্বুদের রূপ ধারণ করে। কিংবা দ্বিতীয় একটা নীল প্রজাপতি হয়ে। এখন কিছুক্ষণ তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। অবশ্য অনেক ডাকাডাকি করলে নিজের রূপ ধারণ করে আবার সামনে হাজির হন। তবে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমার আর ইচ্ছে করছিল না এবং এর আগেও লক্ষ্য করেছি যে তাঁর অধিকাংশ কথাই অস্পষ্ট, হেঁয়ালিপূর্ণ।

মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দুঃখ ও অভিমান নিয়ে আমি ঠাকুর্দার ঘরে এসে উপস্থিত হলাম। তখনও মারা যায়নি। দুপুরের ঘুম থেকে উঠে ঠাকুমা, বাবা ও মা বারান্দায় চেয়ারে বসে গল্প করছে।

'ওর ওপর ভরসা করে থাকলে এত বড় বাড়িটা কবেই উইয়ের পেটে চলে যেত।' ঠাকুমা বলল পান চিবোতে চিবোতে।

'সে ত যেতই।।' মা বলল।

'ওসব দিনের কথা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়।' বাবা বলল সিগারেট পাকাতে পাকাতে, চাপা গৌরবে মুখটা লাল করে। 'তবে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে। সামনের বছর গোটা বাড়িটাতেই রঙ করাব ভাবছি।'

'সে কী রে? বলিস নি ত আমাকে?' ঠাকুমা বলল হেসে, কণ্ঠস্বরে একটু ঢঙ ফুটিয়ে, তারপর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল বাবার মুখের দিকে।

পরদিন সকালে মৃত ঠাকুর্দাকে দেখা গেল মুখ থুবড়ে মেঝের ওপর পড়ে আছে, জলে ডোবা মানুষ যেভাবে ডাঙার কাছে এসে, হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে ভাসতে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই।

দৃশ্যটা আমি প্রথম দেখি। আমি চিৎকার করতে পারলাম না। কাদতে পারলাম না। আতঙ্কে স্থির হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলাম।

একে একে সবাই ঢুকল ঘরটায়। ঠাকুমা, বাবা, মা, বিড়াল এবং সাপটা। ঠাকুর্দার নাকের কাছে ঘোরাঘুরি করতে থাকা অজস্র কালো পিঁপড়েরা নিচু গলায় নিজেদের ভেতর কথা বলছিল।

'চিৎ করে শোওয়া ত।' খুব চিন্তামগ্ন মুখে ঠাকুমা বলল বাবাকে।

বাবা ঠাকুর্দাকে উল্টে সোজা করে দিল।

'যা ভেবেছি তাই।' দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ঠাকুমা বলল। 'খাট থেকে পড়ে মরে নি, কারণ সেটা হলে ত কপাল ফেটে রক্ত বেরোত। অনেক আগেই মারা গিয়েছিল। তারপর কোনও কারণে পড়ে গেছে।'

মৃত ঠাকুর্দা যে খাট থেকে কিভাবে পড়ে গেল সেই রহস্য আর কোনদিনই বোঝা হল না আমার। হয়ত মরার পরও তার কোথাও তীব্র অভিমান ছিল বাড়িটার ওপর। এবং তাতেই হয়ত মৃতদেহটা একটু একটু করে নিজেকে নিচে গড়িয়ে দেয়।

নিস্তেজ, অবসন্ন ফণা যথাসম্ভব উঁচু করে তুলে সাপটা, সম্ভবত অন্ধ চোখে, একপলক স্থির হয়ে দেখল ঠাকুর্দাকে, তারপর রক্তবমি করতে করতে খানিক পরে দেহত্যাগ করল। বিড়ালটা তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচিয়ে কয়েকটা অশ্রাব্য গাল দিল ঠাকুমাকে, তারপর বাড়ির সবাইকে। এবং বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। নতুন যে জিনিসটা বাড়িতে ঢুকল সেটা একটুকরো হাওয়া, যা দিনরাত পাক খায় আমাদের বিশাল, প্রাচীন বাড়িটার দেওয়াল ও ফাঁকফোকরে। এবং শব্দ ওঠে। দিনরাত ওই হাওয়াটার ঝাপটা খেতে খেতে আমাদের চোখমুখও কেমন শুকিয়ে যেতে লাগল, যেন হাওয়াটা আমাদের শরীরের সমস্ত জলীয় পদার্থ আস্তে আস্তে শুষে নিচ্ছে। হাড় বারকরা লম্বাটে মুখ ও কোটরগত সাদা চোখ দিয়ে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। খুব প্রয়োজন ছাড়া কথা বলি না।

অনেকদিন পর ঠাকুমা মৃত্যুশয্যায় শুলো কিন্তু বাবা তার ঘরে একবারও ঢুকত না, কারণ তার মনে হত যে ঠাকুমা ঠাকুর্দাকে অবহেলা করেছে, তাই ঠাকুমার দেখাশোনা না করলেও চলবে। এর কয়েক বছর পর বাবা মৃত্যুশয্যায় শুয়ে, কিন্তু মা বা আমি বাবার ঘরে ঢুকতাম না, কারণ আমাদের মনে হত যে বাবা, ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা উভয়কেই অবহেলা করেছে, তাই তার দেখাশোনা না করলেও চলবে। তাছাড়া, বাবাকে ভালবাসার চেয়ে মা, আমাকে অনেক বেশি ভালবাসত, যদিও ক্রমান্বয়ে শুকোতে থাকা আমার শরীর ও মন ওই ভালবাসায় কোনও আনন্দই পেত না। শুকোতে শুকোতে মা নিজে ত কঙ্কালই হয়ে গিয়েছিল। এবং মৃত্যুশয্যায় শুলো, কিন্তু আমি মায়ের ঘরে ঢুকতাম না, কারণ আমার মনে হত যে মা, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা ও বাবার দেখাশোনা করে নি, তাই আমারও মাকে না দেখলে চলবে।

এবার আমি বৃদ্ধ। এবং মৃত্যুশয্যায়। কিন্তু একজন আমার দিনরাত সেবা-শুশ্রূষা করে। আমি চিৎকার করে মানা করি। জানাই যে ওটা আমার প্রাপ্য নয়। সে শোনে না।

নিছক প্রেমের গল্প

স্বপ্না গুপ্ত

দিনমণি হালদারের এখনকার ঠিকানা বাঁকুড়া জেলের সাত নম্বর সেল। জেলার সাহেব মাধব মিত্র অভিজ্ঞ লোক। অনেকদিন এ জেলে হয়ে গেল। সাবজেলার পোস্ট থেকে এই জেলেই রয়ে গেছেন। তাই সবকিছু তার নখ-দর্পণে। দিনমণি অনেক ঘুরে ফিরে এই জেলে আসার পর থেকে বরাবরই মাধব মিত্রর নেক-নজরে।

'সার্চ পার্টির' সিপাই রবি দাসকে নিয়ে 'লেট লক-আপে' মাঝে মাঝে বের হন মিত্র সাহেব। সঙ্গে রাখেন দাগি আসামী আব্রাহামকে। অনেকেরই বিছানা-পত্তর ঘেঁটে তছনছ করে চলে যায় জেলারের নেতৃত্বে তল্লাসি বাহিনী। আপত্তিকর সবকিছু নিয়ে চলে যায় আব্রাহাম। টাকা-পয়সা হলে তো কথাই নেই। ছিনতাই হবেই। তবে কোনটায় আপত্তি আর কোনটায় 'পারমিশন' আছে এটা বুঝতেই বহু আসামীর বেশ কিছুদিন 'লপসি' ঘাঁটা হয়ে যায়। দীনুর ফাইল অবশ্যি কোনদিন তল্লাসি হয়নি। বরঞ্চ সাত নম্বর সেলের আসামীর জন্যে একটা বাহাদুর মার্কা বড় খাতা আর কলম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আব্রাহামকে দিয়ে। কৃতজ্ঞতায় দীনু জড়সড় হয়ে পড়ে। আব্রাহাম সেদিন চলে যাবার সময় শুধু চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল —অগর লিখনাই হ্যায় তো ইধার কিঁউ আয়া শ্যালে? দীনুর মনে হল—নির্বোধ কোথাকার? জেলার সাহেবের বুট জুতোর আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। ততক্ষণে, জেল ঘণ্টিতে রাত আটটা বাজল।

লিখতে বসে বার-বারই একটা নামই ভেসে ভেসে উঠছে কলমের ডগায়। দিনমণি হালদার ওরফে দীনু। নায়িকার নামেও একই বিড়ম্বনা। পারুল ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। আর গল্প, সেটাও হবে ফুলডাঙ্গার মাঠ-ঘাটকে নিয়েই।

আমি সেই ফুলডাঙ্গার মণিকে পেছনে ফেলে চলে এসেছিলাম শহর কোলকাতায় নীরেন মামার বাড়ি। বিদ্যেধরীর ধার ঘেঁষে কোথায় চলেছে ছোট মণি? হ্যাঁ মনে পড়ছে, চলেছে কাজলদির কাছে। দিদি কালোজাম খেতে বড় ভালবাসে। জাম পেলেই আঁচলে ঢেকে কাছে টেনে নেয় মণিকে — কার বাগান থেকে চুরি করে নিয়ে এলি রে? কাজলদির বুকটা ওঠা-নামা করে। কয়েকটা জাম মুখে তোলার সময় মেটে উঠোনে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতরে তাকায় ঘন ঘন। কেন সেটা জানা আছে ছোট্ট মণির। কাজলদির বরের কী এক অসুখ — হাঁটা চলা করতে পারে না। কাজলদি কারোর সঙ্গে কথা বললেই গলা উঁচিয়ে ভেতর থেকে গাল দেয়। ব্যস্ত হয়ে মণিকে বলে — এখন যা ভাই। মণি ধীরে হেঁটে চলে যায়। দূর থেকে মুখটা বড় অস্পষ্ট।

কাজলদি দাওয়াটার সামনে বসে থাকতে থাকতে একদিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিল — আর পারছি না রে। একদিন শুনবি তোর দিদি খেতের বিষ খেয়ে মরেছে। কাজলদির চোখের জলের ঘোলাটে রঙটা চেনা। এরপর প্রায় বিনা নোটিশে চার দিনের জ্বরে বাবা বিদ্যেধরীর হাত ধরা আকাশে মিলিয়ে গেল। কাজলদির মত মাকেও মণি দাওয়ায় বসে বুক ভেজাতে দেখল।

এখন বেশ বুঝতে পারি, দুঃখ যেভাবেই আসুক খোলসের ভেতরটা তোলপাড় করে যখন বেরিয়ে আসে সব ধুয়ে মুছে, চোখের কোণ বেয়ে, তখন একটা রঙ-ই ফুটে ওঠে। ধূসর।

মামার বাড়ি পা দিয়েই দিনমণি বুঝতে পারল খাল-বিল পেরিয়ে যত্রতত্র বেড়ানো, ফুলডাঙ্গার পাখি-প্রজাপতি-ফড়িং-ফোঁকরের হিসেব রাখার দিন তার ফুরিয়ে গেছে। এ বাড়িতে তিনটে মাত্র মানুষ — নীরেন মামা, বিছানায় শুয়ে থাকা মামী আর সারা দিনের কাজের লীলা মাসী। দরজা পিচ ঢালা রাস্তা আর সারি সারি পাকা বাড়ি। তবে যে হারু-নীলু-হান্নানরা বলত — মণি তোর কী ভাগ্য রে! কোলকাতায় যাচ্ছিস। কত কী দেখতে পাবি চোখ ভরে। হ্যাঁ, দিনমণি লক্ষ্য করেছে — বাড়িগুলো সব উঁচু উঁচু দেওয়াল ঘেরা। নীরেন মামার চারপাশে এতগুলো দালান বাড়ি, কিন্তু যারা বাস করে তাদের তো বড় একটা দেখা মেলে না। গরমকালে পিচগলা রোদ্দুরে পা টিপে টিপে যখন ছাদে এসে দাঁড়ায় — তখন চারিদিকটা কেমন ঘুমন্তপুরীর মত মনে হয়। মনটা তখন ধূ ধূ করে — যেন ছুটে ফুলডাঙ্গায় চলে যাই। কাজলদির কথা মনে পড়ে। মা কোলকাতায় মাঝে মধ্যে আসে চারটে খুদের নাড়ু খুঁটে বেঁধে ছেলেকে দেখতে।

মনে পড়ে, ফুলডাঙ্গায় মেটে ঘরগুলো যেন হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনগুলোর মাঝে কোন দেওয়াল নেই। তাই তো চার সেপাই খেলতে কোন বাধা নেই। কিন্তু এখানে? সেদিন লীলামাসীর ছেলে কালুর সঙ্গে খেলতে গিয়ে পাশের বাড়ির দেওয়াল টপকে ঢুকে পড়েছিল। রবারের লাল বলটা তো পায়ই নি, মেম সাহেবের মত পোষাক পরা একজন বলেছিল — আর কোনদিন দেওয়াল টপকালে বেঁধে রেখে দেবো। ফুলডাঙ্গার মণি অবাক হয়ে তাকিয়েছিল মেম সাহেবের মুখের দিকে।

দিনমণির কোলকাতা সম্পর্কে ধারণাটা সবে তল পেতে শুরু করেছে। নীরেন মামার সাথে কাকভোরে একদিন বেড়াতে গিয়ে বুঝতে পারল, এখানকার মানুষ ঘুম থেকে উঠেই দৌড়তে শুরু করে। তার অনেক আগেই ফার্স্ট ট্রামটা ট্রাম ডিপো থেকে ছেড়ে গেছে। আর একদিন মামা ধর্মতলায় একটা বিরাট ধব্‌ধবে সাদা বাড়ি দেখিয়ে বলেছিল, ভাল করে মন দিয়ে পড়াশোনা করলে তুই-ও এমন একটা অফিসে চাকরি পাবি। চোখ দুটো একটু একটু করে খুলছে। নীরেন মামার ছোট দীনুর দেখতে ভুল হয়নি সবাই দৌড়চ্ছে। নিশ্চয়ই কোথাও গুপ্তধন লুকানো আছে। কেউ কাউকে বলছে না, পাছে অন্যে টের পেয়ে যায়। দীনু মনে মনে ভাবে — বড় হয়ে সেও দৌড়বে, অনেক জোরে, যেমন সে দৌড়াত ফুলডাঙ্গার মাঠে ব্যাঙের ছাতা খুঁজতে।

শহরটার ধুলোর গুণ যাবে কোথায়? এ ধুলো পায়ে মাড়ালেই মনটা গুটি পোকার মত গুটিয়ে যায়। কোথায় বিদ্যেধরীর পাড় ঘেঁষে উড়ে যাওয়া? দীনুর মনটাও আস্তে আস্তে কেমন গুটিয়ে আসছে। একলব্য হতে হবে যে! মামা বলেছেন, অনেক বড় হতে হবে।

মামাকে নিরাশ করে নি দীনু। রুদ্ধশ্বাসে টপাটপ্ পরীক্ষার সিঁড়ি পার করেছে। শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়ে শহরটাকে আরও বেশ পরিষ্কার দেখতে পায়। সে একাই নয়, অগুন্তি মানুষ ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রসারিত হাত সবার। দাও আমায় দাও। দাতারই কোন পাত্তা নেই। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় — ঘামের গন্ধ বয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ঢলে পড়ে রাতের কোলে। ভোর হ'ল, আবার দৌড় শুরু হল।

এখন, অফিস পাড়ায় বড় বড় দালানগুলোর একটায় ঢুকে পড়ার একটা এন্ট্রি-পাস চাই। মামা একদিন দীনুকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। গম্ভীরভাবে বললেন — তোর মত অমন অনেক ফার্স্ট ক্লাস পায়ের ঘাম মাথায় তুলে চাকরি খুঁজছে। ঘরে বসে থাকলে চলবে? আসল লড়াইটা তো সবে শুরু।

দীনু, তুমি সেদিন মনে মনে কী ভাবছিলে আমার মনে আছে। ওই ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে কোন রকমে এন্ট্রি-পাসটা লুফে নিয়েই বাড়ি ফিরবে। স্বভাব-দোষ যাবে কোথায়? ফুলডাঙ্গার ছোট মণি তোমার মধ্যে উঁকি দেয়। পড়াশোনা শিখে যদি ডিসিশন নিতে না পারিস, তবে অজ পাড়াগাঁ থেকে তোকে নিয়ে এসে গুচ্ছের পয়সা খরচা করে পড়াশোনা করালাম কেন বলতে পারিস? না, দীনু নীরেন মামার প্রশ্নের কোন উত্তর খুঁজে পাই নি। সেদিনও না, আজও না।

'দীনুর চাকরি হয়েছে'— এ চিঠি পাওয়ার অপেক্ষায় মা নাবালের কচু সেদ্ধ খেয়ে পুরো একটা জীবন কাটিয়ে দিল। দীনুর অবর্তমানে মায়েব বুক জুড়ে ছিল ছোট একটা স্বপ্ন — দীনু মানুষ হবে। ফুলডাঙ্গা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে আসা দীনুকে ঘিরে নিঃসন্তান মামারও লটারীর টিকিট কাটা প্রতীক্ষা ছিল। কিন্তু ততদিনে মামার চোখে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে ছবি তা আর পাঁচটা দীনুর মত বাউন্ডুলে বেকার। তবু মামার আশাটা দিনের শেষে পুরোনো নেশার মত ছোঁক ছোঁক করে চেপে ধরে। আর মামী? কিশোর হয়ে ওঠা দীনু মামীর একটা রূপই লক্ষ্য করেছে ঘন কালো চুল পালংক থেকে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। পক্ষাঘাত রোগটা মামীকে বিছানাবন্দী করলেও চুলগুলোকে পারে নি। দু'বেলা 'দীনু খেয়েছিস?' মামীর ক্ষীণ প্রশ্ন ভবঘুরে দীনুর সব ধুলো আঁচল দিয়ে মুছে দিত। মা-মামী-কাজলদি ওরা যেন শেষ জ্যৈষ্ঠের ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি; ভেজা মাটির গন্ধটা বড় আপন। মামী যতদিন বেঁচে ছিল, দীনুব ঘরে ফেরার তাগিদটাও ততদিন বহাল ছিল।

কখন যেন দীনুর ঠিকানা বদলে আশু-দীপক-ভুলুদের সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছিল, তা আর ঠিক আজ মনে পড়ছে না। কিন্তু ক্ষণটাকে চিনিয়ে দেয় টালিগঞ্জের পচা গলা গঙ্গায় আস্তে আস্তে ভেসে চলা আধখানা মানুষ, পরনে প্যান্ট, শার্ট, পায়ে জুতো। বয়সটা আন্দাজ করা যায়। কিন্তু মুন্ডুটার হদিশ কে দেবে? সেটাকে পেছনে ফেলে লাশের ভগ্নাংশটুকু দোল খেতে খেতে চলেছে মোহনার পানে। সে রাতেই আশুদেব গোবর নিকানো উঠোন মাড়িয়ে ঢুকে পড়েছিল যারা তাদের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝে নেবারও সময় পাই নি। যে পথটা বেছে নিতে বেকার দীনুর ছিল একরাশ দ্বিধা, সেই পথটা ধরেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে শুরু করল। দিনের পর দিন — এলোপাথারি। আঠারো-উনিশ-কুড়ি, মাঝখানে হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে চোদ্দ-পনের-ষোলো। কতগুলো ফুটন্ত প্রাণের উথালি পাথালি, বাইরের ঝড়কে ব্যঙ্গ করতে করতে চলেছে কালো জালি দেওয়া শকটে।

লেখাটা শেষ করে অনিন্দ্য ঘড়ির দিকে তাকালো। নাগাড়ে লিখে ফেলে, সেটা পড়তে ওর কখনই ভাল লাগে না। সে কাজটায় সীমাহীন উৎসাহ সুতপার। লেখার তাগাদাও আগে সুতপার থেকেই। পড়েও ফেলবে এক শ্বাসে। ভয়ানক আবেগপ্রবণ। বলে কিনা, একটা কিছু লেখো। সেটা ছাপাবার দায়িত্ব আমার। আগামী বইমেলায় সে নিজে সবার হাতে বইটা তুলে দেবে — 'নিছক প্রেমের গল্প।' মা[illegible] না হলে কেউ অমন কথা ভাবতে পারে।

অনিন্দ্য থাকে দমদমে আর সুতপা নাকতলায়। সুতপার নাগাল পাওয়া ভার — তাই অনিন্দ্য ভুরি ভুরি চিঠি লেখে। প্রস্তাবটা শুনে মনে মনে হাসে। আসলে সুতপাকে বলা হয়নি যে এর আগে এক ডজন গল্প (পত্রিকা অফিস থেকে) সরাসরি আবার আমার কাছেই ফিরে এসেছে। সুতপার দৃঢ় ধারণা অনিন্দ্যর প্রতিভা নষ্ট হচ্ছে। কোন কদর পাচ্ছে না।

আজ চার বছর ধরে সুতপাকে দেখছি। পারলে ও আকাশ ছুঁয়ে ফেলে। পুরোপুরি নিজের চেষ্টায় এখন টেক্সটাইল ডিজাইনার হয়েছে। ভাল রোজগার ইদানিং শুরু হয়েছে। ভাবখানা এমনি যে তার ডানার তলায় আমায় নিয়ে উড়তে পারলে বেজায় খুশী। টিউশনি করে কী আর......? অনেকদিন পর অনিন্দ্য একটা লেখা শেষ করে সুতপার হাতে দিতে

পেবে বেশ উৎফুল্ল। শনিবাব টিউশনিব পর চলেছে সুতপাব বাড়ি। বাড়িতে বসেই ডিজাইনেব কাজ কবে। ইচ্ছে ছিল নন্দনে 'অন্য সিনেমা' দেখতে যাবে। এক কথায নাকচ করল — এখন অনেক কাজ বাকি তোমাবও, আমাবও। ছবি দেখে সময় নষ্ট কবলে চলবে না। বস, চা করে নিযে আসি। চা নিয়ে ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গে অনিন্দ্য বলে - এবাব বোধ হয পাখিটা নিদেন পক্ষে লোহার খাঁচায পোরা যাবে। সুতপা উত্তব কবে — আজ, সাবাদিন শুধু তোমার কাজ করেছি। সন্টলেকে প্রদোষদাব কাছে গিযেছিলাম। দেখ তো প্রচ্ছদে কোন ছবিটা তোমাব পছন্দ। বলতে বলতে ক'টা পেন্সিল স্কেচ অনিন্দ্যব সামনে মেলে ধবল।

— কী হবে ছবিগুলো দিয়ে?

- মলাটে একটা ইম্প্রেসিভ ছবি হলে?

— কিসেব ছবি?

— 'তোমাব নিছক প্রেমেব গল্প'ব বইযেব।

এবাব বলো কোনটা পছন্দ টালিগঞ্জেব খালেব ধাব ঘেঁসে হেঁটে চলেছে পাইপগান হাতে এক কিশোব দীনু কাক্কলদিকে মুঠো ভবে ভাত দিচ্ছে, না কি অনিন্দ্য – সুতপা হাত ধবাধবি কবে, সবি দীনু পাকল একটা বড মাঠেব মাঝখানে? আব এটাও চলতে পাবে বিদোধবীকে পেছনে ফেলে পশ্চিমে ঢলে যাওযা সূর্য। বলো কোনটা বাছাই কবলে ? কী পাগলামো শুরু কবলে বলতো? ওটা আদৌ দাঁড়িয়েছে কিনা ভাবতে হবে। আব তুমি কত কী প্ল্যান প্রোগ্রাম কবে ফেললে ? দু একজনকে পডাতে পাবলে ? সুতপাকে নিবৃত্ত কবাব চেষ্টায শেষ প্রশ্নটা কবে ফেলল অনিন্দ্য। কোন পাবলিশাস এব উমবতি হয়েছে শুনি ?'

সুতপা গম্ভীব হযে যায এক মুহূর্ত। তাবপব বলে তুমি তো জান একবাব আমাব মাথায কিছু ঢুকলে সেটা কবেই ছাডব। যাইহোক প্রচ্ছদে কোন ছবিটা যাবে বলবে ?

- তোমাব যা ইচ্ছে। অনিন্দ্য উত্তব কবে। কথা বাড়িযে লাভ নেই।

বইমেলাব কটা দিন অনিন্দ্য একেবাবে গা ঢাকা দিযেছিল। সুতপাব ঝোলানো ব্যাগ ভর্তি নতুন বই। বঙিন ছাতাগুলোব তলায বেঞ্চিতে বসেছে। নতুন বই উল্টে পাল্টে দেখাব লোকেব অভাব হল না। কিন্তু অনিন্দ্য বায়? নামটা কোথাও শুনেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আচ্ছা দেখি। টাইট বাজেট, আগে বাকী স্টলগুলো ঘুবে নিই। সবাবই ওই মন্তব্য।

একশটা কপি যে কবেই হোক বইমেলা উপলক্ষে পাঠকেব মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। শেষ দিনে মেলায হাজিব থাকা এক গোফ না ওঠা চিত্রকবকে দিয়ে ছোটো একটা সাইন বোর্ড বানিয়ে ছিল - - বই পড়ুযাদেব অনিন্দ্য বাযেব উপহাব। দীনুকে ভাল লাগলে সেটাই হবে পাবিশ্রমিক।

সুতপাব বিগশপাব ভর্তি বই খালি হযে যেতে বিশেষ সময লাগে নি। তবে দীনুকে ওদেব ভাল লেগেছে কিনা, সেটা জানার জন্যে সুতপা-অনিন্দ্য অপেক্ষা কববে আবও অনেকদিন। চাযেব স্টলটাব দিকে এগিযে চলেছে দু'জনে — অনেকক্ষণ মুখে কোনো কথা নেই। মেলা শেষেব ঘোষণা মাইকে বাব বাব শোনা যায। মৃদুলযে সেতাবে সেতাবে সুব বাতাসে মিলিযে যাচ্ছে। ধোযা ওঠা চায়ের পেপার গ্লাসটা হাতে নিযে অনিন্দ্য মুচকি হেসে বলে — এবাব ? সুতপা বলল . তুমিই তো বলছ স্বপ্ন — শিশুকে বুকে নিয়ে তোমাব জানালাটা খুলে আকাশেব রঙ পাল্টানোর অপেক্ষা কোরো পারুল ....। আমি অপেক্ষা কবব অনিন্দ্য।

স্টলেব নিযন বাতিগুলো নিভতে শুরু কবছে। কম আলোয সুতপাব মুখটা কেমন দৃঢ দেখায। ওবা পার্ক স্ট্রীট স্টেশনের সামনে এসে দাঁড়ায। শেষ ট্রেনটা ঢুকছে।

অলীক টেলিফোন

গৌতম ঘোষ দস্তিদার

দয়িতার কপালের মস্ত, সুগোল, মেরুন টিপটির দিকে পূর্ণ-চোখে তাকিয়ে একটি দীর্ঘশ্বাস সংবরণ করল অচিন। নতমুখী দয়িতা টেবিলের কাঁচে জলের দাগ কাটছে। অচিন উল্টোদিকের চেয়ারে বসে নিজের চোখদুটি তার দিকে নিক্ষেপ করে। এইসব বদ্ধ রেস্তোরাঁর কেবিনের সিলিঙে রোদ-ঝলমল দুপুরেও টিউব জ্বলে। দুটো টিউব ভাগাভাগি করে এমনভাবে বসানো যে চারটি খুপরিতে আলো হয়। এই অনিয়মিত আলোয় অচিন দেখল, দয়িতার মুখের একটা পাশে বেশ কিছুটা আবছায়া, ঠিক অন্ধকার নয়, জমে আছে। অদ্ভুত, তার বাকি গোলার্ধ বেশ পরিচ্ছন্ন — এক টুকরো জ্যোৎস্না হালকাভাবে পড়ে আছে টবের সূর্যমুখীতে, চকিতে মনে হল অচিনের। সেই আলো-ছায়া দয়িতার গলা ছুঁয়ে নেমে গেছে বুকেব প্রকাশিত অংশে, আর গলায় একটা সরু সোনার চেন বুকের ঢাল বেয়ে ঝুলে আছে সর্বনাশেব একেবারে কিনারায়। এই শীতের দুপুরেও দয়িতার কপালে-গলায় অল্প-অল্প ঘাম জমেছে। ঘাড় ও কপালের কাছে কয়েকটি খুচরো চুল লেপ্টে আছে ঘামে, অচিন দেখল। দেখতে-দেখতে খুব গোপনে সে দীর্ঘশ্বাসটি সংবরণ করল। সিগারেট ধরাল। একধরনেব বুক-চাপা নৈঃশব্দ্য ঘনিয়ে উঠছিল বদ্ধ কেবিনের অপরিসরে।

সিগারেটের ধোঁয়া গলায় লাগাতেই তার বিস্বাদ টের পেল অচিন। শুকনো গলায সিগারেটের ধোঁয়া বেশ খারাপই লাগল তার। আসলে চা খেয়েই সিগারেট ধরাবার কথা। কেবিনে চা-খাবার দিতে বেয়ারারা একটু দেরিই করে। সে-রকমই তাদের শিক্ষা। অন্যমনস্কতাব মধ্যে, বস্তুত আর কিছু করার নেই বলে, সিগারেটটা ধরিয়ে ফেলেছিল অচিন। সামান্য সময় আঙুলে ধরে রেখে অ্যাশট্রেতে ঘষে আগুন নিভিয়ে ভিতরে ফেলে দিল সিগারেটটা। কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল তার।

টেবিলের উপর তখনও জলের দাগ কাটছে দয়িতা। অন্য হাতটি টেবিলের প্রান্তে আড়াআড়ি বুকের কাছে রাখা। সেই হাতের কব্জিতে বাদামি চামড়ার ব্যান্ডে আঁটা কালো গোল ঘড়ি। অন্য হাতে একটি বালা, সোনার। অচিন একটা আবছা গন্ধ পেল দয়িতাব, হালকা কোনও পারফিউম বা বডি-ট্যাল্‌কের সঙ্গে মেশানো দয়িতার নিজস্ব ঘ্রাণ খুবই গোপনে বুকভরে আত্মসাৎ করে নিল সে। তারপর টেবিলের দিকে সামান্য ঝুঁকে আলতো করে ছুঁল দয়িতার জল-ব্যস্ত হাত, আঙুল। চোখ তুলে তাকাল দয়িতা। 'কী হল, আজ কথা বলবে না, ঠিক করেছ নাকি!' অচিন অনুচ্চে হাসি-মাখা গলায় বলল।

দয়িতা উত্তর দিল না। তার মুখে মিহি কুয়াশার মতো বিষাদের আস্তরণ। হাল্কা-গোলাপি লিপস্টিকের প্রলেপ আচ্ছন্ন করে দুই ঠোঁটেও লেগে আছে অনুরূপ ছায়া। নাকের নিচে তিনটি স্বচ্ছ ঘামের বিন্দু, ঠোঁট দিয়ে মুছে দিতে ইচ্ছে করল অচিনের। আজ ঠিক সতেরো দিন পরে দয়িতার সঙ্গে দেখা অচিনের। সতেরো দিন আগে, এক পড়ন্ত বিকেলে, দয়িতার কলেজে গিয়েছিল অচিন। সচরাচর যায় না। কলেজে যেতে বারণই করে দয়িতা। তার

অস্বস্তি হয়। পাঁচ বছর পর এখনও অচিনকে নিয়ে নানা অস্বস্তি আছে দয়িতার। কিন্তু সেদিন সকাল থেকেই দয়িতাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল অচিনের। তারও সাত দিন আগে দয়িতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, অচিনের স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন দুপুরের পর তার আর-কোনও ক্লাস ছিল না। সন্ধের আগে বন্ধুদের কাউকে পাওয়া যাবে না। সকাল থেকেই দয়িতার কথা ভেবে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল অচিন। শীতের দুপুরে, উজ্জ্বল আকাশ আর সোনালি রোদের দিকে তাকিয়ে, প্রবল জলপিপাসার মতো, তার আবারও মনে পড়ল দয়িতার কথা। তার সারা শরীর, মন জেগে উঠল দয়িতার জন্য আকণ্ঠ পিপাসায়। মঙ্গলবার দয়িতার সাড়ে-চারটে পর্যন্ত ক্লাস। অচিন স্টাফ রুমে, লাইব্রেরিতে বসে অস্থির সময় কাটাল, তারপর বেরুল।

কলেজের পুরনো গথিক সিঁড়িতে পা রেখে একটু থমকেছিল অচিন। দয়িতা কলেজে এসেছে তো! কিংবা যদি কোনও কারণে এসে বেরিয়ে যায়! ফোন করে এলে হত! মনেই পড়েনি। তা ছাড়া, তাদের কলেজে প্রিন্সিপালের ঘরে ফোন। সেখান থেকে, ব্যক্তিগত ফোন করতে অস্বস্তি হয় অচিনের। চওড়া সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটু দ্বিধায়ও পড়ল অচিন, দয়িতা রাগ করবে না তো! কিন্তু কী করবে অচিন! দয়িতা তাকে চুম্বকের মতো টানছিল। দয়িতা আজ কী রঙের শাড়ি পরেছে, তা জানা যেন অচিনের পক্ষে বিষম জরুরি হয়ে পড়েছিল।

স্টাফ-রুমে লম্বা টেবিলের কোণের দিকে বসে কী বই পড়ছিল দয়িতা। খুবই নিমগ্ন তার ভঙ্গি। অচিন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে 'দয়িতা' বলে ডাকতেই বই থেকে চোখ তুলে তাকে দেখে যেন ভূত দেখার মতোই চমকে উঠল দয়িতা। আয়ত চোখদুটি সার্চলাইটের মতো ফেলে অচিনকে দেখল সে কয়েক পলক। অচিন দেখল, নিমেষে তার মুখের বিব্রত ভাবটা সরে গিয়ে ফুটে উঠল বিকেলের শেষ আলোর মতো এক উদ্ভাস।

বই বন্ধ করে, টেবিলের উপর-রাখা ব্যাগে বইটি রেখে, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে, ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে পাশের মহিলাকে 'সুমিত্রাদি, আমি বেরুচ্ছি' বলে, টেবিলের পাশ দিয়ে ঘুরে দরজার কাছে অচিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'চলো'। যেন, এতক্ষণ সে অচিনের জনাই অপেক্ষা করছিল।

কলেজের বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় এসেই একেবারে অন্য মূর্তি দয়িতার। যেন, ইরেজার দিয়ে মুখের হাসিটা নিমেষে মুছে ফেলেছে সে। কঠোর, মেঘলা মুখে অচিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমাকে আমি বারণ করেছি না কলেজে আসতে! তুমি কি চাও, আমি চাকরিটা ছেড়ে দিই!' একেবারে ময়ূরের রূঢ়তা দয়িতার গলায়।

যেন, একটা তির আচমকা ছুটে এল তার দিকে, বিঁধে গেল কোথাও, মনে হল অচিনের। স্তব্ধ, বিমূঢ় হয়ে গেল সে। তার মনে হল, অদ্ভুত, একটু আগে ওইভাবে তার দিকে তাকিয়ে হাসল দয়িতা, হাসিটা ধরে রেখেই সবার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে এল তার দিকে, পেরিয়ে এল অতগুলি প্রশস্ত সিঁড়ি, ক্যাম্পাস, আর রাস্তায় নেমেই পাল্টে গেল সে নিমেষে! তা হলে, দয়িতার সেই তাৎক্ষণিক হাসিটা ছিল একেবারেই বানানো, কৃত্রিম, অভিনয়! দয়িতার থমথমে, কর্কশ গলা শুনে মন হয় না, অচিনের সঙ্গে সে কাটিয়ে এসেছে পাঁচ-পাঁচটি বছর। অচিনের মনে হল, পাঁচ বছরে তাদের সম্পর্ক একটুও এগোয়নি। কিংবা পাঁচ বছর নয়, তার সঙ্গে দয়িতার কোনও পরিচয়ই হয়নি কখনও। যেন, অচেনা কোনও মেয়েকে সে রাস্তায় কুপ্রস্তাব দিয়েছে, কিংবা হাত ধরে টেনেছে — এমনই বীতরাগ, ঘৃণা তার গলায়। তীব্র অপমানে মুহূর্তে সারা শরীর জ্বলে উঠল অচিনের। মনে হল, এই শেষ, আর কখনও দয়িতার মুখোমুখি হবে না সে।

অচিন জানত, দয়িতা অসন্তুষ্ট হবে। কিন্তু সে নিশ্চিত ছিল, খুশিও হবে দয়িতা। রাগ সরিয়ে সেই খুশিটাকে বের করে আনবে অচিন। সত্যি কথাই বলবে, 'তোমাকে ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল! দিনের-পর দিন তোমাকে না-দেখে আমার খিদে হয় না, ঘুম হয় না।' আর, এসব শুনে, রেস্তোরাঁর আড়ালে, ট্যাক্সির ভিতর চকিতে অচিনের চুল মুঠো করে ধরবে দয়িতা, বলবে, 'শয়তান! ইমপসিবল! ইনকরিজেবল!' আর, 'ওহ, লাগে, লাগে, ছাড়ো, ছাড়ো' বলতে-বলতে অচিন মাথাটা এলিয়ে দেবে দয়িতার কাঁধে!

দয়িতার রাগ সে চেনে। প্রথমেই মুখটা থমথমে হয়ে যায়। কোনও রেখা থাকে না। তারপর কথা বন্ধ করে, অদ্ভুত চুপ হয়ে থাকে। কোনও কথারই জবাব দেবে না সে তখন। অচিনের কথা যে শুনতে পাচ্ছে এমন মনেই হবে না। এমনকী, মনে হবে, অচিন তার পাশেই নেই, রাস্তায় একাই হাঁটছে সে।

তখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে অচিন। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে আলতো করে ছোঁয় দয়িতার পার্শ্ববর্তী হাত, আঙুল। দয়িতা ছাড়িয়ে নেয় না। বাসে কিংবা ট্যাক্সিতে বসে সে দয়িতার উরুর উপর তর্জনী দিয়ে এলোমেলো দাগ কাটে। দয়িতা একটু পরে জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে অচিনের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'কী হচ্ছে কী। সরে বোসো', বলে। মেঘ কেটে যায়।

কিন্তু সেদিন বিকেলে একেবারে অন্যরকম। অচিনের মনে হল, সে আসলে দয়িতার কেউ নয়, সামান্য-পরিচিত, কোনও আলাদা সম্পর্ক নেই তাদের মধ্যে। হঠাৎ দুজন পরিচিত মানুষের দেখা হয়ে গেছে রাস্তায়। বাসস্টপ পর্যন্ত দু'জন একসঙ্গে যাবে, তারপর যে যার বাসে উঠে পড়বে।

ঠিকই যে, দয়িতার কিছুটা অস্বস্তি থাকে তাকে নিয়ে। একটা আড়াল তার পক্ষে খুবই জরুরি। বছরও ঘোরেনি মনীষের সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে তার। তাদের বিচ্ছেদের জন্য অচিন দায়ী নয়। দয়িতা চায় না, লোকে তেমনই ভেবে নিক। অচিন দেখেছে, দয়িতা খুবই সচেতন থাকে তার ব্যাপারে। গোপনতাটা কিছুতেই ভাঙতে চায় না।

অচিনের একেক সময় সন্দেহ হয়, দয়িতা কি সত্যিই তাকে ভালবাসে। মনে হয়, ভালবাসা নয়, ওই গোপনেই যেন তার সব আকর্ষণ। অচিনের কাছে তার যে অপরিসীম গুরুত্ব আছে, এই বিষয়টি যেন সে বেশ উপভোগ করে, ফ্লাটার্ড হয়। আর, এভাবে ভাবলে সবকিছু কেমন তালগোল পাকিয়ে যায় অচিনের। নিজেকে বিষম অকিঞ্চিৎকর মনে হয়। অপমানে জ্বালা করে সারা শরীর, সবকিছু নিরর্থক মনে হয়।

বন্ধুত্বের কথা বলে দয়িতা। কিন্তু অচিন জানে, একটা বয়সের পর কেউ আর কারও নিছক বন্ধু হয় না। বন্ধুত্বের আড়ালে সম্পর্ক অন্য-কোনওদিকে বাঁক নেয়। অন্য কোনও স্বার্থ থাকে, থাকে আত্মপ্রবঞ্চনাও। আর দু'জন পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের যে-পারস্পরিক আকর্ষণ, অনুভূতি, তাকে বন্ধুত্ব দিয়ে ঢেকে রাখা বেশ হাস্যকর। তখন শরীর শরীরের বন্ধুত্ব চায়। নারী-পুরুষের ওই টান শেষ পর্যন্ত অযৌন থাকে না। এখানে বিভ্রমের কোনও জায়গা নেই। এসব কথা অচিন দয়িতাকে কখনও বলেওছে। দয়িতা তখন নতুন করে সংশয়ের ভিতর ঢুকে গেছে, অচিন দেখেছে।

অচিনের কখনও মনে হয়, দয়িতা তাকে মনীষেরই একরকম বিকল্প হিসেবে ভাবে। মনীষের শূন্যতা সে ভরিয়ে রাখতে চায় অচিনকে দিয়ে। অন্য দিকে, অচিনের কাছে নিজেকে মূল্যবান, অধরা করে রাখতে চায়। একই সঙ্গে দয়িতা খুব সাবধানীও। অচিনের কাছ থেকে সে একরকম ছায়া পায়। সেই ছায়াটা তার কাছে জরুরি। কিন্তু, প্রকাশ্যে সে অচিনকে কোনও গুরুত্ব দিতে রাজি নয়। তার নিজের সামাজিক পরিচয়, প্রেক্ষিতকে একটুও ক্ষুণ্ণ

করবে না সে। অচিনের মনে হয়, দয়িতা তাকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করে। নিজের জন্য অচিনকে যতটা প্রয়োজন, তার বাইরে তাকে নিয়ে ভাবে না সে।

সেদিন, শীতের ধূসর বিকেলে, প্রস্তরীভূত দয়িতার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে এইসব ভাবনায় আচ্ছন্ন হচ্ছিল অচিন। তখনই যে স্পষ্ট করে ভেবেছিল, ঠিক তা নয়। কিন্তু, মাথার ভিতর দপ করে একটা-কিছু জ্বলে উঠেছিল। আর, সেই জ্বালাটা টের পেতেই অচিন আচম্বিত লাফ মেরে একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়েছিল। কী বাস, কোথাকার বাস, খেয়াল করেনি। একবারও পিছন ফিরে তাকায়নি। অচিনকে যদি অতটা বশীভূত, অনুগত, ক্রীড়নক ভেবে থাকে দয়িতা, তা হলে সে-দায় অচিনের নয়। সেদিন দয়িতার আত্মবিশ্বাসে আঘাত দিতে পেরে একধরনের জিঘাংসা চরিতার্থ হয়েছিল তার। দয়িতা যে ওই মাঝ-পথ থেকে বাস পাবে না, সে-ই কলেজ স্ট্রিট পর্যন্ত হাঁটতে হবে, এসব ভাবনা উঁকি মারলেও প্রশ্রয় দেয়নি অচিন।

তারপর একটা-একটা করে কেটে গেছে নিখুঁত সতেরোটা দিন। কেউ কাউকে ফোন করেনি, অপেক্ষা করেনি কেউ কারও জন্য।

আজই হঠাৎ দুপুরে দয়িতা অচিনের কলেজে এসে হাজির। অচিনের আর ক্লাস ছিল না। লাইব্রেরিতে যাবে, দোতলা থেকে নিচে নামছিল। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছিল দয়িতা। আগেও এসেছে, কখনও ফোন করে, কখনও হুট করে। অচিন সামান্য অমনস্ক ছিল, খেয়াল করেনি দয়িতাকে। সিঁড়ি দিয়ে অনবরত ছেলেমেয়েরা উঠছে-নামছে। তা ছাড়া, দয়িতা, ওই সিঁড়িতে, দুপুরবেলা, অপ্রত্যাশিতও। হঠাৎ দয়িতার গলায়, 'কী, চলে যাচ্ছ', শুনে চমকে তার দিকে তাকিয়ে অচিনের মনে হল, এত কাছ থেকে আমি দয়িতাকে লক্ষ করলাম না! পরের মুহূর্তেই সে নির্নিমেষ তাকাল দয়িতার দিকে।

দয়িতা সব সময় তাঁতের শাড়িই পরে। আজ সে পরেছে একটা ছাইরঙা শাড়ি, চওড়া হলুদ পাড়-আঁচলের সঙ্গে মিলিয়ে হলুদ ব্লাউজ। অনেকটা লম্বা সে, যেন আজই প্রথম লক্ষ করল অচিন। দীর্ঘ সতেরো দিন পর মুখোমুখি দয়িতাকে দেখে কেমন বুক কেঁপে উঠল অচিনের। সিঁড়ির দুই ধাপ উপর থেকে দয়িতাকে দেখে তার সামনে ঝলমল করে উঠল মায়াবী রোদ্দুর।

'তুমি, এ-সময়ে, ক্লাস নেই?' যেন কিছু বলতে হয় বলেই বলল অচিন।

'আজ কলেজে যাইনি।' খুব স্তিমিত গলায় বলল দয়িতা।

'এদিকে কাজ ছিল কোনও? ছুটির দিনে এতটা উজিয়ে এলে।' অচিন পরের সিঁড়িতে পা রাখল।

বাক্যদুটো উচ্চারণ করেই সে টের পেল, সতেরোদিন আগের অপমানটা আবার ফিরে আসছে।

'তুমি কি এখন বেরুতে পারবে, ক্লাস আছে? এগারোটা নাগাদ বাড়িতে ফোন করেছিলাম। মাসিমা বললেন, তাড়াতাড়ি বেরিয়েছ।' দয়িতা কেমন স্বগতোক্তির মতো বলল।

'হ্যাঁ, একটু কলেজ স্ট্রিট হয়ে এলাম। না, ক্লাস নেই। টেস্ট শুরু হচ্ছে, ক্লাস কম। এখনই বেরিয়ে কোথায় যাব, ভেবে লাইব্রেরিতে যাচ্ছিলাম। তুমি নিচে বাসস্টপে গিয়ে দাঁড়াও। আমি রণজিৎদাকে একবার বলে আসি।'

অচিন নিচে, রাস্তায় এসে দেখল, বাসস্টপে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দয়িতা। তার কাঁধ থেকে ঝুলছে সাদা পাটের পাকানো দড়ি দিয়ে বানানো ব্যাগটা। কী-একটা ফেয়ার থেকে কিনেছিল। অচিন সঙ্গে ছিল। ব্যাগটা প্রথমে তারই চোখে পড়েছিল। কিন্তু তাকে দাম দিতে দেয়নি দয়িতা। অদ্ভুতভাবে বলেছিল, 'আমার কাছে আছে।' থমকে গিয়েছিল অচিন।

আরেকবার সে মহীশূর থেকে চন্দনকাঠের মালা-দুল-বালা এনেছিল দয়িতার জন্য। প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বিচিত্রভাবে হেসে উঠেছিল সে, 'আমি এসব পরি!' পরে, হাসি মুছে ফেলে থমথমে গলায় বলেছিল, 'এসব আমি পছন্দ করি না — কারও কাছ থেকে কিছু নেওয়াটেওয়া। বিশ্রী লাগে আমার।' শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল অচিন। হাত বাড়িয়ে বলেছিল, 'দাও। আমার ভুল হয়ে গেছে। সরি।'

'এনেছ যখন, থাক।' দয়িতা ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়েছিল প্যাকেটটা। কিন্তু দয়িতাকে কখনও পরতে দেখেনি। হয়ত কাউকে দিয়ে দিয়েছে। অথচ, দয়িতা যে এসব পরে না, তা নয়।

ব্যাগটা লক্ষ করতে-করতে আজ আবার সেই বিস্মৃত চন্দনকাঠের গয়নার কথা মনে পড়ল অচিনের।

'চলো, কোথায় যাবে?' দয়িতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অচিন।

'আমি জানি না। বাড়িতেই চলে যাব কি না, ভাবছি। শরীরটা ভাল লাগছে না।' দয়িতা খুবই ম্রিয়মাণভাবে বলল।

'কী হয়েছে! এ-কদিন কী করলে! একবারও ফোন করলে না!' অচিন দযিতার চোখের দিকে তাকাল।

কোনও জবাব দিল না দয়িতা। হাঁটতে শুরু করল।

এই রেস্তোরাঁটিতে আগেও এসেছে তারা। ছাত্র-ছাত্রীরা এখানে বিশেষ আসে না। দুপুরেব দিকে নির্জনই থাকে। বেয়ারাগুলি মোটামুটি চেনা হয়ে গেছে। এগিয়ে এসে কেবিনের পরদা তুলে দাঁড়ায়। প্রথম-প্রথম এরকম বসতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত দয়িতা। এখন মানিয়ে নিয়েছে। এই আড়ালটুকু যেন অন্যভাবে জরুরিও মনে হয় তাব কাছে।

'শরীর খারাপ লাগছে কেন — কী হয়েছে?' অচিন জল খেল।

'কী হবে তোমাব জেনে!' আঁচল দিয়ে গলার কাছে ঘাম মুছল দযিতা। তার গলায চাপা বিষাদ।

তখনই দয়িতার টেবিলে-পড়ে-থাকা লম্বাটে গড়নের পাঁচটি আঙুল অচিন একসঙ্গে নিজের হাতে তুলে নিল। ঈষৎ ঝুঁকে দয়িতার করতলে নাক ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিল সিক্ততার, শরীরের। এই গন্ধ তার খানিকটা চেনা। দয়িতার হাতের উল্টোপিঠে সে ঠোঁট বোলাল। দেখল, আবেশে চোখ বুজে ফেলেছে দয়িতা। আর, তার গালের উপর গড়িয়ে আসছে দু-ফোঁটা জল।

অচিন কখনও দয়িতার অশ্রু দেখেনি। সে বিচলিত হল।

হাতটা ছাড়িয়ে নিল দয়িতা। চোখ মুছল। অচিন দেখল, দয়িতার মুখটা মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। চোখের পাতাদুটি ভারী হয়ে আছে। যেন, চোখ বুজলেই আবারও বেরিয়ে আসবে জলবিন্দু। অচিনের ইচ্ছে হল, দয়িতার আচ্ছন্ন চোখের পাতায় নিজের ঠোঁটদুটি রেখে দিতে।

বেয়ারা কফি দিয়ে গিয়েছিল। কফির কাপে চামচ নাড়ছিল দযিতা। অচিনের দিকে নীরবে এগিয়ে দিল একটা কাপ। অচিন কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেটটা ধরাল।

'সেদিন রাত থেকে আমার জ্বর হয়েছিল, অচিন। সাতদিন টানা বিছানায় শুয়ে। রোজ ভেবেছি, তুমি আজ আসবে কিংবা ফোন করবে। সারাদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করতাম। রাতে ঘুম হত না। অসহ্য মাথা যন্ত্রণার মধ্যে রাতটা পার হয়ে যেত। মনে হত, কাল তুমি ঠিক ফোন করবে।'

অচিনের মনে হল, সে যখন দয়িতার হাতটা ধরেছিল, আলতো ঠোঁট রেখেছিল হাতে, তখনই সে দয়িতার গায়ের তাপ, জ্বরের গন্ধ টের পেয়েছিল। তখন খেয়াল করেনি। এখন মনে হতেই সে আবার দয়িতার হাতটা টেনে নিল। হাত দিয়ে তাপ অনুভব করল।

'এ কী। তোমার গায়ে তো এখনও জ্বর রয়েছে! এভাবে বেরুলে! আমাকে একটা ফোন করলে না কেন কলেজে। কী যে করো না!' হাতটি নিজের গালে ছোঁয়াল অচিন।

'ট্যাক্সিতে এসেছি। এ-সময় বাসে যা ভিড়।' দয়িতা বলল।

'ডাক্তার দেখিয়েছ!' অচিন উৎকণ্ঠ হল।

'নাহ্, পাড়ার দোকানে বলে ওষুধ আনিয়েছিলাম!' দয়িতা বলল।

'চলো, উঠে পড়ি। এরপর ঠাণ্ডা পড়বে। কিছু গায়ে দাওনি কেন!' অচিন দয়িতার হাতটা ছেড়ে দিল।

'এনাফ! অনেক হয়েছে! আমার জন্য অত চিন্তা করতে হবে না তোমায়। ন্যাকামো!' হাসল দয়িতা।

'না, আমার চিন্তার কী! হু অ্যাম আই!' অচিনও হাসল।

'আমিই বা তোমার কে। নইলে — ' কথা শেষ করল না দয়িতা।

'আমার ভুল হয়েছিল। আয়াম রিয়েলি সরি! কী যে হল সেদিন হঠাৎ! তুমি এমনভাবে বললে! মনে হল, আমার কোনও ভূমিকাই নেই তোমার কাছে।' দয়িতার দিকে তাকাল অচিন।

'তুমি আমার কথা ভাবলে না! আমাকে ওইভাবে রাস্তায় একা ফেলে চলে গেলে তুমি! আমি ভাবতেও পারিনি, অচিন!'

'আমি তো বললাম —'

'তুমি জানো না, কলেজে আমাকে নিয়ে কীরকম কথা হয়। বছর ঘুরে গেল, তবু আড়ালে আমি এখনও আলোচনার বস্তু। আড়ালেই বা কেন, প্রকাশ্যেই এমন-সব ইঙ্গিত করে, তুমি ভাবতে পারবে না। অথচ সবাই শিক্ষিত, সভ্য-ভদ্র মানুষ। পাগল-পাগল লাগে আমার। আমি কী করব, অচিন!' দয়িতার গলায় আর্দ্রতা।

'কেন ওসবে কান দাও। সব মানুষই একরকম — অন্যকে নিচে নামিয়ে আনন্দ পায়।' অচিন বলল।

'তা নয়। অন্যদের দোষ দিয়ে কী লাভ! মনে হয় আমিই খুব খারাপ। নিজেকেই আজকাল কেমন ঘেন্না লাগে আমার। একটা সম্পর্ক শেষ হতে-না হতেই আবার তোমার সঙ্গে — অ্যাম আই এ হোর, অচিন, বলো।' ফুঁপিয়ে উঠল দয়িতা। কান্নার আবেগে কেঁপে উঠল তার করুণ শরীর।

'চলো, ওঠো তো! ভবানীপুরে শ্যামলদার আজ চেম্বার আছে। একবার দেখিয়ে নেবে। জ্বরের ঘোরে বাজে বকছ!' অচিন উঠে পড়ল।

'ধুত! আমি এখন ডাক্তারফাক্তারের কাছে যাব না। নন্দনে যাবে, বা অ্যাকাডেমিতে — অনেকদিন নাটক দেখি না। যাবে?' দয়িতা বসেই আছে।

'না, ভবানীপুরেই যাব। শ্যামলদা পাঁচটার মধ্যে এসে যান।' অচিন বলল।

দয়িতা ব্যাগ থেকে ছোট আয়না বের করে মুখ দেখল। হাত দিয়েই উড়ো চুলগুলি ঠিক করে নিল। ঠোঁটে সামান্য লিপস্টিক ছোঁয়াল। গোটা দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখল অচিন। মুগ্ধ-চোখে দয়িতার দিকে চোখ ছোট করে তাকিয়ে বলল, 'ভাল কথা, তোমায় আজ সাংঘাতিক দেখাচ্ছে! ওরকম দেখিয়ে-দেখিয়ে আর কখনও লিপস্টিক লাগিয়ো না। ইট মে কস্ট ইউ।'

'খুব, না!' হাসল দয়িতা।

২

ট্যাক্সিতে উঠে দয়িতা বলল, 'আমাকে তোমারও খুব খারাপ মনে হয়, না?'

'কেন?' অচিন চোখ ফেরাল দয়িতার দিকে।

'সবার যেমন মনে হয়! মনে হয় না, আমি ফ্লার্ট করছি তোমার সঙ্গে?' না-তাকিয়েই বলল দয়িতা।

'আমার ভাবার মতো আরও অনেককিছু আছে। খামোখা বাজে চিন্তায় মনখারাপ কোরো না, টুটুল!' অচিন বলল।

ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সিটা হু-হু করে ছুটছিল। জানলা দিয়ে উত্তুরে হাওয়া এসে লাগছিল দয়িতার গালে, চুলে।

অচিন তার দিকে ঝুঁকে হাতবাড়িয়ে জানলার কাঁচ তুলে দিল। দয়িতার বুকের ভিতর কেমন শিরশির করে উঠল। অচিন কি সত্যিই তাকে অতটা ভালবাসে, যে-ভালবাসা জানলার কাঁচ তুলে দেয়, সামান্য অসুখের কথা শুনে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়! ভাবতে-ভাবতে দয়িতা আবার জানলার বাইরে ছুটে-যাওয়া চেনা শহরের দিকে চোখ ফেরাল। দয়িতার মনে হল, আজ যেন সে একটা নতুন জীবনের দিকে যাচ্ছে।

গঙ্গার দিক দিয়ে এলোমেলো বাতাস বইতে দেখছিল দয়িতা বন্ধ কাঁচের ভিতর দিয়ে। বাতাসে উড়ছিল শুকনো পাতা, দূরবর্তী মেয়েটির শাড়ির আঁচল। এখনও তেমন শীত পড়েনি। তবু জ্বরটা হল বোধহয় ঠাণ্ডা লেগেই। ট্যাক্সির কাঁচ তোলা, তবু সামনের জানলা দিয়ে হাওয়া ঢুকছেই। হাওয়া নয়, অন্যরকম শীতে সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল দয়িতার।

দেখতে-দেখতে দিনগুলি কেমন কেটে গেল। সেবার শীতেই দহন তীব্র হয়ে উঠেছিল দয়িতার। বাইরে থেকে বোঝার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু দয়িতা কেমন টের পেত, সে দাঁড়িয়ে আছে এক গভীর খাদের কিনারে। পিছোতে-পিছোতে সে এসে দাঁড়িয়েছে এখানে। এবার পিছনের অন্ধকার, অতল খাদ দুই হাত বাড়িয়ে টেনে নেবে তাকে।

সেবার শীতে তারা দার্জিলিং গিয়েছিল, সে আর মনীষ, সঞ্জয় আর চন্দ্রিকা। ভোররাতে, জিপ ভাড়া করে, সবাই যেমন যায়, টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে গিয়েছিল দল বেঁধে। চারদিকে তখনও আবছা অন্ধকার, কুয়াশা। সামনে ড্রাইভারের পাশে বসেছিল দয়িতা আর অন্য-একটি অচেনা অল্পবয়সী মেয়ে। সঞ্জয় চন্দ্রিকা আর মনীষ বসেছিল পিছনে। দয়িতা ইচ্ছে করেই একা বসেছিল। পাহাড়ি পথে নীরবে নিজের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল তার। গাড়ির উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপার চলছিল। টুপটুপ করে জল গড়িয়ে পড়ছিল কাঁচের উপর। দয়িতা সেই জলবিন্দুর দিকে তাকিয়ে ছিল ভাবলেশহীন চোখে।

পাহাড়ের দুরূহ বাঁকগুলি অনায়াসে, খেলাচ্ছলে পেরিয়ে যাচ্ছিল নেপালি চালক। অন্যান্য যাত্রীদের. বিশেষত চন্দ্রিকার, মুহুর্মুহু টুকরো আর্তনাদ, রুদ্ধ শ্বাসমোচনের শব্দ সে বারবারই টের পাচ্ছিল। অথচ, দয়িতার একটুও উৎকণ্ঠা ছিল না। সে শূন্য, স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল সামনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের দিকে। একবার তার চকিতে মনে হল, চলন্ত জিপটি যদি কোনও সংকীর্ণ বাঁকের মুখে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গড়িয়ে পড়ে গভীর খাদে! আশ্চর্য. ওইরকম ভাবনায় বিন্দুমাত্র বিচলিত, শঙ্কিত হল না সে।

গাঢ় কমলারঙের সূর্য তখন আকাশের, পাহাড়ের, কুয়াশার সব আবছায়া মুছে দিয়ে একটু একটু করে ফুটে উঠছে নিজস্ব মহিমায়। নির্মেঘ আকাশের নীলে, সাদায় ছড়িয়ে পড়ছে তার বহুবর্ণ বিভা। সেই অপরূপের দিকে অপলক তাকিয়ে দয়িতার মনে হল, এই সূর্যোদয়ের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই।

আগের দিন রাতে হোটেলের জানলা-দরজা-বন্ধ ঘরে রুম-হিটারের সুইচ অন করে, হালকা-নীল আলো জ্বেলে মনীষ সোফায় বসে অল্প-অল্প করে মদ খাচ্ছিল। দয়িতা তার আগে মুখ-গলায় ক্রিম ঘষেছে। নীল আলো ছিটকে পড়ছিল তার মুখে, গলায়, বাহুতে। বিছানায় লালরঙের কম্বলের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে দয়িতা বলেছিল, অস্ফুটে, 'বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

মনীষ যেন শুনতেই পায়নি, এমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে গ্লাসে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাতে-ধরাতে বলল, 'কাল সানরাইজ দেখতে যাচ্ছি। হোটেলেই সব ব্যবস্থা আছে। সকালে ওরাই সময়মতো ডেকে দেবে। নো প্রবলেম। সঞ্জয়রাও যাচ্ছে।'

দয়িতার একবার মনে হল, বলে, যাবে না। কী ভেবেছে কী মনীষ! সে কি মনীষের ইচ্ছে অনিচ্ছের পুতুল! সে যা বলবে, তা-ই করতে হবে তাকে! তাকে একবার জিজ্ঞেস করার কথা মনে হল না! দয়িতার মনে হল, মনীষ যেন চন্দ্রিকার সঙ্গেই এখানে এসেছে, তার সঙ্গে নয়।

আজ সারাদিন হোটেলে ফেরেনি মনীষ। সকালে বেরুবার সময় বলে বেরিয়েছিল জলাপাহাড়ের দিকে যাবে। তার অফিসের কারা-কারা এসেছেন, ওদিকেই কোথায় উঠেছেন। স্পষ্ট করে বলতে পারেনি মনীষ। দয়িতাও জিজ্ঞাসা করেনি। সে জানে, এক ঘোর মিথ্যার মধ্যে ঢুকে পড়েছে মনীষ। বেড়াতে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করার অতটা উৎসাহ তার মতো উন্নাসিক মানুষের পক্ষে মোটেই স্বাভাবিক নয়। যদি সেরকমই হত, তাহলে দয়িতাকেও সেখানে নিয়ে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তা নয়। দয়িতা জানে, মনীষ সারাটা দিন, সকাল-দুপুর সন্ধ্যা, চন্দ্রিকার সঙ্গেই কাটিয়েছে। সঞ্জয় আজ কী কাজে কদিনের জন্য কালিম্পঙে যাবেন, দয়িতা কালই শুনেছিল।

সারাটা দিন হোটেলের বন্ধ ঘরে একলা কাটিয়েছে দয়িতা। সন্ধের পর ফিরল মনীষ। বেল বাজলে নিজেকে গুছিয়ে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলল দয়িতা। কোনও কথা না-বলে দয়িতার দিকে না-তাকিয়ে ভিতরে ঢুকে এল মনীষ। দয়িতা তার গায়ে অন্য মেয়ের গন্ধ পেল। একটা অচেনা পারফিউম, ট্যাল্‌কের হালকা গন্ধ দরজা খুলতেই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার গোটা অস্তিত্বের উপর। কেমন গা গুলিয়ে উঠল দয়িতার।

সোজা বাথরুমে ঢুকে পড়ল মনীষ। বেরিয়ে এল অনেকক্ষণ পরে। সন্ধেবেলাযও স্নান করেছে। দয়িতার কেমন কান্না পাচ্ছিল, অপমানে সারা শরীর-মন জ্বালা করছিল তার। সে স্পষ্ট টের পেল, পাহাড়ে ধস নামছে, সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে, তারা আটকে পড়বে এক বেঘোর বিচ্ছিন্নতায়।

সেদিন রাতে দয়িতা আর বাইরে খেতে যায়নি। শুয়ে পড়েছিল। তার খুব শীত করছিল। মনে হচ্ছিল, পাহাড়ের-পর পাহাড় পেরিয়ে কনকনে হাওয়া জানলার কাঁচ ভেঙে ঢুকে আসছিল ঘরে, ঢুকে যাচ্ছিল তার ত্বক মাংস ভেদ করে একেবারে হাড়ের ভিতরে। মনে হচ্ছিল, তার শরীরের উপর ঝরে পড়ছে বরফের গুঁড়ো, পাহাড়ি বৃষ্টি, হিম। একটু-একটু করে বরফে চাপা পড়ে যাচ্ছে সে। বুকের কাছে হাঁটুদুটো জড়ো করে চোখ বুজে শুয়ে ছিল সে। অপেক্ষা করছিল, কখন বরফে ফাটল ধরবে, আর হিমবাহের অতলে চলে যাবে সে।

শুতে এসে একটা হাত অভ্যাসমতো দয়িতার গায়ের উপর তুলে দিয়েছিল মনীষ। দয়িতা কোনও কথা না-বলে হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিল। ওইটুকু স্পর্শেই তার কেমন গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। অবাক হয়েছিল দয়িতা, এত তাড়াতাড়ি পাল্টে যায় অনুভূতি! মনীষের হাতটা আজই প্রথম পাথরের মতো ভারী মনে হল দয়িতার।

মনীষ জোর করেনি। তার প্রয়োজনও ছিল না। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর, দয়িতা, জেগে থেকে, সারারাত মনীষের ঘুমের, নিশ্বাসের শব্দ শুনছিল।

টাইগার হিলে যাবে না, ভেবেছিল দয়িতা। পরে কী ভেবে মত বদলেছিল।

কলকাতা থেকে আসার সময় ট্রেনেও দয়িতার তেমন-কিছু মনে হয়নি। আসলে সে বিষয়টি লক্ষ্যই করেনি। এখন মনে হয়, লক্ষ করার মতো অনেককিছুই ছিল। চন্দ্রিকার দিকে নানা বিষয়েই অস্বাভাবিক মনোযোগ ছিল মনীষের। দয়িতাকে একা রেখে সে বারবার উঠে গিয়েছিল সঞ্জয়দের কাছে।

সঞ্জয়ের ব্যাপারটাও বুঝতে পারে না দয়িতা। তাঁর যেন বেশ প্রশ্রয় রয়েছে গোটা বিষয়টিতে। বিকেলে তারা ম্যালে বেড়াতে বেরুলে চন্দ্রিকার সঙ্গে দেখা হত নিয়মিত। অধিকাংশ দিনই সঞ্জয় আসতেন না। চন্দ্রিকা বলত, 'ও যা শীতকাতুরে, হোটেল থেকে বেরুতেই চায় না!'

মনীষ প্রায়ই চন্দ্রিকাকে হোটেল পর্যন্ত এগিয়ে দিতে যেত। ফিরত যখন, তখন কিছু-না-কিছু কেনাকাটা করে আসত। হয় টুপি, নয় কার্ডিগান, বা সোয়েটার — এরকম-সব। বলত, 'একা-একা এসব বেশ দরদাম করে কেনা যায়। সঙ্গে মহিলা থাকলেই পেয়ে বসে ওরা।' এইসব কথার যে কোনও মানে হয় না, তা বোঝার মতো ক্ষমতাও যেন মনীষের ছিল না।

প্রথমদিন চন্দ্রিকাকে পৌঁছে দিতে গিয়ে যখন অনেকটা দেরিতে ফিরল মনীষ, সেদিন দয়িতা ঠাট্টা করেই বলেছিল, 'বাব্বা, তোমার যে এত শিভালরি, তা জানতাম না তো!'

মনীষ কিন্তু ঠাট্টা হিসেবে নেয়নি কথাটা। বলেছিল, 'হোয়াট ড় ইউ মিন?'

'কী মিন করব! মিন করার মতো কিছু আছে নাকি! আশ্চর্য!'

'তা তুমিই জানো।'

'তুমি রেগে যাচ্ছ কেন! কী এমন বললাম।'

'ইউ ইরিটেটিং মি!'

'অদ্ভুত কথা বলছ!'

দয়িতা বিষণ্ণ চোখদুটি তুলে তাকিয়েছিল মনীষের দিকে। রাগ নয়, ঘৃণা নয়, অপমান বা অভিমান নয় — একধরনের শূন্যতা তাকে চারদিক দিয়ে কুয়াশার মতো ছেয়ে ফেলল। আর-কোনও কথা বলল না সে।

মনীষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে তিন বছর। তারও আগে বছর-দুই মেলামেশা করেছে তারা। দয়িতার হঠাৎ মনে হল, এই মুহূর্তে যেন অতগুলি বছর নিমেষে মিথ্যা হয়ে গেল। মনে হল, বিশ্বাস, ভালবাসা, নির্ভরতা, সম্পর্ক — এসব আসলে খুব ঠুনকো জিনিস। কতগুলি অলীক ধারণা মাত্র, কোনও ভিত্তি নেই তার। এক-পলকে, সামান্য হাওয়ায়, ছেঁড়া কাগজের মতো উড়ে যায়। কাঁচের বাসনের মতো হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়।

রাতে আলো নিভিয়ে শোওয়ার পর মনীষ, তার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'আয়াম সরি! আয়াম রিয়েলি সরি। তোমাকে ওভাবে বলা উচিত হয়নি আমার।' বলতে-বলতে তার মুখের উপর নিজের মুখটা নামিয়ে এনেছিল মনীষ। আর, দয়িতাও নিমেষে, বিশ্বাসে, আশ্রয়ে ফিরতে চেয়ে, দু-হাতে আঁকড়ে ধরেছিল মনীষকে। অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে যেতে-যেতে সে খড়কুটোর মতো আঁকড়ে ধরেছিল শরীর। মনীষ জিভ দিয়ে মুছে দিচ্ছিল তার গালের-উপর-গড়িয়ে-আসা জলরেখা। দয়িতা ভেবেছিল, সে ভুল বুঝেছিল মনীষকে।

তারপরেও চন্দ্রিকার সঙ্গে দেখা হচ্ছিলই। দয়িতা তাকে গুরুত্ব দেবে না ভেবেও লক্ষ করছিল চন্দ্রিকাকে। তার ঠোঁট টিপে হাসা, হিল্লোল, মনীষের মুগ্ধতা টের পেতে অসুবিধে হয়নি আর। দয়িতা নিশ্চিত হয়েছিল।

একবার ভেবেছিল একাই কলকাতায় ফিরে যায়। পরে ভেবেছিল, থাক, সে কোনও সিন-ক্রিয়েট করবে না। টাইগার হিলে যাবে না ভেবেও মত পাল্টেছিল।

ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে পড়েছিল দয়িতা। মনীষ, চন্দ্রিকা আর সঞ্জয় এগিয়ে যাচ্ছে পাশাপাশি। দয়িতা দেখল, উপরে ওঠার সময় চন্দ্রিকার পিঠে হাত রাখল মনীষ।

চন্দ্রিকা আজ একটা লাল-টকটকে লং কোট পরেছে। মাথায় বেঁধেছে সিল্কের স্কার্ফ। হাতে সাদা গ্লাভস। বেশ লম্বা সে, প্রায় সঞ্জয়ের কাঁধের কাছে তার মাথা। হঠাৎই খিলখিল করে হেসে উঠল চন্দ্রিকা। ভোরবেলার নৈঃশব্দ্য খানখান হয়ে ভেঙে গেল তার হাসির শব্দে।

ফেরার পথে গাড়িতে সঞ্জয় বললেন, 'আমরা কাল গ্যাংটক যাচ্ছি, আপনারাও চলুন না!'

'না, না, আমার আর ছুটি নেই। কালই ফিরব। টিকিট কাটা রয়েছে।' দয়িতা বলল।

'টিকিট ক্যানসেল করা যায়। তোমার কলেজ খুলতে এখনও পাঁচদিন বাকি!' মনীষ বলল।

'না, আমি যাব না।' দয়িতা স্পষ্ট করে বলল। পরে কী ভেবে জুড়ে দিল, 'তোমার ইচ্ছে হলে ঘুরে এসো। আমি একাই ফিরতে পারব।'

দয়িতা জানলার দিকে মুখ ফেরাল। পরিষ্কার নীল আকাশে সাদা মেঘগুলি বালক-বালিকার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছিল, জানলা দিয়ে হাত বাড়ালেই একটা-দুটো মেঘ ধরে ফেলতে পাববে সে। গাড়িতে সে যদি একা থাকত, তা হলে জানলার কাঁচ নামিয়ে দিত দয়িতা।

রোদ একটু-একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে চরাচরে, কুয়াশা মুছে পাহাড়ের খাদ, গাছপালা, চূড়া, নিচের বসতি ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দয়িতার মনে হল, সম্পর্ক কি সত্যিই এরকম সরু সুতোয় বাঁধা! একটু টান লাগলেই তা ছিঁড়ে যায়, জট পাকিয়ে যায়! একটু নতুন, ঝকঝকে দিনের দিকে তাকিয়ে দয়িতার মনে হল, তার আর সামনে তাকাবার কিছু নেই। নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে টের পেল, সব মেঘ জমছে তার বুকের ভিতর।

কলকাতায় ফিরে ক্রমশই আরও-বেশি নিঃসম্পর্কিত হয়ে যাচ্ছিল দয়িতা আর মনীষ। হঠাৎই বাড়ি ফিরতে মনীষের আরও দেরি হতে লাগল। বাড়তে লাগল অফিসের ট্যুরের সংখ্যা। প্রায়ই রাতে বাড়ি ফিরে বলত, 'আমি খাব না। তুমি খেয়ে নাও।' টিপসি হয়ে ফিরত। প্রায়ই তার জামায় লেগে থাকত লিপস্টিকের রং। একদিন একটা আস্ত নীল টিপ লেগে ছিল মনীষের সাদা জামার বুকের কাছে! দরজা খুলে দিয়ে দয়িতা একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অপলকে দেখল সেই নীল বিন্দু!

চন্দ্রিকাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এল বোধহয়। মনীষ ঘরে ঢুকে এলে দয়িতা দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, 'টিপটা জামা থেকে খুলে রাখো। কাল ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

'কীসের টিপ, কার টিপ, কাকে ফেরত দেব?' অসংলগ্ন গলায় বলল মনীষ।

দয়িতা কথা বাড়ায়নি। তার প্রবৃত্তি হয়নি।

দার্জিলিং থেকে ফিরে পাশের ঘরে ছোট ডিভানটায় শুত দয়িতা।

সেদিন মধ্যরাতে মনীষ এসেছিল তার ঘরে। ঘুমের মধ্যে শরীরের উপর ভার টের পেয়ে হুড়মুড়িয়ে উঠে বসেছিল দয়িতা। বেড-সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিয়েছিল। মনীষকে দেখে অবাক হয়েছিল সে।

'তুমি!' কোনওরকমে বলল দয়িতা।

'আমি! সো হোয়াট!' স্খলিত গলা মনীষের।

'ডোন্ট টাচ মি! চলে যাও তুমি! তোমার লজ্জা করে না!' উঠে বসল দয়িতা। ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

'তোমার খুব অহঙ্কার, না?' এগিয়ে এসে শক্ত করে দয়িতার হাতটা ধরল মনীষ। ছটফট করে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে-করতে দয়িতা দেখল, তাকে ফের ডিভানের উপর শুইয়ে দিয়েছে মনীষ।

পরদিন কলেজ থেকে দয়িতা আর বাড়ি ফেরেনি। দু'জনের কাছেই ফ্ল্যাটের চাবি থাকে, মনীষের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কলেজ থেকে মাকে ফোন করে জানিয়েছিল, যাবে। অনেকদিন যাওয়া হয় না। জয়িতা চাকরি পেয়ে মুম্বাই চলে যাওয়ার পর পারমিতা বেশ একা হয়ে গেছেন।

'কী ব্যাপার, হঠাৎ মার কথা মনে পড়ল! মনীষ কি লং ট্যুরে গেল!' পারমিতা জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর গলার কৌতুক, উচ্ছ্বাস ছুঁয়ে গেল দয়িতাকে।

চা খেয়ে ওয়াড্রোব খুলে নিজের শাড়ি-জামা বের করতে-করতে দয়িতা বলল, 'মা, আমি তোমার কাছে কিছুদিন থাকব।'

এ-প্রস্তাবে পারমিতার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু দয়িতার গলায় এমন কিছু ছিল যে পারমিতা থমকে তার দিকে তাকালেন।

দয়িতা শাড়ি-জামা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। অনেকদিন পর এ-বাড়িতে এসে ভাল লাগছিল তার।

রাতে খেতে বসে দয়িতা আচমকা বলল, 'মা, আমি আর মনীষের কাছে ফিরব না।'

'ক্‌কী! কী বলছ তুমি!' পারমিতা চমকে উঠলেন।

'হ্যাঁ, মা, আই টুক মাই ডিসিশন।' দয়িতা মুখ নিচু করে ডিশে ভাত নাড়াচাড়া করছিল।

'কী হয়েছে তোমার! এসব কী বলছ তুমি!' পারমিতা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলেন।

'ঠিকই বলছি। ওর সঙ্গে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। হি ইজ বিয়িং এনগেজ্‌ড আদারওয়াইজ, উইথ আদার ওম্যান!' দয়িতা মুখ তুলল।

'তুমি ভুল ভাবছ না তো! সন্দেহ খুব খারাপ জিনিস।' পারমিতা বললেন।

'আমি কী করে ভুল করব! অ্যাম আই এ স্টুপিড!'

'তা নয়, অনেক সময় বুঝতে ভুল হয়। ভাঙা খুব সহজ, টুটুল! এত তাড়াতাড়ি ডিসিশন নিয়ো না।'

'তুমি জানো, কাল ও আমাকে রেপ করেছে, লিটারারি।'

'এসব তুমি বাড়িয়ে ভাবছ!'

'তুমি কি আমাকেই দায়ী করছ! আমার চেয়ে মনীষ তোমার কাছে বেশি! ঠিক আছে!'

'বোকার মতো কথা বোলো না।'

'কোনও মেয়ে বানিয়ে বলতে পারে যে শি হ্যাড বিন রেপড!'

'আমি তা বলছি না। একটি ঘটনাকে নানাভাবে দেখা যায়!'

'আমরা মাসখানেক আলাদা ঘরে শুই। ও নিয়মিত চন্দ্রিকার কাছে যায়!'

'মেয়েটি কে?'

'ওর এক বন্ধুর স্ত্রী!'

'তিনি জানেন না?'

'দার্জিলিঙে দেখেছিলাম সঞ্জয়কে। কেমন যেন প্রশ্রয় আছে, মনে হয়েছিল!'

'তুমি মনীষের সঙ্গে কথা বলো।'

'হোয়াই শুড আই! তুমি এমন বলছ যেন সব দোষ আমার! তুমি কি আমাকে এখানে থাকতে বারণ করছ! মেক ইট ক্লিয়ার।'

'ছি' টুটুল! তুমি আমাকে এই বুঝলে!'

ট্যাক্সিটা পার্ক স্ট্রিটের ক্রসিং-এ সিগনালে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দয়িতা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। ঘাড় ফিরিয়ে অচিনের দিকে তাকাল। সে দেখল, একটুকরো রোদ আড়াআড়িভাবে

অচিনের চশমার উপর পিছলে পড়েছে। কেমন অন্যমনস্ক দেখায় তাকে। চশমার ভিতর তার চোখদুটি ঈষৎ বিহ্বল, বিভ্রান্ত মনে হয়।

আমি কি অচিনকে ঠকাচ্ছি! সেই ইউনিভারসিটি থেকে অচিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার। সেইসব বন্ধুরা কে কোথায় ছিটকে গেছে। যে যার আলাদা-আলাদা জীবনে ঢুকে পড়েছে। অচিনের সঙ্গেই যোগাযোগটা ছিল। দয়িতার এখন মনে হয়, অচিনকে সে বুঝতে পারেনি। গভীর, অন্তর্মুখী অচিনের তার প্রতি বন্ধুত্বের বাইরেও একটা অন্য টান, আকুলতা ছিলই। দয়িতা টের পায়নি। কিংবা টের পেলেও আমল দেয়নি। তারপর তো মনীষের সঙ্গেই জড়িয়ে পড়ল। তখন আর অন্যদিকে তাকাবার অবকাশ ছিল না দয়িতার।

এখন মনে হয়, মনীষ তাকে কখনওই সেভাবে ভালবাসেনি। ভালবাসতে জানেও না সে। হয়তো ভালবাসা তার কাছে তত-প্রয়োজনীয় নয়। তার সব টান শরীরের উপর। দয়িতাকে সে কেবল শরীরেই পেতে চেয়েছে। ফলে, যখন জানা হয়ে গেছে দয়িতার শরীরের সব রহস্য, অনুপুঙ্খ, পাওয়া হয়ে গেছে সব স্বাদ, তখনই অকিঞ্চিৎকর হয়ে গেছে সে মনীষের কাছে।

এখন এসব মনে হয়। আগে কখনও মনে হয়নি। আসলে বিবাহিত জীবনটা এমন অভ্যাসের ব্যাপার, তখন দৈনন্দিনতার বাইরে আর-কিছু ভাবার অবকাশ থাকে না। প্রয়োজনও হয় না। কিংবা, মনে হয়, সম্পর্ক যখন আছে, তখন ভালবাসাও আছে। তা নিয়ে আলাদা করে না ভাবলেও চলে। ভাবতে গেলেই জটিলতা তৈরি হয়, সম্পর্কের অসাড়তা প্রকট হয়ে ওঠে।

এই যে অচিন, কদিন আগেই অমন রাগ করল তার উপর, এতদিন দেখা করল না, ফোন করল না, তা সত্ত্বেও সে যে-ই এসে দাঁড়াল তার সামনে, তার সব অভিমান তো নিমেষে মিলিয়ে গেল! দয়িতা জানে, অচিন তাকে মনে মনে কামনা করে। কিন্তু সে-জন্য সে কখনও জোর করবে না। অচিনের আত্মসম্মানবোধ খুব তীব্র। দয়িতা এখন বোঝে, শুরু থেকেই অচিন কেবল অপেক্ষা করে গেছে। এখনও করে। দয়িতার ইচ্ছা-অনিচ্ছাগুলিকে সে খুব মূল্য দেয়। দয়িতার মাঝে-মাঝে মনে হয়, অচিন যদি তাকে একটু জোর করত! অচিনের অতটা আত্মবিশ্বাস ছিল না।

অচিনের দিকে তাকিয়ে কেমন বিধুর বোধ করল দয়িতা। সেদিন রাস্তার মধ্যে কেন ওভাবে বলতে গেল অচিনকে! অচিন কখনও অত তীব্রভাবে রিঅ্যাক্ট করে না। অভিমান থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। কিন্তু কী করবে দয়িতা! তার যে আজকাল কেমন মেঘ জমে থাকে মাথার ভিতর, তা সে কাকে বলবে! অচিন তাকে বুঝবে না!

আবার অদ্ভুত ছেলেমানুষিও আছে অচিনের। এই যে এখন তাকে নিয়ে চেনা ডাক্তারের কাছে ছুটল নিজের সব কাজকর্ম ফেলে, একবারও ভাবল না সেখানে গিয়ে কী পরিচয় দেবে তার! দয়িতার মতামতের কোনও ভ্রূক্ষেপ করল না সে!

ঠিকই, ইদানীং শরীরটা ভাল যাচ্ছে না দয়িতার। একটুতেই খুব কাহিল হয়ে পড়ছে। একটা বছরের ঝড় যেন তার শিকড় ধরে নাড়িয়ে দিয়েছে। জয়িতা প্রায়ই ফোন করে ওর কাছে যেতে বলে। কলকাতা যেন ভার হয়ে উঠেছে দয়িতার কাছে। চেনা মানুষদের সে আজকাল এড়িয়ে চলে। সকলের ওই ইঙ্গিতপূর্ণ সহানুভূতিতে গা জ্বলে যায় তার। প্রিয় শহরটাকে আজ যেন একটা মস্ত পাথর মনে হয়। বাড়ি আর কলেজ, কলেজ আর বাড়ি, এ-ছাড়া তার আর-কোনও জায়গা নেই এত বড় শহরটায়। মাঝখানে এক অলীক ছায়ার মতো অচিন আছে। অচিনের কথা ভাবলে একটা ভয়ের অনুভূতি তাকে কেমন আচ্ছন্ন করে

দেয়। মনে হয়, অচিনকে দেওয়ার মতো আর-কিছু অবশিষ্ট নেই তার। সাবধানী হয় দয়িতা। কী হবে আর জটিলতা বাড়িয়ে! ব্রিটিশ কাউনসিলের স্কলারশিপটা যদি পেয়ে যায়, তা হলে সে চিরতরে চলে যাবে এই শহর ছেড়ে।

কিন্তু অচিন! অচিনকেও ছেড়ে যাবে! পারবে?.. .ঠিক পারবে! যাওয়ার আগে অচিনের একটা বিয়ে দিয়ে যাবে। একদিন অচিনকে বুকে জড়িয়ে খুব আদব করবে। আঁচড়ে-কামড়ে শেষ করে দেবে তাকে।

অচিনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই তার একটা হাত নিজের কোলের উপর টেনে নিল দয়িতা।

৩

সকালেই দয়িতাকে ফোন করল অচিন। পারমিতা ধবলেন। পারমিতা ফোন ধরলে অচিনের কেমন অস্বস্তি হয়। পারমিতা যেন অচিনকে একটু অপছন্দই করেন। ভাবেন বোধহয়, তার জন্যই দয়িতার বিয়ে ভেঙে গেল।

'দয়িতা আছে? আমি অচিন বলছি।'

'হ্যাঁ, ধরো, ডেকে দিচ্ছি।'

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল অচিন। তারপর দয়িতা ফোন তুলল।

'হ্যালো?'

'কী করছিলে?'

'শুয়ে ছিলাম।'

'কেন?'

'কী আশ্চর্য, তা-ও তোমাকে বলতে হবে?'

সামান্য থমকাল অচিন। আজকাল সামান্য কারণে-অকারণে মেজাজ খারাপ করে দয়িতা। কেমন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বসে। দয়িতাকে তখন খুব অচেনা লাগে অচিনের। মনে হয়, তাকে যেন মানুষ বলেই গণ্য করে না সে। আবার পরমুহূর্তেই অন্যরকম। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুঝতে পারে না অচিন। একধরনের বিভ্রমে জড়িয়ে পড়ে সে। মনে হয়, সে যেন দয়িতার কাছে ক্রমশই ভার হয়ে উঠছে। সে সরে গেলেই দয়িতা ভাল থাকবে। এরকম ভেবে বারবার দূরে চলে গেছে অচিন। দেখা করেনি, ফোন করেনি। অথচ দয়িতার সঙ্গে দেখা হলেই নিমেষে সব মেঘ কেটে গেছে অচিনের।

'কলেজে যাবে না?' অচিন জিজ্ঞেস করল।

'দেখি। এখনও ঠিক করিনি। আমার আজ বেলায় ক্লাস।' দয়িতা স্বাভাবিকতায় ফিরছিল।

'আজ ইসিজি-টা করাবে নাকি?'

'ধুস। ওসব কে করাবে!'

'তার মানে! শ্যামলদা কি বললেন!'

'তাতে কী হল! ডাক্তাররা ওরকম বলেন!'

'দেখিয়ে নিতে দোষ কী!'

'আমার ওসব ডাক্তারফাক্তার ভাল্লাগে না।'

'কারওই লাগে না। দরকারেই যেতে হয়।'

'জেঠামশাইয়ের মতো কথা বোলো না তো!'

'বয়স কি কম হল নাকি! চল্লিশ ছুঁয়ে ফেলব এবার!'

'সত্যি, তোমার জন্য মায়া হয়!'

'কেন?'

'না', এমনি!'

মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসল দয়িতা। দয়িতার হাসিতে ভাল লাগল অচিনের।

'বলো না, কি বলছিলে!'

'কী আর বলব! এখনও একটা হিল্লে হল না তোমার!'

'তা ঠিক। কী করব বলো, সবার কি সবকিছু হয়!'

'তোমার অনেক গণ্ডগোল আছে! সুজাতা আমাকে বলেছে।'

'মাই গুডনেস! তুমি তো দেখছি, রীতিমতো গোয়েন্দাগিরি করছ!'

'সুজাতার সঙ্গে সেদিন নিউমার্কেটে দেখা হল, জানো! আরও সুন্দর দেখতে হয়েছে। তুমি কোনও কাজের নয়। সি ওয়াজ ভেরি মাচ ফন্ড অফ ইউ! ফোন নম্বরটা দিল আমায়, নেবে? দ্যাখো না চেষ্টা করে, পরকীয়া বেশ জমবে!'

'এ-বয়সে কি আর পারব!'

'মে গড ব্লেস ইউ!'

'বাজে কথা ছাড়ো! ইসিজিটা আজ করাচ্ছ তো!'

'অচিন, তুমি কেন আমার জন্য এত ভাবো?'

'শোনো, একটু আগে শ্যামলদাকে ফোন করেছিলাম। একটা ল্যাবরেটরির কথা বললেন। তোমার কলেজেব কাছেই। আমি ফোনে কথা বলে নেব। তোমার কটা পর্যন্ত ক্লাস?'

'আমার জন্য কেন খামোখা কষ্ট পাও তুমি!'

'তুমি একেবারে সিরিয়ালের ডায়লগ বলছ!'

'অচিন, আজ নয়। আজ একদম ইচ্ছে করছে না। কলেজেই যাব না, ভাবছি!'

'বেরুবেই না! তোমার সঙ্গে আজ দ্যাখা হবে না!'

'কী হয় দ্যাখা হয়ে! আমি এত খারাপ ব্যবহার করি!'

'ঠিক আছে, আমি রাখছি। ইসিজি-টা শিগ্রি করিয়ে নিয়ো।'

'ছেড়ো না, শোনো, আজ সন্ধেবেলা তুমি একবার আসবে?'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে।'

'না, সন্ধেবেলা আমার কাজ আছে।'

'কী কাজ! বাজে কথা বোলো না।'

'কফি হাউসে যেতে পারি, অন্য কোথাও যেতে পারি।'

'কাল যাবে, পরশু যাবে, আজ নয়।'

'না।'

'ঠিক তো?'

'তুমি বুঝছনা, আমার অসুবিধে হয়।'

'কী অসুবিধে!'

'ওফ! ইউ আর ভেরি মাচ ন্যাগিং!'

'ক্কী! ঠিক আছে, আসতে হবে না!'

'শোনো, শোনো, এক কাজ করো না, তুমি বিকেলে আমার কলেজে এসো। বেরিয়ে ল্যাবরেটরি হয়ে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।'

'শয়তানি, না?'

'প্লিজ!'

'আমার আজ বেরুতে ইচ্ছে করছে না। শরীরটাই ভাল লাগছে না। সকাল থেকে শুয়েই ছিলাম। তুমি এসো।'

'ওষুধ খেয়েছিলে?'

'খাব। তুমি আসছ তো, ছটা?'

'শোনো, টুটুল, তোমাকে কখনও বলিনি, আমার কেমন মনে হয়, তোমার মা আমাকে ঠিক পছন্দ করেন না। হয়তো ভুল, কিন্তু আই ফিল ইট!'

'না, না, মোটেই নয়। তুমি ভুল করছ।'

'হতে পারে!'

'মা আজ থাকবে না। স্কুল থেকে ফিরে বারাকপুরে যাবে। ছোট মাসির মেয়ের বিয়ে কাল!'

'ইমপসিবল! কী বলছ তুমি।'

'ঠিকই বলছি। আমার আজ সারাদিন তোমার জন্য অপেক্ষা করতে ইচ্ছে করছে। খুব পাগলামি করতে ইচ্ছে করছে। ইচ্ছে করছে, নিজেকে ভেঙেচুরে ছিঁড়েখুঁড়ে উড়িয়ে দিতে! এই দ্যাখো, আমার গায়ে কেমন কাঁটা দিচ্ছে!'

'অত ভেবেচিন্তে পাগলামি হয়! প্ল্যান করে পাগলামি, তুমি সত্যিই পাগল!'

'অতকিছু জানি না, তুমি আসবে কি না, বলো!'

'তুমি আমায় লোভ দেখাচ্ছ?'

'না। আমার নিজেরই খুব লোভ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, নতুন করে বাঁচি আবার! বেঁচে থাকার একটা কোনও অর্থ তৈরি হোক! অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে আমার।..... ...ঠিক আছে, রাখছি!'

আচমকা ফোনটা ছেড়ে দিল দয়িতা।

ফোনটা রেখে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল অচিন। কী বলছে দয়িতা! অসম্ভব, এ হয় না। এরকম লুকিয়েচুরিয়ে সে কিছু করতে পারে না দয়িতার সঙ্গে।

ঠিকই, এখন তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার যে, দয়িতাকে সে ভালবাসে, কামনা করে। দয়িতার ঝর্ণার মতো শরীরের আশ্রয় পেতে ইচ্ছে করে খুবই। কতদিন মনে-মনে ভেবেছে, দয়িতার সোনালি আঁচল সরিয়ে তার বুকে মুখ রাখবে। দয়িতার স্ফুরিত ঠোঁটদুটির গভীরে ডুবিয়ে দিতে ইচ্ছে করেছে নিজের কর্কশ ঠোঁটদুটি।

একদিন, একদিনই, অদ্ভুত স্বপ্নের মধ্যে সে দেখেছিল দয়িতাকে। একটি আদিগন্ত মাঠ পেরিয়ে যাচ্ছে সে আর দয়িতা। সবুজ মাঠময় ইতস্তত ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উঁচু-নিচু গাছ, তার ছায়ায় ঘন হয়ে রয়েছে মাঠ। আকাশ থেকে অবিরল জ্যোৎস্না পরির মতো নেমে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সমস্ত চরাচর। নীল আকাশে অসংখ্য তারা ফুটে আছে সোনার ফুলের মতো। দয়িতা পরেছে একটা সোনালি রঙের শাড়ি, একই রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। তার আঁচল হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে অনির্দেশের দিকে। তার আলুলায়িত দীর্ঘ কালো চুল ঢেউয়ের মতো ফুলে উঠছে। জ্যোৎস্না পড়েছে দয়িতার নগ্ন বাহুর ওপর, গ্রীবায়, চোখে ও মুখে।

'টুটুল, এ-জীবন আমাদের নয়!।' অচিন আলতো করে ধরল দয়িতার ডান হাতের একটি আঙুল, অনামিকা।

বিস্ময়-বিহ্বল চোখদুটি ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল দয়িতা। তার ঠোঁটদুটি থরথর করে কেঁপে উঠল রক্তিম পালকের মতো। তার চুলের উপর খসে পড়ল একটি নীল তারা।

'আমরা যেন অন্যের জীবনে ঢুকে পড়েছি।' দয়িতার স্বরে বিষাদ।

'এই অভিশাপ আমাদের সারা জীবন বয়ে যেতে হবে!' অচিন বলল।

'অভিশাপ?' ব্যাকুল হল দয়িতা।

'নয়? পুরনো জীবনটা আমাদের হাতছানি দেবে, আর এই নতুন জীবন আমাদের কোথাও পৌঁছে দেবে না!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে অচিন।

'আমাদের কোথায় পৌঁছনোর ছিল, অচিন?' দয়িতার ভ্রূতে জিজ্ঞাসা।

'ঠিক জানি না। হয়তো কোথাও নয়। বুঝতে পারি না।' অচিন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়।

'আমি আর কোথাও পৌঁছতে চাই না!' দয়িতা হাত ছাড়িয়ে নিল।

'চলো, টুটুল, ওই দ্যাখো, একটা কী অসামান্য নীলরঙা গাছ, আমাদের ডাকছে। চলো, আমরা ওই গাছটার নিচে একটু বসি। খুব জ্যোৎস্না পড়ছে, ভিজে যাচ্ছ তুমি!' দয়িতার নির্জন কোমরে হাত রাখল অচিন।

'চলো!' হালকা হাসি দয়িতার ঠোঁটে।

গাছের নিচে একটি সাদা বেঞ্চ। দয়িতা ময়ূরের মতো আঁচল ছড়িয়ে বসল। অচিন বসল নিচে, ঘাসের উপর। দয়িতার বসায় সরস্বতীর মুদ্রা, অচিনেব মনে হল। দয়িতা হঠাৎই ঈষৎ ঝুঁকে অচিনের মাথাটা টেনে নিল নিজের কোলের উপব। অচিন তার দুই কোমল উরুর উপর মুখ ডুবিয়ে দিতেই শুনল চারদিকে বেজে উঠছে জলের ধ্বনি। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেই দেখল, একটা প্রকাণ্ড কালো মেঘ প্রবল হিংস্রতায় অতি দ্রুত নেমে আসছে তাদের দিকে। নদী উপচে সমস্ত জল বেগে ছুটে আসছে মাঠের উপর। জ্যোৎস্না নিভে গেছে। দয়িতার সোনালি শাড়ি মাখামাখি হয়ে গেছে নিবিড় মেঘে, জলে।

অচিন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরল দয়িতার কোমর। সে দেখল, জলের ভিতর পদ্মের মতো খুলে যাচ্ছে দয়িতার দুই স্তন। অচিন বালকেব মতো সেই পদ্মের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে টেব পেল, তার আঙুলগুলি ববফের মতো সাদা, শক্ত, হিম হয়ে গেছে। সেই হিম আঙুলে, অন্ধকাবে, সে ব্রেইল অক্ষরের মতো পড়ে নিতে চাইল দযিতাকে। ঠোঁট দিয়ে ছুঁল তার জলডোবা পায়ের পাতা। অন্ধকারেই দয়িতার সমূহ শীতল নগ্নতাকে অনুভব করল অচিন। ক্রমশ তার ঠোঁটদুটিও শক্ত, অনুভূতিহীন হয়ে যাচ্ছে, টেব পেল অচিন। সেই নীরক্ত ঠোঁট দিয়েই সে খুঁজে পেল দয়িতার দুই উরু, উরুসন্ধি, নাভি, স্তন! অদ্ভুত, দয়িতার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ সমতল — চোখ, নাক, ঠোঁট কিছুই আঁকা নেই সেখানে!

অচিন বরফের ঠোঁট ও আঙুল দিয়ে অন্ধের মতো, উন্মাদের মতো দয়িতার সমতলমুখ স্পর্শ করতে-করতে কপালের-উপর-আটকে-থাকা একটি টিপ স্পষ্ট টের পেল। তখনই চারদিক কাঁপিয়ে অট্টহাসির মতো তীব্র ঝড় উঠল। উন্মাদ ঝড়ে টুকবো-টুকরো হয়ে উড়ে গেল দয়িতার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উরু, যোনি, স্তন, আঙুল — ছেঁড়া কাগজের মতো। ফাঁকা, শূন্য, নির্জন মাঠের উপর নিমেষে দৌড়ে এল নদী। অচিন অপেক্ষা করল, কাগজের নৌকোর মতো সুদূরে ভেসে যাওয়ার।

এই অদ্ভুত স্বপ্নের কোনও মানে বোঝেনি অচিন। মধ্যরাতে বিজবিজে ঘামের মধ্যে ঘুম ভেঙে একধরনের বিহ্বল বিপন্নতা টের পেয়েছিল সে। উঠে জল খেয়েছিল, সিগারেট খেয়েছিল। ওই রাতে দয়িতাকে টেলিফোন করার কথা ভেবেছিল সে একবার। করেনি। নিথর বসেছিল টেবিলের নির্জনতায়, একা।

গত একটা বছরে দয়িতার সঙ্গে অচিনের সম্পর্ক যে আর তেমন সহজ-স্বাভাবিক নেই, তা অচিন বেশ বুঝতে পারে। এই একটা বছর সে কি তা হলে চতুরতায়, লোভে একটু-একটু করে গুঁড়ি মেরে এগিয়েছে দয়িতার দিকে! ছায়ার মতো ঘিরে থেকেছে তাকে! দয়িতার পাশে দাঁড়িয়েছে নিছক সরল বন্ধুতায় নয়, এক গোপন কামনায়, অপেক্ষা করেছে সুচতুর শিকারির মতো!

এক পড়ন্ত বিকেলে, পরিচিত রেঁস্তোরায়, মুখোমুখি বসে দয়িতা একেবারে ভূমিকাহীন বলেছিল, 'চমকে উঠো না! আমি ডির্ভোস নিচ্ছি।'

অচিন চমকেই উঠেছিল। কী বলছে দয়িতা! সিগারেট ধরাতে গিয়ে থমকে তাকিয়েছিল তার দিকে।

'তোমাকে বলিনি। এই অপমানের ভিতর থাকা যায় না। অসহ্য লাগছে আমার!' দয়িতাকে অসম্ভব ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছিল।

'কী হয়েছে কী! এই তো বেশ দার্জিলিং থেকে বেড়িয়ে ফিবলে!' অচিন বলল।

'দার্জিলিং গিয়েই জানলাম।' দয়িতা মুখ নিচু করল।

'কী জানলে?' অচিন উৎকণ্ঠ হচ্ছিল।

'যা জানার, সেই পুরনো গল্প, আদার এনগেজমেন্ট!'

'তুমি ভুল করছ না তো!' অচিন বলল।

'কোনও মেয়েই এ-ক্ষেত্রে ভুল করে না। তুমি ঠিক বুঝবে না!' দয়িতা মুখ তুলল।

'বুঝব না কেন, বলো!' অচিন সিগারেট ধরাল।

'কী বলব! হি ইজ ডেয়ারিং। আমি এতদিনে একটুও বুঝতে পারলাম না, অচিন!' দয়িতার গলা কেঁপে গেল।

'তুমি মনীষের সঙ্গে কথা বলো। এসব একটু আধটু হয়। দেখো, ঠিক হযে যাবে।' অচিন কোনওরকমে বলল।

'কী হয়। হলেই হল। তুমিও মার মতো বলছ।' দয়িতার গলায় ক্ষোভ, রাগ।

'টুটুল, ব্যাপারটা শকিং ঠিকই! কিন্তু কতকিছুই তো মানুষকে সহ্য করতে হয।' অচিন বলল।

'আমি ওভাবে ভাবতে পারি না। সম্পর্কেব একটা দায়বদ্ধতা থাকে!' দয়িতা অচিনেব দিকে স্পষ্ট করে তাকাল।

'ঠিক আছে! কিন্তু মানুষ তো ভুলও করে!' অচিন হাতটা ধরল দয়িতার।

'আমি তো করিনি। আমি তো নিয়ন্ত্রণ হারাইনি নিজের ওপর! আমাব কি কখনও ইচ্ছে করেনি তোমাকে —'

অচিন চমকে তাকাল দয়িতার মুখের দিকে। দয়িতা দাঁত দিযে চেপে ধবল নিচেব ঠোঁটটা। অচিন দেখল, অপার বিষাদের মধ্যেই দয়িতার মুখে-চোখে ফুটে উঠল সামান্য ব্রীড়া, ঝলক। অচিন চায়ের কাপ টেনে নিল।

সেই স্বপ্নের কথা অচিন কখনও বলেনি দযিতাকে। আজ দয়িতাব মুখোমুখি বসে, হঠাৎ বিস্মৃত গানের মতো ভেসে এল সেই স্বপ্নের দৃশ্য। অচিন টের পেল, একধবনের কাতরতা, আচ্ছন্নতা তৈরি হচ্ছে তার ভিতরে ভিতরে। নিজেকে আড়াল করার জন্য পকেট থেকে রুমাল বের করে অহেতুক মুখ মুছল সে।

'অচিন, আমি চেষ্টা করেছিলাম! আসলে আমাকে সম্পূর্ণ জানা হয়ে গিয়েছে মনীষেব। আমাদের আর কোনও আড়াল নেই। উই হ্যাভ নাথিং টু এক্সপ্লোর।.... সো, সো হি হ্যাজ লস্ট অল হিজ ইন্টারেস্ট। আমি, আমিও ওকে আর ভালবাসতে পারব না। র‍্যাদার, নাও আই হেট হিম। হ্যাঁ, ঘৃণা করি। ভাবলেই ঘেন্না করে আমার!' দয়িতা হাঁফাচ্ছিল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, চা খাও। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।' অচিন প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইল।

'অচিন, আই ফিল ইউ! তুমি কখনও আমাকে কিছু বলোনি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি। ...... আই ওয়াজ হেল্পলেস। আমি তো মনীষকে কখনও ঠকাতে চাইনি। কিন্তু তোমাব কথা ভেবে কষ্ট হত আমার!' শূন্য-চোখে তাকাল দয়িতা।

'পিটি?' ঠাট্টার গলায়ই বলল অচিন।

'তোমার পক্ষে এরকম ভাবা অস্বাভাবিক নয়। তুমি ভাবতেই পার। কিন্তু, তোমার সঙ্গে কদিন দেখা না-হলে আমারও যে আজকাল একটু একা লাগে, ফাঁকা লাগে। এটুকু অন্তত বিশ্বাস কোরো।' দয়িতা চুপ করল।

'অভ্যাস। মানুষ ক্রমশ অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে।' অচিন চায়ের কাপে চুমুক দিল।

অচিন হাসল। তার মনে হল, এই এক কল্পিত আড়াল দয়িতার। বহুদিন ধরেই এই আড়ালটিকে লালন করে সে। দয়িতাকে সে কখনও স্পষ্ট করে বলেনি যে এটা তোমার একধরনের বিভ্রম। নারী-পুরুষের অশরীরী বন্ধুত্ব আসলে একটা অলীক, অবাস্তব ধারণা, বাজে। অচিনের আগে মনে হত, দয়িতা দাম্পত্যের বাইরে তার কাছে পেতে চাইত একধরনের অতিরিক্ত মূল্য, গুরুত্ব — দাম্পত্যকে আরও ঘনীভূত রাখতে অচিনকে দরকার হত তার। অচিনের আলাদা কোনও গুরুত্ব ছিল না দয়িতার কাছে, থাকার কথা নয়। দয়িতা খুবই সাবধানী, হিসেবি। অচিনের সঙ্গে কোন রাস্তায় কতটা যাবে, কটা পা ফেলবে, সবই যেন আগে থেকে হিসেব করা থাকে দয়িতার। সবটাই নির্ভর করে দয়িতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের উপর। অচিনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনও গুরুত্বই নেই তার কাছে। অচিনের টান, মুগ্ধতা, সমর্পণ সবই সে উপভোগ করত কোনও প্রতিদান ছাড়া। তখন মনীষ ছিল অনিবার্য, অমোঘ, সামাজিক, নিজস্ব। অচিন দয়িতাকে নিছক বাইরের ছায়া দিত।

কখনও এভাবে ভাবলেও অচিন এড়াতে পারেনি দয়িতাকে, সরে আসতে পারেনি। দয়িতা নেই, এই ভাবনায় এক নিরর্থক শূন্যতা টের পেয়েছে অচিন। মাঝে মাঝে হঠাৎ কখনও কয়েকদিন দয়িতার সঙ্গে দেখা না হলে সেই শূন্যতার তাৎপর্য অবিকল টের পেয়েছে অচিন। মেঘ জমে উঠেছে তার চারপাশে। সেই শূন্যতার কথা অচিন কখনও বলেনি দয়িতাকে। দয়িতাও বোঝেনি, বোঝার অবকাশও ছিল না তার। প্রয়োজনও ছিল কি!

কত অনায়াসে একটা-দুটো সই করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মনীষ আর দয়িতা। খুবই সহজে, সহমতে দ্রুত নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল দুজনের সম্পর্কের।

শেষ দিন কোর্ট থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল দয়িতা। অচিন তার পিঠের উপর হাত রেখেছিল। সেই ছিল তার প্রথম স্পর্শ, দয়িতাকে। সেই স্পর্শে আরও ভেঙে পড়েছিল দয়িতা।

ফোনটা রেখে থম মেরে বসেই ছিল অচিন। কী করবে সে এখন! কবেকার সেই অর্থহীন স্বপ্নের কথা আজ হঠাৎ এভাবে মনে পড়ছে কেন। কেন স্মৃতি এসে আচ্ছন্ন করছে তাকে!

দয়িতা কি খুব ভেবেচিন্তে বলল কথাগুলি! অচিন কখনও এত স্পষ্ট করে চায়নি দয়িতাকে। আসলে, সে কখনও নিছক শরীর চায়নি দয়িতার। নিছক শরীরের নিস্বাদ, গ্লানি সে জানে। পাওয়ার কথা যদি মনে হয়, তা খুবই অবচেতনে। নাকি, অচিন নিজেও ভণ্ড আত্ম প্রবঞ্চনায় ভোগে! নিজস্ব অন্ধকার আড়াল করে রাখে নিরর্থক মোড়কে! নাহলে ওরকম জটিল, অদ্ভুত স্বপ্ন দেখবে কেন সে! স্বপ্ন, না দুঃস্বপ্ন!

দয়িতার জন্য নিজের ভিতরে যে এক গভীর শূন্যতার বোধ, বিষাদ, হাহাকার টের পায় অচিন, তা কেবল শরীর দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অচিন অনেকভাবে ভেবে দেখেছে। মেয়েদের শরীর তার অজানা নয়। হয়তো তার তারতম্য আছে, আলাদা-আলাদা হাতছানি আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো সবই একরকম, একঘেয়ে। দয়িতাকে কখনও সেভাবে ভাবেনি অচিন।

একদিন বিকেলে পরিচিত রেস্তোরাঁর পরদাঘেরা কেবিনে বসে জল খেতে-খেতে দয়িতা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী খাবে! আজ আমি খাওয়াব। ফেলোশিপের চেক পেয়েছি।'

অচিন চোখ ছোট করে দয়িতার অসামান্য চোখদুটির দিকে তাকিয়ে ঠাট্টার গলায়ই বলেছিল, 'খাওয়াবে? যা খেতে চাইব? আমার তো এখন শুধু লিপস্টিক খেতে ইচ্ছে করছে।' বলে তরুণ বালকের মতো হেসেছিল।

দয়িতা হাসেনি। অনেকক্ষণ পরে, যেন স্বপ্নের ভিতর কথা বলছে, এমন গলায় বলেছিল, 'শরীরে কী হয় অচিন! শরীরের অনুপুঙ্খ জানা হয়ে গেলেই তার সব তাৎপর্য মিথ্যে হয়ে যায়। পুরনো, পরিত্যক্ত হয়ে যায় একটা গোটা মানুষ। মনীষও তো একদিন আমাকে অপরিহার্য ভেবেছিল! অথচ, কত দ্রুত ওর কাছে মূল্যহীন হয়ে গেল এই শরীরটাই!'

নতুন করে সিগারেট ধরাতেই বিদ্যুচ্চমকের মতো অচিনের চকিতে মনে হল, মনীষের অবহেলা, অপ্রেম এখনও ভোলেনি দয়িতা। মনীষকেই সে এখনও আঁকড়ে আছে প্রেমে-অপ্রেমে, ঘৃণায়-আসক্তিতে। যেন, অচিনকেও পেতে চাইছে মনীষেরই বিকল্পে। আলাদাভাবে অচিনের কোনও মূল্য নেই তার কাছে। হয়ত অচিনের প্রতি করুণায় সে তার মূল্যহীন শরীরটাই অকাতরে বিলিয়ে দিতে চাইছে তাকে! মনীষের প্রতি আক্রোশেই চাইছে অচিনকে ব্যবহার করতে। মনে-মনে মনীষকেই বোঝাতে চাইছে, দ্যাখো, আমি এখনও কত মূল্যবান!

মাথার ভিতর এলোমেলো ভাবনা জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছিল না অচিন। মেঘ জমে উঠছিল মাথার ভিতর।

৪

ফোনটা নামিয়ে রেখে দয়িতা টের পেল, এক অসম্ভব ভাললাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে তার ভিতরটা। না, সে কোনও ভুল করেনি। একটাই জীবন তার, সে আর নতুন করে ভুল করতে পারে না। অচিন যে তাকে পাগলের মতো ভালবাসে, দয়িতা তা টের পায়। কখনও স্পষ্ট করে বলেনি অচিন। কিন্তু দয়িতা টের পায়, সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে টের পায়, অচিনের সেই গভীর টান। ডুবন্ত মানুষের মতো গভীর জলের ভিতর অচিন যেন প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চায় তাকে। সে এতদিন বুঝেও না-বোঝার ভান করেছে। একটা আড়াল তৈরি করে নিয়েছে নিজের মতো করে। সেই আড়াল সযত্নে রক্ষা করেছে দয়িতা। আড়াল দিয়ে অচিনকে একরকম চেষ্টাকৃত প্রত্যাখ্যানই করেছে সে।

কখনও অচিন এমন তীব্রতায় তার দিকে তাকায় যে ভিতরে-ভিতরে কেঁপে ওঠে দয়িতা। তার মনে হয়, অচিন যেন তার সর্বস্ব দেখে নিচ্ছে ওই সাংঘাতিক চোখদুটো দিয়ে। দয়িতা তখন অভ্যাসবশত কাঁধের কাছে ব্লাউজটা অহেতুক সামান্য টেনে দেয়। আঁচলটা তুলে আনতে চায় আরও-বেশি বুকের কাছে। অচিনের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই, সে কেমন বিমূঢ়, জলমগ্ন মানুষের চোখে অপলক তাকিয়ে থাকে তার দিকে। আর, দয়িতা, তার মুখের উপর, টেবিলের উল্টোদিক থেকে, অচিনের মুগ্ধ-বিহ্বল চোখের, নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করে। অস্বস্তি হয়, ভাল লাগে। মনে হয়, পৃথিবীতে এখনও তার কিছু গুরুত্ব রয়ে গেছে। সে চোখ নামিয়ে নেয়। টেবিলে জলের দাগ কাটে। এক-ধরনের বিপন্নতা, বিষাদ ছেয়ে আসে ভিতরে ভিতরে।

চশমার ভিতরে অচিনের চোখদুটিকে কেমন ভয় করে দয়িতার। ওই অন্তর্ভেদী চোখদুটির সামনে বেশিক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকা যায় না। মনে হয়, শরীর জুড়ে বৃষ্টি নামে তার। মনে

হয়, বালির ভিতর থেকে এক ক্ষীণ জলধারা বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাকে। অসহ্য নীরবতা জমে ওঠে দুজনের মধ্যে।

সেই নীরবতা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারে না দয়িতা। তার বুকের ভিতর কেমন ভার লাগে, দম বন্ধ হয়ে আসে যেন। সেই অবস্থাটা ভেঙে দিতে চেয়ে কৃত্রিম হাসিতে ভেঙে পড়ে সে।

'কী হল, বোবা হয়ে গেলে নাকি!' দয়িতা হাসতে-হাসতে বলে।

'উঁ!' অচিন তখনও বিহ্বল, আচ্ছন্ন।

দয়িতা অচিনের চোখের সামনে হাতটা নাড়ায়। 'এ কী রে বাবা! সেন্স আছে তো!' হাসে সে।

অচিনও হাসে। হাসিতে ছড়িয়ে যায় বিষাদ। সিগারেট ধরায়। কোনও উত্তর দেয় না।

'কী দেখছ বলো তো!' দয়িতা কৌতুকের গলায় বলে।

'তোমাকে!' অচিন দ্বিধাহীন বলে।

'কোনওদিন দ্যাখোনি নাকি!' দয়িতা হাসে।

'আজই প্রথম দেখলাম মনে হচ্ছে!' অচিনের গভীর গলা।

'তাই?'

'কী দেখলে!'

'মনে হল, আগে কোথাও দেখেছি, চেনা-চেনা!'

'সব মেয়েকে দেখলেই তোমাদের এরকম মনে হয়, না?'

'সবাইকে না, কোনও কোনও মেয়েকে দেখলে মনে হয়!'

'সুজাতাকে দেখেও মনে হয়েছিল?'

তরল গলায়ই বলেছিল দয়িতা। কিন্তু, সে দেখল, মুহূর্তে কেমন কালো হয়ে গেল অচিনের মুখটা, নিমেষে সব আলো মুছে গেল। চশমার ভিতরে চোখদুটিতে ফুটে উঠল একধরনের অসহায়তা।

দয়িতা পলকে নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে অচিনের একটা হাত চেপে ধরে বলল, 'সরি, অচিন, আমি কিছু ভেবে বলিনি!'

অচিন হাসল। হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'না, না ঠিক আছে। তুমি বলতেই পার!'

'অচিন, আমার তো তোমাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। আমার খুব খারাপ লাগে।' দয়িতা খুবই নিষ্প্রভভাবে বলে।

'খুব বোকা-বোকা লাগছে কথাগুলো। জীবনটা সিনেমা নয়।'

'তাই! তুমিই বা তা হলে কেন স্বাভাবিক হতে পার না!'

'আমি কি অস্বাভাবিক!'

'নইলে তুমি খামোখা সম্পর্কটা জটিল করে তুলছ কেন? স্বাভাবিক বন্ধুত্বটা মেনে নিতে পারছ না তুমি!'

'জীবনটা কি কোনও ছক! ছক কাটা থাকবে, আর সেই অনুযায়ী এগোবে তুমি!'

'তাই তো করে সবাই!'

'আমি সেভাবে ভাবতে পারি না। জীবনটা কোনও ছক নয়, ইলিউশান নয় আমার কাছে। ছক থাকে, কিন্তু ছক ভাঙতেও হয়। ইন ফ্যাক্ট, সম্পর্ক কোনও সাদা-কালো জিনিস নয়। সেখানে অনেক ধূসর স্তর থাকতে পারে, থাকে।'

'আমি এসব বুঝতে পারি না। সারল্যই ভাল লাগে আমার!'

'তা নয়, তুমি বুঝতে চাও না!'

'আমার ভীষণ ভয় করে, খারাপ লাগে।'

'আমি কখনও তোমাকে কোনও জোর করিনি।'

'সে-জন্যই তো খারাপ লাগে, তুমি কষ্ট পাও।'

'তুমি সুজাতার কথা বললে, ওর জন্য আমার কিন্তু আর কোনও কষ্ট নেই।'

'ছিল তো?'

'কে জানে, মনে পড়ে না। সুজাতার মুখটাও ভাল কবে মনে নেই।'

'ছিঃ, অচিন! একটা সম্পর্ক ছিল, নেই — ঠিক আছে। শেষ পর্যন্ত তাতে তিক্ততাও থাকতে পারে, কিন্তু গোটা সম্পর্কটা তাতে মিথ্যে হয়ে যায় না।'

'তিক্ততাও নেই, বিশ্বাস করো, কেবল বিস্মৃতি আছে। সে-জন্যই মনে হয়, সুজাতার কাছে যেমন, আমার কাছেও তেমনই সম্পর্কটা ছিল একটা খেলা — কিছুটা শরীর, কিছুটা সময়-কাটানো, লোভ, বাসনা, এইসব। তার চেয়ে বেশি-কিছু নয়!'

'মানুষ কতবার ভালবাসতে পারে, এত ভালবাসা থাকে?'

'ঠিক জানি না। আমার কেমন মনে হয় জানো, সকালে ঘুম ভেঙে প্রথম যার মুখ মনে পড়ে, রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগেও মনে পড়ে যার মুখ, মানুষ তাকেই ভালবাসে। যখন আব সেভাবে মনে পড়ে না, তখন ভালবাসাও দূরে চলে যায়। বা, ভালবাসা দূরে চলে যায বলেই আর মনে পড়ে না সেই মুখ!'

'তেমন মনে পড়ে তোমার?'

'পড়ে।'

চোখ নামিয়ে নিল দয়িতা। তার অস্বস্তি হচ্ছিল। হঠাৎই কেমন ঘাম হচ্ছিল গলায়, বুকে। ভারী হয়ে আসছিল পোশাকের ভিতর ঊরুদুটি।

অচিন ফের সিগারেট ধরাল। তার আগুন জ্বালাবার শব্দ টের পেল দয়িতা।

'আমার কখনও কী মনে হয়, জানো, ভালবাসাটাসা আসলে একটা কনসেপ্ট! মানুষ সেই কনসেপ্টটাই ভালবাসে। আমিও তো ভাবতাম, মনীষকে ভালবাসি। মনীষও বাসে, বিশ্বাস করতাম! কিন্তু কী হল শেষ পর্যন্ত!'

'তুমি স্থায়িত্বের কথা ভাবছ!'

'ভাবব না!'

'পৃথিবীতে কী আর স্থায়ী!'

'বোধহয় একটা সময় আসে, যখন ভালবাসা আর তত-জরুরি থাকে না। ভালবাসা ছাড়াই দিব্যি দিন চলে যায়।'

'তখনই মানুষ বুড়ো হতে থাকে!'

'বুড়িই তো হয়ে গেলাম!'

অচিন আবার তাকাল সেই গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে। আবারও কেঁপে উঠল দয়িতার বুক। কেমন শিরশির করে উঠল ভিতরটা। তার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল, অচিন তাকে ভীষণ, ভীষণ আদর করুক। তাকে দুমুড়ে-মুচড়ে একাকার করে দিক। সেদিন অচিনের সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে খুবই অসহায় লেগেছিল দয়িতার নিজেকে। যেন, দ্বিধা কেটে যাচ্ছিল।

তারও আগে, যখন মনীষের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাঙেনি, তখন সে একরকম দোলাচলতায় ভুগত। অচিনের চোখে বন্ধুত্বের অতিরিক্ত মুগ্ধতা দেখেও না-দেখার ভান করত দয়িতা।

ভাল লাগত, যুগপৎ মনে হত, সে কি মনীষের বিশ্বাস ভাঙছে না, তাকে ঠকাচ্ছে না! অচিনের টান উপেক্ষা করতে পারত না, ভুলতে পারত না মনীষের কথাও। মনে হত, সরে যাওয়াই ভাল। অচিনের জন্য অতটা ঝুঁকি সে নিতে পারে না, অতখানি আত্মবিস্মৃতও হতে পারে না সে! চেষ্টাও করেছে দয়িতা। দিনের-পর-দিন অচিনের সঙ্গে দেখা করেনি, ফোন করেনি অচিনকে। অচিন ফোন করলে এড়িয়ে গেছে। অথচ, শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি নিজেকে। হঠাৎ একদিন, আবার, গ্রীষ্মের পিপাসার মতো, অচিনের সঙ্গে দেখা করার জন্য তীব্র আকুতি বোধ করেছে। অচিনকে ফোন করে বলেছে, 'আজ একটু কলেজ স্ট্রিটে যেতে পারবে -- কটা বই কিনতাম!' ওইটুকু আড়াল রাখতেই হয়েছে। নিজেকে বুঝিয়েছে, একেবারে নিজের জন্য একটা বিকেল, একটা সন্ধ্যা সে কেন পাবে না! কেন নিজেকে অনুভব করবে না অন্যভাবে! তাতে মনীষের কী ক্ষতি!

কী হল তাতে। সে-ই তো মনীষ একটু-একটু করে দূরে চলে গেল! মাত্র তিন বছরেই সে পুরনো, পরিত্যক্ত হয়ে গেল মনীষের কাছে!

দয়িতা রাগারাগি করেনি, চেঁচামেচি করেনি। নীরবে একদিন বিকেলে আর ফেরেনি মনীষের ফ্ল্যাটে। সেদিন বিকেলে একবার মনে হয়েছিল, অচিনকে ফোন করে বলে তার সিদ্ধান্তের কথা। জানায়নি। তার মনে হয়েছিল, অচিন আপত্তি করবে, তাকে অন্যরকম বোঝাবে! নিজেকে দায়ী ভাববে ওই পরিণতির জন্য। দয়িতা তা হলে দুর্বল হয়ে পড়বে।

সেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে বাসস্টপে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত লেগেছিল তার। সে আজ পাইকপাড়ায় ফিরবে না। মার কাছে যাবে। মাকে দুপুরে ফোন করে জানিয়েছিল দয়িতা। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সে দেখেছিল, কলেজের ছাদে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হতে পারে, ঝড় উঠতে পারে! সেই কালো, নিস্পৃহ মেঘের দিকে তাকিয়ে একধরনের আবেগের বশীভূত হচ্ছিল দয়িতা।

জয়িতা মুম্বাই থেকে কলকাতায় এলে বা মনীষ ট্যুরে গেলে সে ল্যান্সডাউনে গিয়ে থেকেছে। অথচ আজকের যাওয়া কত অন্যরকম! ওই দোতলার দুই ঘরের ফ্ল্যাটটির সঙ্গে তার সব সম্পর্ক আজ থেকে শেষ হয়ে গেল। এত সহজে শেষ হয়ে যায় একটা নির্মাণ, সম্পর্ক! ওই দেওয়ালগুলি কি তার কথা ভাববে, বইগুলি খুঁজবে তাকে, টবের মাটি তৃষ্ণার্ত হবে তার হাতের জলের জন্য! ওই সবুজরঙের টেলিফোনটা কদিন পরে আর বাজবে না তাকে ডেকে! ডাকপিওন এসে ওই ঠিকানায় আর পৌঁছে দেবে না তার কোনও চিঠি!

আর মনীষ! আজও কি অনেক রাতে বাড়ি ফিরবে সে! অন্ধকার ঘরে ঢুকে দয়িতার অনুপস্থিতি তাকে খানিকটা অবাক করবে নিশ্চয়ই। সচরাচর এরকম করে না দয়িতা। না-ফিরলে অফিসে ফোন করে মনীষকে জানিয়ে দেয়। দয়িতা মনে-মনে দৃশ্যটা ভাবতে চেষ্টা করল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অভ্যাসমতো বেল বাজিয়ে অপেক্ষা করে-করে শেষ পর্যন্ত ব্রিফ কেস থেকে চাবি বের করে ল্যাচ খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাতেই শূন্য, দয়িতা-হীন ঘরগুলি, আসবাবপত্র, বইয়ের সারি তার মুখের উপর হেসে উঠবে কি হো-হো হাসি!

গলার টাইটা খুলে বিছানায় ছুড়ে দিয়ে সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে হঠাৎই দেখবে সেন্টার টেবিলের উপর ভাঁজ-করা কাগজে পরিচিত হাতের লেখায় লেখা একটিই সরল বাক্য : 'আমি আর ফিরব না!' পড়ে কি স্তম্ভিত হবে মনীষ। নাকি শূন্য ঘরে খুবই ক্ষীণ, স্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠবে তার ঠোঁটে। কাগজটা দলা পাকিয়ে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিয়ে অস্ফুটে বলবে, হিসহিস স্বরে, 'শিট' — যেমন প্রায়ই বলে সে!

রাতে পারমিতা পাশের ঘরে শুতে চলে গেলে, অচিনকে ফোন করবার কথা একবার ভেবেছিল দয়িতা। ইচ্ছে হয়েছিল বলে, 'অচিন, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে তো। আমার আর-কোনও বাধা নেই। আমার খুব সমুদ্র দেখতে ইচ্ছে করছে। নিয়ে যাবে আমাকে।'

এইসব অবান্তর ভাবনার মধ্যে টেলিফোনের সামনে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। খুব ক্ষীণভাবে সে একবার ভেবেছিল, আশা করেছিল, মনীষ তাকে ফোন করবে। যদি ফোন করে, তাহলে কী বলবে তাকে, মনে-মনে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু মনীষ ফোন করেনি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিল দয়িতা। অচিনকেও ফোন করেনি। এলোমেলো ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়েছিল।

যেদিন বিকেলে পাকাপাকিভাবে বন্ধন ছিন্ন হল, আলাদা হয়ে গেল সে আর মনীষ, সেদিন দয়িতা নিজের মধ্যে একধরনের শূন্যতা, বিষাদ টের পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু পাশাপাশি সেই বিকেলটাকে খুব নতুন, আলাদাও মনে হয়েছিল তার। কোর্ট থেকে অচিনের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে নিজেকে খুব নির্ভার মনে হয়েছিল। পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে অচিন একবার আলতো করে ধরেছিল তার হাত। অল্প চাপ দিয়েছিল। এক মুহূর্ত, কিন্তু দয়িতার মনে হয়েছিল, অত সংক্ষেপেই সে যেন নিজের কথা বলে নিল। সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে সেই স্পর্শ যেন শুষে নিতে চাইছিল দয়িতা।

ট্যাক্সিতে বসে অচিন আলগাভাবে দয়িতার উরুর উপর তর্জনীর প্রান্ত দিয়ে মৃদু আঁকিবুকি কাটছিল। দয়িতা তাকাল অচিনের দিকে।

'টুটুল, তোমাকে ভীষণ আদর করতে ইচ্ছে করছে!' অচিনের চোখে কেমন ঘোর, আচ্ছন্নতা।

চুপ করে রইল দয়িতা। তারপর খুব স্তিমিত স্বরে বলল, 'আজ নয়, অচিন, এখন নয়, এভাবে নয়! তুমি আমাকে একটু সময় দাও!'

দয়িতা কখনও ভেবেছে, মনীষের সঙ্গে তার সম্পর্কের সব তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল, মনীষ চন্দ্রিকার সঙ্গে ওইভাবে জড়িয়ে পড়েছিল বলেই কি সে সরে এল মনীষের কাছ থেকে! ওরকম তো কত হয়! ভালবাসা ছাড়া, এমনকী একজন আরেকজনকে আঁচড়ে-কামড়েও, কত মানুষ দিব্যি জীবন কাটিয়ে দেয়। তাহলে দয়িতা কি সম্পর্কের চেয়ে আত্মসম্মানকেই বড় করে দেখেছিল! মনীষেরও আর-কোনও ভূমিকা ছিল না তার কাছে! না কি দয়িতা আসলে চেয়েছিল নতুন করে অচিনের দিকেই এগোতে! ভিতরে ভিতরে অন্য সম্পর্কের টান ছিল তারও! ভোলাপচুয়াসনেস ছিল!

আজকাল খুবই ক্লান্ত লাগে দয়িতার। হঠাৎ-হঠাৎ মাথার ভিতর কেমন দপদপ করে। মনে হয়, মস্তিষ্কের সমস্ত ধমনী ছিঁড়ে রক্ত বেরুবে। কাল অচিন জোর করেই ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল। তার জন্য অচিনের এই উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় মনে মনে বিব্রত হয় দয়িতা, আবার একধরনের ভাললাগায় ভরে যায় ভিতরটা। মনে হয়, মনীষের অবহেলাই শেষ কথা নয় -- কারও কাছে তার এখনও এত গুরুত্ব রয়ে গেছে!

আবার কখনও সংশয় এসে ছুঁয়ে যায় তাকে। মনীষের কাছেও তার একদিন কম মূল্য ছিল না! আস্তে-আস্তে জুড়িয়ে গেছে সম্পর্কের উষ্ণতা, তারা ক্রমশ একটা অভ্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তীব্র হয়েছে অসম্পর্ক।

এখনও অচিন তার শরীর জানে না। সে জন্যই দয়িতার এই পুরনো, ব্যবহৃত, পরিত্যক্ত শরীরটা খুব নতুন, ঝকঝকে, কাম্য মনে হয় তার। শরীরের রঙিন, কল্পিত খোলসটা সরে গেলে সে-ও তো আর পাঁচটা মেয়েরই মতো, সাধারণ, গতানুগতিক। তা হলে শেষ পর্যন্ত দয়িতা অচিনের কাছেও পুরনো হয়ে যাবে, সম্পর্ক জুড়িয়ে যাবে তাদেরও।

তবে কি সহজ লোকের মতো সুখী ও স্বাভাবিক হতে পারবে না সে কখনও! অচিন বলে, যারা নিজেদের নিয়ে ভাবে না, তারাই সুখী হয়। সুখী হওয়া কোনও কাজের কথা নয়। সুখকে সন্দেহ করা উচিত। বস্তুত, সহকর্মী বা আত্মীয়-বন্ধুদের মতো সুখী হতে দয়িতার কি তত-আকুতিও আছে! দয়িতা দেখেছে, পরিচিত সমস্ত সুখী মুখগুলিই কীরকম গোল-গোল, একঘেয়ে, তৈলাক্ত। যতই বিদুষী, আলোকিতা হোক, একটা নতুন শাড়ি বা নতুন গয়নায় তারা কীরকম তৃপ্তিতে সুখে ও অহঙ্কারে গলে পড়ে আহ্লাদী বিড়ালীর মতো। টিচার্স রুমে বসে সহকর্মীরা যখন একে অন্যের শাড়ি-গয়নার প্রশংসা করে, কে ছেলে-মেয়েকে কোন দামি স্কুলে ভর্তি করল, কে কোথায় কত স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট বুক করেছে—এসব সরবে জাহির করে, তখন নতুন করে সংশয়ের ভিতর ঢুকে যায় দয়িতা। মনে হয়, এ ও তো এক ধরনের সুখ! আরও কতরকমের সুখ আছে পৃথিবীতে! সে-ই কেবল সম্পর্ক নিয়ে ভেবে মরে কেন।

আজ সকালে ঘুম ভেঙেই অচিনের কথা মনে পড়ল দয়িতার। ঘুম-ভাঙা আচ্ছন্নতার মধ্যে হঠাৎই মন ঠিক করে ফেলল সে। অচিনকে সে একদিন বলেছিল, 'আমাকে একটু সময় দাও তুমি!' আজ, ঘুম ভেঙে বারান্দায় এসে, একটি নতুন সকালের দিকে তাকিয়ে, দয়িতার মনে হল, জীবনটা আবার নতুন করে শুরু করবে। অচিন তাকে ভালবাসে। দয়িতা জানে না, অচিনকে সে ভালবাসে কি না। কিন্তু চেষ্টা করবে দয়িতা। একটা দুঃস্বপ্ন আর অপমানের ক্ষত নিয়ে সারা জীবন কাটতে পারে না।

রোদ এসে পড়েছে মেঝেতে। জানলার পরদাগুলি সরিয়ে দিল দয়িতা। ঘরটা আলোয় ভরে গেল। তখনই অচিনকে ফোন করার কথা মনে হয়। পারমিতা স্কুলে চলে গেছেন। তাঁর সকালে স্কুল। বেলায় ফিরবেন। বিকেলে বারাকপুরে যাওয়ার কথা। অনেকদিন আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যান না পারমিতা। দয়িতা বোঝে, তাকে নিয়ে সবাই ফিসফাস করে। পারমিতা সেসব এড়িয়ে থাকতে চান। তবে, মেজমাসি খুব করে বলেছেন, পারমিতাও যাবেন, ঠিক করেছেন। না-গেলে খারাপ দেখায়।

অচিনকে ফোনটা করে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে ছিল দয়িতা। সে টের পেল একধরনের লজ্জা, ব্রীড়ায় তার কান গরম হয়ে উঠছে। বহুকাল পর শরীরে তীব্র জলোচ্ছ্বাস টের পেল দয়িতা। যেন, সমুদ্র কাঁপিয়ে উঁচু পাহাড়চূড়ার মতো ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তপ্ত বালিয়াড়িতে। কিংবা, কোনও স্তব্ধ, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি ফুলে উঠছে অন্তর্গত লাভা ও আগুনের চাপে। রুক্ষ প্রান্তর বিদীর্ণ করে এগিয়ে আসছে ঝোড়ো বৃষ্টি। দয়িতার সমস্ত রোমকূপ যেন উন্মুখ হয়ে উঠছে কোনও প্রিয় স্পর্শের জন্য!

সারা সকাল শুয়ে-বসে আলস্যে কাটাল দয়িতা! কলেজে যাবে না, জানিয়ে দিল ফোন করে। তারপর অনেক বেলায় ঢুকল স্নান করতে। শাওয়ারের নিচে নিজের সমূহ নগ্নতাকে মেলে দিয়ে চোখ বুজে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সে। অসংখ্য জলবিন্দু তার চিক্কণ ত্বকের উপর বৃষ্টির মতো উচ্ছ্বসিত নাচানাচি করছে। অবিরল জলের ছোঁয়ায় যেন দৃঢ় হয়ে উঠল তার বৃন্তদুটি। একটু একটু শীত করছিল। তবু অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল দয়িতা। সিক্ত স্তনের উপর তর্জনী বুলিয়ে যেন নিজেকেই অনুভব করতে চাইছিল সে। তার মনে হল, কোনও আকুল স্পর্শের জন্য যেন অধীর হয়ে উঠেছে দুটি বালিকা, একেবারে অনসূয়া-প্রিয়ংবদার মতো। চোখ বুজে ফেলল দয়িতা। সে টের পেল, এক চরম সমর্পণের জন্য, এক অনিঃশেষ গ্রহণের জন্য বহুকাল পর আর্ত হয়ে উঠেছে তার সর্বস্ব।

দুপুরে একটা গল্পের বই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল দয়িতা। ঘুম ভাঙতেই কেমন বিহ্বল লাগল তার। অন্ধকার নিবিড় হয়ে এসেছে চারদিকে। হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে জানলার

বাইরে তাকাতেই দেখল, চারদিকে আলো জ্বলে উঠেছে। সন্ধে হয়ে গেল! অচিন এসে কি ফিরে গেল! এত ঘুম ঘুমিয়েছিল সে, ডোরবেল বাজলেও শুনল না, ঘুম ভাঙল না!

দয়িতা বাথরুম থেকে চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল। শ্যাম্পু করেছিল। চুলগুলি মেঘের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। একটু চিরুনি বোলাল। ম্যাক্সিটা ছেড়ে শাড়ি পরবে ভাবল, ইচ্ছে করল না। শীতের অবেলায় ঘুম ভেঙে উঠে গর্ভিণীর মতো আলস্য, অনিচ্ছা যেন তার সারা শরীরে ভর করে আছে। মুখে, গলায়, হাতে ক্রিম ঘষল। সোফায় গিয়ে বসল। ঘড়ির দিকে তাকাল। সোয়া-ছটা বাজে। উঠে জানলা বন্ধ করল। হিম আসছে। পরদা টেনে দিল। সারা ঘরে অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে কেবল ঘড়ির টিকটিক শব্দ।

চা করবে নাকি? দয়িতা একবার ভাবল। থাক, অচিন এলেই করবে। টিভি-টা চালাল। ভাল লাগল না। বন্ধ করে দিল।

অচিন এলে, ফিরে যাবে, তা হয় না। দরজা খুলে বেলটা বাজিয়ে দেখল দয়িতা, না, ঠিকই আছে! লোডশেডিং হয়নি তো বিকেলে! চলে গেলে ঠিক ফোন করত অচিন। ফোনের শব্দেও ঘুম ভাঙবে না, তা হয় নাকি!

তা হলে অচিন কি আসবে না! কোথাও আটকে পড়ল হঠাৎ! নাকি ইচ্ছাকৃতই এল না। দয়িতা আজ সকাল থেকে অধীর হয়েছিল অচিনের জন্য। অচিন আসবে না!

হঠাৎই দয়িতার মনে পড়ল, একদিন সে অচিনকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'অ্যাম আই এ হোর!' কোনও স্পষ্ট উত্তর দেয়নি অচিন। তা হলে, তা হলে, তাকে কি আসলে তেমনই মনে করে সে! ছি, ছি, এতটা নির্লজ্জ সে হল কী করে! বিছানায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দয়িতা।

ঘুমের ভিতর একটানা টেলিফোন বেজে যাচ্ছে, শুনল দয়িতা। কখন ঘুমোল সে! চোখ না-খুলেই সে অন্ধকারে ওই অবিরাম ধাতব ধ্বনি অনুভব করছিল।

সত্যিই বাজছে কি টেলিফোনটা! নাকি, স্বপ্নের ভিতর ভেসে আসছে কোনও অলীক টেলিফোন! কাকে ডাকছে! দয়িতাকে! কেন! কে তাকে ফোন করবে!

বাজছে, বেজে যাচ্ছে, সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ছে সেই ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, তরঙ্গ। দয়িতা চোখ খুলল। বেড সুইচ টিপে নীল আলোটা জ্বেলে দিল। সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল হালকা, মায়াবী আলো। টেলিফোনটা বাজছে, বেজে যাচ্ছে। দয়িতা টের পেল, তার স্নায়ুর ভিতর ছড়িয়ে পড়ছে সেই অবিরল শব্দতরঙ্গ। প্রতিটি ঘুমন্ত রোমকূপ যেন জেগে উঠছে সেই শব্দে।

বাজুক, বাজুক, বেজে যাক।

চোখ বন্ধ করে ফেলল দয়িতা।

শিকার

প্রবীর ঘোষ

চৈত্রের শেষ প্রায়। দিন চারেক পরই বাসন্তী পুজো। ট্যাটরা গ্রামের এই পুজো খুব জাঁকজমকপূর্ণ। গ্রামের মানুষ দিন গোনে কবে বাসন্তী পুজো আসবে......। বাড়ীতে আত্মীয়স্বজনের যাতায়াত শুরু হয়ে যায় পুজোর দু একদিন আগেই। দুর্গাপুজোর মতোই আনন্দ এখানে। বাসন্তী পুজোতো দুর্গাপুজোই। আর এই ট্যাটরা গ্রামে শরতের দুর্গাপুজো হয় না। ফলে সারা বছরেব আনন্দ উৎসাহের বন্যা বয়ে যায় এই বাসন্তী পুজোয়। যার যেমন সচ্ছলতা তার তেমনভাবে।

গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করেন পদ্মাক্ষীচবণ পণ্ডা। বছর ছ-সাত আগে ময়না গ্রামের একটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন। বতমানে পদ্মাক্ষীর দুটো ছেলে-মেয়ে। ছেলে অতনুর বয়স পাঁচ, আর মেয়ে অনিতার প্রায় আড়াই বছর। দুটি পুকুরসহ বিঘে চারেক জমি নিয়ে ভিটে বাড়ী। পদ্মাক্ষী মা বাবা ভাই বোনেদেব নিয়ে একই সঙ্গে থাকেন।

মেদিনীপুবের 'উড়ে ব্রাহ্মণ' পদ্মাক্ষী মাস্টারকে গ্রামের সকলেই চেনেন। পুজো-আর্চ্চা করার জন্যে তার ডাক পড়ে। সেই সুবাদে পরিচয-পবিচিতির গণ্ডীটা আরো বেড়ে যায়। আশে পাশের গ্রামেও তিনি পুজো করতে যান। কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো, সবস্বতীপুজো, বাসন্তীপুজো .... সব পুজোই তিনি করে থাকেন। মাস্টার লোক ভালো, তবে বড্ড বেশী লোভী। জিনিস পত্রের লোভ সামলাতে পারেন না। লোভী হিসেবে মাস্টারের, গ্রামে খুব সুনাম বা দুর্নাম আছে। সেই 'খ্যাতির কথা' গ্রামের বাইরেও কেউ কেউ জেনেছে। শিক্ষকতা, পুজো আর্চ্চা তো পদ্মাক্ষীর পেশা — আর নেশা হলো মাছ মাবা বা ধরা। সময় সুযোগ পেলেই সে কাজ করে থাকেন। এমনকি দূরে মফঃস্বল শহরে রবিবারে টিকিট কেটেও মাছ ধরতে যান কখনো সখনো।

পাঁচিল দেওয়া মাটির বাড়ী। ছিমছাম, বেশ পবিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাঁচিলের খিড়কী-দরজা পেরিয়ে আট দশ গজ দূরেই আছে একটি পুকুর। আবার বাড়ী ঢুকতে সামনের দিকেও একটি পুকুর। তবে খিড়কীর দিককার পুকুরটায় আছে পুরনো বড়ো-সড়ো মাছ। ঐ পুকুরটাতে বাড়ীর মেয়ে বৌরা থালাবাসন মাজার কাজটাই বেশী করে থাকে। পুকুরের একধারে উঁচু গড়ানো পাড়। সেখানেই আছে অতনুর প্রিয় আমের কলমের গাছ। তাতে বড়ো বড়ো কাঁচা আম ছেয়ে আছে। অতনু লুকিয়ে-চুরিয়ে সুযোগ পেলেই ঐ গাছের আম পাড়তে যায়। আম গাছটির পেছনে রয়েছে বাঁশঝাড়।

পরশু মঙ্গলবার। বাসন্তী পুজো শুরু হচ্ছে। পুজোর আনন্দ বাচ্চাদের মধ্যেই বেশী। অনিতা অতনুরা ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। অতনু তো বেশ দুরন্ত। বাড়ী থেকে গজ চল্লিশেক দূরেই পুজোর দালান। সেখানে প্রতিমার গায়ে খড়িমাটির পর রঙ দেওয়া শুরু হয়েছে। ছোটদের আনন্দ আর ধরে না। একবার বাড়ী, একবার পুজোমণ্ডপে, কখনো আম জামতলায় — এইভাবে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে সারাটি দিন। তাদের কড়াভাবে কেউ বাধা দেয় না এসময়। আর বারণ করলে শুনবেই বা কে। পদ্মাক্ষী যদিও বা ছেলেমেয়েদের একটু শাসন

করতে যান, ওঁর বাবা বাধা দিয়ে বলেন ঃ 'আরে পুজোর কটা দিন একটু ছুটাছুটি করতিছে, করুক না। অনকে (ওদের) বকাবকি করস নি।' অনিতা ও অতনু জেনে গিয়েছে, দাদু বাবাকে বারণ করলে, বাবা আর তেমন কিছু বলবে না।

আজ রবিবার। পদ্মাক্ষীর স্কুল নেই। গরুর বিচালি ফুরিয়ে যাচ্ছে। তাই পাশের গ্রামে সেই সন্ধানে চলে যাওয়া। দুপুর বারোটার পরে বাড়ী ফিরে দেখেন অনিতা আর অতনুকে ভাত খাওয়াচ্ছে ওদের মা। কিছুক্ষণ আগে অনিতার পেট ব্যথা করছিল। গা-টাও একটু গরম আছে। পদ্মাক্ষীর স্ত্রী মিঠু খুব মেজাজ নিয়ে মেয়েকে বলছেন ঃ 'খাবার পর শুইয়া পড়বি। খবরদার সন্ধ্যার আগে পূজার কাছে যাসনি। ব্যারাম হলে তো মোকেই (আমাকেই) দ্যাখতে হবে।' মাতৃভক্ত মেয়ে মার কথায় কোনো প্রতিবাদ করেনি। কিন্তু অতনু সঙ্গে সঙ্গে বলেছে ঃ 'দিদি না গ্যালেও মুই কিন্তু যাব।' ছেলের কথায় মিঠু একটু হেসেছেন। আর দেখলেন বারান্দার ও প্রান্তে বসে জাল বুনছেন তাঁর শ্বশুর। মিঠুর দাদা রজনীকান্ত আগামীকাল সকালেই আসবেন বলে সংবাদ পাঠিয়েছেন। সাধারণতঃ পুজোর দু-একদিন আগে ভাগ্নে-ভাগ্নীর নূতন জামা-প্যান্ট নিয়ে তিনি আসেন। পদ্মাক্ষীকে ভাত খাওযাতে-খাওয়াতে মিঠু তাঁর দাদার আসবার সংবাদটা জানালেন। বজনীকান্তর সঙ্গে পদ্মাক্ষীর খুব ভালো সম্পর্ক। দুজন-দুজনকে খুব ভালোবাসেন।

বিকালে চা খাওয়ার শেষে মিঠু খিড়কীপুকুবে বাতের রান্নার চাল ধুতে যান সন্ধের দিকে। পদ্মাক্ষী খিডকীপুকুরের ধার দিয়ে গোয়াল ঘরে যাচ্ছিলেন। বিচালি আর কদিন চলতে পারে দেখতে। মিঠু চাল ধুতে ধুতে স্বামীকে বললেন ঃ 'জান, এইমাত্র পুকুরের অউখানটায় একটা মাছ যেন ঘাউ মারছলো' — কথাটা বলে ঘাট থেকে দূবে পুকুরের এক পাড়ে ঢিল ছুঁড়ে জায়গাটা দেখানোর চেষ্টা করলেন। শুনেইতো পদ্মাক্ষীর মাথায় মাছ মারার নেশা চেপে যায়। বৌয়ের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ গয়নাব মধ্যে বালা, কুটুমেব মধ্যে শালা। কাল সকালে রজনীদা আসবেন, মাছ তো ধরতেই হবে। বলেই পাঁচিলের গায়ে লাগানো মাছমাবা দশ ফলা বড়ো কোঁচটা আনতে চলে গেলেন, গোয়ালঘরের দিকে না গিয়ে।

এদিকে মিঠুর শ্বশুর, বাড়ীর ভিতর থেকে ডাকছেন — বৌমা ও বৌমা .. । ডাক শুনে বাসন রেখে মিঠু বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। 'অনিতার খুব জ্বর আস্যে বল্যা মনে হয়, একটু দ্যাখো ত।'

চৈত্রের শেষ। পুকুরে তিন চার হাতের বেশী জল নেই। পুকুরেব পাশেও বড়ো বাঁশ ঝাড়। পদ্মাক্ষী কোচ নিয়ে ঘাঁই লক্ষ্য করছেন। পাড় ঘেঁসে রয়েছে শালুকের গাছ। সন্ধে উতরে গেছে। বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে পুকুরের জল খুব পরিষ্কারভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ঝাড়ের ছায়া এসে পড়েছে পদ্মাক্ষী যেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন সেখানে। আমগাছটা দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে। কখনো অল্প-অল্প বাতাসে বাঁশের ক্যাচর-ক্যাচব সাঁ-সাঁ শব্দ। অন্ধকারে জলের মধ্যে ঘাঁই-এর দিকে তাঁর অর্জুনের লক্ষ্যভেদ যেন। মাছ মাবা তাঁর মনে আগুন ধরিয়েছে। পরিবেশ সেই নেশায় এনে দিয়েছে মাদকতা। আলো-আঁধারীতে হঠাৎ শালুক পাতা নড়তেই সজোরে দক্ষ হাতের কোঁচ বিদ্ধ কবলেন সেখানে। মাছ গেঁথেছে! মনের আনন্দে কোঁচ টেনে তুললো পুকুর পাড়ে। সত্যিই বেশ বড়ো ওজনদাব মাছ।

পুকুর পাড়ে কোঁচটা রেখে বাড়ির ভিতর গিয়ে পদ্মাক্ষী বৌকে বললেন – 'খুব বড় মাছ গেঁথেছে রে। যা, ঝুড়িতে কর‍্যা লিয়ায় যা'। বৌকে 'তুই' বলায অবাক হলো মিঠু। স্বামীর কণ্ঠস্বরেও। আনন্দে হ্যারিকেন নিয়ে পুকুর পাড়ে চলে যান তিনি। গিয়ে দেখেন — অতনুর শরীর কোঁচে বিদ্ধ হয়ে আছে। ...

পুকুর পাড়ে হৈ-চৈ ইত্যাদির পর পদ্মাক্ষীর খোঁজ করতেই তাকেও পাওয়া গেল নিজের ঘরে। পদ্মাক্ষীর দেহটা তখন মৃত্যুর শেষ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে — আড়ায় ঝোলানো দড়ির মধ্যে।

একটি গাছের জন্ম

অনিতা অগ্নিহোত্রী

অরিন্দম ওর মেয়ের দু'কাঁধে হাত রেখে রেলিঙের কাছে নিয়ে এল। — "পাচ্ছিস? কীসের গন্ধ বল তো?" টুটুন চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস নেয়। ঘাড় দুলিয়ে বলে,

- "হুঁ উ, নীচের আন্টি মাংস রান্না করছেন।"
- "দূর বোকা।" অরিন্দম হাসে। তারপর নিজেও ঘ্রাণ নেয়।

আমের মঞ্জরীর সুবাসে টলমল করছে রোদ। তাতে মিশেছে জ্যোৎস্নার অলীক ঘ্রাণ। অনেক দূরের নক্ষত্রমণ্ডল পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে গাছটার মায়া।

ওয়ারেন হেস্টিংসের চেয়ে অনেকটাই তরুণ, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে একটু বড়। গাছটা অরিন্দমদের বারান্দার ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে তার ঘন ডালপালা নিয়ে। তার ভাবভঙ্গিতে কোনও ভারিক্কি চাল নেই, বরং অরিন্দমকে অনেকটা পছন্দই করে গাছটা। সমবয়সী বন্ধুর মতো।

সোমা বলল, "এখন কোথায় বেরোচ্ছ? একেবারে খেয়ে নাও। রান্না হয়ে গেছে। এত রাতে সাপখোপ থাকবে, দেখো।"

খেতে বসে প্রায় সব ভাত ফেলে উঠল অরিন্দম। মৃত মুরগির পায়ে কি রক্ত জমে আছে? বিস্বাদ কুমড়ো, আ-সমুদ্র ভাত, ডালের শুকনো লঙ্কা গলায় চলে গিয়ে খুব খানিকটা কাশাল অরিন্দমকে।

সোমা, টুটুন, অর্ণব, সবাই কেমন ঝাপসা ঝাপসা, অচেনা। চশমাটা বুধবার দেবে, তার আগে না।

সোমা কত বার বলেছে বাড়িতে একটা ডুপ্লিকেট চশমা রাখতে। আজ যে অমিত, তেজেশ ওভাবে চশমাটা ভেঙে দেবে — স্রেফ হাতে ধরে মটমট করে — ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল অরিন্দম।

হ্যা হ্যা করে হেসে অমিত বলেছিল, 'একটা নতুন করিয়ে নিস, শালা কুঞ্জুস।' তেজেশ ওর ঘাড়টা ধরে আচমকা মাথাটা চেপে ধরেছিল টেবিলের খোলা ড্রয়ারে।

'মধু খাবি, খা...মধু খা।'

মধুর শিশিটা কেউ আগেই সরিয়ে নিয়ে গেছে।

কবিরাজি ওষুধের সঙ্গে মধুর অনুপান লাগে। তাই অফিসেই থাকত শিশিটা। সেটাও ওদের কাছে হাসির ব্যাপার, নিন্দের।

মাথা চেপে ধরায় অরিন্দম আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে কয়েকটা ঘুসি চালিয়েছিল। তাতে অমিতরা খেপে উঠে লাফিয়ে পড়ে ওর উপর। চড়চাপড় পড়তে থাকে অরিন্দমের মাথায়, পিঠে। বিকেলে ইউনিয়ন রুমে ডেকে প্রবীণ সীতানাথদা বলেন, — "কোনও প্রভোকেশনেই এমন আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অরিন্দম, তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।"

ক্ষুধাহীন উপবাসের পর অল্প আলোয় অরিন্দম তার নিজের দেশে বেড়াতে যায়। বাড়ির পিছনে এখনও অনেকটা ফাঁকা জমি। এক সারি বাড়ি — রাস্তার দিকে মুখ করে। ওই জমিতে ছড়িয়ে আছে নতুন পুরনো গাছেরা। পায়ে চলা পথের গোড়াতেই একটা বকুল, তার উত্তর-পশ্চিমে বিরাট শিরীষ হাওয়ায় কেবলই ছোট্ট ছোট্ট পাতা ভাসায়। জাম আছে, মহানিম, একটা মহুল। সারংগীদের বাগান নামক এই জংলা জমির খোঁজ এখনও কেউ যেন পায়নি, মাল্টিস্টোরিড বানানোর যোগাড়যন্ত্র আরম্ভ করেনি সেটাই আশ্চর্য। অথবা, হয়তো ওই পুরো ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন, যা অরিন্দম, একাই দেখে প্রতিদিন।

জোৎস্নার মধ্যে দিয়ে প্রায় সবকটি গাছকে আলাদা করে চেনা যাচ্ছে।

"গাছ আক্রমণ করে না, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে না, অপমান করে না, অন্য গাছ বা প্রাণীকে নিশ্চিহ্ন, নির্মূল করে দেওয়ার জন্য তাদের কোনও উদ্যোগ নেই।

প্রাণিজগৎকে মর্যাদার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে বাঁচতে দেওয়াই যদি সভ্যতার উদ্দেশ্য হয় তবে বৃক্ষসভ্যতাই শ্রেষ্ঠ সভ্যতা।"

কাল দুপুরের পর অরিন্দম যখন অফিসের ক্যান্টিনে টিফিন খাচ্ছিল, তখন এই জায়গাটা চেঁচিয়ে, নাটকীয় ভাবে পড়ছিল একজন। অরিন্দম মাথা তুলে বা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেনি।

ডায়েরিটাও অমিতদের কব্জায় গেছে, ও বুঝতে পারল। এটাও খুঁজে পাচ্ছিল না ক'দিন ধরে।

বিকেলেই চশমা ভাঙার ঘটনাটা ঘটল। আর, ক্ষমা চাওয়ার ঘটনাটাও। শিরীষের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় নিজের চার পাশের বায়ুস্তবে মৃদু স্পন্দন অনুভব করে অরিন্দম। কোমল উত্তাপ পাঠাচ্ছে তাকে শিরীষ, ঝাঁকড়া ডালপালা নিয়ে কাছে আসতে পারছে না, অথচ ওর নিঃশ্বাসের শব্দ খুব কাছে।

গাছ কাউকে কিনতে চায়না, কাউকে ক্রীতদাস বানাতে চায় না, অথচ মানুষ শোষণ করে, অন্য মানুষকে ভৃত্য বানায়।

ছোট গাছ বড় গাছের ভৃত্য নয়। পাতার ফাঁক দিয়ে আসা রোদ ছেঁকে নেয় বড় গাছ, যাতে তার নীচের ছোট গাছ তাপ সইতে পারে। বটের তলায় তুলসী জন্মায়, দেবদারুর নিচে আনারস বাড়তে থাকে রাঙা, রৌদ্রলোভী শরীর নিয়ে।

মধু খেতে ফুলের মধ্যে মুখ গুঁজে দেয় ময়ূরকণ্ঠী মৌটুসি পাখি। মধু খেতে থাকে আর ওড়ে। তার কপালে, ঠোঁটে মাখামাখি হয় রেণু। টাটকা শিমুল তার ঠোঁটের আঘাতে কখনও ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তবু পাখিকে চেপে মেরে ফেলার কথা কখনও ভেবেছে শিমুল গাছ?

সোমা চিকেন আনিয়েছিল আজ, মাসের গোড়ার দিক বলেই। পরিমাণে অল্প, তার মধ্যে থেকেই পায়ের হাড় অরিন্দমের পাতে পড়েছিল। সংসার চালায় বলে এটা তার প্রাপ্য। ততক্ষণে চশমার বিলের হিসেব ঢুকে গেছে তার স্নায়ুতন্ত্রে। চিকেনের পায়ের যোগ্য নয় সে, এটাই মনে হচ্ছিল। অপমানিত, পরাজিত অরিন্দম নিজেই তো একটা মুরগির মতোন, যে মাথা নিচে, পা উপর হয়ে জবাই হতে দোকানে যায়, আর যার রক্তে ক্রমাগত মিশতে থাকে লাঞ্ছনার ভয়।

"বাঘকে শেয়ালে পরিণত করাই হচ্ছে মানুষের শ্রেষ্ঠ ম্যানেজমেন্ট টেকনিক—"

— "ব্যাটা নিজেকে বাঘ ভাবে, দেখুন সীতাদা।" অমিতের হাতে অরিন্দমের ডায়েরি।

— "আঃ", সীতানাথ চারটে গ্রহরত্ন পরা হাত তুলেছিলেন প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়ে, — "আমাকে বলতে দাও। অরিন্দম, তুমি কী মিন করেছ, বলোতো ঠিক করে। গভর্নমেন্টের হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কমেন্ট করতে চাও -- তার জন্য আমরা আছি, সংগঠন....."

ল্যাজে আগুনলাগা শেয়ালের মতোন কত মানুষ যে এই শহরে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, সংগঠন কি তাদের চেনে?

শেয়াল এমন একটা প্রাণী যার কোনও শক্তি নেই, স্বস্তি নেই। কেবলই পালাচ্ছে। বাঘের জ্বালায়, বাঁদরের খ্যাপানোয়, প্যাঁচার চিৎকারে। এই শহরের শেয়াল পালাচ্ছে নানা কারণে। তার ওপর তাদের ল্যাজে আগুন। শেয়ালদের মুখ দেখেই চিনতে পারে অরিন্দম। কেউ হনহন করে দৌড়চ্ছে, মাল ডেলিভারি দিতে দেরি হলে মালিক থাপ্পড় মারবে। কারও পিছনে জিনস আর টাইট টি শার্ট পরা কাবুলিওয়ালা। তিরিশ বছরে কাবুলিওয়ালাদের পোশাকের কী বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। কম্পিউটার স্ক্রিনের সামনে আঠারো ঘণ্টা বসেও আউটপুট না দিতে পারা অন্ধ হয়ে আসা মফস্বলের ছেলে। এরা শেয়াল।

এদেরই অনেকে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি এসে ভাত ফেলে উঠে যায়, কেউ চরম কাপুরুষতায় বউকে মারে, কেউ ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত তোলে। দুর্বলরা দুর্বলতরদের আক্রমণ করে। রক্তের বিষ উগরে দেয়। যেমন মাস দেড়েক আগে অর্ণবকে মারতে চড় তুলেছিল অরিন্দম। তার চোখের মণি অর্ণব। ইংরেজি কমপোজিশনে সামান্য ক'টা ভুল। 'এক্সপ্লয়টেশন' কথাটা চট করে হয়তো মাথায় আসেনি, লিখেছে 'এক্সপ্লয়েটমেন্ট'। কমিটমেন্ট, অ্যাচিভমেন্টের মতোন এক্সপ্লয়েটমেন্ট।

— "হয় ওটা? তোর নিজের গ্রামার? ইডিয়ট?" রাগে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছিল অরিন্দমের।

সোমা এসে ছেলেকে সরিয়ে দিয়েছিল।

-- "তোমাকে পড়াতে হবে না। ঢের হয়েছে। সময় দিতে পারো না, কথায় কথায় এত রাগ কীসের?

সে দিন রাতে চুনখসা দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে গ্লানিতে চোখ ভরে এসেছিল অরিন্দমের। তার কান্না অব্যক্তই থেকে যেত যদি না কিছু পরে শুতে এসে সোমা অরিন্দমের মুখ নিজের বুকে টেনে নিত।

ছোট ছেলেকে শান্ত করার ভঙ্গিতে অরিন্দমের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে সোমা বলেছিল, — "আস্তে আস্তে মিটে যাবে, এ সব দেখো। গণ্ডগোলের মুখে একটু শান্ত থাকতে হয়।"

অরিন্দম এখন তার স্বপ্নের অরণ্যে হেঁটে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত আকাশ থেকে আসা আলোকে সূক্ষ্ম জালে ছেঁকে নিচ্ছে গাছেদের কিন্নর দল। কী ভাবে এ ওর ডালে জড়িয়ে গিয়ে তারা এক বিশাল অনুবৃত্তীয় চাঁদোয়া তৈরি করেছে আকাশের নিচে। নানা গড়ন, গন্ধ ও আকারের পাতাদের আর আলাদা করে চেনা যায় না গেরুয়া চন্দ্রালোকে। নিচেও অজস্র মরা পাতা। পাতা মাড়িয়ে হাঁটতে কষ্ট হয়। অপরাধ নিও না, পাতারা। ফিস ফিস করে বলে অরিন্দম, আর মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটে। তার পরাভবের যোজনব্যাপী গল্প কী ভাবে শুরু হয়েছিল, আর কোন বিন্দুতে পৌঁছে তার শেষ হওয়ার কথা, কিছুই ভাল করে মনে করতে পারে না এই ভেষজগন্ধী রাত্রির মধ্যে দাঁড়িয়ে।

গণ্ডগোলের মধ্যে শান্ত থাকতে হয়, সোমা বলেছিল। চেষ্টা তো করেছি, সোমা, তবু শান্ত থাকলে ওরা যেন আরও বেশি খেপে ওঠে। তাই উত্তেজিত হয়ে উঠে দেখেছিলাম কী হয়। তাতে ওরা ক্ষমা চাইতে বাধ্য করল।

তা মাপ চেয়েছ, বেশ করেছ বাপু, শিরীষের খসখসে গলা অরিন্দমের কানে মোলায়েম লাগে, এখন ও সব ভুলে যাও। গোড়া থেকে আমরাই ছিলাম, আমরা থাকব। পুরনো, মরা পাতার নিচে অমন কত শেয়ালের কংকাল তুমি পাবে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার মতো চামড়া।

চশমা ছাড়া এখানে তো ঝাপসা লাগে না। বরং আধো অন্ধকারে দেখা যায় গাছেদের গায়ের বলিরেখা, বাকলের রং, অথচ ঘরের মধ্যে সোমাদের ঝাপসা দেখছিল অরিন্দম। রাতে পৃথিবীর নানা দৃশ্য, শব্দ স্পষ্ট হয়ে তার কাছে ফুটে উঠতে থাকে। বাদুড়ের ছানা মানুষের গলায় কাঁদে ভয় পেয়ে, শিকারি প্যাঁচার ধাতব আওয়াজ আঁকশি দিয়ে উড়ন্ত টিয়াকে ধরতে যায়, কাকের বাসায় নানা ঝটাপটির শব্দ, আশ্রয়চ্যুত হয়ে শূন্যে গড়ায় সদ্য পাড়া ডিম। গাছেরা নির্বিকার, শান্ত, নিশ্চিন্ত। তাদের কোনও শিকার খেলা নেই।

—"এই যে কমরেডস আমাদের নতুন মেম্বার। অরিন্দম বাগচি।" মেম্বার, না শিকার? কে বলেছিল? কবে? তার হাত কি অরিন্দমের কাঁধে ছিল? সে হাতে কী ছিল? ইতিহাসের প্রশ্নপত্রের মতো জটিল হয়ে গেল কেন আরম্ভটা?

নতুন অফিসে, প্রথম দিন একটু বুক টিপটিপ করেছিল। অরিন্দমরা চার জন। অরিন্দমই সিনিয়র। গত বছর পুরনো অফিসটা বন্ধ হয়ে গেছিল। মানুষ আছে, কাজ নেই। বিশ্বায়নের হাতছানিতে যেমন আমেরিকা থেকে সস্তা মুরগির 'পা'-রা উড়ে আসে, সেই একই প্রক্রিয়ায় এ দেশে অফিস উঠে যায়, বন্ধ হয়ে যায়। অরিন্দমদের তাড়ানো হয়নি, বরং বাঁচানোর জন্যই কাছের বড় দফতরে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত, নতুন অফিসে দলছুট তারা চার জন। বাকিদের নিয়ে অতটা মাথা কেউ ঘামায় না। তারা একই পে-স্কেল থেকে রিটায়ার করে যাবে।

অরিন্দমকে ঠিক ঝেড়ে ফেলা যায় না। তার পোস্টগ্র্যাজুয়েশন, তার কম্পিউটাব ডিপ্লোমা। ও কোনও গূঢ় ষড়যন্ত্র আঁটছে, সবাইকে টপকে যাবে নিজের গ্রেডে — এই রকম সন্দেহে জ্বলতে পুড়তে থাকে অমিতরা। মাস খানেকের মধ্যেই কম্পিউটাব যে কাজে লাগে তার থেকে সরিয়ে দেওয়া হল অরিন্দমকে। তাও মধ্যে মধ্যে যেত অরিন্দম হাতের প্র্যাকটিস বজায় রাখতে। লিখিত আদেশ পাওয়ার পর আর যেতে সাহস করেনি। ও যেন অনুপ্রবেশকারী, অথবা ভাইরাস, কম্পিউটিং রুমে ঢুকলে সিস্টেম ধসে যাবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সমস্যা যে ধর্মীয় নয়, অচিরেই বোঝে অরিন্দম। এখানে সে নতুন, সংখ্যালঘু, চাকরি না নিয়ে তাকে টিকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, টিকে থাকার চেয়ে বেশি কিছু করতে গেলে শাস্তি পাবে। সেই জন্য হেড অফিস যখন নিজের গ্রেডের উপর দিকে অরিন্দমকে জায়গা দিল, তুমুল চেঁচামেচি আরম্ভ হল তাকে ঘিরে। কে ওর মাথায় ছাতা ধরে, কে ওর সোর্স? যে বাইরে থেকে এসেছে, তার জায়গা গ্রেডের সব থেকে নিচে হতে হবে। লম্বা লম্বা চিঠি যেতে লাগল এই মর্মে, হেডঅফিসে, তারই সঙ্গে অরিন্দমকে ঘিরে আস্ফালন, মন্তব্য চলতেই থাকল।

এখন যেখানে বসে অরিন্দম, নিচের তলায় একটা আলাদা বিল্ডিং-এ, যার পিছন দিকটা গুদাম। সামনের দিকে একটা মাঝারি ঘরে ছড়ানো চারটে টেবিল । জানলা নেই। সামনের কাঠের পার্টিশন দেওয়ালে লটপট করে ওঠে গত বছরের ঠাকুরের ক্যালেন্ডার। কম্পিউটার থেকে, কাজ থেকে অনেক অনেক দূরে অরিন্দমের ঠিকানা। দিনের আটটা ঘণ্টা সে এখানে কাটায় কাজহীন, শ্রান্ত অবস্থায়। তার কাছে কোনও ফাইল আসে না বহুদিন। একটা লম্বা রেজিস্টারের নানা রকম এন্ট্রির কাজ শেষ হয়ে যায় আধ ঘণ্টার মধ্যে। তারপর দীর্ঘ দিন। সে কাগজ বা বই পড়লে ওপরে নালিশ যায়। টিফিন বাক্স উধাও হয়ে যায় অর্ধেক দিন। ডায়েরিটা পকেটে রাখত অরিন্দম। ডায়েরি লিখত। কোনও অসতর্ক সময়ে হয়তো তার বুকপকেটের ডায়েরি কোথাও রয়ে গেছিল। টয়লেটে বা ক্যান্টিনের বেসিনে।

হেড অফিসে কে জানে কেন এদের চিঠিপত্র উপেক্ষা করল। অরিন্দমের উঁচু জায়গাটা বদলাল না। নামিয়ে দিলে কত খুশি হত অরিন্দম। অমিত, তেজেশরা চশমা ভেঙে ওকে

অন্ধ করতে তেড়ে আসত না তাহলে। অর্ণবের বোর্ডের পরীক্ষা সামনে। অরিন্দম একটু শান্তিতে থাকতে পারত।

ভাত ফেলে উঠে যে রাতে নিজের অরণ্যে যায় অরিন্দম, সে দিন ফিরতে তার দেরি হয়ে গিয়েছিল অনেক। শিরীষের মোটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল কি? মাথায় কুচো পাতা, কাঁধে শুকনো ঘাস, প্যান্টে ধুলো — সোমা ওকে খুব বকেছিল দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্য।

"ক্ষমা চাওয়ার দুঃখ তুমি কিছুতেই ভুলতে পারছ না। এটাই হয়েছে তোমার আসল সমস্যা।"

"তা নয় সোমা। আসলে ক্ষমা চাইলেও যে ব্যাপারটা মেটে না, তা বুঝতে পারছি। আর কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।"

— "লম্বা ছুটিতে যাও, মানবাধিকার কমিশনেও যেতে পারো।"

— "ছুটির পর তো ওখানেই ফিরতে হবে, ওই ক্যালেন্ডার টাঙানো টেবিলে। মানবাধিকার কমিশনে প্রমাণ করতে না পারলেও একই অবস্থা। আর প্রমাণ করার কোনও উপায় নেই। এর পর আমাকে পাগল সাব্যস্ত করার জন্য মেডিক্যাল বোর্ডও বসানো হবে।

কোন উৎস থেকে হাওয়া ওঠে কে জানে!

বসন্তবাতাস দমকে দমকে ছুটে আসছে। ক'দিন ধরেই, সারা দুপুর, সারা বিকেল। বাতে তাদের নিঃশ্বাসে তারাবা কাঁপে। রাস্তার ধারে শুকনো পাতারা উড়ে বেড়াচ্ছে। আমের মঞ্জরীরা ছোট ছোট ফল হয়ে উঠছে। অরিন্দম হারিয়ে যাওয়ার পর অমিতরা বাড়ি এসে ওর ডায়েরিটা দিয়ে গেছে। ওর ড্রয়ারে পড়ে ছিল নাকি। ইউনিয়ন কনডোলেন্স করতে পারেনি, মৃত্যু তো বলা যাচ্ছে না। নতুন চশমাটা এসে গেছে পাড়ার দোকান থেকে। সীতানাথ বলে পাঠিয়েছিলেন, বউমাকে জিজ্ঞেস করে এসো কিছু অসুবিধে হলে যেন সংকোচ না করেন।

সোমা চোখ নিচু করে বলেছিল, অর্ণবের পরীক্ষাটা হয়ে যাক।

দাদা সারাদিন বইয়ে মুখ গুঁজে আছে। পরীক্ষা এখনও মাসখানেক টানবে। বাবা একটা বিচ্ছিরি সময়ে চলে গেল। টুটুন জানে, বাবা ফিরে আসবে। বাবার জামা, পাজামা, চটি সব ওই সারঙ্গী বাগানে ঘাসের জঙ্গলে পড়ে। শুকনো পাতা, ধুলো পড়ে তাদের চেহারা খুব তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে। শিরীষের নিচে একটা নতুন নিমগাছ গজিয়ে উঠেছে। টুটুন কাছে এসে দাঁড়ালে গাছটা খুশি হয়ে ওঠে।

টুটুন চোখদুটো বন্ধ করে থাকে অল্পক্ষণ। এখন ও রোদের মধ্যে গাছের গায়ের গন্ধ আলাদা করে পায়। কাল পরীক্ষা নেই। সদর দরজা টেনে নিয়ে সারঙ্গী বাগানে আসছে টুটুন। ট র্ র্ র্ পাখি ডাকছে একটানা। ছায়ারোদে মাখামাখি ওই জঙ্গলেও হাওয়ার বিরাট তোলপাড় চলছে। হাতের রাবার ব্যান্ড দিয়ে উড়ন্ত চুলগুলো ঝুঁটি করে নিল টুটুন।

—"গাছ তো হাঁটতেও পারে না, কথাও বলে না, তবে বৃক্ষসভ্যতা হলে কী লাভ হত, বাবা?"

—"এই যে আমরা এত দৌড়ই, হাঁটি, কথা বলি — কাকে কী বোঝাতে পারছি, কোথাও এগোতে পারছি, বল? আমরা যদি আরও উন্নত প্রাণী হতাম, আমাদের মধ্যে সংকেত দেওয়া-নেওয়া হত, কথার দরকারই হত না, বুঝলি বোকা?"

—"তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারি তোমার মন ভাল আছে, না নেই। আমিও উন্নত প্রাণী, বাবা।"

হারিয়ে যাওয়ার আগে বাবা ক'দিন অফিস যায়নি। তখন স্কুল থেকে ফিরে টুটুন বাবার কাছ ঘেঁষে শুয়ে থাকত। দু'জনের বকবক চলত খুব।

হেঁটে কী হয়? রাস্তা পেরনো যায়, মানুষের কাছে যাওয়া যায়? মানুষকে বাঁচানো যায়? না।

বুদ্ধির কাজ, মেধার কাজ জীবনকে রক্ষা করা, প্রাণকে আগলে রাখা।

গাছ জীবনকে রক্ষা করে, শিকার করে না, ধ্বংস করে না, দুর্বলকে বাঁচতে দেয়।

আমরা সব কিছু মানুষের মাপে ভাবি বলে ভুল হয়, বাবা বলত। ওই রকম চুপ করে আকাশে হাত মেলে, মাটি ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাকাটাই হয়তো সব সভ্যতার শেষ রূপ। নিজেদের হিসেব দিয়ে ওই চেহারাটা আমরা বুঝতে পারি না।

একটা শ্যামাপোকা পৃথিবীতে আসে ক'দিনের জন্য। তার প্রতি দিন কত দুঃখ আনন্দের ঘটনায় টইটম্বুর। ধানগাছের জীবনের একটা দিন আমাদের কাছে একটা বছরের মতো। আবার বুড়ো বটগাছের কাছে একটা বছর একটা দিনের সমান।

বারান্দায় দাঁড়িয়েও খুব গল্প হত বাবা আর টুটুনের। মা এক সময় চেঁচিয়ে ডাকতে আসত — আয়, পড়বি।

প্রাণের প্রবহমানতাকে যে রক্ষা করে, সে মনীষা। গাছ মনীষার প্রতীক। প্র-ব-হ্-মা-ন-তা। রেলগাড়ির মতো লম্বা। শক্ত কথা।

ব্যাপারটা তো লম্বা-ই মা। বীজ থেকে গাছ, তার থেকে ফল, ফুল, আবার গাছ। ডালে ডালে পাখি, তার ডিম, তার ছানারা। কাঠবেড়ালি, তার বাচ্চারা...। প্রাণের মিছিল চলেছে।

বাবা বলেছিল, অন্য প্রাণীদের জন্মের একটা নির্দিষ্ট মুহূর্ত আছে, মৃত্যুরও। কিন্তু, একটা গাছ কখন জন্মায় কখন মারা যায় বলা মুশকিল। সাদা চোখের কাজ নয়। বীজ থেকে অঙ্কুর বেরোয়, তারপর বীজ দু'আধখানা হয়ে গাছের জন্য পথ করে দেয়। প্রাণ যখন যায়, গাছকে এক লহমায় ছাড়ে না। ভাঙা ডালে, কাটা গুড়িতে একটু একটু করে নিভতে থাকে প্রাণ।

আমি এখন কত কিছু বুঝতে পারি। টুটুন মনে মনে বলে। এই রে, তোর কষ্টের দিন শুরু হল। অরিন্দম বলে। সারঙ্গী বাগানের রোদ-হাওয়া তার কথা লুফে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বস্মৃতি বিদ্ধ করে তাকে। এইখানে দাঁড়িয়ে আরও একটি গাছের জন্ম দেখতে হবে? পরাজিত মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠবে বৃক্ষসভ্যতা? অরিন্দম দাঁড়িয়ে থাকবে, না, যুদ্ধে নামবে আবার? বাগানের ঘাসপাতার নিচে কাদামাখা পোশাক আছে, ছেঁড়া জুতো। বাঙ্কারের নিখোঁজ সৈনিকের মতোন এখনও বেরিয়ে পড়া যায়।

গুটেনবার্গের সৈন্য

সমীর চৌধুরী

আশ্চর্যের কিছু নেই যে এখন ছোট কাঁটাটা দশটার ঘরে বড় কাঁটাটা এগারটার। হাই তোলে সোমেন, বাঁ দিকের জানলাটা দিয়ে ঘরে ঢোকে অন্যমনস্ক বাতাস, তারে টাঙানো লুঙ্গি, তোয়ালে, টেবিলের এলোমেলো কাগজ-পত্রিকার পাতা ওড়ে, কাক ডাকে কোন আড়াল থেকে, স্বরে এক ধরনের হাহাকার। নিচে কলতলায় কারা যেন কথা বলছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। জল পড়ার শব্দের সঙ্গে একটা ধাতব শব্দ মিলে-মিশে হালকা, অন্যমনস্ক বাতাসের সঙ্গে উড়ে যায়। সোমেন জানে এরপর কী হবে। আচমকা মা অথবা নিভা— মানে তার দিদি, কুশ্রী, সামনের দাঁত সামান্য উঁচু, বিয়ে আর হবে না জেনেই বোধহয় খিটখিটে একটু, একটা নার্সারিতে পড়ায় ইদানীং — ঘরে ঢুকে ডাকবে, কিন্তু অপেক্ষা করবে না, বেরিয়ে যাবে।

যেদিন কেউ ডাকাব আগেই ঘুম ভাঙে সেদিনটা একটু অন্যরকম মনে হয়। যেন নতুন জন্মের ভোব। সামান্য হিম লাগা বাতাস গায়ে হাত বুলিয়ে গেলে নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে পৃথিবীটাকে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু প্রায় দিনই পায়ের দিকের দেওয়ালের মাথায় গোল ক্লাসিক, কোয়ার্টজের কাঁটার দিকে তাকালে মন খারাপ হযে যায়। শুরুতেই কতটা সময় ঝরে গেল! এরপর কলগেট-চর্চা, চা চারমিনার, কলতলার কেরানি ভিড় এড়িয়ে পায়খানায় যাওয়া—সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাই ডিসগাসটিং! নিউটন, পিকাসো বা তলস্তয় কটায় ঘুম থেকে উঠতেন; উঠেই পায়খানায় যেতেন না শুয়ে শুয়ে নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে..... ইত্যাদি..... না সেসব জানা হয়নি। প্রায় ফিকসেশনের মতো মগজে সেঁটে আছে এই চিন্তা। অঞ্জন সেন - তার বন্ধু, বিবেকানন্দ কলোনির প্রথম গ্রাজুয়েট - কবিতা লিখত — পাগল হয়ে যাবার পর একদিন তাকে রাস্তায় ধরে খুব গম্ভীর মুখে প্রশ্ন করেছিল, 'এই সোমেন, তুই ঠিক বলতে পারবি, নোবেল পুরস্কার পেতে হলে গীতা না বাইবেল — কোনটার ওপর বেস করে লিখতে হবে?' সন্ত্রস্ত সোমেন, খাবিখাওয়া গলায় বলেছিল, 'আমার মনে হয় বাইবেল —'

পরে মনে হয়েছিল অঞ্জন কি তাহলে সাব-কনসাস মাইন্ডে নোবেল পুরস্কারের প্রত্যাশা রেখেছিল? তার মানে সে নিজে যদি কোনোদিন পাগল হয়ে যায়, তাহলে কি রাস্তায় লোক ধরে ধরে জিজ্ঞেস করবে, তলস্তয় বা পিকাসো কটায় ঘুম থেকে উঠতেন, উঠেই পায়খানা যেতেন, নাকি শুয়ে শুয়ে নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে.......কথাটা মনে হতেই খুব হাসি পেল সোমেনের। কিন্তু হাসল না। বাস্তবিক, শুধু অঞ্জন নয়, তার বন্ধুদের মধ্যে ঠিক কজন উন্মাদ-প্রক্রিয়ায় মিশে গেছে মনে করার চেষ্টা করল। অঞ্জন, নরেন, দীপ — আরো পিছনের দিকে গেলে একঝাঁক মুখ মনে পড়ে; টিন এজ তখন, কেউ জেলের ভেতরে, কেউ বাইরে, কেউ পুলিশের গুলিতে, কেউ আততায়ীর — হেমন্তের পাতা হয়ে খসে গেছে। নিজের বেঁচে থাকা, এই বিছানা, অন্যমনস্ক বাতাসের সঙ্গে মেশা হাহাকারময়

কাকের ডাক—সবকিছুই অলীক বিভ্রমের মনে হয়। মনে হয়, বেঁচে থাকাটাই ভারি আশ্চর্যের, হেমন্তের গহীনে একটা আধা-হলুদ পাতা কেন টিকে গেল তাব কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা জানা নেই সোমেনের।

সীমা ঘরে ঢুকল। ছোট বোন, এইচ এস দেবে এবার, তবে নিভাব চেয়ে সুশ্রী। সাধাবণত এ সময়ে সে আসে না, হয় মা না হয় নিভা — কিন্তু সোমেনকে চকিত করে সীমা খাটের পায়ার কাছে এসে সোমেনকে চোখ খুলে শুয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয় প্রথমে। দুই ভ্রূর মাঝখানে ভাঙা চাঁদের মতো বিস্ময় ঝুলে থাকে। বলে. 'দাদা. মা বলল কলতলা ফাঁকা আছে, একটু পরেই ভিড় হয়ে যাবে —'

'যাচ্ছি।'

আড়মোড়া ভাঙে সোমেন। অন্যমনস্কতার ধুলো ঝেড়ে শোনার চেষ্টা করে কলতলার সেই শব্দ, কিন্তু মনে হয় সত্যিই, কলতলা থেকে কোনো শব্দ আব ভেসে আসছে না। হাহাকারময় কাকের ডাক আর স্মৃতিমেদুর নীলকণ্ঠ আকাশের কথা ভুলে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে পড়ে সে।

নিভা সাত-সকালেই কোথাও গেছে. চা খেতে খেতে সীমার কাছে এই সাংসারিক তথ্যটা জানল সোমেন। চা আর দুটো নোনতা, এরপর এক ঘণ্টার মধ্যে আরো দু'বার চা হবে, নোনতা ছাড়া। খাদ্যবস্তু, আবও পবে। প্রাত্যহিক পর্বেব এই ঘেরাটোপ মাঝে মাঝে ভাঙে, যেদিন সকালেই কোথাও যেতে হয়।

নোনতার ক্লিশে পার হতেই মা ঘরে ঢুকল। ভুল চিকিৎসায় হাসপাতালের বেডে বাবা প্রাক্তন হয়ে যাবার পর থেকেই মায়ের চেহারায় নদীর পাড় ভাঙার শব্দ পেয়েছে সোমেন। সেই পাড় এখন বাস্তবিকই ভাঙা, প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ছাড়া কারুর পক্ষে জানা সম্ভব নয়, অতীতে কেমন ছিল এই মানুষটার চেহারা। ধ্বস্ত, ভাঙাচোরা গাল, মুখের চামড়ায় মজা নদীর আঁকিবুঁকি।

মা একটা চেয়ার টেনে সোমেনের মুখোমুখি হয়। কিছু বলার আগে চিরকালই, সোমেন দেখে আসছে, মা কেমন-এক চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। সেই চোখে এমন কিছু থাকে যার জন্যে অস্বস্তি হয়, মনে হয় ছেলের ব্যাপারে তিনি আশাহত।

আজ কিছুক্ষণ সেভাবে গেল। সোমেনের মনে অস্বস্তির কাঁটা বেঁধে, যে-কোনো প্রসঙ্গই উঠুক, সেটা যে খুব স্বস্তিদায়ক হবে না — এটা সে বোঝে। নীলকণ্ঠ আকাশ এবং কাকের ডাকের সঙ্গে মিশে থাকা অন্যমনস্ক বাতাসের স্পর্শ এখন হারিয়ে গেছে। স্মৃতিতে আচমকাই হানা দেয় এক অন্ধকার নেকড়ে উপাখ্যান। ছায়া ছায়া কতগুলো মুখ, ভাষাহীন, ক্রন্দনরত, তার পাশে লোলুপ নেকড়েরা জিভে চেটে নেয় রক্তের আঘ্রাণ, হাসে, পৈশাচিক উল্লাসে। পাশাপাশি কতগুলো শেয়াল, মুখোশধারী — রক্ত কান্না আর ঘামের থেকে উৎপন্ন ফসলের ভাগিদার — এরাও আছে। নিজের অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়। মায়ের অস্তিত্ব কয়েক মুহূর্তের জন্য ভুলে যায় সোমেন।

'বাবাসাতে সুধীরবাবুর বাড়িতে একবার গেলে ভালো হত —'

হালকা হাওয়ায় ডানা মেলে যেন ভেসে আসে শব্দগুলো। আদেশ-উপদেশ-অনুরোধ — কিছুই নেই — হয়ত সেজন্যেই, আচমকা নিজের মাকে খুব দুঃখী মনে হয় সোমেনের। অন্ধকারে, প্রেতচ্ছায়ায় ক্রন্দনরত মূর্তিগুলোর পাশে মাকেও যেন দেখতে পায় সে। ভাবে কথাটা নিয়ে, বারাসত! কি যেন নাম পল্লীটার? মনেও পড়ে না। অথচ মাত্র হপ্তাদুয়েক

আগেও সেখানে গিয়েছিল সোমেন। পানসে চা আর নাম-না-জানা একটা বিস্কুট খেতে খেতে টাক-মাথা, সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ার করা একটা লোকের সঙ্গে বাধ্যতামূলক সাহিত্য আলোচনায় রত হয়েছিল সে। কাগজে 'পাত্র চাই' শিরোনামে নিভার জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইতিপূর্বে পরপর চারবার — অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার সামনে পড়ে — প্রথমবার তো কোনো চিঠিই পায়নি; দ্বিতীয়বার কাঁকিনাড়ায় ছুটতে হয়েছিল তাকে, মায়ের তাড়নায়, কেননা পাত্রপক্ষ নিভাকে দেখে যাবার পর কোনো সাড়াশব্দ দেয়নি, সেখানে এক কাঠগোলার মালিকের সঙ্গে কাঠের গুণাগুণ, দরদাম ইত্যাদি নিয়ে ক্লান্তিকর কিছুক্ষণ আলোচনার পর, 'এক্ষুনি কিছু বলতে পারছি না, পরে জানাবো' শুনে ফিরে আসতে হয়েছিল, তৃতীয় পাত্র এক বুড়ো, আধকপালে, চোয়াল উঁচু বেঢপ লোক, যাকে তারাই বাতিল করেছিল, আর চতুর্থ পাত্রটি দ্বিতীয়পক্ষ, ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যুক্ত, সোমেনের ঘরে আলমারিতে মার্কসের রচনাবলীর পাশে কান্টের 'ক্রিটিক অফ পিওর রীজন' দেখে জানতে চেয়েছিল কে এসব বই পড়ে; তারপর মার্কসবাদ ইত্যাদি নিয়ে মুরুব্বির সুরে দু'চারটে এমন কথা বলেছিল যে সোমেন বাধ্য হয়েছিল তার ভুলগুলি ধরিয়ে দিতে এবং ফলে সেই দ্বিতীয়পক্ষ ক্রূর সন্দেহের দৃষ্টিতে সোমেনের দিকে তাকিয়ে জানতে চেয়েছিল, বামপন্থী হঠকারীদের সম্পর্কে তার কী ধারণা এবং যা হয়, সোমেনের বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নোত্তরে নাজেহাল, ক্ষমতার ননীচোরা পাত্রটির ইগোতে সাংঘাতিক ঘা লাগে এবং ব্যাপারটার সেখানেই ইতি ঘটে; তারপর এই বারাসাত। মাকে বোঝানোই মুশকিল যে এভাবে হ্যাংলামোপনা করে কোনো লাভ নেই, কেননা, এই মানুষ কেনাবেচার বাজারে ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার ভিড় বেশি, ফলে সবাই চাইবে বাজারের সেরা মালটিই কিনতে, নিভা ততদূর সেরা নয়।

মায়ের কথা শুনে এক লহমায় এতগুলো কথা ভেবে নিল সোমেন। তারপর মায়ের মুখের দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মা আবার প্রসঙ্গটা তুলল, 'লোকটা তো বোধহয় খোঁজ নিতে বলেছিল — '

এই এক দোষ মায়ের, অনেক কথাই ভুলে যায় আজকাল। বলে, 'না, সেকথা বলেনি। খবর পাঠাবে বলেছিল। তা যখন পাঠায়নি তখন ধরেই নিতে হবে —'

সোমেন চা শেষ করে আবার সেই অন্ধকারময় নেকড়ে উপাখ্যানের কথা এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী ঘটনাগুলোর কথাও চিন্তা করে। ছায়াচিত্রের মতো, কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত, মনের পর্দায় এলোমেলো কিছু ছবি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়; সে ভেবেই পায় না, কেন হতদরিদ্র এক চাষী পরিবার, কোন এক রিকশাঅলার বউ আর এদের জড়িয়ে যে ঘটনা পরম্পরা, তার কথা মনে পড়লেই এই বাড়ি, নদীর পাড় ভাঙা মা, দাঁত উঁচু বোন, বিষণ্ন সীমা — এবং নিজের প্রায়-হলুদ জীবনের কথা মনে পড়ে: আইডেন্টিফিকেশনের প্রশ্নে ঠিক খাপ খায় না। সে চাকরি পায়নি ঠিকই কিন্তু ফ্রিলান্স করে। শব্দেরই মায়াবী জাদুতে এই শব্দ, ঢেকে দেয় শব্দ বেচাকেনার ক্লিন্ন জগতের নীচতা; নিজেকে অনেকের থেকে আলাদা করে নিয়ে ভাবতে শেখায় — যদিও তার কোনো কারণ নেই। এছাড়া আছে এই বাড়ি, কিছু ভাড়াও পাওয়া যায়; নিভা এখন দিদিমণি, উপরন্তু ছেলে পড়ায়। সীমাও দুটো টিউশনি করে। সামাজিক এই অবস্থান থেকে অনেক দূরে, অন্ধকার মাঠের সেই ঝুপড়ি ঘর, সেই 'রিকশাঅলা আর চাষি পরিবার। তবুও ছবি দুটো পাশাপাশি নয়, অনেক সময় সোমেনের চিন্তায় মিলেমিশে যায়। যেমন এখন হলো। 'আসলে এ হয়ত তার মনের দোষ' — ভাবল সোমেন। তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, বারাসাত যাওয়ায় আর কোনো মানে হয় না। লোকটা আমাকে বলেছিল খবর দেবে —'

মায়ের মজানদীর ইকড়িমিকড়ি কাটা মুখে এক অসহায় দুঃখ ঝুলে থাকে। ছেলেটাকে খুবই পছন্দ হয়েছিল মায়ের, কিন্তু কী আর করা যাবে! সোমেন আলোচনায় ইতি টানার জন্য উঠে দাঁড়ায়। তারপর অনেকটা মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই যেন বলে ওঠে — 'দেখি, আরো একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দেব —'

'কিন্তু ওরা তো নিভার ছবি ফেরত দেয়নি এখনও। যদি পরে মত করে —'

'অসম্ভব! লোকটার কথা শুনে আমি যতটুকু বুঝেছি — আজকাল ছবিটবি অনেকে ফেরত দেয় না। আমার জানাশোনা একটা ছেলে — ব্যাঙ্কে কাজ করে — একশোটা মেয়ের ফটো জোগাড় করেছে এইভাবে — বিয়ের পর বউকে সবকটা দেখিয়ে তারপর আগুনে পোড়াবে বলে —'

এত কথা এবং এইসব কঠিন কথা মাকে কখনও বলে না সোমেন। কিন্তু এখন ইচ্ছে করেই, আসলে মায়ের মোহভঙ্গ করার জন্যেই কথাগুলো বলে, নির্বাক, স্তব্ধ, মায়ের আঁকিবুঁকি কাটা মুখের ভাঁজে ভাঁজে যে শীতার্ত রোদ্দুর লেগে আছে সেদিকে তাকিয়ে সোমেন দ্বিতীয়বার বাথরুমের দিকে চলে গেল।

দুই

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দোতলায় নিজের বই ভর্তি নাতিশীতোষ্ণ ঘরখানায় ফিরে আসে সোমেন। সীমা — ছোট বোন চা দিয়ে যায়। দ্বিতীয় কাপ, টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজ আর বইপত্র সরিয়ে কাপটা রেখে আগন্তুক দৃষ্টিতে নিজের ঘরটাকেই দেখে সে। টেবিলের ওপর লম্বা গোল মোড়কখানা পড়ে রয়েছে বই, কাগজ, পত্র-পত্রিকার মাঝখানে, তাকায় সোমেন, কিন্তু গভীর আলস্যে, হাত বাড়িয়ে মোড়কটা খোলার ইচ্ছে চাপা পড়ে থাকে।

গত দু'মাসের মানসিক-শারীরিক পরিশ্রমের পর এই অবসাদ রৌদ্ররমণে ক্লান্ত পথিকের মতো উপভোগ করে সে। মাস ছয়েক আগে মফস্বলীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী এমনি এক সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, মোড়ের পানের দোকানে সিগারেট কিনতে কিনতে লোক-মারফত, অর্থাৎ আলোচনারত তিন মাঝবয়েসীর মারফত জানতে পারে রেললাইনের ওপরে সামান্য জমির মালিক, প্রায়-নিঃস্ব এক চাষি পরিবারের আট বছরের একটি মেয়েকে কাল রাতে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে পাশের কুঁড়ের এক বিবাহিতা, সদ্য সন্তান হওয়ায় সে পিতৃগৃহে বিশ্রামের জন্য আগত হয়ে শেষ পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে ধর্ষণকারীদের পায়ে ধরে নাকি একথাও বলেছিল যে, তার সেলাই হয়েছে, প্রচণ্ড ব্যথা, এ অবস্থায় কিছু হলে — তাতে ধর্ষণকারীরা আরো আমোদ পায় এবং সারারাত তাকে খোলা আকাশের নিচে ফেলে আটজন ধর্ষণ করার পর আপাতত সেই আট বছরের মেয়েটি এবং সে হাসপাতালে শয্যাশায়ী —

তা, এসব খবরে মধ্যবিত্ত-প্রতিক্রিয়ায় সোমেন, নিরুদ্বিগ্ন হেঁটে যায় বাসস্ট্যান্ডের দিকে এবং বাস ধরে কাগজের অফিসে, অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী 'মাছের বাজারে মাছ নেই, মাছি উড়ছে' শিরোনামায় একটা গদ্য জমা দিতে।

সেখানে থেকে কলেজ স্ট্রিট বইপাড়া, কফি হাউস ইত্যাদি সেরে বাড়ি ফিরে আসার পর তার জীবনের অন্যতম আশ্চর্য ঘটনাটি ঘটে, যখন রাত আটটা নাগাদ শুধু মুখ-চেনা একটা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনটি অচেনা যুবক তার সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং তাকে অবাক করে জানায় তার লেখক-পরিচিতি এবং কোন্ কোন্ কাগজে সে লেখালেখি করে সেসব খবর তারা জানে। এ পর্যন্ত হয়ত ততদূর নয়, কিন্তু তার বিস্ময়ের পালে হাওয়া লাগে, যখন সে শোনে ওদেরই একটা ছেলে বলছে —

'সোমেনদা, আপনি হয়ত শুনে থাকবেন, কাল রাতে ডানকুনি লাইনের ওপারে চাষিপাড়ায় দুটো মেয়েকে — তাদের একজনের বয়েস আবার আট — তাদের দুজনকে গ্যাংরেপ করা হয়েছে। আট বছরের মেয়েটা বুঝতেই পারছে না — বাঁচবে কিনা, বাঁচলেও তার কী অবস্থা হবে, বলা খুব মুশকিল। অন্য মেয়েটার অবস্থাও খুব ভালো নয়। আমরা আপনার কাছে এসেছি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে। আমরা জানি, কারা এসব করেছে, পেছনেই বা কারা কারা আছে। শুনেছেন কিনা জানি না — হয়ত শুনেছেন — এর আগেও চাষিপাড়ায় এই রকম ঘটনা ঘটেছে। চাষবাস তো বন্ধ হয়েইছে, এখন চাষিরা জমি বিক্রি করে পালাতে চাইছে —'

অন্য একটা ছেলে, একটা চোখ সামান্য একটু ট্যারা, সামনের দাঁত সামান্য উঁচু, বলে, 'ওদের কথা বাদ দাও দিলীপ। আসল কথাটা বলো সোমেনদাকে —'

বক্তা — যার নাম দিলীপ — উত্তেজনার ঝাঁঝ মিশিয়ে বলে, 'এটাই আসল কথা। পুরো ব্যাপারটা না বললে সোমেনদা বুঝবেন কী করে। ধর্ষণ তো রোজই কত হচ্ছে —'

অন্য একজন, সুবীর, অল্প চেনা সোমেনের, বলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুই পুরোটাই বল —'

দিলীপ দাঁত-উঁচু ছেলেটির দিক থেকে সোমেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, '..চাষিপাড়ায় এই হামলা, সোমেনদা, নতুন কোনো ঘটনা নয়। আপনি তো জানেন, আশেপাশে ফাঁকা জমি আর নেই, অথচ খরিদ্দার প্রচুর। জমির দামও বাড়ছে হু-হু করে। লাইনের ওপারে ঐ চাষিপাড়াটুকু যা আছে, বহু বছর ধরে কয়েকটা পরিবার ওখানে রয়ে গেছে। চারিপাশে এত উন্নতি হয়েছে, ওখানে তার কোনো চিহ্ন নেই। এখনও সেই কেরোসিনের বাতি। কিছুদিন ধরেই ঐ পরিবারগুলোর ওপর নানাভাবে হামলা হচ্ছিল। এমনকি চাষ করলে জমির ফসলও কারা যেন নষ্ট করে দিচ্ছিল। ধর্ষিতাও হয়েছে দু'টো মেয়ে। ফলে দু'একটি পরিবার ইতিমধ্যেই জমি বিক্রি করে পালিয়েছে। এমনকি আমাদের ওপরও নানাভাবে আক্রমণ নেমে আসছে। এই কিছুদিন আগেই অন্য একটা ছুতোয় আমাদের দু'টো ছেলেকে ওরা যখন মারল, আমরা থানায় গিয়ে শুনলাম, আমাদের নামে নাকি এর আগেই ডায়েরি হয়ে গেছে এবং অফিসারের কথা শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল সম্পূর্ণ নৈতিক সমর্থন তার ওদিকেই —'

এতক্ষণে সামান্য বিরক্ত, অসহিষ্ণু সোমেন, এসবের মধ্যে তার নিজের ভূমিকা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে ওঠে, 'কিন্তু এসব ব্যাপারে আমি আপনাদের কীভাবে সাহায্য করতে পারি, ঠিক বুঝতে পারছি না।'

সুবীর বলে, 'সোমেনদা, আমরা কয়েকজনে মিলে আজ সকালে চাষিপাড়ায় গিয়েছিলাম। ওরা তো এখুনি যা দাম পায় তাতেই জমি বিক্রি করে পালাতে চাইছে। আমরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওদের শান্ত করে এসেছি। কিন্তু দুপুরে ধর্ষণকারীরাই প্রকাশ্যে গিয়ে ওদের শাসিয়ে এসেছে, কোনরকম ট্যাঁ-ফুঁ করার চেষ্টা করলে দেখে নেবে বলেছে। এখন, এই অবস্থায়, প্র্যাকটিকালি আমরা কয়েকজন খুব লোনলি ফীল করছি, আপনি তো বড় সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন লেখালেখির সূত্রে, আমরা সবাই আপনার লেখা পড়েছিও। এখন, এইসব নিয়ে, মানে পুরো অবস্থাটা নিয়ে আপনি যদি কিছু লেখেন, আমাদের মনে হয়, মানে — ওরা বাধ্য হবে থমকে দাঁড়াতে —'

সোমেন একটু অসহিষ্ণুভাবে বলে, 'দেখুন, আমি তো খবরের কাগজে চাকরি করি না। সামান্য যা লেখালেখি করি সেসব তো ওনারাই ঠিক করে দেন। আর তাছাড়া ধর্ষণ-টর্ষণ নিয়ে তো প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। এরপর কি এসব ব্যাপারে সম্পাদক কোনো আগ্রহ দেখাবেন? আমার মনে হয় —'

সোমেন এড়িয়েই যেতে চাইছিল। কোনো ভয় ইত্যাদি কারণে নয়, আসলে অভিজ্ঞতার মননশূন্য একঘেয়েমিতে তার মনে হয়েছিল, হয়ত অবচেতনেই, ধর্ষণ-টর্ষণ সমাজের নিয়মমাফিক ব্যাপার, এসব নিয়ে এত বকবক করার, লেখা-ফেকার কোনে মানেই হয় না। কিন্তু তাকে বাধা দিয়েই দিলীপ ছেলেটা বলে, 'সোমেনদা, হয়ত আপনি ঠিকই বলেছেন, সম্পাদকেরা এসব ব্যাপারে আগ্রহ না-ও দেখাতে পারেন, কিন্তু তবু — ধরুন ছোট নিউজ আকারেও যদি ব্যাপারটাকে তোলা যায় কাগজে — আমাদের মনে হয় আপনি যদি একবার অন্তত আমাদের সঙ্গে যান রেললাইনের ওপারে, নিজের চোখে চাষি পরিবারগুলোর দুর্গতি একটু দেখে আসেন — তারপর আপনি লিখুন না-লিখুন সে আপনার ব্যাপার —'

সুবীর বলে, 'বছর দুই আগে আপনি ধর্ষণ নিয়ে কোনো একটা কাগজে গল্প লিখেছিলেন —নামটা আমার ঠিক মনে নেই — কিন্তু গল্পটা এত জীবন্ত ছিল যে, আমি ভাবলাম—'

বিরক্তি এবং বিস্ময় মেশানো দৃষ্টিতে সুবীরের দিকে তাকায় সোমেন। কী গল্প সে লিখেছিল — লিখেছিল হয়ত — ঠিক মনে করতে পারে না। খানিকটা ক্লান্তি এবং আপাতত এইসব আলোচনা চাপা দেবার জন্যে কোনকিছু না ভেবেই সোমেন বলে, 'ঠিক আছে, কাল কেউ একজন আসবেন আপনারা। — আমি যাব।'

এই সংলাপ-বিনিময়ের প্রতিক্রিয়ায় ঘটনাপ্রবাহ কতদূর গড়াতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না সোমেনের। কেননা পরদিন, নীলকণ্ঠ আকাশের নিচে ঘুম ভেঙে ওঠার পর — যখন সে প্রায় ভুলেই গেছে গতকালের ধর্ষণকাহিনী, মোহময় বাতাস আর কোয়ার্টজের টিক টিক রচনা করছে প্রত্যহের এসথেটিক্যাল সূচনাপর্ব, ঠিক তখনই নিভা, বড়বোন, ঘরে ঢুকে জানায়, কে একটা সুবীর নামের ছেলে তাকে খোঁজ করছে। ফলে বিছানা ছেড়ে নিচে, কলতলাপর্ব পার হয়ে এক কাপ চা খেয়েই বিরক্তি এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে বেরোতে হয়। রেললাইন পার হয়ে চাষিপাড়ায় পৌঁছে অবশ্য এই অনিচ্ছা তার উবে যায়, বেশ খুঁটিয়ে সব কিছু দেখে, বিমূঢ়, বিভ্রান্ত চাষি-পরিবার, ধর্ষিতাদের মা-বাবা, পেটমোটা ন্যাংটো শিশু, শিকনি ইত্যাদি দেখতে-দেখতে একসময় কুড়ি বছর আগের সোমেন, রাত দু'টোয় বাড়ি-ফেরা সোমেন, অন্ধকার পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো সোমেন বুদ্ধিজীবিতার আলস্য আর স্বার্থপরতার ধুলো ঝেড়ে মাথা তোলে তার মধ্যে; খানিকটা আবেগপ্রবণ আর ক্রুদ্ধ সে, প্রায় অ্যাডভেনচারিস্ট মনোভাবের বশেই সিদ্ধান্ত নেয়, সে লিখবে, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে, একটা ধর্ষণের আড়ালে যতরকম সামাজিক চক্রান্ত আর অবদমন লুকিয়ে থাকে তার পুরোটা তুলে ধরবে।

বাড়ি ফেরার পথে লেখার চিন্তায় অন্যমনস্ক সোমেন হঠাৎই লক্ষ করে একটা সাইকেল তাকে ফলো করছে। ফেরেব্বাজ চেহারার একটা ছেলে একবার ডানদিক একবার বাঁদিক দিয়ে সাইকেল-সহ তার সামনে এগিয়ে যায়, দাঁড়ায় এবং ক্রূর সন্দেহের চোখে তাকে সামনে থেকেই লক্ষ করে। বাস্তবিক সে বাড়ি পৌঁছনো পর্যন্ত এই অভিনব অনুসরণ তাকে ভীত করার বদলে আরো উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ করে — একবার সে ছেলেটার মুখোমুখি হবার কথাও ভাবে, কিন্তু পরমুহূর্তে মত পাল্টায়। বাড়ি ফিরে নিজের নাতিশীতোষ্ণ ঘরে সে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে লেখার টেবিলে ব্যস্ত হয় — এবং সাইকেল-আরোহীর চোয়াড়ে মুখটায় থাপ্পড় কষাতে না-পারার অবদমিত লাভাস্রোত উগরে দেয় সাদা কাগজের বুকে।

পুরো লেখাটা তৈরি হয় বিভিন্ন লোকের ইন্টারভিউ, পুরনো কিছু তথ্য এবং বর্তমান ধর্ষণ-ঘটনার সমন্বয়ে। বস্তুত, এর জন্য বেশ কয়েকদিন হাঁটাহাঁটি করতে হয় তাকে, এবং এমনকি, হাসপাতাল-ফেরৎ ধর্ষিতাদের একটা অসম্পূর্ণ ইন্টারভিউ — আট বছরের মেয়েটা

অবশ্য তাকে কিছুই বলেনি—উল্টে তাকে দেখে, আপাতগম্ভীর, কেউ আঁতেল বললেও বলতে পারে, এমন চেহারার সোমেনের চোখে বালি পড়ে; সে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে সেই বালি মুছে ফেলতে চেষ্টা করে।

সেদিন লাইনের ওপার থেকে ফেরার পথে সাইকেলচালক-অনুসরণকারীর সঙ্গে আরো একজনকে দেখে সোমেন। গালের ওপর গভীর টানা ক্ষতচিহ্ন, দিলীপ-সুবীরের বর্ণনায় এই চেহারার নাম নারু; অন্যতম ধর্ষণকারী, পার্টি করে, গণেশ মাইতির অন্তরঙ্গ। সোমেনও, দ্বিধাহীন দেখে তাকে, আর এইসব ছোট ছোট দৃশ্য-ঘটনাই তপ্ত করে তাকে; একটা ধর্ষণের ঘটনা তার হাতে হয়ে ওঠে সামাজিক অন্যায়ের দলিল চিত্র এবং লেখাটা তার হিতাকাঙ্ক্ষী পেজ এডিটর দুলাল চক্রবর্তী — যাঁর সাদা ধুতি-পাঞ্জাবির মতোই মানুষটাকেও পরিচ্ছন্ন হৃদয়বান বলে এতদিন ভেবে এসেছে, এই ১৯৯৩-এর সংবাদপত্র জগতের লোক হওয়া সত্ত্বেও — তার হাতেই তুলে দেয় সে। ঠিক সাতদিন পর অ্যাসাইনমেন্ট অনুযায়ী 'বাজারে কেরোসিন নেই, গৃহস্থের মাথায় হাত' শিরোনামায় একটা গদ্য জমা দিতে গেলে নিরমার বিজ্ঞাপন-ধুতি পরিহিত দুলাল চক্রবর্তী ধর্ষণ-সম্পর্কিত লেখাটা ফেরত দিয়ে বলেন, 'এটা ছাপা যাবে না, সোমেন।'

আশাহত সোমেন, দুলাল চক্রবর্তীর দিকে তাকায়।

'একে তো লেখাটা বেশ বড়', দুলাল চক্রবর্তী বলতে থাকেন, 'তাও না হয় কাটছাঁট করে ছেপে দিতাম, কিন্তু এই ধরনের ঘটনা চারপাশে এত ঘটছে যে — তাছাড়া —'

কিছুটা অসহিষ্ণু, যদিও তার নিজেরই আশঙ্কা ছিল দুলালদা এই ধরনের কিছু বলবেন; তবু এই মুহূর্তে নিজেকে সে চেপে রাখতে পারে না, বলে, 'কিন্তু ঘটনা নয় দুলালদা, আপনি তো নিশ্চয় পড়েছেন - আমি আসলে এই ধর্ষণপ্রাবল্যের মূল ব্যাপারটাকেই ধরতে চেয়েছিলাম —'

'কিন্তু এ ব্যাপারে আমার একটা প্রশ্ন আছে।' শান্ত, মুখে ক্ষীণ হাসি জিইয়ে রেখে দুলাল চক্রবর্তী বলেন, 'তুমি যে ব্যাপারে এত উত্তেজিত হচ্ছ, একটু খোঁজ নিয়ে দেখ, যে মেয়ে দু'টি ধর্ষিতা হয়েছে, তাদের দিক থেকে—মানে, আমি বলতে চাচ্ছি অনেকক্ষেত্রে এইসব মেয়েরাই তাদের আচার আচরণের মাধ্যমে অনেক সময় প্রোভোক করে ধর্ষণকারীদের—'

হতভম্ব সোমেন, তার হিতাকাঙ্ক্ষী, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটির দিকে চেয়ে খাবি-খাওয়া গলায় বলে, 'কিন্তু আট বছরের মেয়ে —'

'হতে পারে মেয়েটার বয়েস আট, কিন্তু এইসব নিম্নশ্রেণীর লোকজনদের ছেলেমেয়েদের যৌবন আসে খুব কম বয়সে, চলেও যায় তাড়াতাড়ি। তাছাড়া বয়েসটা যে আট, তারই বা প্রমাণ কী? ইনলিটারেট লোকেরা ছেলেমেয়েদের বয়সের ঠিক ঠিক হিসেব রাখে না। ওসব মীনিংলেস ব্যাপারে মাথা ঘামানো ছেড়ে অভিনেত্রীদের আত্মহত্যা নিয়ে ফিচারটা লিখে ফেল — কভারস্টোরি করব।'

অতএব, বাধ্য ছেলের মতো সোমেন, খানিকটা হতচকিত, মাহাত্ম্যপূর্ণ শব্দে বললে কিংকর্তব্যবিমূঢ়, পথে নামে এবং সেদিনই একটা চেনা পত্রিকা — প্রচার একটু কম, তাহলেও দৈনিক পত্রিকা তো বটেই — যারা ইতিপূর্বে একটা লেখার জন্য বলেছিল তাকে, তাদের কাছে লেখাটা পাঠিয়ে, নিজেকে কিছুটা দায়মুক্ত ভেবে বাড়ি ফেরে, অভিনেত্রীদের আত্মহত্যা-সম্পর্কিত কভারস্টোরির জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে।

তার তিন দিন পরেই অনিন্দ্য, ঐ কাগজের অ্যাসিস্টেন্ট পেজ এডিটর — কফি হাউসে তার সঙ্গে দেখা হতেই হাসতে হাসতে বলে, 'কিরে শালা, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? খবরের কাগজে ধর্ষণ-রাজনীতি নিয়ে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কেউ ছাপে? ফিচার দে —'

স্বাভাবিকভাবে এরপর লেখাটা গেল পরিচিত এক মাসিক পত্রিকায় আর পনের দিন পরেই — এতটা তাড়াতাড়ি সোমেন নিজেও আশা করেনি — শুধু তার লেখার কথাটা সম্পাদককে স্মরণ করিয়ে দিতেই গিয়েছিল, আর গিয়ে শুনল, তার লেখা মনোনীত হয়ে গেছে — চার-পাঁচটা সংখ্যায় ধারাবাহিক বেরুবে। সাফল্যের উল্লাস তাকে এতটাই গ্রাস করল যে, পথে নেমে পরপর তিনটে সিগারেট প্রায় চেন-স্মোকারের ভঙ্গিতে খেয়ে নিল সে। এবং বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায় যখন সুবীরের সঙ্গে দেখা হল, তখন, বহু বছর পর 'সবকিছু ঠিকঠাক চলছে' — এমন একটা কৈশোরক-ভাব হৃদয়ে দেখা দিল এবং সে, উল্লাস চেপে রাখার ব্যর্থতায়, যেন এই প্রথম তার লেখা ছাপা হচ্ছে কোথাও, এমন ভঙ্গিতে খবরটা সুবীরকে জানাল। লেখালেখির জগৎ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাই, 'খবরের কাগজে ছাপা হল না সোমেনদা?' এই প্রশ্নে সোমেনের উল্লাস ফুটো করে সুবীর।

'না', নিজেকে সামলে নিয়ে বলে সোমেন, 'আমি তো আগেই বলেছিলাম, খবরের কাগজে এত বড় লেখা ছাপা হওয়ার সম্ভাবনা কম, তবে এই কাগজের প্রচারসংখ্যাও কম নয় — আমাদের এখানেও চলে — দেখেছি তো —'

সম্পাদক জানিয়েছিলেন পরের মাস থেকেই বেরবে — কিন্তু পর পর তিন মাস চলে গেল। এদিকে দিলীপ আর সুবীর প্রতি মাসে স্টলে কাগজে দেখে এসে তাদের হতাশা জানাচ্ছে। বাস্তবিক, সোমেন এতটাই লজ্জিত হয় তার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিতে যে, প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করে '.....' মাসিক পত্রিকার অফিসে ধরনা দেয়। ছ'মাসের মাথায় হা ক্লান্ত সোমেন, লেখাটা ফেরত নেবে ভাবতে ভাবতে পত্রিকার অফিসে পৌঁছে সম্পাদকের টেবিলে, উল্টো দিকের চেয়ারে বসে শোনে, 'লেখাটা বেরবে, তবে আর একটু দেরি হবে।' তারপর সোমেন কিছু বলার আগেই ফের, 'আপনাদের ওদিকে গণেশ মাইতি বলে কাউকে চেনেন?' কথা শেষ করে সম্পাদকের হাঁড়ির মতো মুখটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে প্রায়, চোখে খেলা করে পাতায় পাতায় চলা সাবধানী কুটিলতা, হয়তো সামান্য বিদ্রুপও।

তড়িতাহত সে, তখনই মনে পড়ে নামটা প্রথম দিলীপ অথবা সুবীরের কথায় শুনেছিল সে। ধর্ষণকারীদের পেছনে অন্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তাই বলে এখানে, এই সুসজ্জিত পত্রিকা অফিসে.......এতটাই হকচকায় সোমেন যে কয়েক মুহূর্ত কথাই বলতে পারে না। তারপর তার হাঁ-মুখ উগড়ে দেয় তিনটি শব্দ : 'কেন বলুন তো?'

'না, এমনিই। আপনার সঙ্গে আলাপ আছে কিনা জানতে চাইছিলাম।' কথা শেষ করে তার সম্পর্কে এক ধরনের নিস্পৃহতায় ফাইল ওল্টায় সম্পাদক। খুব দ্রুত সোমেনের মস্তিষ্কে নানা এলোমেলো চিন্তা ঘুরপাক খায়। এই পত্রিকায় যে তার ধারাবাহিক একটা গদ্য প্রকাশ পেতে চলেছে, দিলীপ-সুবীররা ছাড়া আর কাউকেই বলেনি সে। এমন হতে পারে ওরা আরো অনেককে বলেছে। এসব কথা কাউকে বলতে নিষেধ করার প্রয়োজন অনুভব করেনি সোমেন; কেননা, দিলীপ-সুবীররা, বা ওরা যাদের বলবে — তারা সকলেই পত্র-পত্রিকা থেকে অনেক দূরের অসাহিত্যিক লোকজন সব। তবে কি খবরটা শেষ পর্যন্ত ওদের মারফৎ গণেশ মাইতি.... তারপর এই সুসজ্জিত টেবিল.... সোমেন বুঝতে পারে লেখাটা আর ছাপা হবে না এখানে।

বাস্তবিক তাই-ই হলো। চারমাস পরে কোনো কারণ ছাড়াই ডাকে লেখাটা ফেরত এল তার কাছে। অতএব সে লেখা গেল লিটিল ম্যাগাজিনে। সেখান থেকে একটা তৃতীয়শ্রেণীর আধা-পর্ণো পত্রিকায় — হ্যাঁ, সেখানেও চেষ্টা করেছিল সোমেন — অবশেষে তার এই নাতিশীতোষ্ণ ঘরে এসে ড্রয়ারের হিম উপেক্ষায়, বন্দী সেই লেখা দিনের পর দিন, রাতের

পর রাত, কোয়ার্টজের টিক টিক শব্দের মতো তার মস্তিষ্কের মধ্যে ঢুকে যেতে থাকে — দিলীপ রাতের অন্ধকারে মার খায়, সুবীর ছেলেটা একদিন চুপি চুপি এসে জানিয়ে যায়, তার কাছে যে তারা এসেছিল, সোমেন যে এসব নিয়ে লেখালেখি করছে — এসব খবর ওরা জেনেছে; চাষি-পরিবারের ওপর হুমকি অব্যাহত আছে, কেস একটা হয়েছে বটে, কিন্তু অপরাধীদের চিনতে অস্বীকার করেছে মেয়ে দু'টি -- ফলে গালকাটার দলবল নির্ভীক ভ্রমণ করছে — এসব খবর এবং প্রতিদিন কাগজ খুলে ধর্ষণ ইত্যাদির খবরে, সোমেন ড্রয়ারের হিম ঔদাসীন্য থেকে লেখাটা টেনে বার করে এবং অনবরত রি-রাইট ও নতুন নতুন তথ্য ও ঘটনার সমাবেশে একটা দীর্ঘ গদ্যে রূপান্তরিত লেখাটার শিরোনাম দেয়, 'পশ্চিমবঙ্গে গণধর্ষণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (১৯৭০-৯৩) অথবা এলিট-লুম্পেন-পল-পারসন জোট-কর্তৃক সমাজের কিনারার অধিবাসীদের অবদমন'। ফলে যা হবার তাই হয়, লেখাটা তার ছাপার যোগ্যতা আরো হারায়। বিশেষ করে ধর্ষণেব বগরগে বর্ণনাহীন সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি এবং ক্ষমতার অলিগলির বাসিন্দাদের ওপর আক্রমণাত্মক এই লেখা কাউকেই সন্তুষ্ট করে না, তীব্র আক্রোশে শব্দগুলো যেন ফেটে পড়ছে সেখানে।

তিন

তৃতীয় কাপ চা নিয়ে সীমা ঘরে ঢোকে। হাওয়া, উড়িয়ে নিয়ে গেছে কখন বায়সকুলের প্রোপাগাণ্ডামূলক ডাক। প্রোপাগাণ্ডা — কেননা সোমেন লক্ষ করেছে, এক থেকে দুই থেকে চার থেকে আট বাড়াতে থাকে ওরা। শব্দশূন্যতা চিরে টেপ রেকর্ডার থেকে উড়ে আসে 'চোলিকে নিচে ক্যায়া হ্যায.......' আশেপাশের কোনো বাড়ি থেকে হবে। যে বাজায় তার রুচিবৈচিত্র্য সোমেনকে হতবাক করে, কেননা রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে চোলিকে নিচে হয়ে নির্মলা মিশ্র, তারপর অনুপ জালোটায় সে থামে। শব্দব্রহ্মের এই গণজাগরণ অন্তত লেখার টেবিলে যখন বসে সে, তাকে, তার দুই ভ্রূর মাঝখানের চামড়ার কুঁচকে ওঠায় সহায়তা করে কখনও, এর বেশি কিছু নয়।

সীমা এবং চা — দুটোই দেখে সে। যেহেতু চায়ের কাপটা তার সামনে রেখে সীমা একটা চেয়ার টেনে তার সামনে, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সোমেনকে একবার দেখে নিয়ে বলে, 'দাদা, দুটো রচনা অন্তত লিখে দিতে হবে —'

'রচনা!' কাপটা টেনে নিয়ে বোনের দিকে, প্রায় অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকায় সোমেন, যেহেতু এই মুহূর্তে প্রদোষকালীন ছায়াচ্ছন্নতায় স্মৃতিপথে বিচরণরত সে।

'টেস্টে আসবে, স্যার এগুলো আগেই করে রাখতে বলেছেন, ফাইন্যালেও এই চারটের মধ্যে থেকেই আসবে —'

' বিষয়টা কী?'

সীমা একটা কাগজের টুকরো এগিয়ে দেয় দাদার দিকে। সেই কাগজে রচনার বিষয়গুলো লেখা রয়েছে এই ভাবে: (১) পরিবেশদূষণ ও তার প্রতিকারের উপায়, (২) সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের অবদান ও তার থেকে বিপদের সম্ভাবনা, (৩) পারমাণবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা, ও (৪) কলকাতার পরিবহন সমস্যা।

সোমেনের ভ্রূ কুঁচকোয়, পরক্ষণেই আলতো হাসি ঠোঁট ছুঁয়ে যায় তার। চায়ে চুমুক দিয়ে সীমাকে লক্ষ করে বলে, 'সবেতেই দেখছি সমস্যার ব্যাপারটা আছে। চারটেই লিখতে হবে?'

'প্রথম দুটো লিখে দিলেই হবে —

'দু-তিনদিন সময় দে —' তারপর অসহিষ্ণু সোমেন, সময়-তালিকার দিকে চেয়ে বলে ওঠে, 'নিজেও তো একটু বই-টই ঘাঁটলে পারিস। দূষণ-টুষণ নিয়ে তো প্রায়ই কাগজে কিছু না কিছু লেখে আজকাল —'

'দুর! ওসব মনেই থাকে না আমার —' উঠে যেতে যেতে বলে সীমা।

তার গমনপথের দিকে চেয়ে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার বহুবিভঙ্গ, বায়ু-পরিণয় লক্ষ করতে করতে ধর্ষণের ইতিহাসে প্রত্যাবর্তন করে সে।

প্র্যাকটিকালি, ধর্ষণ আর গণধর্ষণের মধ্যে একটা মৌলিক পার্থক্য লক্ষ করেছে সোমেন এবং সেটা তার লেখার মধ্যে পরিষ্কার বলেওছে। ধর্ষণ ব্যক্তির যৌন-লালসার প্রকাশ, বিকৃতিরও। কিন্তু গ্যাংরেপ হলো অন্য জিনিস। যেমন নদীয়ার একটা গ্রামে দীপা, লক্ষ্মী আর বিমলা — তিনটে মেয়েকে একসঙ্গে গণধর্ষণ করার পর খুন করা হয়। এই ঘটনার পিছনে ছিল একটা রাজনৈতিক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব; মেয়ে তিনটেকে রাজনীতির জগৎ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর এই রাস্তা নেওয়া হয়। কল্পনা ধর — বেশ্যাদের সুস্থ সমাজজীবনে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে যুক্ত ছিল — প্রস কোয়ার্টারের দালালরা তাকে গ্যাংরেপের পর তার যৌনাঙ্গে ক্ষুর ঢুকিয়ে দেয়, সুমনা — অসংগঠিত শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করত, ছাদ পেটাই করে যেসব মেয়েরা, তাদের সংগঠিত করার আন্দোলনে যুক্ত এই মেয়েটাও গণধর্ষণের শিকার, গেঞ্জি কারখানার কল্পনা, মীনা আব দীপালি — খুব গরিব ঘরের মেয়ে, প্রায় ঝুপড়ি থেকে উঠে আসা — এরা গণধর্ষণের শিকার হয় একাধিক জটপাকানো কারণে। এইসব কারণের পিছনে যতরকম সামাজিক চক্রান্ত আছে সবকিছুকে ধরতে গিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের ষোল পাতার লেখাটা বাড়তে বাড়তে এখন একশো ছাপান্ন পাতার সুদীর্ঘ প্রবন্ধে রূপায়িত। সোমেন দেখিয়েছে এইসব ধর্ষণ-ঘটনার সামনের সারিতে থাকে লুম্পেনরা, আর পিছনে থাকে রাজনৈতিক দলের তৃতীয়শ্রেণীর নেতারা, তারও অনেক পিছনে আবছা ধূসরিমায় ঢাকা থাকে সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত সংস্কৃতিসম্পন্ন ভদ্রশ্রেণীরা।

যাবতীয় পত্র-পত্রিকা-ফেরত লেখাটা শেষবার রি-রাইট করার পর এক কর্কশ আক্রমণাত্মক মূর্তি ধারণ করে। সোমেন নিজেই বুঝতে পারে, এই লেখা কেউ ছাপবে না। সরাসরি পাণ্ডুলিপি থেকেও অনেক বই হয়। ইতিপূর্বে যেসব পাবলিশারদের প্রুফ দেখা, প্রবন্ধ-গ্রন্থের পরিশিষ্ট বা নির্ঘণ্ট তৈরি, কপি কারেকশনের কাজ সে করেছিল তাদের কাউকে কাউকে সে বললও — কিন্তু বিষয়বস্তু শোনার পর তারা নানারকম ফ্যাকড়া তোলে — ফলত সোমেন উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে রেললাইনের ওপারে চাষি-পরিবার প্রমোটারের কাছে জমি বিক্রি কবে পালায়, গালকাটারা তাকে দেখলে এস্টাব্লিশমেন্ট-হাসি হাসে, দিলীপ সুবীর রাস্তায় দেখা হলে না-চেনার ভান করে মুখ ঘুরিয়ে নেয়, সব মিলিয়ে ক্রুদ্ধ সোমেন সিদ্ধান্ত নেয় সে নিজেই একটা পত্রিকা বার করবে, ত্রৈমাসিক পত্রিকা, সেখানেই লেখাটা তিন-চার খেপে ছেপে বই বার করে নেবে। এর আগে টিন এজ উৎসাহে একবার, তারপরেও একবার — দু'টো পত্রিকা বের করেছিল সে। দুটোরই জন্ম-মৃত্যু এক সংখ্যায়। লেখালেখি থেকে বর্তমানে তার যা আয় হয়, তা অতি সামান্যই। একটা লেখা তৈরি করতে সময় লাগে, তারপর ছাপা হতেও সময়, টাকা পেতে আরো সময়। সব মিলিয়ে সাত-আট মাসের আগে নয়। তাও একটা দুটো কাগজ ছাড়া বাকিরা যা দেয় তা এতই কম যে, লোকের কাছে বলা যায় না - সোমেন টাকার ব্যাপারে দু-একবাব মিথ্যে কথাও বলেছে লোককে। কলেজ স্ট্রিটের প্রকাশক মহলের ওপর আস্থা অনেকদিন আগেই হারিয়েছে সোমেন। বাস্তবিক, নামকরা পত্রিকায় ছাপা না হলে প্রকাশকদের কাছে সে লেখার কোনো মূল্য থাকে না। এইসব কারণে, সোমেন, পত্রিকার জন্য রক্ত বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়। এটা অবশ্য সোমেনের ইউটোপিয়ার লক্ষণ — কেননা, প্রেস মালিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার মাথায় হাত

চড়ে। প্রেস-বিযুক্ত সোমেন জানতই না, ছাপা-বাঁধাই-কাগজের দাম এতটাই বেড়েছে — মোটামুটি ক্ষীণ-স্বাস্থ্যর একটা কাগজ করতেও এখন হাজার-পাঁচেক টাকা দরকার। শরীরে এত রক্ত নেই যে তিন মাস অন্তর — যেহেতু বিজ্ঞাপনের সোর্স নেই, বিক্রিও অনিশ্চিত — তাই, রক্ত বিক্রি করেই একটা কাগজ করা যাবে। তাছাড়া ভালো লেখা ইত্যাদি পাওয়ারও সমস্যা আছে। রক্তের দামও সেই তুলনায় —

সব মিলিয়ে পুরো ব্যাপারটাই ইনটেলেকচুয়াল ইমাজিনেশানের ভূত হয়ে দেখা দেয় এবং অবশেষে সিগারেটের ধোঁয়ার মতো বায়ু-পরিণয়ে লীন হয়। এই পর্বে যৌথভাবে, অর্থাৎ আবো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে কিছু করার পরিকল্পনা করেছিল সে। কিন্তু সে প্রচেষ্টাও প্যাড এবং বিজ্ঞাপনের ফর্ম ছাপানো পর্যন্ত এগিয়ে থেমে যায়, যেহেতু এতসব চিন্তা ও উদ্দেশ্যের বিভিন্নতা যে, সোমেন থামতে বাধ্য হয়। একই পত্রিকায় গণধর্ষণের ইতিহাসের পাশে তৃতীয়শ্রেণীর ছোটগল্প, হিমালয় ভ্রমণের গাইড লাইন — এসব ছাপতে নারাজ ছিল সে।

ছাপাছাপির সব প্রচেষ্টা বন্ধ হলো, কিন্তু সোমেন নিস্তার পেল না। তার গল্প-কবিতা, এমনকি ফিচার — যার বিষয়বস্তু ছিল টিভির বাড়বাড়ন্তে বইয়ের পাঠক কমে যাচ্ছে — সেখানেও, কীভাবে যেন ঘুরে-ফিরে গণধর্ষণের প্রসঙ্গটা চলে এল। অবশেষে দুলাল চক্রবর্তী যখন দেখলেন চাকোলতোড় গ্রামেব ছাতা পরব নিয়ে লিখতে বসেও সোমেন গণধর্ষণের প্রসঙ্গ টেনে আনছে অকারণে, তখন তিনি — যেহেতু এতদিন সোমেনের লেখার ওপর কখনও কলম চালাতে হয়নি, এখন বিস্তৃত কাটাকুটির পর সোমেনকে ডেকে উদ্বেগ আর স্নেহ-মেশানো কণ্ঠে বললেন, 'তোমার হলোটা কী সোমেন? গণধর্ষণের ভূত দেখছি তোমার ঘাড়ে বেশ ভালোভাবেই চেপে বসেছে। এসব কী! কোথায় চাকোলতোড়ের ছাতা-পরব, সেখানেও তুমি আননেসেসারি গ্যাংরেপের প্রসঙ্গ টেনে এনেছ!'

বাস্তবিক এবার সাবধান হতেই হয় তাকে। কিন্তু এই সাবধানতা অন্ধকার রাতে ছাদে উঠে পায়চারি করতে বাধ্য করায় তাকে। কখনও সে বৃষ্টি হলে গাছপালার দিকে হেঁটে যায় একা। ভাবে, এভাবেই নিজেকে শান্ত করবে, কিন্তু সকালে উঠে যখন খবরের কাগজ খুলে দেখে মেদিনীপুরের কোনো গ্রামে মা ও মেয়েকে গণধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে, হুগলীর এক গ্রামে নাবালিকাকে গণধর্ষণের পর আততায়ীরা অ্যাসিড দিয়ে তার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে তারপর তাকে হত্যা করেছে, তখন সে ড্রয়ারের দারু-ঔদাসীন্য থেকে লেখাটা ফের বের করে, নিরুপায় আক্রোশে সোজা-সরল শব্দগুলো সরিয়ে আরো দু-চারটে কুলিশ শব্দ, স্ল্যাং ইত্যাদি ঢুকিয়ে দেয় — যেন শব্দগুলোকেই আগামী যুদ্ধের জন্য নির্মম সৈন্যে রূপান্তরিত করে সে এবং এমনি এক ভাবে ক্রুদ্ধ সোমেনের ডিসিশন দাঁড়ায় 'দিনযাপন' নামে একটা সাইক্লোস্টাইল পত্রিকা — কুড়ি, পঁচিশ বা ম্যাক্সিমাম পঞ্চাশ কপির, মাসে একটা কবে বেব করবে সে, একাই। কফি হাউসের দেওয়ালে ছাড়াও জনবহুল রাস্তায়, কয়েকটা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অফিসের গায়ে সেঁটে দেবে।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবার দ্রুত এগিয়ে যায় সোমেন। দু'টো কবিতা, একটা মিনি গল্প আর নিজের 'ইতিহাস' রচনাটি ধারাবাহিকরূপে আত্মপ্রকাশের আকাঙ্ক্ষায় তার শিল্পীবন্ধু রমেশের আঁকা স্কেচ ও হাতের লেখায় প্রস্তুত হয়ে তার টেবিলে উপস্থিত। শুধু প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়র জায়গাটুকু ফাঁকা রাখা আছে, কেননা, সোমেন তার এই পত্রিকা-প্রকাশের উদ্দেশ্যপ্রবণতার একটা ব্যাখ্যা দিতে চায়।

চায়ের টেবিল ছেড়ে ওঠে সোমেন। সীমা চলে গেছে মাধ্যমিকের ব্যস্ততায়। মা নিশ্চিতভাবে এই মুহূর্তে উনুনের আজীবন শিল্পে, নিভা কোথাও দিদির্মাণ। বারুদহীন মধ্যবিত্ত বাতাস তাকে ঠেলে দিল জানলার দিকে। নিসর্গ দেখে সে, কিন্তু বুকের ভেতর কোথায় যেন লাভাস্রোত বয়। ফিরে আসে। পায়চারি করে। কয়েক পলকের দেখা আট বছরের সেই

চাষির ঘরের মেয়েটি, তার সরু সরু পা নিয়ে সোমেনের সামনে, মুখে কোনো কথা নেই। সেই রাতের পর থেকে সে নাকি আর কথাই বলে না। কত হাজার বছরের বিবর্তনে মানুষের এই ভাষিক অভ্যাস, অথচ এক রাত্রেই সে ফিরে গেছে সেই আদিম হোমো ইরেকটাসের পর্যায়ে! ভাষা নেই তার, লিপিও নেই।

টেবিলেই ফিরে আসে সোমেন। কাগজের রোলটা খুলে চোখের সামনে মেলে ধরে। খুদে খুদে অক্ষরগুলো যেন সারিবদ্ধ সৈনিকের মতো, যুদ্ধের প্রতীক্ষায় অপেক্ষমান।

রেখে দেয় সে পত্রিকা। তারপর কাগজ-কলম টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করে তার সম্পাদকীয়—

গুটেনবার্গের সৈন্য

এত পত্রিকার ভিড়ে কেন আবার এই সাইক্লোস্টাইল-প্রচেষ্টা, তার একটা কারণ দর্শানোর প্রয়োজন আছে — অন্তত নিজের কাছে। শুনেছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ব্লিৎসক্রিগ যখন পিষে দিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা দেশ, সেই সময় নরওয়ের এক অখ্যাত গ্রামের স্কুল-মাস্টার, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে, গ্রামের ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়ে কোনো এক মরমী বিকেলে হতভম্ব গ্রামবাসীদের সামনে, তার নিজস্ব গাদা-বন্দুক নিয়ে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়েছিল আকাশ তাক করে। পরে সকল গ্রামবাসীদের প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়, তার এই বন্দুকচর্চার কারণ : 'হিটলারের বিশাল অন্যায়কে চ্যালেঞ্জ জানানোর, তাকে রুখে দেওয়ার কোনো ক্ষমতাই আমার নেই। মানুষ হিসেবে এই অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতা আমাকে পীড়া দেয়। শক্তির এই ভয়াবহ প্রকাশ নুট হামসুনের মতো প্রগতিশীল সাহিত্যিকের চিন্তাকেও বিকল করে দেয় যেখানে, সেখানে আমার মতো একজন নিরীহ গ্রাম্য-মাস্টার, যে দশজনকে একত্রিত করতে পারে না, আবার নিজের বিবেককেও চাপা দিতে পারে না — এছাড়া তার কী-ই বা করার আছে! আমি বিশ্বাস করি, এই অন্ধকার আর মৃত্যুর উৎসব একদিন কেটে যাবে, সেদিন মানুষ হিসেবে এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য লজ্জায় মুখ লুকোতে হবে আমাদের। তাই এই ঘোর অন্ধকারের, এই মানবিক অপকর্মের বিরুদ্ধে এ আমার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ!'

নরওয়ের সেই স্কুল-মাস্টারের মতোই, আমরাও বলতে পারি, এ আমাদের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ। ১৪৫৫ সালে গুটেনবার্গ যখন মুভেবল টাইপ বা অদলবদল করা যায় এমন হরফ আবিষ্কার করেন, তখন সেই হরফের নাম হয়েছিল গুটেনবার্গের সৈন্য। গুটেনবার্গ নিজেও বলেছিলেন, মাত্র একুশটা সৈন্য নিয়ে আমি বিশ্বজয় করেছি! পৃথিবীর ইতিহাসে এই সৈনিকদের বিপুল কর্মক্ষমতা বারে বারে লক্ষ করেছি আমরা। দাসব্যবসা-বিরোধী আন্দোলনে, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে, ফরাসী বিপ্লবে—সর্বত্র! আজ তার গায়ে পি. টি. এসের ঝকঝকে পোশাকের উল্লাস, শরীরে ভাত-ঘুম স্বাস্থ্যের অলস পসার, চোখে বিজ্ঞাপন সুন্দরীর কটিদেশ জড়িয়ে-থাকা বস্ত্রের নিরুদ্বিগ্নতা! তার শরীর-মন-আত্মা পাশবিক ইতরসভ্যতার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। ভাড়াটে সৈন্যের মতো সে আজ জীবনের বিরুদ্ধে, পণ্য ও ইতরসভ্যতার সপক্ষে। কিন্তু নরওয়ের সেই স্কুল-মাস্টারের মতো আমরাও বিশ্বাস করি, এই ইতরসভ্যতার অন্তিম দিন ঘনিয়ে আসছে। সিফিলিস-আক্রান্ত বারবনিতার মতো তার ছেতরে-পড়া পোকায় খাওয়া যোনিসহ এই কশাইতন্ত্র একদিন পথের ধারে পড়ে থাকবে আর সেই অন্তিম দিনে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা গুটেনবার্গের সৈন্যরা জীবনের সপক্ষে লড়াইয়ে নামবে। তাদের সংখ্যা হবে অফুরন্ত। পৃথিবীর প্রতিটি পথ-ঘাট, রেস্তোরাঁ, অলিন্দ, অফিস-স্কুল, লাইব্রেরি, বিদ্যালয়—সব কিছু দখল করে নেবে তারা। সেই অন্তিম দিনের লক্ষ্যে, আজকের এই অজাচারিতার অন্ধকারে, আমাদের এই সাইক্লোস্টাইল গাদা-বন্দুক প্রচেষ্টা—

উপকথা

বিমল গঙ্গোপাধ্যায়

অফিস বেরোবার সময় তাড়াহুড়ো করা ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে সুদীপ্তর। সব ঠিকঠাক আছে, তবু এটা নেই সেটা নেই করে হাঁকডাক করা, জলের গ্লাস মনে করে মশলার ডিশে চুমুক দিতে যাওয়া, জুতোর ফিতেতে গিঁট বাঁধিয়ে ফেলা, কব্জিতে না বেঁধে হাতঘড়িটিকে প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে নেওযা এমনিসব ব্যাপার স্যাপারে তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে মণি, সুদীপ্তর স্ত্রী। সুদীপ্তর প্রশ্নেব উত্তব দিতে দিতে, 'কই তো', 'তাই তো', 'এই তো' — এমত উচ্চাবণের ফাঁকে ফাঁকে সে চরকির মতো ঘুরপাক খায়। তার কপালে ঘাম জমে যায় বিন্দু বিন্দু। রীতিমত দৌড়ঝাঁপে কখনও কখনও গোড়ালি থেকে শাড়ী উঠে যায় বিশ্রীভাবে বা বুকের কাপড় বেসামাল হয়ে বুকের অনেকটা তলপেট নগ্ন হয়ে পড়ে। এমনকি কথা বলতে গেলে শব্দগুলো অব্দি জড়িযে যায় এর পিঠে ওর পিঠে।

সুদীপ্ত বলে, তোমার কি কিছুই খেয়াল থাকে না? সুদীপ্তব গলায ঝাঁঝ ফুটে ওঠে। বিরক্তিব ভাঁজ পড়ে কপালে। মণি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে বুঝতে পারে গলায পাক দিয়ে কান্না উঠে আসছে। সে তো সাধ্যমত সবকিছু গুছিয়ে রাখে। একতরফা ভুলগুলো সুদীপ্ত করে চলে। আবার ধমকে কথা বলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে, যেন মণির ভুলেই যাবতীয় বিশৃঙ্খলা।

প্রতিদিনের মতো আজও ছোট গোল টেবিলেব ওপব হাতঘড়ি রুমাল চিরুনি মণি গুছিয়ে রেখেছে, সুদীপ্ত খেতে বসার আগেই। সুদীপ্ত ছোট চিরুনিটি হাতে ধরে চিৎকার কবে ওঠে — চিরুনি পাচ্ছি না কেন? আব তখনই মণির দৌড়দৌড়ি, খোঁজাখুঁজি। রীতিমত উদভ্রান্তিকর অবস্থা। সুদীপ্ত গজরাতে শুরু করে, প্রথমে নিচু গলায়, তারপর জোরে জোরে। 'বেআক্কিলে', 'দায়িত্বজ্ঞানহীন', 'হোপলেস' — এমনি সব নিত্যকার শব্দের গা পিছলে, 'রাস্কেল' — স্পষ্ট উচ্চাবণে আজ বলে ফেলল সুদীপ্ত। মণি ততক্ষণে দেখে ফেলেছে সুদীপ্তর হাতেই ধরা রয়েছে ছোট চিরুনিটি। সে খাটের বাজু ধরে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কী বললে? আর একবার বল?

সুদীপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল এবং মুহূর্তে বুঝতে পারল মণির চোখের চাউনি, দাঁড়াবাব ভঙ্গী সব অন্যরকম দেখাচ্ছে। অন্যদিনের মতো নয়। তবু সুদীপ্ত নিজের অবস্থানে ঋজু থাকার প্রচেষ্টায়, কী বলেছি? গম্ভীব গলায় বলল এবং সন্তর্পণে অবস্থাটা সামাল দেবাব চেষ্টা করল — বাজে তর্ক কবতে গেলে দেরী হয়ে যাবে। ট্রেন পাব না।

মণি কিন্তু নড়ল না। স্থির দাঁড়িয়ে রইল। সুদীপ্ত মোজা জুতো পরে অধিকতর মনোযোগী হয়ে জামা গুঁজল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াল প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময় নিয়ে। এমনকি পোকা বাছার মতো করে মশলার ডিসে মৌরি এলাচ সব আলাদা করল। মুখে পুরল একটি একটি করে। সময়ের এই কালক্ষেপ সুদীপ্তর নিজের কাছেই বেমানান এবং অসহ্য মনে হল। কিন্তু সে অবাক হয়ে লক্ষ করল, মণি তার অবস্থান থেকে একচুল

নড়ল না। নির্বিকার মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকি সুদীপ্ত অ্যাটাচিটা হাতে তুলে নিয়ে 'আসছি' বলার পরও অস্ফুট গলার কোন প্রত্যুত্তর শুনতে পেল না। সুদীপ্ত বুটসুদ্ধ পায়ে লাথি মেরে ঘরের দরজা খুলল এবং পরমুহূর্তেই ততধিক জোরে ধাক্কা দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল এবং এই দুই ক্ষেত্রেই বিকট শব্দ সৃষ্টি হল।

সুদীপ্তর জুতোর আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই মণি আস্তে আস্তে জানলার দিকে এগিয়ে এল। পাদুটো তার অসম্ভব ভারী মনে হতে লাগল। মাথার পিছন দিক থেকে ঘাড় বরাবর একটি শিরার দপদপানি সে টের পেল স্পষ্ট। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখল একটি কুকুর পা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে ডাস্টবিনের ছাই ওড়াচ্ছে। কমবয়সী একটি ছেলের সাইকেলের রডে চেপে সমবয়সী একটি মেয়ে হাত নেড়ে কিছু বলতে বলতে খেলার মাঠের দিকে চলে গেল। টুপি মাথায় ভেটেরিনারী সার্জেন অপুদের গোয়াল ঘরের দিকে যাচ্ছে পিচকারির মতো দেখতে বড় একটি সিরিঞ্জ দুহাতে সাপটে ধরে।

কুকুরটির পছন্দমত কোন খাদ্যবস্তু ডাস্টবিনে নাও মিলতে পারে। তবু খোঁড়াখুঁড়ি করে দেখতে হচ্ছে। সাইকেলের সিটে বসা ছেলেটি এবং রডে চেপে মেয়েটির প্রণয় যে কোন মুহূর্তে বিবাদ, তা থেকে বিশ্বাসভঙ্গতায় পৌঁছতে পারে। অপুদের গরুদুটি বিকালে দুধ দেবে, যতটা দেওয়ার কথা তার চেয়েও পরিমাণে বেশী। অবশ্যই সে দুধ পাতলা হবে। তার উপকারও কমে যাবে। কুকুর ছেলেমেয়ে ভেটেরিনারী সার্জেন এবং গরু, প্রত্যেকের সম্পর্কে এমন অনুপুঙ্খ বিচারে, মণির নিজেকে স্বচ্ছন্দ মনে হতে লাগল। তখন সে একে একে সুদীপ্তর অসহায় মুখ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সময় নিয়ে চুল আঁচড়ানো মশলা বাছা, 'আসছি' বলে পিছন ফিরে তাকানো এবং বুটসুদ্ধ পায়ে দরজায় অক্ষম লাথি মারা, সব কটি ছবি দেখল পর্যায়ক্রমে। একবার, দুবার তারপর ড্রেসিং টেবিলের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে স্থির চোখে চেয়ে রইল নিজের প্রতিবিম্বের দিকে। তার হাসি পেল। একলা ঘরে দাঁড়িয়ে সে নিজের মতো করে হাসল। স্বচ্ছন্দে। নির্ভাবনায়।

সুদীপ্ত একটি মাঝারি মাপের বিজ্ঞাপন কোম্পানিতে চাকরি করে। এই চাকরির দৌলতেই তার বিয়ে করা, দু কামরার বাড়ি তৈরি, খেয়ে পরে বেঁচেবর্তে থাকা।

কোম্পানির বড়ো সাহেব লোকটি খেয়ালী। আবার আড়ালে কেউ কেউ বলে খচ্চরও। নতুন যে মেয়েটি টাইপিস্ট হিসাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছে, বড় সাহেব নিজের ঘরে তার বসার ব্যবস্থা করেছে। ঘরটি ছোট। বাইরের আলো বাতাস ঢোকে না বললেই চলে। তাপমাত্রার হেরফের ঘটাবার জন্য সাহেব মেশিন লাগিয়েছে। সেটি চলেও ঠিকঠাক। কিন্তু ঘরের মধ্যে জোরালো আলো লাগানোয় সাহেবের আপত্তি। কাজ চালানোর মতো আলো। অধিক প্রয়োজন হলে, একটি অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি যেন সদ্যফোটা কোন ফুল ধরে রয়েছে আঙ্গুলের আলতো চাপে, এমনি ভঙ্গীতে একটি জোরালো বাল্ব ধরে রয়েছে, আদতে যেটি একটি চমকে দেবার মতো টেবিল ল্যাম্প, সাহেব যেটি জ্বালিয়ে নিজের টেবিলে রাখে। আর টাইপিস্ট মেয়েটিকে বারেবারে জিজ্ঞেস করে — তোমার কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো? মেয়েটির নাম স্বপ্না। স্বপ্না জবাব দেয় — নো স্যার। থ্যাঙ্ক য়্যু স্যার।

সাহেব তখন হেসে বলে, মাঝে মাঝে তোমার দিকেও ঘুরিয়ে দেব। আমি একা ইলুমিনিটেড হব কেন? দিনের মধ্যে অনেকবারই সাহেবের ঘরে ঢুকতে হয় সুদীপ্তকে। প্রতিবারই লক্ষ করেছে স্বপ্না অদ্ভুত জড়োসড়ো হয়ে বসে কাজ করে। এমনকি সাহেব কখনও শব্দ করে লম্বা শ্বাস ফেললে স্বপ্না চমকে মাথা তুলে তাকায়। সাহেব একদিন সুদীপ্তর সামনেই 'সুইটি স্বপ্না' বলে ডাকতেই স্বপ্নার চোখমুখ এতটুকু হয়ে গেছিল। লজ্জায় না ঘেন্নায় সুদীপ্ত বুঝতে পারেনি। কিন্তু স্বপ্নার নাকের পাশে কয়েক বিন্দু ঘাম জমে উঠেছিল মুহূর্তে। সে দেখতে

পেয়েছিল। এই দেখুন? — যেন সুদীপ্তকে সাক্ষী রেখে কথা বলা, এমনি ভঙ্গীতে সাহেব বলেছিল, অ্যাডড্রেসিংটা বেশ অরনামেন্টাল হোল না? এখন থেকে অফিসের সবাই ওকে ওই নামেই ডাকবেন।

তারপর সাহেবের খোলামেলা হাসি। চা আনিয়ে খাওয়া। সাহেবের ব্যক্তিগত জীবনের টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ। সুদীপ্তর প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য। স্বপ্নার সংক্ষিপ্ত 'হুঁ-হ্যাঁ' সংযোজন। সবকিছু মিলেমিশে পরিবেশটা সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে সুদীপ্তর মনে হয়েছিল, যে যাই বলুক, বড়ো সাহেব লোকটি খেয়ালি। কাঁচা কোঁচা একটু ঢিলেঢালা।

আজ হন্তদন্ত হয়ে অফিসে ঢুকে, ফাইলপত্র পেন পিনের বাক্স সব টেবিলে গুছিয়ে রেখে, বাথরুমে যাওয়ার কথা ভাবছে সুদীপ্ত, বেয়ারা এসে বলল, বড়ো সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

তখনও সুদীপ্তর ঘাড় গলার ঘাম মোছা হয়নি। এলোমেলো চুল ঠিক করতে চিরুনি চালানো হয়নি। এমনকি এক গ্লাস জল অব্দি খাওয়া হয়নি। সেই অবস্থাতেই সে বেয়ারাকে বলল, যাচ্ছি।

প্রতিদিনের প্রতিবারের মতো আজও সুদীপ্ত 'মে আই কাম ইন' বলে সাবধানে দরজার ভারি পর্দাটা সরাল। আর তখনই সে স্পষ্ট দেখতে পেল সাহেব নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে স্বপ্নার পিছনে দাঁড়িয়ে দুহাতের বেড়ে স্বপ্নার গলা জড়িয়ে ধরেছে। স্বপ্না কাঠ হয়ে নিজের চেয়ারে বসে রয়েছে। ভয়ে তার চোখমুখ সাদা হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সুদীপ্ত কি করবে বুঝে উঠতে না পেরে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সাহেবের ধমক শুনতে পেল।

সুদীপ্ত মাথা না তুলেই জবাব দিল — বেয়ারা রামশরণ।

নট নাউ।

কিন্তু ও বলল বড় সাহেব আপনাকে....।

সুদীপ্ত তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই সাহেব টেবিলে ঘুসি মেরে চিৎকার করে উঠল — আর ইউ নট আওয়্যার অব্ কার্টসি?

হোয়াট স্যার? — সুদীপ্ত বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল।

'কাম ইন' — জিজ্ঞেস করার সৌজন্যটুকু বোধ করেন না?

আই হ্যাভ আসকড স্যার। — সুদীপ্ত বুঝতে পারল যতটা জোরে তার বলা উচিত ছিল, গলায় তেমন জোর নেই।

ইউ? — আঙুল নেড়ে সাহেব ডাকল সুদীপ্তকে — কাম হিয়ার।

সুদীপ্ত ধীর পায়ে এগিয়ে এল।

বী সিটেড। — সাহেব বলল, লিসন টু হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ। নাম্বার ওয়ান; আপনাকে আমি পাণ্ডবেশ্বরে বদলি করতে পারি।

নাম্বার টু, আপনার ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দিতে পারি।

থার্ড অ্যান্ড লাস্টলি বলে ইশারায় স্বপ্নাকে দেখিয়ে বলল, মিস চ্যাটার্জীকে আপনি আগলি প্রপোসাল দিয়েছেন, এই প্লীতে সাসপেন্ড করতে পারি।

সুদীপ্ত চমকে উঠল। ইতিমধ্যেই তার হাতের চেটো পায়ের তলা ঘেমে উঠেছে। ঢোঁক গিলতে গিয়ে দেখল গলাটা শুকনো খরখরে লাগছে। সে মিনমিনে গলায় কোনরকমে বলল, আপনি খেয়াল করেননি স্যার। আমি জিজ্ঞেস করেছি।

সেম হোপলেস ওয়ার্ডস।—সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। আপনি আমাকে এখনও ব্লেম করছেন? সুদীপ্ত কাতর গলায় বলল। ইউ গো প্লীজ।

এমন ঘোরতর বিপর্যয়ের মধ্যেও এই প্রথম সুদীপ্তর হাসি পেল। কিন্তু আশ্চর্য, হাসিটা তার বুকের মধ্যে পেটের মধ্যে পাক খেতে লাগল। চোখমুখে তার কোন অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল না। সে একবার সাহেবের দিকে আর একবার স্বপ্নার দিকে তাকাল। ঘরের কোন আসবাব তার চেনা বলে মনে হল না। এমনকি ঘরটার আবহাওয়া ঠাণ্ডা না গরম, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বলছে না নিভে আছে, কিছুই সে ঠাওর করতে পারল না। হঠাৎ সুদীপ্তর মনে হল এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র। সে বাদে অফিসের সবাই একপাশে জড়ো হয়ে হ্যাঁচকা টানে তাকে ফেলে দেবার ছক কষছে। বড় সাহেবের হাতে সুতো বঁড়শি হুইল। বাকিরা লাইন দিয়ে সাহেবের পিছনে দাঁড়িয়েছে। যার মধ্যে স্বপ্না শিউশরণও আছে। তাকে বিপদগ্রস্ত করার জন্যেই শিউশরণ মিথ্যে করে বলেছে সাহেব আপনাকে ডাকছে।

আর নিশ্চুপ বসে থেকে স্বপ্না মাদি হাঁসের মতো সাহেবের সোহাগের ভাগ নিচ্ছিল। সুদীপ্ত আর চিন্তা করতে পারছিল না। কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। তারপর 'আসছি' বা যাচ্ছি' এ জাতীয় কিছুই না বলে সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিজের টেবিলে বসে সে কাজের ফাঁকে ফাঁকে সন্তর্পণে সহকর্মীদের চোখমুখের অভিব্যক্তি, লক্ষ্য করতে লাগল। তাদের মাথার চুলেব বিন্যাস, গোঁফের তীক্ষ্ণতা, নাক এবং ঠোঁটের স্ফীতি, এমনকি মাংসল আধিক্যে পুষ্ট ঘাড় — সবকিছুই আজকে তার কাছে বিশেষ অর্থবহ বলে মনে হতে লাগল।

টিফিনের সময় সে অন্যদিনের মতো টেবিলে বসে টিফিন খেল না। পরিবর্তে অফিসের সামান্য দূরে ছোট অপরিচ্ছন্ন পার্কটায় বয়স্ক পাতাবিহীন একটি গাছের নীচে বসে রইল চুপ করে। এই সময় একজন ভিখারি এসে মিনমিনে গলায় ভিক্ষা চাইল। সে ফিরেও তাকাল না। তার সামান্য তফাতে বসে কয়েকজন জুয়াড়ী তাস পিটছিল। তাদের কোন আলোচনা তার কানে ঢুকল না। সন্দেহজনক চেহারার একজন লোক তার সামনে দিয়ে যাতায়াত করল কয়েকবার। সে গ্রাহ্যই করল না। নিজেকে তার যত না বিস্মিত, তার চেয়ে বেশি অসহায় মনে হতে লাগল। একজন প্রকৃত অপরাধীকে সে চিহ্নিত করতে পারল না! পরিবর্তে অপরাধী তাকে দোষী সাব্যস্ত করল! হুমকি দিল! ভয় দেখাল! বদলি, ইনক্রিমেন্ট, মিথ্যা অপবাদ — স্রেফ এই তিনটি ধাক্কাতেই তার ব্যক্তিত্ব টলে গেল! সুদীপ্তর শরীরের মধ্যে অদ্ভুত অস্থিরতা শুরু হল। সোচ্চার না হোক নিরুচ্চার অবজ্ঞাতেও সে তার প্রতিবাদ জানাতে পারল না!

অফিস ছুটি হওয়া পর্যন্ত সুদীপ্ত অন্যমনস্কের মতো নিজের টেবিলে বসে কাজ করল। বড়ো সাহেবের ঘর থেকে তার ডাক এল না একবারও। শিউশরণ তার টেবিলে জলভর্তি যে গ্লাসটি রেখে গেছিল, একসময় বাথরুমে গিয়ে সে গ্লাসের জলটুকু বেসিনে ঢেলে দিয়ে এল। অ্যাকাউন্টেন্ট বাগচি একবার জিজ্ঞেস করল — বোসের শরীর খারাপ নাকি?

সুদীপ্ত এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যাতে হ্যাঁ বা না দুই মনে হতে পারে। তখন রেকর্ডকীপার পরমেশ্বর বলল, কোন বাড়িতে শান্তি নেই মশাই।

আর এর গায়ে গায়েই সুদীপ্ত চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। কে হাসল দেখার জন্য ঘাড় তুলে তাকতেও ইচ্ছে করল না তার।

স্টেশন থেকে সাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে শরতের জলভরা ভাসমান মেঘ তাকে ভিজিয়ে দিল খানিকটা। অনায়াসেই সুদীপ্ত কোন ছাউনির নিচে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু সে দাঁড়াল না। মণি দরজা খুলে দিয়ে অস্ফুটে বলল, ইস!

রোজকার মতো মণি কিন্তু সুদীপ্তর সঙ্গে 'এই হয়েছে' — 'তাই হয়েছে' বলে কথা বলতে শুরু করল না। যন্ত্রচালিতের মতো বাথরুমে তোয়ালে দিয়ে দিল। সুদীপ্তর ভেজা জামাকাপড় বারান্দার দড়িতে মেলে দিল। বেশ শব্দ করেই চায়ের কাপ রাখল ছোট গোল টেবিলটার ওপর। তারপর নিচুস্বরে টিভি খুলে দিয়ে, সোফার ওপর বসে একদৃষ্টে চেয়ে রইল পর্দার দিকে। তখন সুদীপ্তর সকালে চিরুনি খুঁজে না পাওয়া এবং আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলির কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু মন খারাপ বা ঐজাতীয় কোন বোধে আক্রান্ত হল না সে। এমনকী রাতের বেলায় খেতে বসে মণি যখন বলল, আর একটু তরকারি দিই?

সে মুখে জবাব না দিয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল — না।

রাতে শুতে যাবার আগে মণি পোশাক বদল করল। হাল্কা প্রসাধন করল। যেমন সে রোজ করে। তার খুব অভিমান হতে লাগল। আর তাই খুব সজাগ হয়ে রইল সুদীপ্তর অতি ক্ষীণ গলায় 'মণি' ডাক শোনার জন্য।

একই বিছানায় দুজনে শুল। দুপাশে মুখ করে। মাঝে খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে। নিশ্চুপ জেগে শুয়ে দুজনেই। হঠাৎ সুদীপ্তর বুক খালি করে লম্বা শ্বাস বেরিয়ে এল। বেশ শব্দ হল তাতে। মণি চমকে পাশ ফিরল — কী হল? কষ্ট হচ্ছে?

সুদীপ্ত বলল, না। আসলে কী জান — এইটুকু বলে সে একটু থামল। তারপর মণির খুব কাছে সরে এসে নিচু গলায় থেমে থেমে অফিসের পুরো ঘটনাটা বলল। বলতে বলতে তার গলা ধরে এল — আমি কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। কী অসহায় অবস্থা যে তখন আমার!

মণি চুপ করে শুনছিল। সুদীপ্ত থামতে আস্তে করে বলল,

কোনভাবেই পারলে না?

সুদীপ্ত প্রথমে ঘাড় নেড়ে বলল, না। তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমনি ব্যগ্র গলায় বলল, মিথ্যে দোষারোপ শুনতে শুনতে হাসি পেয়ে গেছিল।

মণি চকিতে বিছানায় উঠে বসল — সত্যি?

হ্যাঁ। — সুদীপ্ত মাথা নাড়ল। — তবে কী জান? সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে হাসতে পারলাম না। — সুদীপ্তর গলাটা বিমর্ষ শোনাল — হাসিটা ভেতরেই রয়ে গেল।

অল্প সময়ের জন্য নির্বাক দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন পাশের ঘরে ঘড়ির টকটক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। নীরবতা হেতু সময়ের মন্থর দীর্ঘতা। একসময় সুদীপ্ত খুব সহজ এবং স্বাভাবিক গলায় মণিকে বলল, শুয়ে পড়।

মণি তখন তার দুহাতের বেড়ে সুদীপ্তর গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আর একদিন অহেতুক মিথ্যেবাদী বলে অপমানিত হতে হলে, হাসিটা তোমার বুকের মধ্যে থেকে আপনিই বেরিয়ে আসবে। দেখো তখন....।

তখন পাশের ঘরের ঘড়িতে সুরেলা আওয়াজে রাত বারোটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। সময়ের হিসাবে ঈশ্বরের পৃথিবীতে আর একটি দিনের সূচনা হচ্ছে।

সুখ

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

সূর্য তখন হেলে গিয়েছিল পশ্চিম মাঠের নীচ বরাবর তাল-খেজুরেব মাথায়। ঐ মাঠের কোল থেকে আলপথ ধরে কারা যেন এগিয়ে আসছিল। অনেকখানি দব থেকে হাঁটাটা চোখে পড়ে, মানুষগুলো অচেনা থেকে যায়। ওরা যত এগিয়ে আসে, মাথার পুঁটুলি আর বগলের বড় বোঁচকাখানা মানুষ ছাপিয়ে চোখে লাগে। একটা মেয়েমানুষ আর সঙ্গে দুটো ছেলে। কি বা কারা ঠাওর করা মুস্কিল। আর একটু এগিয়ে এলে চোখে পড়বে। ধানক্ষেত, আমজামের বাগান, বামুনপুকুর, গোটাকয়েক ডোবা আর তিনটে শ্মশান মন্দিব এই নিয়ে গাঁ। এদিকে যখন আসছে তখন গাঁয়েরই ঘরে আসবে। মাস গেলেও নতুন কেউ আসা চোখে পড়ে না, তাই কেউ এ গাঁয়ের লাল রাস্তা ধরে এলে সবারই একটা কৌতূহল থাকে। বিশ ঘরের মধ্যে কারো না কারো ঘরে উঠবে। আসছে ঠিকই কিন্তু হাঁটার গতিটা বড় বিরক্তিকর। সাতপো মাটি ছেতালে আসছে। যেন নড়তে পারে না। তবে একটু পা চালিয়ে এলেই ঝঞ্ঝাট কমে যায়। বোঝা যায় কার ঘরের কুটুম মানুষ আসছে। আর খানিকটা পা চালাতে না চালাতে সূর্যটা পুরোপুরি ডুবে গেল। আলো-আঁধারিতে মানুষগুলো আবছা হয়ে যায়। মুখচোখগুলো হারিয়ে যায় পুঁটুলির নিচে। এখন শুধু মনগড়া সব ভাবনা। বৌ ভাবে ওর দিদি, ভাইপো ভাবে পিঁসি, গিন্নী ভাবে কোলনাড় বোন, কর্তা ভাবে হা-ভাতে মুকুন্দপুরের অভাগী বোনটা। কার ঘরে যাবে ঠিক নেই, তবু ওই একটুক্ষণের মধ্যে ভাবনার ভাঙ্গাগড়া চলে।

সন্ধ্যের শাঁক বাজে। তুলসীতলায় প্রদীপ দেখিয়ে বৌয়েরা গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে। গোপালের বৌ প্রণাম করে মাথাটি তুলে দেখে দোরগোড়ায় তার শাশুড়ী হাহু-হাই করছে। পিদিমটাকে কোনমতে ঘরে ঢুকিয়ে শাঁকে তিনটে ফুঁ দিয়ে দোরগোড়ায় গিয়ে দেখে ভৈরবেব মা। পুঁটলিটা তখনও কোমরে। আঁতকে ওঠে গোপালের বৌ। কয়েকটা লণ্ঠন চারপাশে জড়ো হয়েছে। সে আলোয় দেখে সিঁথিতে সিঁদুব নেই, হাতে শাঁখা নেই, পরনে থান কাপড়। শেষ যখন এসেছিল বছর সাতেক আগে, লালপেড়ে কাপড় মাথায় দগদগে সিঁদুর, একহাতে কাচের রঙিন চুড়ি, ঢল-নামা শরীর। রং যেন ফেটে পড়ত শরীরে। শাড়ী ব্লাউজের ভেতর থেকে ভরাট যৌবন গরবে ঢলে পড়ত। তখন চারপাশের অন্ধকারেব মাঝে ভৈরবের মায়ের সাদা কাপড়টা সবাইকে যেন আঁতকে দেয়। হা-হুতাশটা সেই হতবাকের বেশখানিক পরের কথা।

গোপালের বৌ পাথর হয়ে যায়। ভৈরবের মা র ফাগুন মাসেব চৌদ্দ তারিখে বিয়ে হয়েছিল। নেপালের বৌও এসেছিল একই দিনে। এ-পাড়া ও-পাড়া ব্যাপার তাই বাজনার আওয়াজে একেবারে ঝমঝম করছিল। গোপালেব বাপ মাইক-টাইক পছন্দ করেনি। আব আজকালকার মত ভুজনোবাড়ি, গাছ প্রতিষ্ঠা কি লক্ষ্মীপুজো, দুর্গাপুজোতে তখন এত হিন্দী সিনেমার গানও বাজত না। গোপালের বাপ মদন চাটুজ্যে দু দল বাজনা করেছিল। ওপাড়ায় গদাধর চক্রবর্তীর ছেলের বিয়েতে ছাগলবাজনা হোল। গদাধব চক্রবর্তী তার দু

বছর আগে মরে গেছে, কাজেই নিজের বিয়েতে নিজেকেই যোগাড়যন্তর করতে হোল রাখহরি অর্থাৎ খেলুকে। বুড়ি মায়ের ইচ্ছে এক ছেলের বিয়ে, তা ছাগল বাজনা হোক। যত ফুঁক দেবে চামড়ার পেট তত ফুলবে। ছাগলের ঠ্যাং-এর মত মুখগুলো ছড়িয়ে আছে চার দিক। সানাই-এর মত সুর। প্রথম ভ্যাঁতেই বুঝিয়ে দেবে বিয়ে লেগে গেছে। পাশাপাশি পাড়ায় দুই নতুন বউ এলে এমনিতেই বউদের কত জানার কথা থাকে, তার উপর আবার মুখের ছাঁদ ভাল হলে তো কথাই নাই। পুকুরঘাটে চৌদ্দ বছরের ছুঁড়ি থেকে চুরাশি বছরের বুড়ি পর্যন্ত চেপে ধরবে।

পুকুরঘাটেতেই দু নতুন বউয়ের আলাপ হয়েছিল। প্রথম প্রথম বাপের বাড়ির জন্যে মন কেমন কেমন, তারপরে রাতে ইয়ের ব্যাপার আর সবশেষে দিনে দিনে শাশুড়ীর তেজ বাড়া এ-নিয়ে মনের কথাবার্তা বলত। পরে সয়লার সময় সই পাতিয়ে ফেলল দু-জনে। কখনও কলসীর ভেতর করে এ-ওর জন্যে আম আনছে, নারকেলের নাড়ু আনছে, অরুচির সময় আচার আনছে। তবে এসব বছর দুয়েক।

মা মারা যাওয়ার পর খেলু এদিক-ওদিক চাকরীর সন্ধান করতে লাগল। একটি ছেলে হয়েছে। তার উপর ছুঁয়োচের দিন পালেদের মন্দিরে পুজো করাতে যজমানরা চটে গেছে। হাসপাতালে ছেলে হয়েছে খবর পেয়েছে তবু সংক্রান্তির চালকলার লোভে না জানিয়ে পুজো করল। যজমানরা বলেছে মন্দিরে উঠতে দেবে না। মা-ও যা হোক ঝামেলা মিটিয়ে গত বছর হার্টফেল করে মরে গেছে। খুঁজতে খুঁজতেই তারকেশ্বরে একটা কাঠকলে কাজ পেয়ে গেল খেলু। চলে গেল বউ-বেটা নিয়ে। তারপর মাঝেমাঝে এসেছে। এলে ভৈরবের মা সইয়ের খবর নিয়েছে। আজ সইয়ের থান কাপড় দেখে গোপালের বৌ চোখে কাপড় চাপা দিল। বিয়ের দিনের বাজনার সুর এখনও যেন কানে বাজছে!

দু-চার কান শুনে যে যার কাজে চলে যায়। গোপালের মার ঘরের সামনে এতক্ষণ ধরে এত কথা হল তাই সবাই ধরেই নিল গোপালের মার ঘরেই ঢুকবে। অনেক কথার পর গোপালের মা র যখন তিনটি পাতের কথা মনে এল তখন মনটা কেমন খচখচ করতে লাগল। তবু গোপালের মায়ের মনটা খানিক নরম। তার কত্তা দিন পনের উত্তরে তীর্থ করতে গেসল তাতেই মনটা কেমন আঁকপাঁক করছিল। বয়েস তা ষাট-সত্তর হোল তবু একদিন কুটুম-বাটুম বাড়ি গেলে বিছানাটাকে সমুদ্দুর মনে হয়। আর এ বৌয়ের তো বিয়ে হোল এই সেদিন। দিনকতক যাক, তারপর জঞ্জাল কেটে ঘরটা খানিক গোবর লাতা দিয়ে উঠে যাবে। গোপালের মায়ের ডাকে ভৈরব পুঁটলিটাকে আগেভাগে কাঁধে তুলে ঘরে ঢুকে যায়।

পুঁটলি দুটো রেখে হাতে লণ্ঠন নিয়ে ভৈরবের মা পুকুরঘাটে যায়। হাত-পা ধুয়ে উঠানে গুড়-মুড়ি খেতে বসে। ভৈরব এত বড় বাড়ি, ধানের মরাই, চাল রাখা অত বড় ডিলিটা দেখে হাঁ হয়ে যায়। নেড়ামাথায় সদ্য গজিয়ে-ওঠা খচখচে চুলগুলোর উপর হাত বুলিয়ে এত চাল-ধানে কত কাল চলতে পারে ধারাপাতের বিদ্যেয় তার হিসেব করার চেষ্টা করে। ছোট ছেলে পচা বছর চারেকের। কাপড়ের ভেতর দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে মাই কামড়ায়। দুধ নাই তবু ঝোঁক ছাড়ে নি। মাঝে মাঝে মাথা দিয়ে এদিক-ওদিক ঘষে — ছুঁচের মত বেঁধে চামড়াসার বুকের উপর তবু ছেলে গোঁ ছাড়বে নি। গুড়-মুড়ি চেবাতে-চেবাতে ভৈরবের মা বরের মরণবেলার যন্ত্রণাটা শোনায়।

সকাল বেলায় কাজে বেরোবার আগে বারবার বলছিল শরীরটা কেমন লাগছে। কাজে যাবার মেজাজ নাই। তা খেটে-খাওয়া মানুষ একদিন না খাটতে গেলে পেটে টান পড়বে। তাছাড়া কলে কাঠও জমা পড়ে আছে বেশ কিছু। মেশিনে খাইয়ে কাটিয়ে রাখতে পারলে নিশ্চিন্তি। না গেলে মালিক এখন খচখচ করবে, পাঁচকথা শুনোবে। বলবে এখন ছ্যাঁকছ্যাঁকে জ্বর কি মাথাব্যথায় দুশো টাকার ক্ষতি হয়েছে। নেপালের বাপ সকাল থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত ভালই কাজ করছিল। শাল আর সেগুনের গুড়ি দুটোকে কেটে রেখেছিল, তারপর বুকের কাপড়ের উপর বনচকলদার কাঠটাকে লাগিয়ে মেশিনের ব্লেডে আটকাতে গিয়ে

জ্বরো গায়ে মাথাটা ঘুরে কাঠের বদলে নিজের মাথাটা আগিয়ে দিল ব্লেডের মুখে। ওদিকে ধানকলের আওয়াজ, এদিকে কাঠকলের আওয়াজ — কোন শব্দই কারো কানে গেল না। ওদিকে মালিক তিনবার ডেকে কতদূর কাজ এগোল জানতে চাইল। তিনবারেও সাড়া না পেয়ে বেসামাল লুঙিটাকে ধাতে এনে — 'শালা লাটের বাঁট, উত্তর দিতে পারিস নি, মরে গেছিস নাকি' — বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে দেখে কাঠটা ফাড়া হয় নি — রাখহরির মাথার চাঁদিবরাবর ব্লেডটা খানিকটা ফেড়ে দিয়েছে। রক্তে সেগুন কাঠটা রক্তচন্দনের মত টকটকে হয়ে গেছে। মানুষটা কাটা ছাগলের মত লাফাচ্ছে। হাসপাতালের গাড়ি এসে বিনের বটতলায় যখন নিয়ে গেল কাৎলা মাছের মত তখন লাফাচ্ছে। খানিকটা পরে ধকধক করতে করতে বুকটা পুট করে থেমে গেল। রাখহরি শ্রীহরির আশ্রয়ে চলে গেল।

ভৈরবের মা ঘর-দোর ঝাঁট, বাসন মাজা, কাপড়-কাচা, ধান-সেদ্ধ, বাটনা-বাটা, মুড়ি-ভাজা এসব কাজ করছে গোপালের মায়ের ঘরে। তা যা কিছুই করতে হোক পেট ভরে খাবার অভাব হয়নি। ভৈরবের বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে তো সব দিন দুবেলা জোটে নি। যতদিন বিশ-পঞ্চাশ টাকা ছিল যা হোক হয়েছে। ধারদেনাও তো কিছু ছিল। ভৈরবও এ-কদিনে বেশ চটপটে হয়ে উঠেছে। এমনিতেই বেশ ফড়োয়াৎ ছেলে তার উপর বাপ মরার পর মাসকয়েক অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। বাপ মরার পর অবস্থাটা কি বুঝেছে আর তাই সকাল থেকে গোয়াল পরিষ্কার করা, বেগুন-বাড়িতে জল দেওয়া, ছাগলটাকে তেঁতুলপাতা এনে দেওয়া এসব বেশ ঝটপট করে। মাস-খানেক বেশ কেটে গেল।

সেদিন রাতে গিন্নী কত্তাকে শোনাল, বৌ আজ রাতে পান ছিঁচে রা[illegible] একদিন দুমড়ে মুচড়ে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, ছিঁচেছে। ভৈরবের মা আসার পর ভেবেছিল বৌ রাতে একটু তেল মালিশ করে দেবে কিন্তু দুদিন বাতের যন্ত্রণায় পা একেবারে বেঁকে যাচ্ছে, বৌ চোখে দেখেও মুখে একটিবার 'আহা' পর্যন্ত করে নি। গোদানি দিনরাত শাশুড়ীর নামে ভৈরবের মাকে লাগাচ্ছে। কত্তা শুনে চুপ করে রইল। প্রতিদিন তিনটে পাতা পড়লে বছরে কত পড়ে সে হিসেব করা আছে। শুধু চুপ করে রইল, গিন্নী যাতে শুনছে কি মনে করে আরো রেগে যায় সে ইচ্ছেয়। রাগেরও একটা মাধুর্য আছে। এখন অবশ্য রাগলে একটা লাভও আছে। এমনই রেগে গেল গিন্নী যে কালকেই ভৈরবের মাকে নিজের ঘরে উঠে যেতে বলল!

একদিনে মায়ে ছায়ে অনেকটা ঘরটাকে বাগিয়ে এনেছিল। টালির ঘরের ভেতরটা ইঁদুর মাটিতে ভরে গিয়েছিল। গোবর দিয়ে বুজিয়ে ক্ষেতমাটি দিয়ে লাতা দিয়েছে। সামনের ঝোপ-জঙ্গল কেটে ফেলেছে অনেকখানি। নালার ধারের কুল ঝোপটাতে একটা চোবা দিতেই দুধ গোখরোটার লেজটা বামে হেলে যায়। 'বাপরে' বলে চেঁচিয়ে উঠে ভৈরব পেছন দিকে ছুটে আসে। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ছুটে আসে চারপাশ থেকে দু-চারজন। লাঠি দিয়ে সরিয়ে দেখে সাপ দুটো মড়ার মত শুয়ে আছে — জোড় লেগেছে। গোপালের মা ঘর থেকে নতুন গামছাটা নিয়ে ছুটে আসে। ফেলে দেয় সাপ দুটোর উপরে। খানিক পরে সাপ দুটো ফোঁস করে ওঠে। জোড় লাগা সাপ মারলে পাপ হয়। সাপ দুটো ফণা নামিয়ে বড় ফাটল দিয়ে বনের মধ্যে সেঁদিয়ে যায়। সাপের চেয়ে লক্ষীমন্ত গামছাটার দিকে সবার নজর তখন বেশী। গোপালের মা ঠাকুরনাম করতে করতে সাত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকে যায়।

মাসখানেক যেতে ঘরদোরটা খানিক বাগানো হয় কিন্তু পেটের চিন্তা ক্রমশ বেড়ে যায়। ভৈরবের মা খাটার মত কাজ পায় না। বামুন ঘরের বৌ তো আর মাঠে ধান রোয়া ধান কাটাতে যেতে পারে না। আর ঘরসংসারের কাজকর্ম সে সব ঘরে ঘরে বৌ-শাশুড়িতে করে নেবে। ধোয়াধুয়ি আজকাল আর কি করবে। চুরি-চামারির ভয়ে কাঁসার থালা অধিকাংশ ঘরে অর্ধেক তুলে দিয়েছে। টিন কি কলাই করা। ডাবু পর্যন্ত পিতল নাই। লোহার চলছে। সারা জ্যৈষ্ঠ মাসটা ভৈরবের মা এ-ঘর সে-ঘর ঘুরল, দু একদিন ধানসিদ্ধ কি বিয়েবাড়ির

মুড়ি ভাজল কিন্তু তাতে তো আর নিত্যদিন হবে না। বড়টা যা হোক কিছু যোগাড়যন্ত্র করে, কিন্তু ছোটটি তো কাজ করার মতও হয় নি অথচ ক্ষিদের টান আছে। দিনরাত মাকে ঝুনে খাচ্ছে ভাত দাও, মুড়ি দাও, গুড় দাও, পিঁয়াজ দাও করে।

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি ভৈরবের বাগালিটি গেল। গরুর পাল নিয়ে মাঠে গেছে এদিকে বগনাটার পিছু পিছু তাড়া করেছে পশারীদের ধুমসো এঁড়েটা। ছুটতে ছুটতে একেবারে বৈঁচের ডাঙায়। পিছু পিছু তেড়ে গেছে ভৈরব। ই ফাঁকে চারটে হেলে বাড়ুয্যেদের জমিতে নেমে ফসলে মুখ দিয়েছে। বাড়ুয্যেদের সঙ্গে চাটুয্যেদের অনেক কালের ঝগড়া। গরু চারটেকে খোঁয়াড়ে দিল। তারপর লেগে গেল গিন্নীতে গিন্নীতে গালাগালি, সবশেষে হাই প্রেসারেব চাটুয্যের সঙ্গে লো প্রেসারেব বাড়ুয্যের বাখনাবাখনি। ভৈরবের বাগালিটি গেল।

শাক পাতা যোগাড় করে আষাঢ়ের কটা দিন গেল। বর্ষার জল পড়েছে। ধান রোয়া লেগে আছে। জমিতে পুরনো বেগুন আছে আবার খানিক নতুন বেগুন ধরেছে। খানিক কাঁঠাল এখন গাছে ঝুলছে। ছেলে দুটো কেমন, ছকছকে হয়ে উঠেছে। এব-ওর মাঠেব ধারে ঘুরঘুর কবে। বাগানের ভেতর সুড়সুড করে। মায়ের বারণ শুনতে চায় নি। মারও খায তেমন মায়ের কাছে।

আষাঢ় মাসের আজ ছাব্বিশ তারিখ। উল্টোরথ। ঠাকুর কুটুমবাড়ি থেকে রথে করে ফিরছে। লাগোয়া পাশের গাঁয়ে মেলা বসেছে। ছোট কাঠের রথ — মেলাও ছোট। ছেলে দুটো সকাল থেকে মেলা দেখতে যাবে বলছে। মেলা দেখতে যাওয়া মানে পযসা নিয়ে যাওয়া। ভৈরবের মা ছেলে দুটোকে বুঝোয় মেলাতলায় ছেলেধরায় কত ছেলে ধরে নিয়ে চলে যায়।

সকাল থেকে চানবেলা পর্যন্ত পুকুরে হাতড়ে খানিক গুগলি কুড়িয়েছে ভৈববের মা। আজকাল ঘরে ঘরে হাঁসচাষ, কত গুগলি আর পুকুরে থাকবে। শুষনি শাক আর গুগলি সেদ্ধ করে ছেলে দুটোকে খানিক দিয়ে নিজের মুখে একগাবল শাক গুঁজে দু ঘটি জল খায়। তাবপব দুয়োবে আঁচল পেতে শুয়ে পড়ে। ছেলে দুটো উঠোনে ঘুরছে। দুপুর পডতি মুখে গাল পাড়াপাড়ি শুনে উঠে বসে ভৈরবের মা। তাকিয়ে দেখে ছেলে দুটো চালতা গাছটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। গাল দিচ্ছে গোপালের মা। ব্যাপারটা খানিক পরে বোঝে। ওদের গাংদেয়ালির হাঁড়ি তালগাছটায় আজ সবে একটি তাল নেমেছে আর হা-ভাগীর ব্যাটা দুটো কুড়িয়ে নিয়েছে। কাছে ডাকতেই ছেলে দুটো বলে — 'না মা, আমরা কুড়োয় নি।' ভৈরব বলে — 'শব্দি পেয়ে ইখান থেকে যেতে যেতে কে কুড়িয়ে লিয়েছে।' ভৈরবের মা বোঝে গিন্নী আগের ঝাল ঝাড়ছে। নিজে চুপ করে পড়ে থাকে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরদোর পুকুরঘাট আসতে যেতে গালে তুলে দেয় গোপালের মা। হঠাৎ সন্ধ্যের দিকে ঘর ঢুকে চারদিক ভাল করে হাতড়ে দেখে ছুটে বেরিয়ে আসে ভৈরবের মা। ছুটে যায় গোপালের মায়ের কাছে। গলা তুলে গাল পাড়তে থাকে। আগুনের মত জ্বলে ওঠে ভৈরবের মা। ব্যাটার মাথায় হাত রেখে গোপালের মা বলুক ঘর থেকে তাল বার কবতে না পারলে ব্যাটার মরামুখ দেখবে। ভৈরবের মার মূর্তি আর ব্যাটার মরা মুখের কথা শুনে গোপালের মা গলা নামিয়ে গজগজ করতে ঘর ঢুকে যায়।

রাত নামে। খানিক পরে আকাশে সিকি-খানা চাঁদ ওঠে। রাত গভীর হয়। উনোন জ্বলে। ভৈরবের মা তাল মাড়তে বসে। লেচ্চি খাবার জন্যে ছেলে দুটো দু পাশে বসে। লেচ্চিটা চিবোতে চিবোতে ময়দা মেখে ফেলে। উনোনে তাওয়া চাপায়। খান দশেক রুটি করে ভৈরবের মা। উনোনটা নিভিয়ে দেয়। কুপিটা জ্বলে। কুপিটাকে ঘিরে তিনজনে খেতে বসে। রুটিগুলো মুখে তুলেই তিনজনেই মুখ তোলে। তালরুটির স্বাদে মিষ্টতা যেন ঠোঁটের দু পাশ দিয়ে ঝরে পড়ছে। কারো মুখে কথা নেই কিন্তু সারা মুখে গভীর একটা আনন্দ টলটল করছে। ঘরের ভাঙা দেওয়াল, চারপাশের ভাঙা বেড়া, কুপির কালো শীস্ আর আকাশের চাঁদটা ঐ টলটলে গোটা আনন্দের কাছে নেহাতই বেমানান। এ সুখের আনন্দ তারা জানে না।

অন্ধকারের নান্দীপাঠ

উৎপলেন্দু মণ্ডল

সবে জোয়ার লেগেছে। দুধের সরের মতো নরম পাঁক। একটু তফাতে শক্ত চরের ওপর যদুপালন আর ধানী ঘাস। জোয়ারের জল সেখানেও উঠবে। জল ঈষৎ নীল। শীত এখনও যাই যাই করেও রয়ে গেছে। পায়ের দিকটায় একটু শির্‌শিরানি জাগে। সামনেই ফাল্গুন। নিতাই বাঁ হাতে জালের দড়িটা ধরে ডান হাতে লাঠির ওপর ভর দিয়ে টানতে থাকে। এই ফাল্গুনে যদি নমিতারে .... শালা সমাজ, সমাজের মুখে ইয়ে কবি। নিজেরা একেবারে সতীলক্ষ্মী! সব শালাদের সে চেনে। নিতাই সতর্ক হয়। গরম শুরু হবার মুখে বড্ড কামটের উৎপাত। তখন জলে নামতে ভয় হয়। এই কটা দিন জাল টেনে সে আর নদীতে নামবে না। জঙ্গল করতে যাবে। তার আগেই যদি নমিতারে ....

জোতদার বাড়ির ঘাটের সামনে আসতে হেমা জিজ্ঞেস করে, মাছ পড়তেচে কিনা। হেমার নৌকাটা চরাতে আটকে রয়েছে। জল আর একটু বাড়লে নৌকো আপনি ভেসে উঠবে। হেমাদের পয়সা আছে। গত সনে লঙ্কা চাষ করে অনেক পয়সা পেয়েছে। কয়েক বিঘে জমিও কিনেছে। নৌকো মাঝনদীতে নোঙ্গর করে বেঞ্চি জাল পেতে বসে থাকে। ব্যস্, আর কামট কুমীরের ভয় নেই। কিন্তু তাদের তো আর উপায় নেই। গতর যত দিন আছে তত দিন কামট কুমীর আর বাঘের থেকে নিস্তার নেই। ভগবান ভরসা। তাকে বিশ্বাস করলি সব হবে। কিন্তু ভগবান কই, কুই আর তার দিকে তাকাচ্ছে? না হলি সে এত দিনে নমিতাকে বে করতি পারল না! নমিতার বাবাও তেমনি। সুধীরকাকা, কত ছোটবেলা থেকে ওদের বাড়িতে চুল কাটতো। সে কত দিন সুধীরকাকাকে বলেছে — কাকা, আমার ব্যাকসাইট কাটে দ্যাও। তা কাকা কাটতি চাইলি কি হবে, বাবা মোটেই কাটতি দিত না। বলত, বাবু হবা? বাবু হলি বাঁকা লাঙ্গল ধরবে কারা? আমরা চাষাভুষা লোক। কিন্তু জমি আর কোতায়? সব তো গাঙ্গ-ভাঙ্গনে। তা আর যে ক' বিঘে আছে তা বাবার এখনকার নবাবপত্তুরদের ভোগে লাগবে। তাকে তো ছিটেফোঁটাও দিল না। তার ওপর নাপতির মেয়ে বে করলি! না, সামনের ফাগুনেই .... আর দেরি করলি হবে না।

নমিতা সেদিন দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ওপরে। তাকে দেখে বটতলার দিকে চলে গেল। ইশারায় ডাকল। ও আর দেরি করতে চায় না। তার দাদারা ভাইরা তাকে আর বাড়িতে রাখতে চাইছে না। সে যেন সামনের মাসে..... না হয় সে দুলো জোতদারের কালী মন্দিরের থেকে সিঁথনে সিঁদুর ছুপিয়ে নেবে।

ধানী ঘাসের ওপর সে জাবড়ে বসে, তারপর মাটির মালসাতে জালের কুচোপোনাগুলোকে সব ঢেলে ফেলে একটা একটা করে পোনাগুলো গুনে অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে তোলে। সত্তর টাকা হাজার। কাঠির মতো পোনাগুলো যেন নারকেল কাতার দড়ি। নারকেল কাতা ছোট ছোট করে কেটে যদি এর সঙ্গে সে মিশিয়ে দেয়, তাহলে .... শালা ব্যাপারী যদি বুঝতে পারে! মাথায় খেলে যায় ব্যাপারটা। একদিন পরখ করে দেখতে হবে। বানগাছের ছায়া

বিস্তৃত হয়। বেলা বাড়ে, আবার দলিজ ঘরে বসে নিজের ভাতটা নিজে ফুটিযে নিতে হবে। আর কদিন সে হাত পুড়িয়ে রান্না করবে? সামনের মাসে সে নমিতাকে বিয়ে করে নিয়ে আসবে। তাদের জমির সেরে খাস জমিতে সে ঘর বাঁধবে। কে তাকে বাধা দেবে!

গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দখিন দিক থেকে হাওয়া বয়। জলের স্বচ্ছ নীল আভা অন্তর্হিত হয়। জল সাদা ও ঘোলাটে হয়। গত সপ্তাহে সুখময়ের মেয়েকে কামটে কেটেছে। আজ তাই জলে নামতে ভয় হচ্ছে নিতাইয়ের। কাল নমিতা বারণ করে দিয়েছিল। সে যেন চাকতি জাল নিয়ে আর না টানে। হেমার নৌকোয় যদি ভাগীদার হয়ে জাল ফেলতে দেয় তাহলে যেন অবশ্যই যায়। নমিতা জানে না — হেমা কেন অন্যকে ভাগীদার করবে! তার লাভ কমে যাবে না? কিছু টাকা যোগাড় করতে পারলে — বর্ষার আগে জমির সেরে ঘরটা সে তুলতে পারত। মা গঙ্গার নাম করে সে জলে নেমে পড়ে। তার সঙ্গে অনেকেই নেমে পড়েছে। সবাই বেশ একসঙ্গে দেখে মজা করে। গল্পে গল্পে ভালই কাটে। এর মধ্যে ঝগড়া টগড়া যে হয় না তা নয়।

হারু রপ্তান কয়েক দিন হল ধাপার মাঠ থেকে এয়েছে। কলকাতায় কাজ করতে গিয়েছিল। ফুটানি খুব, সেও জাল নিয়ে তাদের সঙ্গে টানছে। হারু এদের মধ্যে বয়স্ক — গলা খাঁকারি দিয়ে সে সবাইকে শুনিয়ে বলে — তা তুই শেষ পর্যন্ত নাপতে বেটির পীরিতে পড়িছিস — তা ভাল — তুগো জন্যি সমাজের আর কিছু থাকল না। তোমরা এখন লায়েক হয়েচ — কী আর বলব —

— কেন, নাপতি গো কাছে ক্ষৌরী হয়ে তবে শুদ্ধ হও, আর তাগো মাইয়ে বে করতি গেলি তখন আর সমাজের কিচু থাকল না, না! কেন লম্বা হরেনের ছেলে কী করছে জান না! দিনরাত কলুনপাড়ায় গিয়ে পরের বউয়ের সঙ্গে বক বকম্ করতেচে, তার বেলায় কিচু হয় না! হারু চুপ করে যায়। তখন কানা কেষ্ট জোরে জোরে একমনে গান গায় —

পীরিতে ইরিতে কাঁঠালের আঠা / ও ভোলা মন
লাগলি পরে ছাড়বে না —

দখিনা বাতাসে সে গান পল্লবিত হয়ে রাঙ্গাবেলে, কচুখালী নদী-প্রান্তর-বনে ধাক্কা খায়। কেবল সরোমাসি নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে বলে ওঠে — কী হয়েচে হারু, ও যদি সুধীর নাপতির মেয়েকে বে করে, তালি তুগো কী — তোরা খাওযাবি না পরাবি! সরোমাসি মায়ের বয়সী। মা বেঁচে থাকলি সরোমাসির মতো জাল টানতে হোত। মাঝে মাঝে মাসি চিৎকার করে ওঠে '— এ নদী নয় রে, গতজন্মের ভাতার।' অন্যেরা তখন বলে — 'ও মাসি, তোমার ভাতারের এত মাগ কেন?'' এই নদীতে সরোমাসির বর মারা গিয়েছিল। সরোমাসিই তাকে একটু যত্ন আত্তি করে। নিজের ছেলেপুলে নেই। মা মারা যাওয়ার পর ওর কাছে এসে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেয়। তা সরোমাসি একদিন বলেছিল — মেয়েটা খারাপ নয় নেতাই — গড়ন বেষ্টন ভাল। বাবার মুখ পেয়েছে। পিতৃমুখী মেয়েরা সুখী হয়। তা সেই সুখের জন্য তো সে দিন নেই রাত নেই নদীতে পড়ে আছে। জমির সেরে খাস জমিতে ঘরটা না তুললে তার আর শান্তি নেই।

আজ বাড়ি যাওয়ার সময়ে কয়েক আঁটি যদুপালন তুলে নিয়ে যেতে হবে, ঘরেতে আজ জ্বালানির কিছু নেই। মাথার ওপর রোদ বেশ গন্‌গনে। ত্রিমোহনায় সুধাংশু মাঝি খেয়া দিচ্ছে। এপারে এলে আর ওপারে যাবে না। সেই আবার বিকেলে — তা যদি এ রকম একটা খেয়াঘাট রাখতে পারত তাহলে শালা জলের মধ্যে আর এরকম করতি হোত না। পাছায় বসে বসে শুধু নৌকো বাও। পারে গিলি পয়সা। ভালমন্দ লোকজন দেখা যেত। কত বাবুলোক এখন সোন্দরবন দেখতি আসে। তা তাদের সঙ্গি দুটো কতা বলতে চাইলে কলকাতায

অপিসি টপিসি একটা কাজটাজও তো করে দিতে পারত। এই ডাউনি আর থাকতি ভাল লাগে না। জমির সেরে ঘর বেঁধে কী হবে, একেবারে কলকাতায় গিলি হয়! নমিতা লোকে বাড়ি ঝি-র কাজ তো করতে পারবে!

— কি রে, বাড়ি যাবিনে নাকি? বেলা দুকুর —

— না, এই যাই। ক আঁটি যদুপালন তুলতি হবে।

২

গাবতলার পুকুরে চান করে একা নমিতা। তার সঙ্গে বাবা মা ভাই কেউ কতা কয় না। গাবতলার ছায়ায় সে নিজেকে উন্মুক্ত করে দেখে—স্তনবৃন্তে পরিবর্তন, তলপেট ভার, যেন নড়াচড়া। নিতাই জানে। বললে শুধু হাসে।

এট্টু সবুর কর নমি — সামনে বর্ষার আগে ঘর তুলবই। মানুষটা যে কী, সে ঠিক বুঝতি পারে না। কালকে বলল নবীন জোতদাবের নৌকো মহালে যাবে। এ বছর নাকি মধু ভাল, সবাই বলছে —। যাই কর বাপু, তাড়াতাড়ি কর। শেষে আইবুড়ো অবস্থায়! শয়তানটা পেটে নড়াচাড়া করে। তুমি কি বাপু বুঝতি পারছ না? সেদিন কিচু টাকা হাতে দিয়েচে। তার এখন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তবু সে থাকত, মনে হোত কত কাচে — যেন তার সামনে আচে। সেই দীঘল চেহারা, মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। কেন যে এত মনে পড়ে! যার সঙ্গে সে সারা জীবনের জন্য গাঁটছড়া বাঁধবে, তাকে না দেখলে যেন মনে হয় সব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। কবে ফিরবে কে জানে! যা গোঁয়ার লোক, কী করছে কেউ আন্দাজ করতে পারবে না! আজ হয়তো গোসাবা থেকে চালডাল নিয়ে যাত্রা করবে। হে মা শাজঙ্গুলি, তুমি রক্ষা কর। তোমার জঙ্গলে গিয়ে মানুষটা যেন সুস্থ ফিরে আসতে পারে। সামনের বছরে তোমার থানে পুজো দেব মা। আঁচলটা ভাল কবে কোমরে পেঁচায়। ভিজে কাপড় যাতে কেউ বুঝতে না পারে। পায়ে পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগোয়। মা রান্নাঘরে ভাত খাচ্ছে। তাকে ডাকেও না। সে যে কী করে এ সংসারে আছে তা ভগবান জানে আর সে জানে। শুধু সাদা বেড়ালের ছানাটি তার জন্য অপেক্ষা করছে। সব্বায়ের খাওয়ার পর সে খায়। হাঁড়ির পাশে সানকিটা থাকে। তখন বেড়ালটা ডাকতে থাকে — তাকে ডাকে। এস, খেতে এস। মুখের গ্রাস তুলতেই মনে পড়ে মানুষটার কথা — কোথায় খাচ্চে, কী করছে।

তার বাপ-ঠাকুর্দা কোনো দিন বন করতে কিংবা মহালে যায়নি। গামাল করে বেড়িয়েছে। সে ভালয় ভালয় ফিরলে একবার দুখেযাত্রার পালা গাওয়াবে। বাবা এখনো গামাল থেকে ফেরেনি। আসার আগে খেয়ে নিতে হবে। সে এখানকার কেউ নয়। সে বিয়ে করবেই। বেজাত? তাতে কী হয়েছে? মানুষের আবার জাত কী? লোকটা আর কত বছর হাত পুড়িয়ে রাঁধবে? তার জন্য নিজের বাবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেছে। বাবা তার নামে এক কাঠা জমিও দিল না। জমির সেরে কোনমতে ঘর তুলবে। কোথায় কাঠকুটো, কোথায় খড়, নাড়া —

খাওয়ার পরে এ সময়ে পেটটায় কি রকম অস্বস্তি হয়। সামান্য ব্যথাব্যথা করছে। শত্তুরটা কি এভাবে জানান দেয়? কোথায় রাখবে শত্তুরটাকে। কবে ঘর তুলবে — তার স্বপ্নের বাড়িঘর। তার স্বপ্নের মানুষ। এ সময়ে এক রাজপুত্তুর যেন তার দু-চোখে চুমু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয় — সেই রাজপুত্তুরকে চোখে দেখা যায় না। শুধু অনুভব করা যায়। এক স্বপ্নিল মায়াময় জগৎ! কোথায় বাবার খরচক্ষু — কোথায় মা, কাকিমার বাঁকা কথা। আঃ, কি ঘুম! সে স্বপ্ন দেখে — নিতাই জাল টানতে টানতে তাকে টানছে। তারপর হেঁতাল বনের

ভেতর তাকে অকারণ ডেকে নিয়ে যায়। গাছের আড়ালে কেউ তাদের দেখতে পায় না। তারা দুজনে শুধু স্বপ্ন দেখে। এ সময়ে নিতাই তার মুখের ওপর মুখ নিয়ে আসে। পাকা খেজুরের গন্ধ মুখে। বাতাস আরও দামাল হয়। দখিনা হাওয়া এগিয়ে আসে হেঁতাল বন ভেদ করে। ফরেস্টের একটা লঞ্চ শুধু ভট্‌ভট্‌ শব্দ করে। আবেশঘন নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে খান্‌খান্‌ হয়।

বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় সামনের দিকে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখে —ফরেস্টের লঞ্চ নয় -- রইস খাঁর মেচো ভট্‌ভটি। ন্যাজাটে যাচ্ছে। নিতাই থাকলে মাছ দিত। নমিতা ভাবে ওদের মাছ কত জায়গায় না যাচ্ছে। আর তারা এখানে পড়ে আছে। নিতাই শুধু স্বপ্ন দেখে তার বাবার জমির সেরে সে একটা ঘর তুলবে। চারপাশে শুধু চেনা লোক, এদের মাঝে থাকতি তাদের ভাল লাগে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নমিতা আবার পাশ ফিরে শোয়। তেল চিট্‌চিটে বালিশে মাথা রেখে মনে হয় সামনেই নিতাই, এক মাথা কোঁকড়ানো চুল। দীঘল চেহারা — যেন কালাচাঁদ। যুগ-যুগান্তর ধরে রাধা যে ভাবে অপেক্ষা করে সেইভাবে সে অপেক্ষা করছে—

সামনে মরিচঝাঁপি। কালো জমকালো বন। যেন বা গহন গোপন কোন অন্ধকার পর্বত। কত মানুষের যন্ত্রণা এখানে। 'দণ্ডকারণ্যের কত লোক এখেনে এসে ছিল বল দেখি!' পাছায় বসে গোঁড়া-বুটে ধরে বাঁজা নগেন। মুখে পোড়া বিড়ি। তার কথায় কেউ বড় একটা গুরুত্ব দেয় না। তাদের মাথায় একটাই চিন্তা — পিটেন পুলিশ গাঙ জুড়ে ছোটাছুটি করতেছে। শালাদের লঞ্চে কী যেন লাগানো — শব্দ হয় কম। দণ্ডকারণ্যের কত লোক মরল কত কোল বাচল তার হিসেব করে এতদিন পরে কী হবে? তারা নিজেরা এ যাত্রায় বাঁচবে কিনা কে জানে! ধরলেই শালা জেল। বাঘের মুখ থেকে বাঁচা যাবে — কিন্তু ওই শালাগো মুখ থেকে বাঁচা অসম্ভব। শালা ফরেস্টের পুলিশ। শুয়োরের বাচ্চারা ফরেস্ট করেচে — কী, না বাঘ পুষতেচে। লোকে খাতি পারতেচে না, আর শালারা বাঘ পুষব। কী হবে বাঘ পুষে! আগে ব্ল্যাক করলি তবু দুটো পয়সা পাওয়া যেত — আর এখন পাস কর — দত্তর ফরেস্ট অপিস থেকে সই সাবুদ কর — শালা হাজার বায়নাক্কা।

—জোরে কোল টান।

নিতাই বাঁজা নগেনকে হেঁকে বলে। সামনে বড় টান। নিতাই মনে মনে বলে, সব শালা বসে বসে ঝিমুচ্ছে। দাঁড় খেঁচার জোর নেই। শুধু মচ্‌মচ্‌ করে আওয়াজ হচ্ছে। কাল সকালে প্রথম বনে নামতে হবে! দুপুরের মধ্যে যদি একবার ছাঁটা দেওয়া যায় তাহলে কাল সূয্যি ডোবার পরে আর এক ছাঁট দেওয়া যাবে! ঘরের চার কোণায় চারটে মজবুত খুঁটি দরকার —ভাল দেখে ক'টা খুঁটি কেটে যদি একবার নৌকার মধ্যে ফেলে দিতে পারে, তাহলে ঘরের ভাবনাটা কিছু কমে। একবার গোসাবায় যেতে পারলে, সাহাদের গোলায় মধু মোম বেচে দাও, কাঁচা পয়সা। আঃ ঝন্‌ঝন্‌ করে বাজে! তারপর জমির সেরে খাস জমিতে ঘর, পুকুর, উঠোন। লাউমাচা, পুঁইশাক, সামনে তেঁতুলগাছ — উঠোন জুড়ে বাচ্চারা হামাগুড়ি দেবে। স্বপ্নে-জাগরণে সে খুব জোরে হ্যাঁচকা টান দিলে। হিসনে জোড়া থেকে দাঁড় দড়ি ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যায়। নিতাই পিছনে গুঁড়োর ওপর পড়ে যায়। বিনোদ বাউলে তাকে ধরে।

— কী দরকার বাবা এত জোরে। এই তো আর মোটে দু-বাঁক, তারপর একেবারে বনে —

— হুঁ ......

এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শুধু বাঁজা নগেন তার হেঁড়ে গলায় গান গেয়ে ওঠে। একবার সে হালদারকাটিতে যাত্রায় বিবেকের গান গেয়েছিল, দুঃখের গান, কিঞ্চিৎ কথা ও সুর সহযোগে অন্ধকার চিরে সে জানান দেয় —

দেখরে দুখে নয়ন মেলে আমি যে তোর মা,
খুঁদকুড়ো অঞ্চলে বাঁধা — আমি যে তোর মা....(গলা সপ্তমে চড়ে)

মা বলার আর্তি এমন, যেন সবাইকে মনে হয় মা বনবিবির শরণাপন্ন। তবু তার মাঝে নিতাই বলে, শালা গান মারাচ্চ! সুমুখি চ্যায়ে দেখ কোনও ছোট খাল-টাল আচে কিনা। ফরেস্টের লোক আচে কিনা —। শুধু গান মারালে হবে?

মাখনের মতো সর। নরম। মায়ের স্নেহের মতো কোমল। তারপর বন, সারি সারি। যেন নিপুণ শিল্পী এক আশ্চর্য দক্ষতায় রচনা করেছে। যেখানে বান গাছ সেখানে শুধু বান গাছ, যেখানে ক্যাওড়া সেখানে শুধু ক্যাওড়া। প্রকৃতির আশ্চর্য শ্রেণীবিন্যাস।

ওরা চর থেকে তফাতে নৌকো নোঙ্গর করেচে। যাতে বাঘ সাঁতরে তাদের নৌকোর কাছে না চলে আসে। কলার মোচার মতো নৌকোটা ভাসে, ঢেউয়ের ধাক্কায় দুলতে থাকে। গলুইয়ে বসে শুধু একজন। মুখে বিড়ি। সতর্ক চোখে চারদিকে তাকায়। কুডুল। তেমন হলে সবাইকে ডাকবে —

* * *

মুচিপাড়ার গাঙ্ ভাঙ্গনের কাছে এসে নমিতার পেট ব্যথা করে। কি রকম যেন! এর আগে এভাবে হয়নি। কোমর জলে দাঁড়াতে পুঁটি পেছন থেকে বলে — কি রে নমি, দাঁড়ালি কেন?

— এই দেখ না, পেটটা কি রকম ব্যথা ব্যথা করছে।

— ও গরমের ব্যথা, ভাতার পেলে ঠিক হয়ে যাবে।

সামনে হাঁটু জলে সরোমাসি। সব শুনে বলে — চল, ওই গাছতলায় চল।

ঝাঁকালো বানগাছটির তলায় বসে পড়ে ওরা। সামনের মাটির মালসায় পোনাগুলো গুনে গুনে তুলছে। নমিতা আর বসতে পারছে না। সরোমাসি ওকে গাছতলায় শুইয়ে দেয়। এখানে মাটি একটু শুকনো। নমিতা চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। মাসি পাশে বসে বাগদার পোনা গোনে।

— মাসি গো, আর পারতিচি নে।

— র মা, এট্টু তো সহ্য করতি হবে। ভাল করে এট্টু দেখি। সামনে হেঁতাল বাগান -- চল, ওখেনে চল। ব্যথা খা মা — মাসি দরদের সুরে বলে, ঠাকুর দেবতার নাম কর। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।

নমিতা শুয়ে সেই স্বপ্নের কথা ভাবে। শুধু নিতাই নেই, সেই স্বপ্নে আরও একজন আসছে।

আচালবাদা, ঘন অন্ধকার। খলসে গাছের গন্ধে সারা বন ম ম করছে। সবাই আকাশের দিকে মুখ করে — গাছের ডালে চাক খোঁজে। হাতে চক্‌চকে দা। সাতজেলের শশধব কামারের তৈরি। বিনোদ বাউলে সবাইকে সতর্ক করে দেয়।

—মউলেরা সব সতর্ক থাক। যেখেনে চাক সিখেনে ওনারা। তেমন কিচু নজরে পড়লি —

নিতাই পেছন থেকে বলে — হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে।

নিতাইয়ের হাতে হেঁতাল পাতার বোড়ে। চাক দেখলেই আগুন জ্বালাবে। হাতে কুড়ুল। সুমুন্দিদের কাউকে দেখলে একেবারে মাথা জাঁতিয়ে কোপ।

বিনোদ কাঁদো কাঁদো গলায় প্রার্থনা করে, মহিমে দেখাও ঠাকুর — মহিমে দেখাও। গরিবগুরবো লোক লোভ সামলাতি পারি নে। পাপ নিওনা মা।

নিতাই জানে, বাউলে যতই কাঁদুক, কোনো অবিশ্বাস্য অলৌকিক মহিমা সে দেখতি পারবে না। সব শালা পচা ঠাকুর। রাতে অন্য মাগী না হলি ঘুম হয় না। দিনে একেবারে পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা! সঙ্গীদল অনেকটা এগিয়ে। একেবারে সামনে বাঁজা নগেন। ওর মরার ভয় নেই। সবাই জানে ওর বউ পালিয়েচে ওর অঙ্গের দোষের জন্যে। সবাইকে বলে, ও আগে থাকবে। নিজের পৌরুষ হয়তো ও এভাবেই জাহির করতে চায়। বাঁজা নগেনের চোখের দৃষ্টিও প্রখর। বান খলসে, কোন গাছে কোন মাছি চাক বাঁধে সে জানে। এ জনিই বিনোদ তাকে নিয়ে আসে, সে কোনো বার না বলে না।

নিতাই শুধু বিনোদ বাউলের ঘাড়ে বসিরহাটের গামছাটা দেখে। ডালপালার মধ্যে ঘন অন্ধকারে ভাল করে কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ চোখে পড়ে দুটো জীবন্ত লাল ভাঁটার মতো চোখ সামনের দু-পা খাড়া করে পাছা পেড়ে বসে আছে। ঘুট্‌ঘুটি অন্ধকারে চোখদুটো যেন তাকে ডাকছে। বাঁ হাতের কুড়ুলটা ডান হাতে নিয়ে আসে। বোড়েটা বগলে। শুধু একবার বিনোদদা বলে চিৎকার করে ওঠে.... তারপর ঐ দুটো চোখে খোঁজে বাঁচন-মরণ। তার বাবা দীন জোতদারের বারোভাতারী মেয়েটাকে বিয়ে করার পর এভাবে তাকায়। নমিতার বড়দা তার দিকে এভাবে তাকায়। যেন সেই দু-জোড়া চোখ। যারা তাকে ভয় দেখায়।

হুঙ্কার দিতেই ডান হাতটায় যে কুড়ুলটা ধরেছিল সেটা ছুঁড়ে মারে, একেবারে মাথা তাক করে। অব্যর্থভাবে লাগেও, নাক বরাবর মাথায় বিঁধে থাকে। মাথার মধ্যে সেঁধিয়ে যায় সাতজেলের শশধর কামারের কুড়ুল। দক্ষিণ রায়ের বাহন আরও রেগে যায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে নিতাইয়ের ওপর। স্যাণ্ডো গেঞ্জির ওপর দুই থাবা। ঘাড়ের ওপর কৃন্তক, ছেদক দাঁতের যুগপৎ আক্রমণ। তারপর বনের গাছগাছালির মধ্যে শিকার মুখে নিয়ে দৌড়।

বিনোদ বুঝতে পারে, বাঁজা নগেনদের ডাকে। তারাও বাঘের পেছনে পেছনে ছোটে। নগেন হাতের দা সজোরে মারে। গাছের গুঁড়িতে গায়ে লেগে সেটা ফিরে আসে। তুলে নিয়ে দেখে শুনে একেবারে সামনে গর্ভিনীর পেট ঘেঁষে কোপ। শালা ছেনাল মাগীর মতো পেট! নাইকুণ্ড জুড়ে ভাতের হাঁড়ি। যেন হালদার বড়ির উঠোন জুড়ে রোদ। উঠোনে পোয়াতী মাগীগুলো সারি বেঁধে শুয়ে। মাঝে মাঝে বউটাকেও শুয়ে থাকতে দেখে।

-- ধর ধর, ছাড়িয়ে নে। এই নগেন, দিখতেচ কি?

অনেক কষ্টে ছাড়িয়ে নেয়। ঘাড় বেয়ে রক্ত গেঞ্জি ভিজিয়ে দিয়েছে। মুখে গ্যাঁজলা। ঘাড়ে নিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারে নগেন মৃত মানুষের ভার অনেক।

স্থানত্যাগের আগে বানগাছের একটা লম্বা ডাল কেটে তার মাথায় বিনোদ গামছাটা বেঁধে দেয়। রীতি অনুযায়ী স্মারকচিহ্ন এটাই। শ্যামাপদ বলে — হবে না! যত্ত সব আপদ! আইবুড়ো মাইয়ে নে দিনরাত ঢলাঢলি করবে। মা বনবিবি কি এসব সহ্য করতি পারে?

নৌকোর গলুইয়ে শোওয়ানো সাদা থান কাপড়ে ঢাকা নিতাই। সারাদিন ধরে নৌকো চলেছে, পিটেনের ভয়ে। নগেন তেমনি পাছায় বসে। নির্বিকার শ্যামাপদ বলে — আমাগো পাস থাকলি নেতাই তবু সরকার থেকে টাকা পাতো।

— ওর টাকা নেবে কে। সুধীর নাপতির ছেনাল মাইয়ে? সে দেখ, পেট করে বুসে রয়েচে। দেশে আর আচক বাচক আচে মনে কর?

ভোরের হিম ঠেলে এখন চৈত্রের দাবদাহ। প্রত্যেকের গায়ে সাদা নুন। এ টিপটা ভাল হল না। কেজি কুড়ি মধু হয়েছে, তাও আবার ভাগী পাঁচজন। নিতাইয়ের ভাগ যদি ওই মেয়ে — বিনোদ ভাবে, তারও বদনাম হল।

বাঁজা নগেন আস্তে করে নৌকোর পাছা ঠেকায়। তারপর কোল টেনে চর বরাবর নৌকোর ডালি রাখে। গলুইয়ে শোয়ানো সাদা থান কাপড়ে নিতাই। যেন অপূর্ব চিত্রকলা। দীঘল শরীর, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল।

তখনই হেঁতালের ছায়াময় আঁধার কাটিয়ে কেঁদে ওঠে নবীন পুরুষ। সরোমাসির ঠোঁটে হাসি ফোটে। ঘোরের মধ্যে শুয়ে নমিতা স্বপ্ন দেখে — জমির সেরে ঘাস জমিতে ঘর। সামনে তেঁতুল গাছ৷ রোদ্দুরে টান টান উঠোনে হামাগুড়ি দিচ্ছে তার স্বপ্ন — কোমরে মোটা ঘুন্‌সি।

বারচারেক পাঁকে পা দিতেই পা তেতে ওঠে নগেনের। এরপর সবাই জিজ্ঞেস করবে। সবাই জেনে যাবে। তবু যতক্ষণ চুপ করে থাকা যায়। বিড়ির প্রথম টানের ধোঁয়াটা ছাড়তেই কানে ভেসে আসে শিশুর কান্না.....প্রথমে বাতাসে, তারপর বিদ্যাধরীর নোনা জলে মিশে যায় সেই শব্দ। অনঙ্গ অন্ধকারের বুকে নান্দীপাঠ। নগেন আশ্বস্ত হয়। ওকে বলতে হবে না। বড় হয়ে সব জেনে যাবে —

শুধু চরাচর জুড়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে নিমফুলের গন্ধ। সমুখে দামাল দখিনা বাতাস.. ...

কোপ

মুর্শিদ এ. এম

কোহিনুর মার্কেট থেকে লোহাপোল অনেকখানি পথ। সরু অলিগলি রাস্তা। মানুষজন, টাঙ্গা আর এই কিছুদিন হোল অটোরিকশায় জমজমাট। দুধারে কাঁচা নালা। পাকা নালাও পাড় ভেঙে কাঁচারই মতো। দুদিকেই টালি-ছাওয়া বস্তি। মাঝে মাঝে এঁদো ডোবার কিনারে চামড়া ট্যানিং করার কারখানা। সারাক্ষণ চামড়া-ধোয়া জল বয়ে চলেছে নালায়। ডোবাতে জমে উঠছে কাঁচা চামড়ার কুচি, ছাঁট। অন্য এলাকার কেউ হাঁটতে গেলে নাকে কাপড় চাপে। কেউ কেউ বমিও করে ফেলে। তবে যারা এখানে বহুদিন বসবাসে আছে তাদের কোনও অসুবিধাই নেই। জীবনধারণের অন্য আয়োজনের মতো এই থেমে-থাকা আকাশ আর তার স্তব্ধ বাতাস অভ্যাসে মিলেমিশে গেছে।

গলির মুখে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে এপাশ-ওপাশ ভালমত দেখে নিচ্ছিল নাজিয়া। লোহাপোল পর্যন্ত হাঁটতে হবে। ঝপ করে রাস্তা পেরিয়ে হাঁটা শুরু করে দিল।

সারা শরীরের পলিথিনের চটি-পরা পা দুখানি ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। কাঁধে চার মাসের শিশু। চোখ বুজে নেতিয়ে আছে। তার শরীরে এক-টুকরো কাপড়, — কোমরের নীচে। বাকি অংশ মৌরলা মাছের মত ফ্যাটফেটে শাদা। বেলা এগারোটার গরমে ঘেমে উঠছে নাজিয়া। কালো বোরখা সমস্ত রোদ্দুর শুষে নিয়ে জমা করছে নাজিয়ার পনের বছরের দেহে।

আগের দুখানা বাচ্চা এমন কষ্ট দেয়নি তাকে — যেমন এই শেষেরটা ভুগিয়ে চলেছে। হাজার রকমের রোগবালাই ঘিরে ধরে আছে পয়দা হওয়ার পর থেকেই। দশ মাস ধরে শুষে নিয়েছে নাজিয়ার চর্বি, রক্ত। এখন হাড়-মাস খাওয়ার নেশায় যেন পেয়েছে। পিঠোপিঠি এক- দেড় বছর ছাড়া বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে-দাইয়ে সব দুধ শেষ। সেজন্যেই কিনা কে জানে, ছোটটির শরীর বাড়তেই চায় না। নাজিয়ার শাশুড়ি বলে, মনহুশ অওরত। অপয়া। বেহুদা হয়ে ঘুমলে-ফিরলে তো অ্যায়সা হি হোতা হ্যায়। নাজিয়া বুঝতে পারে, দাই ঠিকমত খালাস করতে পারেনি। হাসপাতালে ভর্তি হতে চেয়েছিল। শাশুড়ি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছিল। — হসপিটাল যায়ে তেরি দুশমন। বড়া লুফাৎ-মজা হ্যায় না মর্দোকে হাত বচ্চা পয়দা হোনে কে লিয়ে? ছিঃ ছিঃ — মহল্লো মে মু দেখানে লায়েক নহী রহে। হামলোগ মর গয়ে কা?

পাশ থেকে সায় দেয় পাড়াতুত বোন — আপাজান সহি বোলিস। কাহে কো ঘরেলু অওরত যায়ে নাপাক হোনে। রগোয়া কাট কে ও নাস-বন্দি করা দিস বহুত জানানা কো।

আরও কিছু শুনতে হোত নাজিয়াকে, এরই মাঝে ফরিদ এসে পড়ে। কথাবার্তা বন্ধ করে ঘোমটায় ঢাকাঢুকি হয়ে যে যার মতো সরে যায়। ফরিদের পেছন পেছন ঘরে উঠে আসে নাজিয়া — ভারি তলপেট নিয়ে।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা পেশল মানুষটার দিকে তাকিয়ে কথা কইতে ভয় লাগে নাজিয়ার। হুকুমের অপেক্ষায় কাছাকাছি দাঁড়ায়। ফরিদ জিজ্ঞাসা করে — কি সব হচ্ছিল ওখানে? গুলতানি মারার জায়গা পাওনি? কী বলছিল ওই বাঁজা মাগীটা?

ধমক শুনে থতমত খায় নাজিয়া। সত্যিকথা বললে কী জানি কী করে বসে! নিজের মতো করে বানিয়ে বলে, — খালাজানের ছেলেপিলে নেই তো, তাই আমাকে একটু সাবধানে থাকতে বলছিল।

— তা, ও বলার কে। কী করতে হয় না হয় আমরা বুঝব। আর কথা বাড়ায় না নাজিয়া। কথাগুলো বেশ নরম। রাগ নিয়ে বলছে না। চুপ করে গেলেই চাপা পড়ে যাবে। রাগ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া মানুষটাকে ভারি পছন্দ নাজিয়ার। সারাদিন কতটুকুই বা বলতে পায় মনের মতো কিছু কথা? এখন তবু তো বলা-কওয়া হল যাহোক। তা ছাড়া শাশুড়ি বা পাড়ার লোকদের সঙ্গে ভালমত হয়ে ওঠে না। ভাঙা ভাঙা দেহাতি উর্দুতে তারা যা বলে, তা বুঝতে পারে — কিন্তু বলতে পারে না। মুন্নির আব্বা বাংলাই বলে তার সঙ্গে। অন্য জায়গায় উর্দু। খুব রেগে গেলে ইয়ার বন্ধুদের গাল দেয় ইংলিশে। মুন্নির আব্বা এখন গোসল করবে। সাবান মেখে হাতের শুকনো খুনের দাগ তুলবে। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুম। বিকেলে আবার আমবাগান বাজারে। খাসি মাংসের দোকানে।

ফরিদের বয়স যখন বার, তখন থেকেই সৈয়দ কাইয়ুম তার ছেলেকে লাগিয়ে দিয়েছে খাসির দোকানে। ছড়ি হাতে দঙ্গল নিয়ে যাওয়া আসা, দেখভাল। দানাপানি দেয়া। খাল ছাড়ানোয় সাহায্য করা — এ সবই শিখে নিয়েছিল ফরিদ। রাত আটটার মধ্যে মাংস শেষ, দোকানের ঝাঁপ নামিয়ে তাসের আড্ডায় বসে যেত কাইয়ুম। বোড়াল থেকে আসত খয়রুল। তারও মাংসের কারবার। একবেলা চলত। বিকেলে পাজামা পাঞ্জাবিতে বাবু সেজে কাইয়ুমের আড্ডায় তালাত মাহমুদের বাংলা গান সুন্দর গলা কাঁপিয়ে গাইত খয়রুল। কাইয়ুম গাইত মেহেদি হাসানের গজল। আড্ডার চেহারাই যেত পালটে।

ফরিদের সুন্দর চেহারা আর পরিষ্কার বাংলা বড় মধুর মনে হত খয়রুলের। ধরাই যেত না ফরিদরা অবাঙালি মুসলিম। আস্তে আস্তে মেলামেশায় অবাঙালিদের নিয়ে জমে থাকা ভাবনায় পালিশ পড়ে চকচকে হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। নাজিয়ার জন্যে ফরিদকে বেছে নিয়েছিল মনে মনে।

একটানা কিছুক্ষণ চলার পর কাঁধের শিশুটিকে দ্যাখে নাজিয়া। লেপটে থাকা ফিরফিরে কালো চুলে ঘাম জড়িয়ে আছে। কোমরে গোঁজা বড় রুমালখানা বার করে মাথার ওপর আলতো বিছিয়ে দেয়। তারপর চলতে শুরু করে। একটু এগোলেই আমবাগান বাজার, মুন্নির আব্বার দোকান।

সপ্তাহখানেক কি দিনদশেক হল বাচ্চাটার গা গরম। গালে গাল ঠেকিয়ে তাপ বুঝতে চায় নাজিয়া। ভারি বুখার। সঙ্গে পেটের গোলমাল। জ্বর নামতে চায় না দেখে ফরিদকে বলে, — কচিটার কী হল বল তো? গা পুড়ে যাচ্ছে, একটু তদ্বির না করলে —

—কে মানা করেছে তদ্বির করতে? আমি কি যাব নাকি ব্যওসা ফেলে? শালার যত লফড়া আমার দোরে। বাঞ্চোৎ ছেলের একটা-না-একটা লেগেই আছে। ঝাঁঝিয়ে ওঠে ফরিদ। ক'দিন আগে দুখানা মাল চুরি হয়ে গেছে। দিমাক বে-লাগাম তখন থেকেই। বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলে — মেডিকেলে গিয়ে টিকিট করাতে পার না? কাল সুবে চলে যাও। বুঝেছ?

কথামত পরদিনই সকালে চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে দেখাতে গিয়েছিল নাজিয়া। ওষুধও পেয়েছিল — চারখানা পুরিয়া, বেলা বারটার পর। বাকি ওষুধ কিনে নেয়ার কথা। কিন্তু কাকে বলবে। সামান্য একটু কমে, আবার পুরনো অবস্থায় ফিরে গেল জ্বর, পায়খানা। আস্তে আস্তে শাদা হয়ে আসছে বাচ্চার শরীর। মেডিকেলে যেতে গেলে ফের সেই পরের মঙ্গলবার। ততদিন কী করবে নাজিয়া!

ঠিকঠাক শোয়ায়, মাথায় পট্টি দেয়, কখনও তেল মাখাতে চায়। ছেলে কিছুতেই চাঙ্গা হয়ে ওঠে না। জ্বর লুকোচুরি খেলে। পায়খানা কেবলই ভিজিয়ে দেয় কাঁথা-কানি। বুকের দুধ টানতে চায় না। কোলে নিতে গেলে ঘাড়ের ডগি থেকে লটকে পড়ে। মাথা লগবগ করে।

নাজিয়ার শাশুড়ি বলে, — ব্যাটাকে জিনে ধরেছে। অমনি দুধে বাতাস লাগতেও পারে। না-হলে অমন গতরঅলা মেয়েমানুষের বুকে মুখ দেয় না কোলের বাচ্চা! পাড়ার কেউ কেউ বলে, — নিশ্চয়ই ভেরে দিয়েছে কেউ মাই। জিনের খবিশ ভি চেপে থাকতে পারে বাচ্চাটার ওপর। কেমন সাদাটে হয়ে যাচ্ছে দিনকেদিন। তুই বাবা একবার নুরো মিঞার কাছে যা। ফুঁকটুক দিয়ে ঝাড়িয়ে দেবেখন। খুব হাতযশ। আঁখ মেলে চাইলেই বিমারি গায়েব!

নাজিয়া এখন হাসতাপাতালে যেতে পারে না। অনেক কষ্টে একবার ফরিদকে বলে বেরিয়েছে, বারবার যেতে চাইলে যেন বেড়াতে যাওয়া মনে হয়। এ ছাড়া মুন্নি আর জুল আছে। হয় তাদের নিয়ে যাও, নয়ত ফেরার সময় কিছু কিনে আন। তারা জানে হাসপাতালের গেটে যে লেবু, আঙুর সাজান থাকে, তা হাসপাতালে যাওয়া লোকদের খেতে দেয়া হয়। সেবার খাতোনের মা সঙ্গে ছিল। এবার কাকেই বা বলে। ফিক্ত নেয়া দাওয়াখানায় যাওয়া তো খোয়াবের ব্যাপার। মুন্নির বাপেরও সময় নেই। একা একা হুটহাট কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারে না। শুধু পার্ক সার্কাস ময়দান, লোহাপোল, আর এই কিছুদিন [illegible] চেনে। নয়ত বোডালেই চলে যেত আব্বাজির কাছে। বোডালে অসুখের খবরটুকুও পৌঁছে দিল না কেউ। তাই নুরো মিঞার কাছেই যাবে। দু-চারটে কলমা পড়ে ফুকে দিলে যদি সেরে ওঠে —।

খাসির দোকানে বেজায় ভিড়। তাকে যেন দেখতে না পায় - এমন আড়ালে দাঁড়িয়ে নাজিয়া দেখছিল ফরিদকে। টাঙানো খাসির গা থেকে কী নিপুণভাবেই না মাংস কেটে নামিয়ে আনছে। বড় ছোরায় ধার দিয়ে নিচ্ছে অন্য হাতে ধরা ভারি লোহার রডে ঘসে। চকাচক চকাচক্ আওয়াজ বেরোচ্ছে। স্যাণ্ডো গেঞ্জি থেকে ছাতি যেন ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। দুহাতে, দাপনায় চাক-চাক পেশি সাজান। রগে চলাচল করা রক্তের নীল রং এখান থেকেই বোঝা যাচ্ছে। মুন্নির আব্বাকে কোনওদিন এভাবে লুকিয়ে দ্যাখেনি। দোকানে কিভাবে মাল বেচাকেনা করে তাও না। কী সুন্দর মহম্মদ রফির গান গাইত। তারপর যেই শ্বশুর আর রফিসাব মারা গেলেন একদিন ছাড়াছাড়ি, সেদিন থেকেই ফরিদ যেন কেমন হয়ে গেছে। ভারি ভাল লাগছে নাজিয়ার। দাঁড়িয়ে থাকে সে আরও খানিকক্ষণ।

আড়াল ছেড়ে চলে যেতে গেলেই সামনে পড়ে যাবে। একবার ভাবল, বলে যাই। কোথাও একলা যাওয়ার দরকার তো হয়নি কোনও দিন, যদি কিছু বলার থাকে। পরমুহূর্তেই ভাবল, থাক, অন্যায় তো করতে যাচ্ছি না। তাছাড়া চার টাকা নিয়েছে সঙ্গে। দরকার তো নেই তেমন। যদি এত লোকের সামনে ধমকে ওঠে! থাক বাবা, পেছনের গলি দিয়ে চুপি-চুপি যাই।

শেষবারের মতো দোকানের দিকে চেয়ে সরে যায় নাজিয়া। লোহাপোলের মাথা ওই দেখা যাচ্ছে। ওরই এপারে কর্পোরেশন ইসকুলের ডানদিকে নুরো মিঞার ডেরা। পা চালিয়ে চলতে লাগল নাজিয়া।

নুরো মিঞার দোচালায় বাইরের দিক কিছুটা ঘিরে নিয়ে রোগী দেখার জায়গা। এক সময় বারান্দা মত ছিল। পেছনের দরজার সঙ্গে লাগোয়া শোয়ার ঘর। দরজা বরাবর রান্নার জায়গা। বারান্দার এইখানে বসে সেসব দেখা যায়। ছোটখাট চৌকির ওপর বসে পড়ল নাজিয়া।

একটু পরে ঘরে ঢুকল নুরো মিঞা। কাঁচা-পাকা ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথা। দুটো গহীন চোখ। গোঁফ-দাড়ি কামান। লুঙ্গির ওপর কাজ-করা জাপানি সিল্কের গোলাপি পাঞ্জাবি। দেখে বোঝার উপায় নেই মানুষটা চারচাকার ভ্যান ঠেলে ছোলা-মটর বিক্রি করে — ঝাড়ফুঁক হল ওর 'সাইড বিজনেস'।

খুব কাছাকাছি এসে রোগীকে একবার দেখে গেল। তারপর ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে এল। ছোট চৌকির দু তরফে দুজন।

— বাচ্চাকে কোলের ওপর লেটিয়ে দাও।

খুব ধরে ধরে কাঁধ থেকে নামাল বাচ্চাকে নাজিয়া। কোলে শোয়াল। চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় শব্দে কী যেন বলতে থাকল নুরো মিঞা। তারপর একখানা ফুঁ পা থেকে মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেল। আবার বিড়বিড় বিড়বিড়, আবার ফুঁ। এবার মাথা থেকে পা পর্যন্ত। শেষবার অল্প সময় বিড়বিড় করে বুকের ওপর ফুঁ মেরে দিল। বেশ গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, ভারি জিনের কারসাজি, বুঝলি বেটি। আরও কয়েকটা পড়া লাগবে। পানি এনেছিস, বোতলে করে পড়ে দেয়ার পানি?

মাথা নাড়ে নাজিয়া।

— সে কি! ঠিক আছে আমিই দিয়ে দেব। বলে, মুখে দুহাতের আঙুল ঠেকিয়ে সেই আঙুল দিয়ে বাচ্চার চোখের পাতা অল্প মালিশ করে। চোখ বুজিয়েই থাকে তবু বাচ্চাটা। গড়িয়ে পড়া শুকনো লালায় একখানা মাছি বারবার বসার চেষ্টায় ঘোরাফেরা করে। রুমাল হাঁকিয়ে তাড়িয়ে দেয় নাজিয়া।

— কিছু খায় পিয়ে?

— না হুজুর।

— দুধ ভি খায় না?

— না, একদম টানে না।

— মাইটা তো একবার দেখতে হবে বেটি। দরদ আছে কি নেই?

— ঠিক খেয়াল করিনি। বলতে গিয়ে কেঁপে যায় নাজিয়ার গলা। পরপুরুষের সামনে দেখাতে হবে? চেষ্টা করলে নিজেই তো বুঝতে পারত দরদ আছে কিনা? হায় খোদা! এসব কী ভাবছে সে! নিজের সুরত নিজেই দেখা। ছিঃ ছিঃ! কোথায় কেমন ভাবে আছে তা বোধ হয় ভুলেই গেছে নাজিয়া। কিছু বলতে যায় আবার। নুরো মিঞা যেন বুঝতে পারে, বলে — লাজের কী আছে বেটি, বিমারির কি লাজ রাখলে ভালো হয়?

বোরখার ভেতর শাড়ি, তারপর ব্লাউজ। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নুরো মিঞা সেদিকটায়। বোরখার বোতাম খুলতেই কেমন একখানা মমতা মাখান মা-মা ভাপ উপছে এসে নুরোর নাকে ধাক্কা মারে। নাজিয়ার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। সে পানি নুরো মিঞা দেখতে পাচ্ছে না বোরখার ওপর দিয়ে। নাজিয়া শূন্য হয়ে যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে। যদি বাছা আমার চোখ তুলে চায়। যদি আবার হাত পা নাড়ে। সেই আশায় বিছিয়ে দিতে চলেছে শরম-লজ্জা। মুখের ওপর পড়ে থাকা একটুকরো কাপড়ের পরদা সরিয়ে নুরোকে বোঝাতে পারে যন্ত্রণার মানে। কিন্তু থাক সেসব। চোখে চোখ পড়ার শরম আরও বেশি। ওগুলো ঢাকা থাক অন্যান্য অঙ্গের মতো। নিজের ব্যথা নিজের মধ্যেই ছড়িয়ে যাক।

শেষ বোতাম খোলার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে যায়। চকিতে দুই হাঁটু গুটিয়ে আড়ালে ঢেকে ফেলে নাজিয়া তার আগোছাল পোশাক। ঘরে ঢোকে এক মহিলা। এসেই চিৎকার করে ওঠে — ফের তুমি কচি কচি মেয়েদের গায়ে হাত দিতে বসেছ? লজ্জা করে না! দফা হো যাও, বেরোও।

নাজিয়া বুঝতে পারে ইনি নুরো মিঞার বিবি। বুঝতে পেরে যায় গোলমাল আর নুরোর মতিগতি। বিবি আবার হুঙ্কার ছাড়ে, রাত-বেরাত বাইরে ঘাটে শুয়েও নেশা মেটে না। আর তুমিও ভি কেমন মেয়েমানুষ, লুচ্চার কাছে এসেছ ছেলে দেখাতে। পালাও এক্ষুনি — যাও।

পাশ কাটিয়ে নুরো মিঞা জলদি ঢুকে যায় ঘরের ভেতর। নাজিয়ার কিছু সময় লাগে গুছিয়ে উঠতে। পিঠে হাত রাখে নুরো মিঞার বিবি। মুখের ওপরকার একফালি কালোকাপড় সরিয়ে দেয়। নাজিয়ার চোখ এবার হারিয়ে ফেলে তার বাঁধন।

বিবির আঙুলে ভালোবাসা। চিবুক ধরে বলে, তোমার তো শুধু বেটা, আমি আমার বেটা-বেটি, ঘর সন্‌সার সব ভাসিয়ে নিয়ে বসে আছি। চোখের পানি আর নেই আমার। আর কক্ষনো আসবে না। এই নাও — বলে, আঁচল খুলে দশ টাকার নোট বার করে বলে, ডাক্তার-বদ্যির কাছে নিয়ে যাও। তারপর বাচ্চাটার গায়ে হাত দেয়, কোলে নেয়।

ফিরতি পথে বাচ্চাটা যেন আরও চুপচাপ। হাত-পায়ে যেন বরফ ঘসে দিয়েছে কেউ। কোন ডাক্তারকে দেখাবে এখন, কোথায় কোন ডাক্তার এই রোগী দেখে, তাও তো জানে না নাজিয়া। আরও গনগনে আলোয় ছোটার মতো পা ফেলে। আমবাগানে গিয়ে পড়তে পারলেই মুন্নির আব্বা — এখনও বাড়ি যাওয়ার সময় হয়নি তার। শ্বাসপ্রশ্বাসের তাপ হাল্কা করে নিতে মুখের ঘোমটা মাথার পেছনে নামিয়ে রাখে। এই গরমেও কচি আমাব ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

ভাবনা ছুটে গেল, যখন চোখ তুলে দেখল, একেবারে খাসির দোকানের সামনেই দাঁড়িয়ে আছে সে। শক্ত মুঠোয় চপার বাগিয়ে মাংসের বটি বানাচ্ছে মুন্নির আব্বা। দু-চারজন খদ্দের।

চোখে চোখ পড়তেই তড়াক করে সিমেন্ট-বাঁধানো চাতাল থেকে চপার নিয়েই নেমে আসে ফরিদ। দুচোখে দুনিয়ার আগুন। হাত ধরে একটু আড়ালে নিয়ে যায় নাজিয়াকে।

— ক্যা হুয়া, কোথায় গেছিলে?

— ডাকতার বাবু —

— কৌন বোলা লে যানে? আমি কি মরে গেছিলাম? বেশরম কাঁহিকা। বলে, হ্যাঁচকা টানে মাথার পেছনে ওলটানো ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে দেয় ফরিদ।

— এত লোক এখানে, আর তুমি বেপরদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছ? ভাগো। বেতমীজ কাঁহিকা।

চোখমুখ রাগে কাঁপছে ফরিদের। নাজিয়া আপ্রাণ চেষ্টা করে আসল কথা গুছিয়ে, বুঝিয়ে বলতে। আমতা আমতা করে সে। বলে — বাচ্চাটার শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে গো —

— যাক। জাহান্নামে যাক। বাড়িতে বলা যায়নি? সিধা বাড়িতে যাও। তারপর আমি গিয়ে বানাচ্ছি তোমাকে —।

গটমট করে হেঁটে আবার ফরিদ লাল চাতালে উঠে যায়। ততক্ষণে নাজিয়া জায়গাটা পার হয়ে গেছে খর পায়ে। তার কথা, তার বাচ্চার কথা শোনবার মতো কেউ নেই এখানে। মুন্নির আব্বা একবার ছুঁয়েও দেখল না তার ছেলেকে। মুন্নির আব্বা বাড়ি ফিরেও দেখবে না তার ছেলেকে। 'খবর' নেবে নাজিয়ার। টলমল করে হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়, পথ বুঝি শেষ হবে না। কিংবা শেষ হলেও তার শেষে থাকবে না কোনও ঠাঁই।

ফরিদের চপার কুচিকুচি করে কাটছে মাংসের ডেলা। ভুনা তৈরি হবে তা দিয়ে। মন তার চলে গেছে নাজিয়ায়। নাজিয়াকে ওভাবে বলাটা কি ঠিক হয়েছে? একটুখানি নরম করে বলা তো যেত। ছেলেটাকে একটিবার দেখাও হল না ভালোমত। কেমন হয়েছে ওইটুকু শরীর? আন্দাজে হাতড়ে চলছিল মাংসের টুকরোয়, রক্তমাখা আশপাশের জায়গায়। কিছুই মনে আসছে না। হাত চলছে হাতের মতো, দিমাক অনেকদূর চলে গিয়ে বসতে চাইছে থির হয়ে। এই টুকরো শেষ করেই ঘরে ফিরবে। তারপর কচিকে নিয়ে যেমন করেই হোক কোনও ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের পায়ে।

আরও তাড়াতাড়ি চপার চলে। খুব জলদি শেষ করে ফেলতে হবে ভুনা-বানানর মাংস। খদ্দের তারিফ চোখে তাকিয়ে আছে। সহসা তাল কেটে যায় ফরিদের। উদ্যত চপার নিপুণ ছন্দে নেমে এসে, মোলায়েম কোপে দুফালি করে দেয় বাঁয়া হাতের আঙুল।

চপার তবু থামল না। থামালে চলবে না। ফরিদ যেন জানতে পারল কিছুটা। কিন্তু অন্য কেউ জানতেও পারল না — আর একটু পরে ফরিদের একটুকরো যন্ত্রণা বিক্রি হয়ে যাবে।

লাশ খালাস

অনিল ঘড়াই

নিধু ডোমের হাতে বাঁশের লগা, পরনের ভেজা গামছায় জল ঝরছিল হরদম। সেই সকাল থেকে পুবো পুকুরটায় খানা-তল্লাসী চালিয়ে হাত-পা এখন সাদা, আঙ্গুলগুলো টিকটিকির তেলোর মত চুপসানো। বাঁশবনের মত কাঁপছিল বেত-ছিপছিপে মানুষটা।

ভাল মতন আলো না ফুটতেই পুরো পাড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বাঁশবনে। খবরটা এখন সবার মুখেমুখে। কানাকানির তাই শেষ নেই। রণবাবুকে যে খুন করতে এসেছিল সেই ছোকরাটাই এই বাঁশ ডোবা পুকুরে ডুবে মরেছে। লাশ খুঁজে বের করতেই হবে। লাশ খোঁজার দায়িত্ব নিধু ডোমেব। না পারলে ভিনগাঁ থেকে জেলের দল আসবে। কচুরিপানা সরিয়ে টানা জাল ফেলবে তারা। নিধুর এতে ইজ্জোৎ যাবার ভয়। থানার ডোম সে। বুকে লোম গজানোর আগে থেকেই লাশ তুলছে। পচাগলা লাশ তুলে বহুবার সদর থেকে বকশিস পেয়েছে। এখন হেরে গেলে লোকে বলবে, মুরোদ নেই তো চাকরি ছেড়ে দাও হে! চামড়া ঢিলে হলে এসব কাজ আর হয় না।

সাপটে তেল মেখে নিযে হাঁ করে পুকুরের দিকে চেয়ে আছে নিধু। হাবিলদাব ধমক দেওয়ার আগেই শেষবারের মত জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তন্ন তন্ন করে খুঁজবে পুরো পুকুর। লাশ পেলে ভাল, নইলে কুলকুচি করে উঠে আসবে ডাঙ্গায়।

হাওয়ার মুখে লম্ফোর শিসের মত নিধুর বুকে এখন ধুঁক-পুকানী।

হাবিলদার সিগ্রেটে ফু দিয়ে বলল, যারে বুড়া, খাড়িয়ে রইলে চলবে? যা যা ঝাঁপিয়ে পড়।

কুকুরকে যেন মাংসের টুকরো দেখিয়ে লোভ দেখানো হচ্ছে, নিধু হাবিলদাবের দিকে তাকিয়ে ঘেন্নায় চোখ নামিয়ে নেয়। বুড়ো শরীরে রাগ গর-গরিয়ে ওঠে। কারোর তাতানো কথা আজকাল ভালো লাগে না। চেষ্টার কোন কসুর করেনি, তবু হদিস মেলেনি লাশের। হদিশ না মিললে তার কি করার আছে? লাশের জন্য তো জান দিয়ে দিতে পারে না? রোদ কামড় মারছে পিঠে। আর একটু রোদ বাড়লে খড়ি ফুটবে সর্বাঙ্গে। ঢিস ঢিস করে নিধুর বুক —।

— এ বাপ, মুখ রাখিস বাপ। জিওল গাছটার কাছে এসে জলে ঝাঁপ দেয় নিধু। কচুরি পানার ফুল থেঁতো হয়ে যায় দেহের ভারে। জলের গন্ধে নেশা ধরে যায় শরীরে। তরতরিয়ে এগোতে থাকে নিধু।

— গতরাতে বৃষ্টির কোন কামাই ছিল না। সেই সময় রণবাবুর দোতলায় পর পর দু'বার গুলির শব্দ শোনে গ্রামবাসী। বিজলি বাতি নিভে যায়। ঝমঝমিয়ে ছেরাতে শুরু করে মেঘ। মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে রণবাবু। যে এসেছিল সে পাইপ বেয়ে নেমে যায় বিপদ বুঝে। রণবাবুর বিলিতি কুকুরটা তাড়া করে তাকে। আর একবার গুলির শব্দ হয়। কুকুরটা বুকে গুলি নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে লোহার গেটটার কাছে। পাঁচিল টপকানোর শব্দ হয়। তারপর দুপদাপ ছুটতে থাকে। কাঁচা পথ, তার উপরে ইঞ্চি চারেক জল — তার মধ্যেই ছুটছিল। তার পিছনে গণ্ডা চারেক মারমুখী মানুষ। বড় ইস্কুলটার কাছে বাজ পড়ে

কড় কড় — ক-ড়া-ৎ। আলোর সাপটা আঁধার ছুঁবলে আবার নেতিয়ে যায়। এই মওকায় বাঁশবনে ঢুকে পড়েছে ভীতু পা। চার গণ্ডা লোক বাঁশঝাড়ের কাছে এসে বর্ষার মুড়ির মত মিইয়ে যায়। তেড়ে ফুঁড়ে বাঁশঝাড়ে ঢুকে যেতে সাহসে কুলায় না। জায়গাটা খারাপ। দিনমানেই গা ছমছম করে, আর রাত্রিতে কথা নেই। ভাবনা-চিন্তা করার ফাঁকেই পাড় ভেঙ্গে ঝপাৎ করে জলে পড়ে যায় কেউ। তারপর একটা প্রাণ-ফাড়ানো আর্তনাদ—। থমকে দাঁড়ানো পুতুল-মানুষগুলো কাঁপে। বাঁশঝাড়ের মাথায় তারা ফোটে কয়েকটা, জোনাকি খেলা করে বেড়ায়। পোকামাকড়ের ডাকের মত কথা চালাচালি হয় —।

— বাছাধন জলে পড়েচে।

— সাঁতরে পালাবে।

—উঃ, অতো সস্তা।

— মানুষটার হাতে ছোটপারা এট্টা বন্দুক ছেলো।

— হুঁ, তোরে বলেচে।

— ল্যাঙ্গোটের মত গামছা পরে নিধু উডুল মাছের মত এগিয়ে যাচ্ছে মাঝ-পুকুরে। এখন আর দমধরে রাখার বয়স নেই, বিড়ি খেয়ে খেয়ে সব শেষ! নামার আগে পাঁচুয়া পেলে ভাল হোত। ধারেকাছে নেশার কিছু পায়নি। নেশা ছাড়া এ সব ছোটলোকি কাজ হয় না! অথচ, বাবুরা বোঝে না। অর্জুন গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পেটমোটা পুলিশটা চেল্লায়, হেই, জলদি কর নিধু। ধুপ চড়চে —।

ধুপ চড়ছে তো তার কি! জলদি লাশ তোলার জন্য চটজলদি প্ল্যানটা দিয়ে দিতে পারবে না সে! বাবুদের সবতাতেই তাড়াতাড়ি। এ যেন ছেলের হাতে মোয়া — টুক করে গালে পুরলেই হল!

মাঝপুকুরে পৌঁছে নিধু চারপাশে তাকায়। এই ফটায় (ছোট্ট) গাঁ-টায় এত মানুষ থাকে? জলে ছায়া পড়েছে কালো মাথার। ভুল ভুলিয়ে আশেপাশে তাকায় সে। কচুরি পানার তেলা পাতায় বাঁশ ডোবার শরীর এখন চিকনাই। ফ্যাকাসে নীল ফুলে মৌমাছি বসছে উড়ে উড়ে। দাপনার কাছটায় কুট কুট করে কে যেন কাটছে। চিমটি কেটে জোঁকটা তুলে নিয়ে বাঁ হাতে ছুঁড়ে দেয় দূরে। জলে লগা ভাসিয়ে নিধু আবার চারপাশে তাকায়। কোথাও কিছু নেই, গাভীন গরুর পেটের মত পুকুরটা এখন ভরাট। এর মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে লাশ? নিধু কি তা হলে হেরে যাবে? মুখে কালি লেপে দেবে বাপ-ঠাকুরদার? মরিয়া হয়ে ডুব দেয় সে। পাঁক ধরে এগোতে থাকে। অর্জুন গাছের ছায়াটা যেখানে শেষ, সেখানে এসে দম ছাড়ে নিধু। পাতলা চুলগুলো ভিজে ন্যাতা। ঘুল ঘুল করে তাকায়। গন্ধ শোঁকে। লগাটা হাতে নিয়ে চিৎ সাঁতারে এগোতে থাকে সে —। এগোতে এগোতে মাথায় গিয়ে ঠেকে মাথা। প্রথমে ভেবেছিল, কাঠ। পরে দেখে, কাঠ নয়, মাথা। কোঁকড়া-ঝাঁকড়া চুলভর্তি একটা মাথা। বাপস্ রে—। বলে কিছুটা পিছিয়ে আসে নিধু। পরে ধাতস্থ হয়ে আনন্দে চিল্লিয়ে ওঠে।

শেষটায় লাশ তোলা হল ডাঙ্গায়। থানায় খবর দিতে সাইকেল নিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি চলে গেল চৌকিদার। খবরটা এস. পি অব্দি যাবে। রণতোষ ভুঁইঞা গ্রামের এম. এল. এ। তাকে খুন করতে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা।

ডাঙ্গায় উঠে নিধু যেন আর মানুষ নেই। একটা বুড়ো-হাবড়া বলদের মত ধুঁকতে থাকে। দাঁতে দাঁত চেপে কাঁপুনি থামাবার চেষ্টা করে। কখনো মুখ ছিটকে বেরিয়ে আসে হি হি শব্দ। ড্যাবরা চোখে মরা ফুলো লাশটা দেখতে গিয়ে আঁতকে ওঠে। আরে, এ যে একেবারে

তপাবাবুর মত দেখতে! বুকের কাছে হাতটা চলে আসে আপসেই, খুন চাগিয়ে জড়ো হয় ভয়। নিধু থরথর করে শীতে।

ঠিক সময় বিওলে কপালীর এমন একটা ছেলে হোত। বউটা বাঁজা। কত ডাক্তার কবিরাজ ঝাঁড়-ফুঁক-মন্তর-তন্তর বিফলে গেল। শেষটায় মনোকষ্টে পচা লাউজালির মত শুকিয়ে মরল বউটা। সেই থেকে সংসারের উপর টান নেই নিধুর। যা পায় তা পচানী তাড়ি আর হাঁড়িয়া খেয়ে উড়িয়ে দেয় সাঙ্গাৎদের সাথে।

আসার সময় থানার বড়বাবু বারবার করে বলেছে, বুঝলিরে নিধু, যে করেই হোক লাশ তুলতেই হবে। নইলে বড় সাহেবের কাছে কি জবাব দেব?

নিধু পুরনো লোক। সিধে আর জটিল কেস দেখে দেখে হাড় পেকে গেল, বড়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে সে কিছু বলেনি। বাবুদের সামান্য সামান্য কেসেই চাকরি যাবার ভয়। ফোন ফাটিয়ে সদর থেকে গাল দেয় এস্‌পি। লোকে বলে, রণবাবু দয়ার সাগর। তার মত মানুষকে কেন খুন করতে এল বেচারা! লোকের কথায় ভেতরে ভেতরে তেতে ওঠে। রণবাবুকে সে শিক্‌নিঝরা বয়স থেকে দেখেছে। ওর গুষ্টিসুদ্ধ খারাপ। রণবাবুর ঠাকুরদা জমিদার ছিল গাঁয়ের। বউ-ঝি'রা তার ভয়ে পুকুরে নাইতে যেতে পারত না। বাগদিপাড়ার লতার সর্বনাশ করে দিয়ে পাতকুয়োয় ফেলে দেয়। লতার বাবা মেয়ের শোকে কেঁদে পা জড়িয়ে ধরলে এক বিঘে জমি ধরিয়ে দেওয়া হয় হাতে। সেই বংশের ছেলে রণবাবু এখন গাঁয়েব হর্তাকর্তা। মেয়ের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করেছে।

শিরদাঁড়ায় হাত বোলাতে গিয়ে নিধু বড্ড ঘেমে যায়। তার নিজের কোন মানসম্মান নেই। থানায় তপাবাবুর হয়ে কথা বলতে গিয়ে বড়বাবু তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করল, শালা, শুয়োরের বাচ্চা, স্পাইগিরি হচ্ছে? চাকরি নট্ করে একেবারে ভিখিরি করে ছেড়ে দেব।

এ গ্রামের অনেকেই তপাবাবুকে সহ্য করতে পারে না। অথচ, তপাবাবু কত ভাল ছেলে! মাছহাটায় বিশ টাকার ম্যাছ বারো টাকায় না দেওয়ায় হলধরের দাঁড়িপাল্লা ভেঙ্গে দিল রণবাবু। তখন তপাবাবুই সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল, দাঁড়িপাল্লার দাম উসুল করে ছাড়ল। মুখ নিচু করে চায়ের দোকানে ঢুকে গেল রণবাবু।

তপাবাবুর মত নিধুর প্রতিবাদশক্তি নেই। তাই হয়ত, তপাবাবুকে তার ভাল লাগে। নইলে, দারোগা বাবু যখন মা-বাপ তুলে গাল দেয় তখন সে কেন হাসতে হাসতে সয়ে নেয়? আসলে, এর জন্য দায়ী পেট। মরা পেটের জন্য শিরদাঁড়াটা জল হয়ে গেল। বাপটাও ধোয়া তুলসী পাতা নয়। কমবেশী বাপও দায়ী। অতবড় তাগড়াই শরীর নিয়ে কেন ফুঁস করে উঠত না বাপটা?

— শালোর বাপ, একবার নামুতে নেমে আসো হে! তুমার টেংরি খুলে বাইরে ঘরে শুইয়ে রেখে খাওয়াব। তুমি আমার শিরদাঁড়া বিকুবার কে হে!

মরা মুখটার দিকে তাকিয়ে নিধু ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে ওঠে। ভেতরটায় চালের পোকার মত ব্যাজ ব্যাজ করে দুঃখ। কেন এমন হয় সে সঠিক বুঝতে পারে না। এমনটা তো তার কোনদিন হয়নি। বুকে লোম গজানোর আগেই বাপের সাথে লাশ টানতে যেত সদরে। বিষ-খাওয়া মেয়েমানুষের পাশে কাঠ হয়ে বসে থাকত। ভয়ে কুরকুর করত সর্বাঙ্গ। সাঁই সাঁই করে রিক্সা ছুটিয়ে সাহস দিত বাপটা, মুটে ভয় পাবিনে ব্যাটা, কাঁচা নোহা সাথে রাখবি। কেউ তুর ধারেকাছেও ঘেঁষতি সাহস পাবেনি।

ভয়-ভ্যাদভেঁদে মুখটা হাঁটুর মধ্যে গুঁজে নিধু শুনত, মড়াকে আবার ভয় কিরে? ওর কি শ্বাস আচে না কথা বলে? মনে রাখবি, জ্যান্ত মানুষই বাগ পেলে গলায় হেঁসুয়া চালায়, মরা মানুষ মা৷টর মতুন ঠাণ্ডা। লড়ে না চড়ে না। শুধু শুখা কথায় ভয় ভাঙ্গত না নিধুর। বাপটা ছিপিতে মদ নিয়ে ঢেলে দিত মুখে। বুকে থাবা মেরে বলত, ভয় না ভাঙ্গলে এসব কাজ হয় না। এতো ভদ্দলোকের কাজ নয় যে আতর ঘষে মাহিনা লিবি। এ কাজ করতি গেলে বুকের ছাতি দরকার।

ও সব ছাইপাঁশ খেয়ে সার ছিটুনো পানিফলের মত জোর ধরেছিল নিধু। দেখেশুনে সেয়ানা বাপটা বলল, তুর এখুন লজর খারাপ ব্যাটা। আই- বুড়ো মায়্যা-ঝি'র দিকে মুটে লজর দিবি নে। ওরা বড় সেয়ানা। শরীল লষ্টো করে দেয়—।

পুরুষ মানুষের দিকে তাকালে শরীর নষ্টের ভয় নেই তবু লাটাই-এর ঘুড়ির মত ছেইরে হয়ে যাচ্ছে তার মন। বাপটা বড় ধূর্ত। মিছে কথা বলেছে। বাবুঘরের ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সে আনমনা হয়ে যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে সে। চওড়া বুকের উপর সেঁটে থাকা জামাটার বোতাম ছিঁড়ে বেরিয়ে আছে লোম, পায়ের গুলিতে আটকে আছে নীল প্যান্টুলুন, — কেটে না দিলে বের করানোই ঝক্কির! মারবেল গুলি চোখ দুটো আধবোজা -- ফুলে আছে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে মণি। থেঁতলানো ঠোঁটটা চেরা চেরা, দাঁত ফাঁক হওয়া বেঁকাচুরা মুখটা পুরনো মন্দিরের মত ভয়ঙ্কর।

রোদ বাড়ার সাথে জল টানছে মাটি, সোডায় কাচা গামছার মত ঝলমল চারদিক। ঢ্যাঙ্গা ঢ্যাঙ্গা বাঁশগাছে খটখটাস শব্দ। তুরপুণের মত পাক খেতে খেতে মাটি ছোঁয় বাঁশপাতা। নিধুর পেটের ভেতর ক্ষিদের কুকুরটা নখের আঁচড় কাটে। তখনই সাইকেলের বেল বাজাতে বাজাতে আরো দুটো পুলিশ এসে হাজির। তাদের মুখে জর্দা পান, ডাগর পেটে ঠাসভর্তি ভাত। ভরা পেটের দিকে তাকিয়ে দণ্ডবৎ করে নিধু। পাকা গাছির জিরোন কাট রস চেনার মত অভিজ্ঞ গলায় সে বলে, ছোকরাটা মনে হয় ভাল ছেলেন গো সিপাই মুশায়। দেখুন, কেমনু ধারা লেস্‌পাপ চেয়ে আচে —? নেশা-করা মানুষের মত ঘোলাটে হয়ে ওঠে নিধুর চোখ।

পুলিশ দুটো বেদম হাসে ওর কথা শুনে। ওদের কুতকুতে চোখে সন্দেহ দেখে ভেতরে ভেতরে দমে যায় নিধু। জন্মে থেকে পুলিশ দেখছে, তবু পুলিশ দেখলে এখনও তার বুকটা ঢিস ঢিস করে।

থানার বড়বাবু নিধুকে নিমগাছের কাছে ডেকে নিয়ে গিয়ে শুধিয়েছিল, হ্যাঁরে নিধু, তোর গ্রামের কার্তিকবাবুর মেজ ছেলেটা এখন কি করে?

বড়বাবুর শুধোনোর অর্থ আলাদা, মোটে সাধাসিধে নয় জলের মত। ভেবে-চিন্তে, সামলে-সুমলে মাথা চুলকে নিধু বলেছিল, আজ্ঞে বাবু, কলকাতায় পড়ে। বড্ড ভাল ছেলে! সেই ছোট বেলা থিকে দেখচি কিনা—।

— দিনকাল খারাপ। দেখা হলে মানা করে দিস ঝুটঝামেলায় না যেতে। ওর নামে থানায় বহু রিপোর্ট —।

সেদিন থানা থেকে ফিরে বুড়োশিবতলার তপাবাবুকে সাবধান করে দিয়েছিল নিধু। কার্তিকবাবুর মেজ ছেলে কথা শোনার ছেলে নয়। গলার রগ ফুলিয়ে বলেছিল, আরে, ছাড়ো তো নিধু খুড়ো। থানা-পুলিশের ভয়ডর আমার নেই। নেয্য কথা বুক ফুলিয়ে বলব — তাতে যা হয় হবে —।

কথা আর সাহস দেখে রা কাড়েনি নিধু। গাঁয়ের লোকে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। সবাই ভাবে থানার ডোম মানে থানার স্পাই। তপাবাবু তাকে অমন চোখে কোন দিনও দেখেনি। বরং ডেকে নিয়ে গিয়ে সিগ্রেট খাওয়ায়। হেসে হেসে কথা বলে। ভালমন্দ শুধোয়।

এমন মানুষের খারাপ হোক কে চায়। সে জানে, বড় দারোগা লোক ভাল নয়। তা ছাড়া বাঘে ছুঁলে কমসে কম আঠার ঘা। যেখানে স্বার্থ সেখানেই দারোগাবাবুর কুতকুতে চোখ। নিজের ছেলেকেও এসব মামলায় ছাড়ে না। তাই ভয় যত সব দারোগা বাবুকে নিয়ে।

তপাবাবুর মতিগতিও খারাপ। দিনরাত মোটা মোটা বই-এ মুখ ডুবিয়ে পড়ে থাকে। দাড়ি-মোচ কামায় না সময়মত। তরলা বাঁশের মত শরীরটা সর্বদা রুখু-সুখু। টান টান কথা তীরের চেয়েও সূচালো, একেবারে অন্তরে ঘা দেয়।

কার্তিকবাবু দুঃখ করে বলেছিল, ছেলেটাকে আমার দেখিস নিধু। ওর যে কি মতিগতি আমি ঠিক ধরতে পারি নে —।

কলকাতার হোস্টেল থেকে সেই কবে এসেছে, এখনো যাবার নাম নেই তপাবাবুর। ওখানে পুলিশের কু নজরে পড়েছিল। রাজনীতি করতে গিয়ে পড়াশুনা এখন মাথায় উঠেছে। মা-মরা ছেলে। কার্তিকবাবু তেমন ভাবে কিছু বলতে পারে না। অত গম্ভীর ছেলের সাথে কথা বলা তার ধাতে সয় না। তাই, এড়িয়ে চলা, দূর থেকে মতিগতি লক্ষ রাখা।

গাঁয়ের অঞ্চল প্রধানের কলার চেপে বটতলায় মেরে বসল তপাবাবু। সেই নিয়ে থানা কাছারি। কার্তিকবাবু কড়া শর্তে ছাড়িয়ে আনল ছেলেকে। এম.এল. এ রণবাবু পর্যন্ত হুঁশিয়ারী করে দিয়েছে কার্তিকবাবুকে। গ্রামের শিক্ষক, সবাই মান্যগণ্য করে — তাই বাপের দোহাই দিয়ে সে যাত্রায় রেহাই পেয়ে গেল তপাবাবু।

অথচ তপাবাবু এসব কিছু মানে না। কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা চার বন্ধু ধরা পড়ে যায় কাঠের ব্রীজটার কাছে। ওদের কাছে বাইরের দেশের অস্ত্র ছিল। খবরটা এস. পি অব্দি পৌঁছোয়। ওরা নাকি রণবাবুকে খুন করতে এসেছিল। মিটিং ছেড়ে ওই কাঠের পুল পেরিয়ে রণবাবু স্কুলপাড়ায় যেতেন। চার ছোকরার জুলপি ছিঁড়ে কানের পাশটা ঘেয়ো করে দেয় দারোগা। পায়ের তলায় দুমাদুম রুলের বাড়ি খেয়ে কিছুই স্বীকার করল না তারা। সে রাতে তপাবাবু ঘুমোয় নি। সারাক্ষণ জানলার ধারে চেয়ে ছিল।

নিধু থানায় তালাশ নেবার আগে তপাবাবু তাকে ডাকে। ঝড় ওঠার আগের মুহূর্তের মুখ। নিধু ভয় পায়। তপাবাবু নিধুর দিকে তাকিয়ে উষ্ণ গলায় প্রশ্ন করে, পশুর মত বেঁচে থাকতে তোমার ভাল লাগে নিধুখুড়ো?

নিধু কি ভাবে বেঁচে আছে তা সে নিজেও জানে না। তার কাছে বেঁচে থাকা মানে পেটপুরে খাওয়া; দু'বেলা থানায় হাজিরি দেওয়া, নেশার সময় বাণ্ডিল দেড়েক বিড়ি, সের খানিক পাঁচুয়া আর লজ্জা ঢাকার আটহাতি ধুতি নয়ত খাকি প্যান্টুলুন। ব্যস, এতেই তার দিন গড়িয়ে সন্ধে, রাত গড়িয়ে ভোর। ল্যাটাং ল্যাটাং গতরটা কেবল টেনে নিয়ে যাওয়া আর আসা —।

বাঁশঝাড়ে সময় গড়াচ্ছিল দ্রুত। পুলিশ দুটো মালের খোঁজে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, ট্রাক থামিয়ে ঘুষ নিচ্ছে কখনো-সখনো। চৌকিদার মাটির ভাঁড়ে চা আনল বারোয়ারীতলা থেকে। তিন ঢোকে চা'টা গিলে নিয়ে নিধু বিড়ি ধরায়। চৌকিদারকে একটা দেয়। হাবিলদার চলে গিয়েছে বাজারের হোটেলটায়। থানার গাড়ি আর ভ্যান রিকসো এলে লাশ তুলে নিয়ে তারা থানায় যাবে। দুপুরের এই সময়টায় বড় ক্ষিদে ক্ষিদে লাগে তার। সকাল বেলায় তাড়াহুড়োতে বেরিয়ে এসেছে। হাঁড়ির ভিজে ভাত হাঁড়িতেই পচছে। নিধু ঢোক গিলে আশেপাশের দিকে তাকায়। দু'ধারে জমাট-বাঁধা হাড় মটমটি আর লাল কচার ঝোপ। ঘুঘু ডাকছে কাঁঠাল গাছের ডালে। তপাবাবুর জন্য তার কষ্ট হয়। আগুন নিয়ে যে খেলে তাকে নিয়ে নিধুর যত কষ্ট। তপাবাবুর শোবার ঘরে সিগ্রেট খুঁজতে গিয়ে বালিশের তলায় রুমালে মোড়ানো কালোপারা একটা অস্ত্র দেখেছিল নিধু। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল হাতটা। তবে

কি তপাবাবুর সাথে কলকাতার বাবুগুলোর যোগসাজ আছে? সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছিল ভাবতে গিয়ে; ধড়ফড় করছিল ছ্যাঁকা-খাওয়া বুকটা। বড়বাবুর কোমরে সে প্রায়ই এই রকম একটা অস্ত্র দেখে। এই অস্ত্র দিয়ে বড়বাবু মাসখানিক আগে দুটো তাজা দেহ উপড়ে দিয়েছে। রাতে রাতে লাশ হাপিস করতে গিয়ে নিধু শুনেছিল, এই ছেলে দুটো নিকুঞ্জ ডাক্তারের কাটা মাথা নিয়ে লোফালুফি খেলেছে চৌ-রাস্তায়। শেষে সদরে গিয়ে ধরা পড়ে। তার পরের দিন থানার পাশের গাঁ থেকে সামন্তবাবুর রাইফেল, নারাণ মুক্তারের পঁচিশ হাজার টাকা বন্দুক দেখিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কারা। সে রাত থেকে তপাবাবু গাঁ-ছাড়া। থানার লোক সন্দেহ করছে ওকে। নিশিরাতে যাওয়ার সময় তপাবাবু ডোমপাড়া দিয়ে ঘুরে যায়। কাশবন চিরে ঘুরপথে আসতে গা-হাত-পা চিরে গিয়েছিল। নিধুকে ঘুম থেকে তুলে অস্ত্রটা গুঁজে দিয়েছিল তার হাতে। ফিসফিসিয়ে বলেছিল, এটা তোমার কাছে রাখ নিধু খুড়ো। হাতছাড়া হলে দলের বিপদ হতে পারে।

মুখের উপর না করতে পারে নি। অস্ত্রটা নিয়ে ফ্যাকাসে চোখে চারপাশ দেখছিল নিধু। শেষটায় খড়ের গাদায় লুকিয়ে রাখে ওটা। তার আগেই তপাবাবু চলে গিয়েছে মাঠ ডিঙ্গিয়ে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি নিধু, ভয়ে চমকে চমকে উঠেছে। সেই থেকে অস্ত্রটা এখন নিধুর কাছে। কতদিন ভেবেছে, পুকুরের জলে ফেলে দেবে। দিতে পারে নি। তপাবাবু যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলেছে, ওটা আমার জীবন। ওটা তোমার কাছে বাঁধা দিলাম নিধুখুড়ো। রগরগ করেছে চোখের ভেতর। খড়ের গাদা থেকে অস্ত্রটা এখন চালের হাঁড়িতে। বুড়ি নেই, চাল নিতে গিয়ে যেন দু'বেলায় দেখা হয় মেজবাবুর সাথে। বুকে কেমন বল ফিরে পায়। শরীরটা গুলোয।

পুলিশের গাড়ি গাঁয়ে ঢুকতেই মাঠের গোরু-গোয়ালে বাঁধা পড়ে। দুপুরে ভাত এসেছিল চৌকিদারেব ঘর থেকে। সংগে বেগুন মলা, শুকুই মাছের কড়া টক। গামছার উপরে এনামেলের থালা বিছিয়ে গোগ্রাসে গিলেছে ওরা দু'জনে। খাওয়ার পরে একটু ঘুমঘুম ভাব এসেছিল। কিন্তু বড় দারোগার ভয়ে ঘুমোয় নি —

গাড়ি থেকে গটমট পায়ে নেমে এসে সামনের দিকে এগিয়ে যায় বড়বাবু। সংগে রণতোষ ভুঁইয়া। এ গাঁয়ের চোখের মণি, চোখের বালি। প্রায় রোজই খবরের কাগজে উনার নাম ছাপা হয়। কলকাতা নাকি ফাটিয়ে দেন ভাষণে, যুক্তি জেরায়। মিটিং ছেড়ে মানুষ পালিয়ে গেলে কথার টানে চিটেগুড়ে পিঁপড়ের মত আটকে রাখেন রণবাবু। এ সব ভগবান প্রদত্ত ক্ষমতা। বৌয়ের গলার সীতাহার বন্ধক দিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন—সব মিটিং-এ এটা বলা চাই-ই চাই।

নিধু ছুটে গিয়ে হাত জোড় করে দণ্ডবৎ করে। সিগ্রেটের ছাই ঝেড়ে কোচা হাতে লাশের দিকে এগিয়ে যায় রণবাবু। সংগে সংগে চা-দোকানী তারিণী এসে টিপছাপ দেওয়া দরখাস্তটা বাড়িয়ে ধরে, তারপর পা চেপে ধরে রণবাবুর, ও বাবু, মোর পানে এট্টু সদয় হোন গো। সেই কবে থিকে বউটার বুকের ব্যামো—। আপনি বললেন, কোলকাতাব হাসপাতালে সীট পাইয়ে দেবেন — বর্ষদিন হলো গো বাবু, ইবার এট্টু গরীবের পানে মুখ তুলে তাকান —

তারিণীকে ঠেলা মেরে সরিয়ে দেয় পুলিশ। নিধু তার চোয়াল বসা গাল, কোটরে-ঢোকা চোখ নিয়ে তারিণীর সাথে সরে দাঁড়ায়।

দারোগাবাবু ডাইরীতে নোট নিতে নিতে বলেন, লাশ কোথায়?

পুলিশ দুটো স্যালুট দিয়ে নিধুকে দেখিয়ে দিল। গাব গাছের গা বেয়ে তখন সার সাব উঠে যাচ্ছে লাল পিঁপড়ে, নিধুর চোখ সেই দিকে।

— বডি সার্চ হয়েছে? বড়বাবুর কড়া ধমকে পুলিশ দুটো ঘাড় কাৎ করে।

— মালপত্তর সব কোথায়?

— এম্‌টি স্যার। বড় চালাক স্যার! — পুলিশ দুটো হাত কচলায়।

— চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। রণবাবু ফুট কাটেন, আগুন খেলে মুখ তো পুড়বেই।

ক্যামেরা ঘাড়ে ঝোলান লোকটা ছবি তোলে। একবার দু'বার তিনবার। সিগ্রেট ধরিয়ে বড়বাবু বলে, আজই লাশ যাবে সদরে। উপর মহলের অর্ডার —

ভ্যান রিক্‌সোয় দশাসই দেহটা তুলে নিয়ে ছনের দড়িতে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধে নিধু। বাই বাই করে রিক্‌সা ছোটায় শালবনের ভেতর দিয়ে। লাঠি হাতে চৌকিদার ছোটে পিছ পিছ্‌। বাঁক পেরুতেই কার্তিকবাবুর সাথে দেখা। মানুষটার এখন মাথার ঠিক নেই। তপাবাবু চলে যাবার পর থেকে কেমন এলোমেলো কথা বলে লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে।

ব্রেকমারতেই ভ্যান রিক্‌সো থেমে গেল শালবনের শেষ মুড়োয়। তখনো কৃপণ রোদের কুসুম কুসুম আলো সর্বত্র। পোড়া বিড়িটা দূরে ছুঁড়ে কার্তিকবাবু বলে, নিধুরে, এট্টু সরাতো বাপ — দেখি মুখটা?

পরনে লুঙ্গি, গায়ে চিটে ময়লা জামা, হাওয়াই চপ্পলের ফিতেয় সেফটিপিন — কার্তিকবাবুর দিকে তাকিয়ে নিধুর বড় কষ্ট হয়। বাঁ হাতে সাদা কাপড়টা সরিয়ে দেয় তৎক্ষণাৎ।

পাগলের মত চেয়ে থাকে কার্তিকবাবু, ঠকঠক করে কাঁপে, আর একটা খুঁটি চলে গেলরে নিধু! এমনি করে সব খুঁটিগুলো যদি চলে যায় তাহলে পুরো বাড়িটার কি দশা হবে বলদিনি—!

নিধু তাকাতে পারে না। গলার মধ্যে আটকে যায় কথা। আর একটা বিড়ি ধরায় কার্তিকবাবু, দু'টান দিয়ে বিড়বিড়িয়ে ওঠে, তপাটা মনে হয় আর বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে একবার কি ওর মায়ের অসুখে আসত না? কত যে টেলিগ্রাম করলাম হোস্টেলে —।

ভ্যান রিক্‌সোটা বড সড়কের উপর তুলে এনে গামছায় ঘাম মুছল নিধু। তপাবাবুর বাবা আপন মনে বকতে বকতে বারোয়ারীতলার দিকে চলে গেল। ঝাঁকঝাঁক হাওয়া ক্ষিদের গন্ধ বয়ে আনে। থানা থেকে কাগজপত্তর নিয়ে তাকে যেতে হবে সদরে। তার মানে, সারাটা রাত রিক্‌সোতেই পগারপার। কাল দশটার বাসে পুলিশ যাবে। তার আগে সদরে লাশ না পৌঁছালে মুশকিল। কাটা-ছেঁড়া হবেই বা কি করে? ভাবনা মতই কাজ হয়। থানার পাশের হোটেলটায় এক পেট সাঁটিয়ে এসে হেঁউ করে ঢেকুর তুলে বিড়ি ধরায় সে। কাছিমের পিঠের মত উঁচু পেটটায় হাত বোলাতে বোলাতে ফিরে আসে থানার রোয়াকে। তিন তাসের জুয়া চলছে পুলিশ ব্যারাকে। বসে থাকতে থাকতে ঘুম পায় নিধুর। কাগজ পত্তর রেডি হতে অনেক দেবী। ডিউটি অফিসারের হাত খালি নেই, হাত খালি হলে ডাক পড়বে তার। নিমগাছতলায় গামছা বিছিয়ে গড়িয়ে নিতে গিয়েই ফ্যাসাদ হল। বড় মজার একটা স্বপ্ন দেখল।

মেজবাবু ফিরে এসেছে। চারদিক জুড়ে কোন কষ্ট নেই, অভাব অনটন নেই। মাঠে-মাঠে ধান, গাছে-গাছে ফল, বাতাসে কি মিষ্টি একটা সুয়াদ।

নিধুকে দেখতে পেয়ে তপাবাবু স্বস্তির একটা শ্বাস ফেলল, আজ একটা সিগ্রেট ধরাও খুড়ো। আজ বড় সুখের দিন! সারারাত ধরে গান-বাজনা হবে।

সিগ্রেট নিতে গিয়ে সিগ্রেট নিতে পারছিল না সে। হাত-পা থেকে মাংস ঝরে বীভৎস এক গন্ধ! চাঁদ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছিল রক্ত।

— মেজবাবু -উ-উ-উ! ভয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিল্লিয়ে উঠেছিল নিধু।

পাহারাদার সিপাইটা ঠেলা মেরে ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে ঘুম। চোখেমুখে জল দিয়ে এসে সে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ায়নি। কাগজ-পত্তর সব ঝোলায় ঢুকিয়ে পেরিয়ে গিয়েছে সুড়কি-ঢালা পথ, শালবন আর তে-মাথা। বড় সড়কের উপর উঠে এসে নিধু যেন অন্য মানুষ। পায়ের পেশীতে খিঁচ লাগিয়ে স্যাট্‌স্যাট্ ছোটায় রিক্‌সা।

ক্রমশ রাত গাঢ় হয়। চাঁদ ফুটে ওঠে আকাশে। কাশফুলের মত মেঘ জলের আয়নায় মুখ দেখে সারাক্ষণ। ওভারব্রীজের শেষ মুড়োয় এসে কপালের ঘাম মুছে দাঁড়িয়ে পড়ে নিধু। জলের শব্দে বুকটাতে গুড়গুড় শব্দ হয়। কপালের ঘাম মুছে নিধু পথের কথা ভাবে।

সদর হাসপাতাল এখান থেকে মোটে মাইল চারেক পথ। এই পথ ধরে কতবার যাতায়াত করেছে সে। কিন্তু আজকের মত এত নিখুঁতভাবে গঙ্গাটা তার চোখে পড়েনি।

তপাবাবু বলত, গঙ্গা সবার জন্য।

ভ্যান রিক্‌সোর তিন চাকায় তিনটে খোয়া আটকে নিধু পেট বাজিয়ে গান ধরে। সেই গানের সুরে চাঁদের আলোয় বড় ঝলমল দেখায় চারদিক। তখন বাবলা গাছের মাথায় তারায় ভর্তি আকাশ, আখক্ষেতে হাওয়ার ছেলেমানুষী দৌড়-ঝাঁপ, ধবল মেঘের উপর হালকা নীলের ওড়না। গান গাইতে গাইতে নিধু বড় আনমনা হয়ে পড়ে। তপাবাবুর কথা মনে পড়ে। অস্ত্রটা এখনও ফেরত দেওয়া হয়নি। কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা। তপাবাবুর সাথে এ বাবুটার বড় মিল। কাপড়ে মোড়ানো টান-টান লাশটার দিকে তাকিয়ে হুহু করে ওঠে বুক। অমন সুন্দর শরীর কাটাকুটি আর সেলাই-এ এফোঁড় ওফোঁড় করবে ডাক্তার। কাল-সিটে মেরে যাবে গতর। মাথা ফাটিয়ে পেট কেটে চলবে মরা মানুষের উপর দস্যিপনা। তারপর, জড়িয়ে মড়িয়ে তুলে দেবে ভ্যান রিক্‌সোয়। জল কাটবে, পচা রক্তে ভিজে যাবে কাতার দড়ি, চাদর আর রিকসোর কাঠ।

— কেন মরতে এয়েছিলেন গো বাবু? -- অসহ্য যন্ত্রণায় নিধু কপাল টিপে ধরে। মেজবাবু যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

— নিধু খুড়ো! দেখে নিও একদিন তোমরা পেট পুরে খেতে পাবে। তোমাদের সকলের জন্যিই তো আমাদের এই লড়াই —

কাঁপতে কাঁপতে ভ্যান রিক্‌সোর দিকে এগিয়ে যায় নিধু। সারা জীবন বহু পাপ করেছে। ভাল মানুষের ছোঁয়ায় এট্টু ভাল হতে দোষ কোথায়? কাতার দড়ি খুলে লাশটা কোল পাঁজা করে তুলে নেয় দু'হাতে। তারপর, ধীরে ধীরে নেমে যায় ব্রীজের নীচে। ভেজা পলিতে পা ছুঁইয়ে চাকরির কথা ভুলে যায়!

গোলামী করতে গিয়ে শিরদাঁড়া হারিয়েছিল তার বাপ। সেই দুঃখ সে এখনো ভোলেনি। কেঁচোর মত বেঁচে থেকে কি লাভ? মস্ত ছাতির গাং'-এ নেমে তার বুকের ছাতি বেড়ে যায়। ঢেউ-এর মাথায় বাবুকে ভাসিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ায়, বেত নুয়ানো ছিপছিপে মানুষটা।

একটি মৃত্যুর জন্য

ঘনশ্যাম চৌধুরী

কেউ বলেছেন কোমা, কেউ বলছেন ডিপ কোমা। কথাগুলো বাতাসে ভাসছে অদ্ভুত এক বাতাসযানে চেপে। বাতাসযানটা চোখে না দেখা গেলেও তার কাজকর্মগুলো বোঝা যাচ্ছে। বৈকুণ্ঠপুরের মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে এসব আলোচনা। আলোচনাটা মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তর্কপঞ্চাননকে নিয়ে। তিনি এখন কেমন আছেন? অনেকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ। দেশের সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত, দেশ-বিদেশজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন, বিদগ্ধ, পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিত্ব তিনি। দেশের গৌরব। বৈকুণ্ঠপুরের সুযোগ্য সন্তান। রত্ন। স্বভাবতই জনগণ তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তিত।

বৈকুণ্ঠপুর বাজার চত্বরে বিন্দুবাসিনী আরোগ্য নিকেতনে নিজস্ব চেম্বার ডাঃ রণবীর মিত্রের। মহামহোপাধ্যায়ের দেখভাল করতে যে মেডিক্যাল বোর্ড ফর্ম করা হয়েছে, উনিও তার মধ্যে আছেন। ডাঃ মিত্র এখন একগুচ্ছ রোগী পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। কথা হচ্ছিল এখানেই। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, কোমা স্টেজ থেকে রোগীকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলেও হতে পারে। তবে কোমা দীর্ঘস্থায়ীও হওয়া সম্ভব। অর্থাৎ কিনা, এই স্টেজে রোগীর আচ্ছন্নভাব কয়েকদিনেরও হতে পারে, অথবা বেশে কয়েকবছরও চলতে পারে। ডাক্তারের এক্ষেত্রে কিছু করার থাকে না।

আচ্ছা ডাক্তার মিত্র, শোনা যাচ্ছে, তর্কপঞ্চানন নাকি ডিপ কোমায় চলে গেছেন?

না। অফিসিয়ালি আমরা এই রকম কোন অ্যানাউন্সমেন্ট করিনি।

কথাটা কিন্তু খুব চাউর হয়েছে বৈকুণ্ঠপুরে।

ওসব গুজব।

আজকের কাগজের রিপোর্ট কী?

ডাঃ রণবীর মিত্রের অভিন্নহৃদয় পার্শ্বচর কেশব চক্রবর্তী দৈনিক ক্রান্তদর্শী পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাটা তুলে ধরে পড়তে শুরু করল — তর্কপঞ্চাননের শারীরিক অবস্থা অপরিবর্তিত রয়েছে। মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষে ডাঃ দিবাকর খাস্তগীর এক প্রেস রিলিজে বলেছেন, শুক্রবার রাতে তর্কপঞ্চাননের সামান্য শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তিনি বিপন্মুক্তই আছেন। তাঁর আচ্ছন্নভাব রয়েছে। পারিবারিক সূত্রেও এ খবরের সমর্থন মিলেছে।

ডাঃ রণবীর মিত্র মনে মনে বললেন, শালা দিবাকরটা ছ'মাসের সিনিয়রিটির জোরে খুব পাবলিসিটি পেয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই আচ্ছন্নভাবটাই কি কোমা?

ডাঃ রণবীর মিত্র তাঁর পাইপে একটু তামাক ঠেসে নিলেন। তারপর কায়দা করে দেশলাইটা জ্বালিয়ে পাইপ ধরালেন এবং যাবতীয় তৃপ্তি একত্রীভূত করে পাইপে কয়েকটা টান দিলেন।

পাইপটা ঠোঁটে চেপে রেখে ছোট ছোট কয়েকটা ধোঁয়ার গুটলি ছাড়লেন। কাগজের খবরটা একনজরে দেখে বললেন,

কোমা স্টেজ থেকে পেশেন্টকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন। তবুও আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রয়োগে রোগীকে বাঁচিয়ে রেখে সময়ের অপেক্ষা করা যেতে পারে। সেই অপেক্ষার কোন নির্দিষ্ট দিন নেই, তারিখ নেই।

আর রোগী যদি কোমাতে চলে যায়?

তবে আর কিছুই করার থাকছে না।

কেন?

কারণ তখন পেশেন্টের ব্রেনের মৃত্যু ঘটে গেছে বলতে হবে। শুধুমাত্র লাংসটাই চলছে। কিন্তু মেডিক্যাল সায়েন্সে ফিজিক্যালি তখনও আমরা তার এক্সপায়ারির কথা বলতে পারি না। আবার তার লাংসটাকে থামিয়েও দিতে পারি না। যদি লাংস থামিয়ে দেওয়া হয়, তখন মেডিক্যাল সায়ান্স বলবে, পেশেন্টকে মার্ডার করা হয়েছে।

সেই স্টেজে তাহলে আপনারা কী করবেন?

পেশেন্টের ফিজিক্যালি ডেথের অপেক্ষায় দিন গোনা ছাড়া কিছু করার নেই।

ও:।

ডাক্তারের টেবিলের টেলিফোনটা ঝাঁ ঝাঁ করে বেজে উঠলো।

হ্যালো।

নমস্কার। আমি দৈনিক ক্রান্তদর্শী থেকে বলছি। সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থ। তর্কপঞ্চাননের খবর কী?

বুড়ো ভোগাবে। অবস্থা একই রকম আছে।

এদিকে তো আমার পরিস্থিতি ঘোড়েল হয়ে যাচ্ছে মশাই! প্রত্যেক দিন বিনিদ্র রজনী যাপন। আর আপনাদের মেডিকেল রিপোর্টের জন্য পিত্যেশ করে টেলিফোনের সামনে বসে থাকা। দৈনিক যুগযাত্রার পয়সা আছে। ওরা একটা লোক মজুত রেখে দিয়েছে নার্সিং হোমেই। ওদের অ্যারেঞ্জমেন্ট ভালো, কনট্যাক্ট আছে। নেটওয়ার্ক বেটার। ফিনান্সের ভাবনা নেই। ওরা পারে। আমাদের তো প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কি আর করবেন। এই মেডিক্যাল বোর্ডে থাকার ফলে আমারও তো ন্যাচারালি নাওয়া-খাওয়া বন্ধই বলতে গেলে। কিন্তু আমার কথা তো আপনারা কিছুই লিখছেন না!

আচ্ছা, আজকে তর্কপঞ্চাননের শরীরের অবস্থা কেমন? সকালের রিপোর্টটা বলবেন!

লিখে নিন। অবস্থা অপরিবর্তিত। তবে আশঙ্কাজনক নয়। সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্টে খানিকটা কষ্ট পেলেও এখন নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছেন।

আপনার নিজস্ব মতামত কিছু থাকলে বলুন। আপনার নামে লিখে দেবো।

কথাটা শুনে ডাক্তার পাইপে সামান্য চাপ দিয়ে বেশ খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিলেন। জিভের ডগায় জল এসে গিয়েছিল। সেটাও পেটে চলে গেল। ডাক্তার তারপর শুরু করলেন,

লিখুন, মেডিক্যাল বোর্ডের অন্যতম সদস্য ডাক্তার রণবীর মিত্র জানিয়েছেন, তর্কপঞ্চাননের মতো রোগী কদাচিৎ পাওয়া যায়। কী প্রচণ্ড সহ্যগুণ! সত্যিই অকল্পনীয়। বৈকুণ্ঠপুরের প্রবাদপ্রতিম মানুষ তিনি। সাহিত্য ও শিল্পে তাঁর অগণন অবদান দেশবাসীর গর্বের বস্তু। তাঁর আরোগ্য আমাদের কাম্য। হ্যাঁ, আমার নামটা একটু লিখে দেবেন।

দুই

তখন রাত দশটা। টি ভি-তে ইংরেজী খবরের পরে হিন্দিতে সংসদ সমাচার হয়ে গেছে। সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থর আজ নাইট ডিউটি। দু' জায়গায় স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট ছিল আজকে। দু'টো কপিই লিখে জমা দিয়ে দিয়েছেন সিদ্ধান্ত। ক্রান্তদর্শীর নিউজরুম এখন গমগম করছে। খবরের কাগজের অফিসের পিক আওয়ার এখন। ইউ এন আই, পি টি আই টেলিপ্রিন্টারে সতর্ক নজর রাখতে হচ্ছে। ইথিওপিয়ায় ক্যু, পাকিস্তান ক্রিকেটে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, তুরস্কে ভূমিকম্প, আরাফতের বিমান মরুঝড়ে — কোনও ভাইটাল নিউজ মিস না হয়ে যায়। বৈকুণ্ঠপুরে লোকালি আজকে কোনও বড় ঘটনা নেই। শহরের অদূরে ন্যাশনাল হাইওয়েতে একটা বাস খাদে পড়ে গিয়ে গোটাকুড়ি লোক মারা গেছে। আহত অনেকেই। রিপোর্টিং-এর বৈশ্বানর গাড়ি নিয়ে গেছে ওখানে। সঙ্গে গেছে ফটোগ্রাফার ত্রিদিব — ত্রিদিবেশ্বর চক্রবর্তী। সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থের নাইট ডিউটি পড়লেই ও টেনশনে ভোগে। তার ওপর রয়েছে তর্কপঞ্চাননের এই ব্যাপারটা। যদি রাতে কোনও ঘটনা ঘটে যায়, তর্কপঞ্চানন যদি মারা যান, তবে তো কাগজের ফ্রন্ট পেজ নতুন করে ছাপতে হবে। অ্যারেঞ্জ পাল্টে যাবে। টেনশন হবেই। এটাই স্বাভাবিক। এখন টানা এক সপ্তাহ নাইট চলবে সিদ্ধান্তর। বউ সুচিত্রা একেবারে খেপে থাকবে। কথায় কথায় বলবে, আগে জানলে কে তোমাকে বিয়ে করতো! ক'দিন ঘরে থাকো? বউ-ছেলেপুলেদের দিকে কতটুকু নজর দাও বল তো? প্রথম প্রথম সিদ্ধান্ত উত্তর দিত,

সাংবাদিকের জীবন, এরকমই হয় সুচিত্রা। কী আর করা যাবে।

প্রথম প্রথম সুচিত্রা চুপ করে থাকতো। এখন বলে,

ধুত্তোর নিকুচি করেছে সাংবাদিকের জীবনের! বুঝতাম রাজরানীর মতো পা এর ওপর পা তুলে দিয়ে বসে বসে খাচ্ছি। তা হলে না হয় হতো। গাধার মতো খাটছি। হাঁড়ি ঠেলছি। আর উনি আমাকে সাংবাদিকতা দেখাচ্ছেন।

আরে তুমি —

চুপ করো! মেজাজ খারাপ করবে না! তুলকালাম কাণ্ড করে দেবো। ভয়ে সিদ্ধান্ত চুপ করে যেতো। ফিউডাল যুগের দুর্দান্ত রাগী পুরুষ হয়ে উঠতে পারে না সিদ্ধান্ত। যার প্রচুর টাকা আছে তারই রাগ আছে। প্রেমও আছে। এই ফিলজফি সিদ্ধান্ত জীবনের প্রত্যেকদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছে। একবার তর্কাতর্কির সময় রাগের চোটে সুচিত্রা কালার টি ভি-তে এ টি দেবের ডিক্সনারিটা ছুঁড়ে মেরেছিল। তাতে টি ভি-র পিকচার টিউবটি ভেঙে গিয়েছিল। নারীজাতির হাতে ডিক্সনারির এইজাতীয় ব্যবহারের ঔচিত্যবোধ নিয়ে সিদ্ধান্তের মনে প্রশ্ন জেগেছিল বৈকি!

অবস্থা বেশ জটিল। — কথাটা শুনে সিদ্ধান্ত পেছনে তাকালো। স্বয়ং সম্পাদকের উক্তি।

কী হলো?

নার্সিংহোমে ফোন করেছিলাম। তর্কপঞ্চাননের অবস্থা স্লাইট ডিটোরিয়েট করেছে। তুমি নার্সিংহোমের সঙ্গে কনট্যাক্ট রেখো। আমি একটু বেরোচ্ছি। ফটোগ্রাফার রেডি রেখো। কিছু ঘটে গেলে, তর্কপঞ্চাননের বাড়িতে অর্থাৎ 'ছায়া সুশীতল শান্তির নীড়ে' ওনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে দু-চার কথা লিখে রাখবে। যদি কিছুই না বলেন, শুধুই কাঁদেন, তবে তার একটা উপযুক্ত ব্যঞ্জনা দিয়ে, উপমা অলঙ্কারে অর্থাৎ পতিব্রতা ইত্যাদি ইত্যাদি, বোঝোই তো — নিউজের শুরুতেই পুট করে দেবে। পাবলিক খাবে ভালো। সেন্টিমেন্ট প্লাস ইমোশন

দিয়ে এমন ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করবে, যাতে পাবলিকের চোখে জল এসে যায়। ফাইল থেকে তর্কপঞ্চাননের সেরা ছবিটি বেছে রেখো। দেখো, দৈনিক যুগযাত্রা যাতে আমাদের বিট দিয়ে না দেয়। ও. কে! আমি বেরোচ্ছি।

ও. কে। — সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থর হার্ট বিট ডবল হয়ে গেল। আজ অফিসে আসার সময় সুচিত্রার ধাতানি খেয়ে এসেছে সিদ্ধান্ত। দু'দিন ধরে রান্নার গ্যাস নেই। গ্যাসটা আনানো হয়নি। কয়লার উনুনে রান্না করে সুচিত্রার চোখ লাল। কাল গ্যাস না আনলে রান্না বন্ধ — সুচিত্রার তীক্ষ্ণনাসা কণ্ঠে আর্তনাদের মতো সেই চিৎকার এখনো ওর কানের পর্দায় হ্যামার করে যাচ্ছে। ইলেকট্রনিক্স টেলিপ্রিন্টার মেশিনের পেলব শব্দ হচ্ছে থেমে থেমে, কিন্তু একটানা। সাব-এডিটররা সংবাদসংস্থার ক্রিড থেকে নিউজ তর্জমা করছে। এখনও লিড নিউজ ছাড়া যায়নি। লিড ছবি সিলেক্ট হয়নি। সিদ্ধান্ত ইন্টারকমের বোতাম টিপলো।

হ্যালো!

হ্যালো, সুখেন! মহামহোপাধ্যায় তর্কপঞ্চাননের নার্সিংহোমে আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর ফোন করে ডেভেলপমেন্টটা জেনে নিও।

ঠিক আছে সিদ্ধান্তদা।

আর ডাক্তার রণবীর মিত্রের লাইনটা ধরতে বলো অপারেটরকে। লাইনটা যেন আমার ঘরে পাঠিয়ে দেয়।

আচ্ছা।

এদিকে হাইওয়ের অ্যাক্সিডেন্টটা কভার করে বৈশ্বানর আর ত্রিদিবেশ্বর ফিরে এসেছে।

সিদ্ধান্তদা, একুশজন স্পট ডেড, চারজন হাসপাতালে যাবার পথে মরেছে। সতেরোজন উনডেড। বাসে ঠাসা ভিড ছিল। খালের পাঁক থেকে ডেডবডিগুলোর একেবারে লাইভ ছবি তুলেছে ত্রিদিবেশ্বর। সকালে একেবারে গরম ছবি আর নিউজ খাবে পাবলিক।

সাবাস! লোকাল থানার ও-সির সঙ্গে কথা বলেছো?

বলেছি। লোকাল পাবলিক, একজন প্রাইমারি স্কুলের টিচার, কয়েকজন দোকানদারের সঙ্গে কথা বলেছি। নিউজ লেখার সময় কিছু কলোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জুড়ে দিলেই মাল একেবারে খুলে যাবে।

ফাইন! নিউজ লাইভফুল করতে একটু গপ্পো জুড়ে দিও। পুলিসের প্রতি পাবলিকের ক্ষোভ, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা — এসব লিখলে আমাদেব কাগজ পাবলিক সিমপ্যাথি ক্রিয়েট করতে পারবে। দৈনিক যুগযাত্রাকে হারিয়ে দিতে হবে। আর ত্রিদিব!

বলুন।

দু'-তিনটে ছবি প্রিন্ট করে আমাকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

আচ্ছা।

ত্রিদিবেশ্বরের জিন্সের প্যান্ট কাদায় মাখামাখি।

দেখুন সিদ্ধান্তদা, একেবারে খালের মধ্যে পাঁকে নেমে ছবি তুলেছি।

হ্যাঁ, পাঁক ঘেঁটেই আমাদের সত্যি ঘটনা জানতে হবে — সিদ্ধান্তের ঠোঁটে এক অদ্ভুত হাসি ঝিলিক দিয়ে যায়।

টেলিফোন বাজলো। সিদ্ধান্ত কপি দেখতে দেখতে বাঁ হাতে বিসিভার তুলে কানে লাগায়।

সিদ্ধান্তদা, ডাক্তার রণবীর মিত্রের লাইন। —অপারেটারের গলা।

হ্যালো! রণবীরবাবু, রাস্তায় তো জোর গুজব, তর্কপঞ্চানন নাকি মারা গেছেন!

মারা যাননি। তবে অবস্থা সিরিয়াস। নার্সিংহোম থেকে এইমাত্র ফোন করেছিলো। আমি যাচ্ছি নার্সিংহোমে।

আপনি আমাকে ফোনে ডেভেলপমেন্টটা জানাবেন। এ ব্যাপারে আপনিই আমার একমাত্র ভরসা। ওদিকে তো দৈনিক যুগযাত্রা তর্কপঞ্চাননের ফ্যামিলির সঙ্গে লাইন করে নিয়েছে। সরাসরি টেলিফোন করছে বাড়িতে।

ওকে। ডোন্ট গেট নার্ভাস। আমার ওপর ভরসা রাখুন।

ছাড়ছি তা হলে।

ঠিক আছে।

সিদ্ধান্ত ভাবছিল, টেনশন একটু হচ্ছে বটে, তবে ঘটনাটা যদি আজকেই ঘটে যায়, একটা দারুণ খবর করার চান্স পাওয়া যাবে। নিউজ এডিটরের চেয়ারের দিকে দৌড়ে আরও এক ধাপ এগিয়ে থাকা যাবে। সিনিয়র সাব এডিটর হিসেবে প্রবুদ্ধ এখনও ওর সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিচ্ছে। অর্থাৎ দু'জনে পয়েন্টে সমান সমান। আজ প্রমোশনের ক্ষেত্রে এটা একটা সুযোগও বটে। নিজের টেবিলে কাজ করতে করতে সিদ্ধান্তর মাথায় ভাবনাগুলো সব জাঁকিয়ে বসলো। ঠিক সাড়ে দশটায় ডাঃ রণবীর মিত্র ফোন করলেন।

এবার বোধহয় তর্কপঞ্চাননকে বাঁচানো গেল না।

অবস্থা কেমন?

আরো সিরিয়াস।

এদিকে বৈকুণ্ঠপুরের রাস্তায় রাস্তায় মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে, তর্কপঞ্চানন মারা গেছেন।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি। রাস্তায় রাস্তায় জটলাও দেখলাম। যাকগে এখনকার অবস্থাটা লিখে নিন।

সিদ্ধান্ত ডাঃ মিত্রের রিপোর্টের নোট নিতে নিতে ভাবছিলো, নিউজটা সে নিজেই করবে। বেশ গুছিয়ে। ওর চোখে ভাসছিলো নিউজ এডিটরের চেয়ার। আর সুচিত্রার সর্বশেষ আবদার একটা ভি সি আর।

রাত সাড়ে এগারোটায় আবার ফোন। অবস্থা আশাপ্রদ নয়। পৌনে বারোটার ফোনের খবর, মেডিক্যাল বোর্ডের জরুরি বৈঠক বসেছে। রণবীরবাবু জানালেন, মেডিক্যাল বোর্ড কোন বিবৃতি ইস্যু করছে না।

সিদ্ধান্ত ভাবছিলো, একটা প্রমোশনের সুবর্ণ সুযোগ। সুচিত্রার বহুদিনের স্বপ্ন একটা ভি সি আর। প্রতিবেশিনীদের সাথে কম্পিটিশনে পিছিয়ে পড়ছে সুচিত্রা। ভি ডি ও পার্লারে গিয়ে গর্বিত ভঙ্গিতে ও ক্যাসেট বাছবে। পুরনো ছবি ম্যাকানাস গোল্ড, শোলে, মধুমতী, জ্যাঙ্গো, টাওয়ারিং ইনফার্নো কিংবা সংঘর্ষ, বেদের মেয়ে জোছনা, রাম তেরি গঙ্গা মইলী। আর দু একটা প্রায় পর্ণো ছবি। রাতভর দেখার ইচ্ছে সুচিত্রার। প্রমোশনটা হলে একঝাঁক টাকা বাড়বে। সংসারে টাকা ঢাললেই সুচিত্রার মুখে হাসি ফুটবে। সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থ স্বপ্নে বিভোর। ইমোশন, সেন্টিমেন্ট, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ভাষার বুনট দিয়ে লিখতে হবে। একটি নক্ষত্রের নির্বাপণ না কি উল্কাপতন, ঝোড়ো বাতাস থামলো, অথবা অস্তাচলে রবি। লাখো মানুষের অশ্রুবিন্দুতে শোকগাথা। মহামহোপাধ্যায়-পত্নীর মৌনমুখর তাপসী মুখমণ্ডলে পতিপ্রেমের উজ্জ্বল উদ্ভাস। শহর মুহ্যমান। নগর শোকস্তব্ধ। দেশজোড়া শূন্যতার হাহাকার।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তর্কপঞ্চাননের শারীরিক অবস্থা যত খারাপ হতে থাকে, সিদ্ধান্ত ততই খুশিতে উজ্জ্বল হয়। অফিসে ব্যস্ততা বাড়ে। ভালো ছবি খোঁজো। বেশ কয়েকটা লেখা রেডি করা আছেই, সেগুলো ফাইল থেকে বের করো। অবিচ্যুয়ারিটা আরেকবার ঝালিয়ে

নাও। রাত সাড়ে বারোটায় নার্সিংহোম থেকে রণবীর মিত্র জানালেন, প্র্যাকটিক্যালি উনি বেঁচে আছেন কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আমরা আরও খানিকক্ষণ অবজার্ভ করবো।

শিল্প সাহিত্যে নাটক চলচ্চিত্রের দিকপাল মানুষদের ফোন নাম্বারগুলো বের করে ফেলো! প্রত্যেকের কণ্ডোলেন্স স্পিচ নিতে হবে। সিদ্ধান্ত পুরকায়স্থ নিজেই সাহসী সিদ্ধান্ত নিলো — ফ্রন্ট পেজে এডিটোরিয়াল লেখা হবে সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে। সিদ্ধান্ত নিজেই লিখবে সেই এডিটোরিয়াল। যার সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সিদ্ধান্ত কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল।

অব্যয়, ডাক্তার রণবীর মিত্রের ফোন ছাড়া আর কেউ খোঁজ করলে বলবে, আমি নেই — হুকুম জারি করল সিদ্ধান্ত। কম্পিটিশন। এগোতে হবে। আগে বাড়ো। ওই চেয়ারটা দখল করতে হবে। ওই চেয়ারের অনেক ক্ষমতা। অর্থ, সম্মান, যশ, অহঙ্কার, স্ট্যাটাস। ক্র্যাং, ক্র্যাং। টেলিফোন —

হ্যালো!

ডাক্তার রণবীর মিত্র বলছি। সুখবর আছে। তর্কপঞ্চাননের লাংস কাজ—খট। লাইনটা কেটে গেল।

হ্যালো, হ্যালো! শুনতে পাচ্ছেন? কু-কুঁক, কু-কুঁক — একটানা যান্ত্রিক আওয়াজ। হতচ্ছাড়া বাপ্পোৎ টেলিফোন। এদিকে দৈনিক যুগযাত্রা কেল্লা মেরে দিচ্ছে। রিসিভার ক্রেডেলে রেখে সিদ্ধান্ত ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ক্র্যাং ক্র্যাং!

হ্যালো।

হ্যালো, আমি রণবীর মিত্র বলছি। লাইনটা ডিসটার্ব করছে। কু-কুঁক খ্যারর, খ্যাস, খ্যারর খ্যাস। হ্যালো হ্যালো!

হ্যালো! রণবীরবাবু! বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি!

শুনুন শুনুন! তর্কপঞ্চাননের লাংস আবার কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। সবকিছু নর্মাল। শুনতে পাচ্ছেন? সব নর্মাল।

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

সব নর্মাল।

সিদ্ধান্ত চেয়ারে গা এলিয়ে দিল। ওর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। চোখগুলো ফেটে বেরোচ্ছে যেন। চারদিক অন্ধকার। ভারসাম্যহীনতায় দুলতে দুলতে সিদ্ধান্ত চেয়ার উলটে পড়ে গেল। পেছনের বুক শেল্‌ফের ওপর। শেলফের কাঁচের কভার ঝনঝন করে ভেঙে গেল।

তিন

রাত আড়াইটা। ডাঃ রণবীর মিত্র স্টেথোস্কোপটা কান থেকে নামিয়ে বললেন, হার্ট অ্যাটাক। দারুণ টেনশনের মাথায় হার্ট ব্লক হয়ে গিয়েছিল কয়েক সেকেণ্ডের জন্য। তবে সিদ্ধান্তবাবু এযাত্রায় বেঁচে যাবেন। রেস্ট চাই। নো টেনশন। নেভার, নেভার! তবে মনে রাখতে হবে, এটা প্রথমবারের স্ট্রোক। কিন্তু ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল।

চারদিন পর মহামহোপাধ্যায় শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ তর্কপঞ্চানন মারা গেলেন।

মৎস্যপুরাণ

মহীবুল আজিজ

.... এক সের খেঁকশিয়ালের মাংস উত্তমরূপে পাটায় থ্যাতলাইয়া উহাতে দারচিনি, লং, এলাচি প্রভৃতি সুগন্ধ মসলা মিশাইতে হইবে। বেশ কয়েকটি বড়-বড় পুরিয়া করা যাইবে। এক-এক পুরিয়া খাইয়া করিলে বীর্য বাহির হইতে কমপক্ষে এক ঘণ্টা সময় লাগিবে।.....

......কাছিমের মাংস রোদে শুকাইয়া লইয়া গুড়া করিতে হইবে। তারপর উহার সঙ্গে তেঁতুলবীচির গুড়া মিশাইয়া ভাল করিয়া একত্র করিতে হইবে। প্রত্যেকবার করিবার পূর্বে আধা ছটাকের মত খাইয়া লইতে হইবে।.........

খালেখাজ্গির গৃহলুণ্ঠনকারীদের মধ্যে ছিল স্পষ্ট দু'টো দল। এক দল সোনা, রূপা, তামা, পিতল, লোহা, কাঠ যা-ই মিলছিল হাতের কাছে; কুড়িয়ে জড়ো করছিল উঠোনে আর চিৎকার করছিল আকাশ ফাটিয়ে, বহু খেলা দেখিয়েছো, তোমার দিন শেষ! অন্য দলটি সন্ধান করছিল রক্তের। মেরুন রঙের সাম্প্রতিক রক্ত থেকে কালচে কিংবা শুকিয়ে কালো হয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। তাদের রক্তান্বেষণ এমন হাস্যকর পর্যায়ে পৌঁছায় যে তারা খাট, পালঙ্ক, তোষক, বালিশ উল্টিয়ে চলে রক্তের খোঁজে। পুরনো সেগুন-আলমারির পাল্লা সরিয়ে ভেতরে নাক গুঁজে দেয় তারা রক্তের আশায়। কারো-কারো বিশ্বাস, শুকনো জমাট হয়ে গেলেও একটা ঘ্রাণ অবশিষ্ট থাকে রক্তের। ঘন অন্ধকারেও সেই ঘ্রাণ বোঝা সম্ভব।

প্রথম দল বলতে গেলে পুরো বাড়িটাকে অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভবানী করে দেয় এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ে। এরি মধ্যে তাদের অন্তর্গত প্রতিশোধস্পৃহাও চায় বিশ্রাম নিতে। তারা মাথাপিছু সোনা রুপা-তামা-লোহার হিসেব করতে-করতে বাড়ি ফিরে যায়। রক্তশূন্য দ্বিতীয় দল পড়ে মহা ভাবনায়। এক ফোঁটা রক্ত পাওয়া গেল না অথচ এত এত নিখোঁজ মানুষের চরমতম পরিণতির কারণ নাকি এই লোকটাই। অক্ষর একজন কোণে অনেক কাগজের ভিড়ে এক টুকরো কাগজে নাক ডুবিয়ে দেয় সোৎসাহে; কিন্তু খ্যাঁকশিয়াল আর কাছিমের মাংসের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে কাগজের টুকরোটাকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। কিছুকাল পরে যখন সে জানতে পেল খালেখাজ্গির ঢেঁকিঘর মেরামতকারীরা ঢেঁকির লোহার দাঁতে আর লোহার পাতে মোড়া গর্তের কাছে যেতে পারছিল না একপ্রকারের দুর্গন্ধের আক্রমণে তখন তার মনে পড়ে আরো অনেককাল আগে খালেখাজ্গির লোকজন রাত্রিবেলা দা-সড়কি নিয়ে বেরিয়েছিল খ্যাঁকশিয়ালের খোঁজে। অনেকগুলো কাছিমও তারা জালে আটকেছিল এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে। ক্ষীণ হলেও একমাত্র সূত্রটি সেদিন হাতে ধরে হাতছাড়া করায় সাক্ষর লোকটি যারপরনাই দুঃখ বোধ করতে থাকে।

এসবের মধ্যে অনেক-অনেক গল্পের জন্ম দিয়ে কিংবা নিজেই নানান গল্প হয়ে শক্তিমান খালেখাজ্গি বিরাজমান দিবালোকের অস্তিত্ব নিয়ে।

তখন সারা গ্রাম জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে। গ্রামবাসীদের স্মৃতিতে কিংবা ইতিহাসে একটিও যুদ্ধ ছিল না তবু তারা বলল, যুদ্ধে যাবার এটাই শ্রেষ্ঠ সময়। এদের মধ্যে সবচাইতে বড় ধানের গোলার মালিক খালেক বলল অন্য কথা, যে-জাতির ইতিহাসে তেমন যুদ্ধজয়ের ঘটনা নেই তারা কীভাবে যুদ্ধ করবে! যুদ্ধটা তাদের জন্যে একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা আর তার মতে সেই যুদ্ধ অন্যায্য। সুদূর আরব ভ্রমণ করে নামের আগে একটি দামী বিশেষণ মূল্যবান পাথরের মত বসিয়ে খালেক ভাবে, গ্রামের লোক তার কথামত নিজ-নিজ অস্ত্র, লাঠিসোটা, বল্লম, লোহা প্রভৃতি গুটিয়ে নিয়ে ফিরবে। কিন্তু তাদের রক্তে তখন জেগেছিল নেশা। তাদের সমবেত কণ্ঠ আকাশবাতাস চিরে যায় যুদ্ধ-যুদ্ধ বলে। একটিও যুদ্ধ না থাকুক, আমরা যুদ্ধের কাহিনী ঢোকাব আমাদের ইতিহাসে। বলে তারা যুদ্ধে চলে গেল।

পুরুষেরা যুদ্ধে গেলে তাদের অরক্ষিত স্ত্রী-কন্যা-মাতাদের সান্ত্বনা যোগায খালেখাজি, তোমরা ভেবোনা, আমি রয়েছি পাশে। গোটা গ্রাম যুদ্ধের পূর্ব-অভিজ্ঞতাশূন্য ছিল একথা হয়তো সম্পূর্ণ সঠিক নয়। যারা মনে করতো স্থলপথে বিশেষ অসুবিধের কাবণে পানিপথে যুদ্ধ হয়েছিল তারা প্রশ্ন করে, যুদ্ধের কামানটা ঠিক কোথায় বসবে? সেখান থেকে গোলা ছিটকে এসে পড়ার আগেই তারা নিরাপদ কোন স্থানে লুকিয়ে পড়তে পারবে কিনা। কারো-কাবো জিজ্ঞাসা, যদি মাত্র আঠার জনেই পারে একটি সাম্রাজ্য উল্টে দিতে তবে আর এত লোক দলে-দলে যুদ্ধে যায় কেন। আরবাগত শ্মশ্রুতে হাত বুলিয়ে খালেখাজি ওদের জানায়, শত্রু বধ করা দূরে থাকুক, বাঙালগুলো কারো একটি যৌনকেশও ছিনিয়ে আনবার যোগ্য নয়!

তবু যুদ্ধ চলে। প্রচুর যৌনকেশসমৃদ্ধ পুরুষেরা বাঙাল নামক লোকেদের হাতে মারা পড়ে। মারা পড়ে বাঙালরাও। ধোঁয়াআক্রান্ত কোন সবুজ ধানের ক্ষেতে শেষ নিঃশ্বাস গুঁজে দেবার মুহূর্তে কেউ ভাবে, বুঝি তার বাড়ির পেছনের বিলেই সে ঘুমিয়ে পড়ছে কিছুক্ষণের জন্যে। কোন গৃহবধূর কাছে খবর আসে তার স্বামীর তর্জনি শেষ মুহূর্তেও বন্দুকের ঘোড়া ছুঁয়ে ছিল। যুদ্ধের অভিজ্ঞতাবিহীন দেশে বস্তুতঃ যোদ্ধার সংকট বলেই আর কিছু থাকল না।

প্রধানতঃ পুরুষরাই যায় যুদ্ধে। নারীবা অপেক্ষায় থাকে তাদের পুরুষদের মৃত্যুসংবাদ কিংবা তাদের হাতে শত্রুহত্যার সংবাদ শুনবে বলে। এবিমধ্যে বহু নারী-নিখোঁজের খবর আসে। গ্রামবাসীরা চোখ বুঁজেই বলে দিতে পারে যুদ্ধে যায়নি ওরা। পুরুষপ্রধান যুদ্ধে দশ হোক আর চল্লিশই হোক নারীর প্রবেশ বলতে গেলে অনাকাঙ্ক্ষিতই। কাজেই শংকা বাড়ে। অনেক রাত অবধি টিমটিমে কুপি জ্বলে খালেখাজির বাড়ি। স্থানীয় বাজারে ক্যাম্প-নেওয়া পোশাকসজ্জিত সৈন্যদের সঙ্গে নাবী-অন্তর্ধানের সম্পর্ক আবিষ্কার করে কেউ-কেউ। জোর-বরাত হলে দুয়েকজন ফিরে আসে। এসেই তারা সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে ভ্যাবলার মত বলে, মাঠ এত লাল হয়ে যাচ্ছে কেন রক্তে। দিনের আলোকেও তাদের মনে হয় জমাট অন্ধকার। সবাই সভয়ে এড়িয়ে চলে ওদের। তারপর, অপ্রকৃতিস্থতা সত্ত্বেও প্রকৃতির নিয়মে তাদের তলপেটে ক্রমঃস্ফীতি দেখা দিলে গ্রামবাসী আগেভাগেই বুঝতে পারে তারা আসলে বসবাস করছে অনাগত শত্রুর সঙ্গে।

নানা গল্প এ-কান সে-কান হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এসব গল্পের কল্যাণে খালেখাজি হয়ে ওঠে পরম পুরুষ। অবলীলায় সে দূরদেশ থেকে আসা সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলে তাদের মাতৃভাষায়। তখন খালেখাজির কবরবাসী মায়ের কাছেও সে অচেনা হয়ে যায়। তার মৃত মা ভাবে, ছেলেটি গিয়েছিল মরুভূমির দেশে। যে-দেশে কস্মিনকালেও যায়নি সেখানকার ভাষা কী করে শিখল! আধপাগল বলে খ্যাত একটি লোক গ্রামের লোকেদের বোঝায় খালেখাজির কীর্তিকাহিনী। ক্যাম্পে বসে সে মোটা-মোটা রুটি চিবোয় বিদেশী সৈন্যদের সঙ্গে। ওদের

চরম খাদ্যপটুত্বের ফলে অচিরেই নিঃশেষ হয়ে আসে গ্রামের যত হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল। ওরা মাছ খায়না বলে তখনও পুকুরের মাছগুলি সাঁতার কাটতে পারছে নির্ভয়ে। লোকটির সবিস্তার বর্ণনায় সকলের ধারণা হয় কোন গোপন স্থান থেকে সে সব দেখতে পেয়েছে। নইলে সবটাই এক বানোয়াট আষাঢ়ে গল্প।

খাওয়াদাওয়ার পর শুরু হয় আসল পর্ব। ক্যাম্পের মেজর তার পুরু গোঁফের আড়ালে একটা হাসি গোপন করে ঢুকে পড়ে একটা কামরায়। একটু পরেই খালেখাজি এক সুন্দরী যুবতীকে ঢুকিয়ে দেয় কামরাটাতে। যে-মেয়েটিকে বহুকাল বহু কামনায়ও লাভ করতে পারেনি গ্রামের সক্ষম যুবকেরা। এমনকি যারা যুদ্ধে গেছে তাদেরও দুয়েকজনের গোপন বাসনা ছিল জয়ের মালা পেয়ে তারা মেয়েটির পায়ের কাছে অস্ত্র রেখে বলবে, পৌরুষের আর কী প্রমাণ চাও! বারান্দায় একখানা চেয়ারে বসে থাকে খালেখাজি বুকের ভেতরে ফুটন্ত উদগ্র উল্লাস নিয়ে। ভেতরে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে মেজর শিকার করে মেষছানার মত বাঙালি মেয়েকে। মেয়েটিকে সে ঠাপাতে থাকে অবিরাম। আসুরিক শক্তিতে মেজর শব্দ তোলে দীর্ঘক্ষণ, ঠাপাৎ, ঠাপাৎ, ঠাপাৎ! আর বাইরে উল্লাসে নিঃশব্দ হাততালি দেয় খালেখাজি। সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গীতের ছন্দ তোলে—পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ! মেজর শব্দ তোলে ঠাপাৎ, ঠাপাৎ! খালেখাজি হাততালি দেয়, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ! ভেতরে ও বাইরে শব্দ থামে একসময়ে। বাইরে এসে মেজর নতুন মেয়ের তালাশ করে।

সাধারণ্যে এ-গল্পের প্রচার হতে না হতেই আধপাগল লোকটিকে একদিন আর দেখা যায় না। শোনা যায় সে অন্তর্হিত হয়েছে অলৌকিকভাবে। অন্তর্ধানের আগে তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল পুরোটাই। ঘরের মেঝেতে এক মানুষ সমান গর্ত খুঁড়তে লেগেছিল সহোদরাকে কোন এক অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে লুকিয়ে রাখবার জন্যে।

সিকি শতাব্দী পেরিয়ে যায়। কিন্তু গল্পগুলো হারিয়ে যায় না পুরোপুরি। নিখোঁজ লোকেদের সন্তানসন্ততির চোখের সামনেই দিন-দিন খালেখাজির চুলের শ্বেতত্ব বাড়ে। ওর হাতে যুক্ত হয় যষ্ঠির সহায়তা। দাওয়ায় বসে-বসে সে ঝিমোয় দুবলা রোগীর মতন। অনেকেই তখন তার ঝিমুনিকে.কোনো অবসাদগ্রস্ত ঘোর ভেবে হঠাৎই সেই দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ নিতে চায়।

: সখিনারে মনে আছে তোমার! ফর্সা ধব্‌ধবা সখিনা। যুদ্ধের বছর নিখোঁজ হয়ে গেল। খালেখাজি চিনত সখিনাকে। কিন্তু লোকে বলে সে-ই এক রাতে ওকে তুলে নিয়ে যায় এবং উঠিয়ে দেয় পাকিস্তানী মেজরের হাতে। একদিন একরাত সখিনাকে ভোগ করার পর মেজর পুরস্কারস্বরূপ সখিনার অবশিষ্ট নারীত্বকে ছেড়ে দেয় খালেখাজির কাছে। কাজেই, সখিনার শেষ সংবাদ তারই জানার কথা। কিছুদিন পর মেয়েটিকে পাওয়া যায় মৃত — শরীরময় নখের আঁচড় দুয়ারে লক্ষ্মীর অসংখ্য পদচ্ছাপ রেখে গেছে। সেই দুর্বল মুহূর্তেও খালেখাজির মুখ দিয়ে একথা বের করানো যায় না যে সে-ই সখিনার মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্যে দায়ী। কেউ-কেউ মুখের ওপরেই তাকে খুনী বলে ডাকতে শুরু করলে সে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বলে, কে দেখেছে ডাকো। আমি খুন করেছি, কে দেখেছে ডাকো তাদের! কেউই তখন আর সাক্ষী খুঁজে পায় না।

এক অদ্ভুত বাস্তবতার মধ্যে তাদের দিনযাপন। সারা গ্রাম জানে সে বহু খুন-নিখোঁজের হোতা। কিন্তু কারো হাতে কোনো প্রমাণ নেই। গ্রামের প্রাচীনতম ব্যক্তি রহমত মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলে যায় তার নাতিকে, তোর মাকে নিয়ে গেছিল খালেখাজি। নাতি বলে, তুমি তো চোহে দেখতি পাওনা দাদু। দেখিনা, দেখতাম। পঁচিশ বছর আগে আমার দৃষ্টি ছিল

বাজপাখির মতন। বছর-বছর মানুষ মরে আর পঁচিশ বছরের স্মৃতির গ্রন্থ থেকে খসে পড়ে একেকটি পাতা। প্রজন্মান্তরের অনেকেই আর পাকিস্তানী মেজরের সঙ্গে খালেখাজির যোগসূত্রের ব্যাপারটিকে বিশ্বাস করতে চায় না। এ-সবই তাদের মনে হয় গাঁজাখুরি গল্প। খালাজির চারপাশে এরিমধ্যে বেশ একটা ভিড় জমে যায়। অপরিসীম আগ্রহে ওরা জানতে চায়, প্রবল তৃষ্ণা নিয়েও সে কীভাবে সম্পূর্ণ প্রদক্ষিণ শেষ করতে পারে তীব্র দাবদাহের আকাশ এবং পায়ের তলের লোহার পাতের মত ঝলসানো আবরণে দাঁড়িয়ে। সৃষ্টির মাহাত্ম্য বলতে-বলতে খালেখাজির চোখে চিকচিকে জলের আভাস—তোমরা জানো একবার পানি খেয়ে কত-কত মাস থাকতে পারে উট। মানুষও উট হয়ে যায় ওখানে থাকতে-থাকতে। সেদিন উটের ক্ষমতা আমিও পেয়েছিলাম।

অল্পদিনের মধ্যেই সহায়তার যষ্ঠিটি তার নিজস্বতার সংকীর্ণ সীমানা ছাড়িয়ে হয়ে উঠল সার্বজনীন। সেই লাঠি শূন্যে তুলে আধবোঁজা চোখে খালেখাজি রায় দেয়, হ্যাঁ, ওর জেনার শাস্তি হলো ওকে মাটিতে অর্ধেক পুঁতে পাথর মারা। কী করে যেন লাল ইটের অনেকগুলিই মাটি-মাটি গ্রামেও এসে পৌঁছায়। হাত বাড়াতেই তারা পেয়ে যায় সেসব। আর, হঠাৎ হাওয়া উঠতেই অর্ধসমাহিত মেয়েটির দীর্ঘ চুল এবং ময়লা শাড়ির আঁচল এমন দুদ্দাড় উড়তে শুরু করে যে আগুয়ান দূরের দর্শনার্থীদের মনে হয় বুঝি ডানা ঝাপটাতে শুরু করেছে এক অস্থির বৃক্ষ। সরকারের তরফ থেকে বিশিষ্ট আবব ভ্রমণকারীদের তালিকাভুক্ত হওয়ার কারণে দুর্লভ একটি তাম্রলিপির মালিক হয়ে খালেখাজি গোটা গ্রামের মধ্যমণির মত বিরাজ করতে থাকে। দুইদিন দুইরাত উৎসব চলে গ্রামে। বড়-বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ হয় প্রচুর মাংস। নতুন-নতুন কিংবদন্তীর জন্ম ঘটে খালেখাজিকে ঘিরে। এমনকি খালেখাজিব এক রাতে ছয়-সাত রমণীকে ভোগ করার দক্ষতার কাহিনীও তখন অলৌকিক গুণের মর্যাদা পায়। সেই অলৌকিকতার প্রভাব এতদূর পৌঁছায় যে গ্রাম্য যুবকেরা মনে-মনে খালেখাজিব শিশ্ন ধার নেয় নিজ-নিজ রমণীকে সঙ্গম করবার বেলায়।

বয়স বাড়লেও সুন্দরী রমণী আর ভাল খাবার শনাক্ত করার চিরকালীন ক্ষমতা খালেখাজির রইল অক্ষত। রুই, পাঙ্গাস, বোয়াল, কই, ইলিশ, গরু, ছাগল, মুরগী এসবের বিচিত্র প্রস্তুতির বিবরণ তার মুখে শুনে সবাই তাকে শেরে বাংলার উত্তরসুরী হিসেবে ধরে নেয়। কারো-কারো ধারণা ঘরের খোসাহীন নারকেলগুলো খালেখাজির প্রচণ্ড মুষ্টিপ্রভাবিত। তারপর, ধরো, বেগুন-বরবটি দিয়ে মাছের তেল কিংবা রুইমাছের পেটের বালিশের স্বাদ যে কী সেটাও খুব ভাল জানে খালেখাজি। তার মৃত স্ত্রী প্রায়ই এটি রান্না করতো। যে-রাতে মাছের তেল আর পেট বালিশ রান্না হতো তার পরদিন খুব ভোরে পুকুরঘাটে প্রতিবেশী রমণীদের এই বিশেষ খাদ্যের রন্ধনপ্রণালী বিষয়ে সবিশেষ বিবরণ দিত খালেখাজির স্ত্রী। এখন ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে খালেখাজি হয়তো মেয়েমানুষটাকে দুয়েকবার স্বপ্নে দেখে। কিন্তু কখনও-কখনও খোঁয়ারি ভেঙে হঠাৎই ভরদুপুরে ভিক্ষাপ্রার্থী কোনো মহিলাকে তার বিপুল ধানের গোলা দেখিয়ে "তলায় কিছু ধান আছে গো, কুড়িয়ে নাও" বলা এবং মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটির মই বেয়ে নেমে পড়া; অল্প পরেই তারও গোলামধ্যে লাঠিসমতে অবতরণ এবং গোলার মধ্যে বিচিত্র শব্দের উদ্গম; এসব যে কেবলই ধেড়ে ইঁদুরদের ধান্যলোভী হুটোপুটি নয় সেটা তার মৃত স্ত্রীও টের পায় পুকুরপাড়ের সমাধির ভেতরে।

পঁচিশ বছর ধরে পুকুরটা প্রায় সেরকমই আছে। কখনও খরার দিনে নীচে নেমে গেছে জলের স্তর, কখনও কানায় উঠে এসেছে জলভরপুর মৌসুমে। বাইরে থেকে সেরকম পরিবর্তন অপ্রত্যাশিত এবং অ-দৃশ্যমান মনে হলেও তলে-তলে এর গর্ভে ঘটে যায় এক প্রচণ্ড ওলটপালট। মুক্তিযুদ্ধের দিনে এক রাতে মুক্তিযোদ্ধা এবং পাকিস্তানী সৈন্যদের

গোলাগুলি বিনিময়ের সময় একটি অতিকায় গোলা পুকুরে এসে পড়লে অজস্র শব্দের ভিড় এই তীব্র জলজ শব্দটিকে শুষে নিলে নিঃশব্দ মৃত্যুর খবর অজানা থেকে যায়। কিন্তু, সকালের আলোয় পুকুরভর্তি বিভিন্ন আকৃতির শাদা-শাদা টুকরো দেখে মুহূর্তেই সবাই বুঝতে পারে পুকুরের গভীর থেকে এমনিই ভেসে ওঠেনি মাছেরা। ওরা আসলে মৃত এবং ওদের চোখে মৃত মাছের দৃষ্টি। ভেসে-ওঠা মাছ খাওয়ার সাহস পায়না বারুদভয়ে ভীত মানুষেরা। অথচ যুদ্ধের দিনে তখন প্রচণ্ড প্রোটিনসংকটের কাল। ভাবা গিয়েছিল, হাঁস-মুরগী-গরু-ছাগল লোপাট হওয়ার দিনে শেষ পর্যন্ত মাছেরাই সবচেয়ে সৌভাগ্যের অধিকারী। সব মাছ একসঙ্গে প্রাণত্যাগ করায় বাড়ির একমাত্র পুকুরটি সহসাই মৎস্যশূন্য হয়ে পড়ে। পঁচিশ বছরে প্রজন্ম-পরম্পরায় সে-খবর আজকের মাছেদের কতটা জানা কে জানে। গ্রামের লোকেদের কাছে পুকুরটা দুই দিকে কমলালেবুর মত খানিকটা চ্যাপ্টা, প্রায় গোলাকার এক তরল ইতিহাসবিশেষ।

সেই পুকুর আজ মাছসমৃদ্ধ। পরিচিত প্রায় সব মাছ বাস করে সেখানে। এমনকি ব্রিটেনের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত এক আসামীর কল্যাণে আফ্রিকা-এশিয়ায় তিলাপিয়া নামের যে-মাছ অজস্রভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা-ও আসে নবাগত অতিথি হয়ে। মৎস্য-আবিষ্কারক লোকটি মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবনের কারাবাস নিয়ে ঘুমাতে যায় রোজ। এদিকে, বিদেশী মাছ অবলীলায় গায়ে শ্যাওলা মেখে ক্রমশঃ ঘোলাটে হতে-হতে একপর্যায়ে স্বদেশী হয়ে যায়।

তবে চাইলেই মাছগুলি ধরা সম্ভব নয়। বেশি কিছুদিন আগে ফর্সামত এক লোক আসে কুমিল্লা থেকে। বলে, বাঙালি মাছ খায়, মাছের চাষ করে না! এভাবে খেতে থাকলে একদিন তো সব মাছ শেষ হয়ে যাবে! তাহলে উপায়! আশংকাগ্রস্ত মানুষকে পুকুর দেখিয়ে আশ্বস্ত করে সেই লোক, আপনারা মাছের চাষ করবেন, মাছও খাওয়া হবে, মাছের টাকায ভাত-কাপড়ও মিলবে। প্রসঙ্গক্রমে সে সাহিত্যে নোবেল-বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টান্ত উত্থাপন করে, দেখুন কতকাল আগে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সবাই মিলে কাজ না করলে জাতির উন্নতি অসম্ভব! তারপর দেশী-বিদেশী পোনায় ভরে ওঠে পুকুর। কুমিল্লাগত লোকের অনুপ্রেরণায় মাছেরা বাড়তে থাকে নির্বিবাদে। তবে, সকলেই সমানভাবে উদ্বুদ্ধ হয় না। আগে পুকুর ছিল সারা বাড়ির সম্পত্তি। যে-কেউ যখন খুশী মাছ ধরতে পারতো। কর্মহীন যুবকেরা ইচ্ছে করলেই ছিপ ফেলে বসে যেতো পাড়ে। কেউ বা জালের কয়েকটি খেপে তুলে আনতো দু'এক বেলার আমিষ। সমবায়ের কল্যাণে পুকুরের মালিক শুধু গ্রামের চার ধনবান। চাইলেই মাছেদের আর পাকড়াও করার উপায় নেই যখন-তখন। সে-তথ্য জেনে মাছেরাও যারপরনাই উল্লসিত। সেটা বোঝা যায় দিনমান তাদের জলান্দোলন দেখে। লম্ফমান রোহিতের রূপালী আঁশে আকস্মিক রোদের বিচ্ছুরণ অভাবগ্রস্ত-ক্ষুধার্ত গ্রামবাসীর চোখের সামনে আচমকা এক টুকরো স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেলে তারা মাছ এবং ভাত উভয়ের সৌভাগ্যে সমৃদ্ধ গ্রামবাসীদের কথা ভাবতে-ভাবতে সারাদিন শুধু শাক কুড়িয়ে চলে। বছরে দু'বার জেলেদের আগমন প্রবল সাড়া তোলে তাদের মধ্যে। অত্যুৎসাহীরা গান বানায়,

"জালুয়া আইল জাল লয়ে
ধরবো মাছ শ'য়ে শ'য়ে।"

ধরে কিন্তু খেতে পায়না। তবে গোপনে-গোপনে বেড়ে-ওঠা মৎস্য-পুঙ্গবদের প্রাণভরে দেখে নেওয়া যায় এই সুযোগে। খালেখাজির উঠোন তখন লোকে লোকারণ্য। অনেকেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকে একটি-দুটি মাছের করুণা লাভের আশায়।

বহুদিন পর আজ খালেখাজি তার দুর্লভ প্রসন্নতা খুঁজে পেয়েছে। পূর্বসন্ধ্যায় গোলার মধ্যে প্রচুর আনন্দধ্বনি সৃষ্টি করা গিয়েছিল। একটু আগে উত্তোলনসম্ভব সমস্ত মাছ জড়ো

করে রেখে গেছে জেলেরা। নানারকম মাছের স্তূপে বেশ বড়সড় একটি রুইমাছ শুয়েছিল আর রোদ বারংবার স্পর্শ করছিল তার শরীর। একটি অল্পবয়স্ক বালকের মত যেনবা এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে সেই রুই। মাছেদের ঘিরে-থাকা সম্পন্ন এবং নামসর্বস্ব গ্রামবাসীদের ভিড় দেখে খুব ভাল লাগে তার। আরো ভাল লাগে সেইসব মুখ দেখে যারা এককালে তাকে খুনী ভাবতো। ভাবতো দখলদার সৈন্যদের মদদ ও মেয়ে-প্রদানকারী। এমনকি বহুকাল আগে যাদের মেয়ে, বোন বা স্ত্রী নিখোঁজের তালিকায় স্থান পেয়েছিল তারাও মনে হয়না আজ তাদের তীব্র ঘৃণা ধরে রাখতে পেরেছে একইভাবে। বেশ কিছুকাল আগেই তারা খালেখাজির স্ত্রীর চল্লিশায় পেট পুরে খেয়ে যায় বহু চর্বাচোষ্য। মাছেও তাদের সমান উৎসাহ।

এরিমধ্যে কামলারা বৃহদাকার মূল স্তূপ থেকে ছোট-ছোট স্তূপ বসাতে শুরু করে। সবচেয়ে বড় স্তূপ কাঁচকি মাছের। কিছু-কিছু ক্ষুদ্র শামুক ও অচেনা জলজ উদ্ভিদও মিশে গেছে ভিড়ে। দু'য়েকটি মাছের ঠোঁটে তখনও সরু তৃণ কিংবা শ্যাওলা আটকে আছে। শোল, বোয়াল, চিংড়ি, মাগুর, শিং, কই, পুঁটি, চাপিলা, তিলাপিয়া প্রভৃতি এক ধারে। কাঁচকি মাছের চারটি স্তূপ তৈরি করা কোনো সমস্যাই নয়। অন্য মাছগুলিও নিঃশেষে বিভাজ্য। শোলে খালেখাজির নিরুৎসাহের ফলে মৎস্যাখেকো মাছে নিরুৎসাহী একজনের সঙ্গে তার বোয়ালের বিনিময় চলতে পারে অনায়াসে। কিন্তু সবেধন নীলমণি রোহিত এ-অঞ্চলে সকলেরই প্রিয় মাছ। আর, ভেতরের পেটবালিশটির দাবী খালেখাজি জানিয়ে রেখেছে আগাম।

ধারাল দায়ে হাত বুলিয়ে খালেখাজি ও অন্য তিন অংশীদারের সামনে মাটিতে বসে পড়ে হিরণ নামের যুবক ও তার সহকারী কিরণ। ছোট বালক কিংবা বালিকার মত শুয়ে-থাকা রুইয়ের দিকে একবার তাকায় দু'জনে। অপরাহ্নের রোদ শেষবারের মত পিছলে যায় মাছটির লালচে শাদা শরীরে। দায়েব বাঁট ডান হাতের মুঠিতে শক্ত করে এঁটে বাম হাত শায়িত মাছের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত একবার বুলিয়ে নিলে এক ধরনের আঠা-আঠা তরল হিরণের তালুতে জমে। তবে তা অল্পক্ষণের জন্যে। পরনের লুঙ্গিতে তালু মুছে নিয়ে সে একই কাজ করে দ্বিতীয়বার। এবারে রুইয়ের নরম শরীরে হাত বুলিয়ে যেন সে আদর করল ঘুমন্ত দেহটিকে।

থক্! হিরণের ধারাল দা রুইয়ের মাথা পুরোটাই শরীর থেকে আলগা করে দেয় অদম্য স্বতঃস্ফূর্ততায়। মনসা পুজোর সময়ে ধারাল খড়্গ হাতে নিশ্ছিদ্র মনোযোগে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের বলীর পাঁঠা মুণ্ডহীন করার তৎপরতা মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে হিরণের মধ্যে। দ্রুত মাথাটা একপাশে সরিয়ে রাখে কিরণ। গলা, মাথা এবং এই দুইয়ের কাছাকাছি উঠোনের নানা স্থানে খুবই সতেজ কিছু রক্ত জমে যায়। কিছুটা তরল শুষে নিলেও এঁটেল মাটির গায়ে একটা তৈলাক্ত আবরণের মত স্থির হয়ে থাকে রক্তের রঙ। "রঙের রঙ দেখে মনে হচ্ছে মাছটা এক্কেবারে ফ্রেশ।" খালেখাজির পরিতৃপ্তিতে মসৃণতার প্রলেপ লাগায় অন্যতম অংশীদার আনোয়ার, ফ্রেশ হবে না! কেবল ওঠানো হল পুকুর থেকে! তাছাড়া মৎস্যখামার থেকে আনা মাছেদের খাবার সরবহার করা হয়েছে নিয়মিত। আর, জলে মজুদ খাদ্যভাণ্ডার তো আছেই। খালেখাজি ও অন্য অংশীদাররাও নয় কেবল, রক্তের তাজা বর্ণ দেখে জমায়েত গ্রামবাসীরাও তৃপ্ত। সচরাচর বাজারের বরফ দেওয়া মাছের রক্তের এমন রঙ পাওয়া মুশকিল। সেখানে রঙটা কেমন মরা, ফ্যাকাশে আর বাসী। অথচ, এখানকার মজাটাই আলাদা। পুকুর থেকে মাছটা তোলা হল একেবারে চোখের সামনে। তারপর চোখের সামনেই ধড় থেকে কেটে নেওয়া হল মাথা। পুরো ব্যাপারটা একেবারে সরাসরি প্রত্যক্ষ করার ফলে মাছের সতেজতা এবং এর রন্ধনোত্তর সার্থকতা বিষয়ে কারো আর দ্বিমত থাকে না। লেজ

আর নিম্নাঙ্গ থেকে পাওয়া যায় মোট ছ' টুকরো। একেক টুকরো কমপক্ষে এক ইঞ্চি ধরে নিলে মাছের বৃহদত্ব এবং এর স্বাদ সম্পর্কেও একটা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় অচিরেই। মাথা এবং লেজের দিক হারিয়ে পূর্বতন সম্পূর্ণ মাছটি দেখতে ছোটখাট একটি কোলবালিশের মত দাঁড়ায়। সাহায্যকারী কিরণ এক দিক থেকে দুই হাতে বৃহৎ মৎস্যখণ্ডটিকে লম্বালম্বি দাঁড় করিয়ে দিলে অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে মাঝ-বরাবর একটি অদৃশ্য রেখা কল্পনা করে দা চালিয়ে দেয় হিরণ। খুব ধারাল দায়ের নীচে পড়ে করাৎ করাৎ শব্দে আপত্তি জানায় মূল দাঁড়াসংলগ্ন কাঁটারা। কিন্তু মৃদু আপত্তিতে কাজ হয় না। অনায়াসে দুটি মাছের চাঙর নিয়ে রক্তাক্ত সাফল্য জানায় হিরণ-কিরণ। মুগ্ধতা ঝরে খালেখাজির দৃষ্টিতে। আজ মজা করে রুই মাছ ও রুই মাছের বালিশ খাওয়ার দিন এসেছে। মাছের সম্ভাব্য দেহাংশ-সংখ্যা বিষয়ে কতিপয় গ্রামবাসী গুঞ্জন তুললে খালেখাজি নিরস্ত করে তাদের, আরে চিল্লাচিল্লি করো কেন? খাসা মাছটা দেখো প্রাণ ভরে! রক্তের অকৃত্রিমতা এত ভাল লাগে যে হিরণ-কিরণ কেউই আর কষ্ট করে হাতের রক্ত ঘন-ঘন মুছে দেবার দায় বোধ করে না। বরং নিজেদের হাত, লোহার দা, মাছের নরম শরীর এবং নীচের মাটি সব মিলিয়ে এরকম এক সতেজ রক্ত-পর্ব উদযাপন করতে পেরে যেন তারা আনন্দিত। খালেখাজির সন্তুষ্টি সেই আনন্দের মাত্রা বাড়ায়।

নাড়িভুঁড়ি, তেল আর বেলুনের মত ফুলে-থাকা পেটবালিশ মধ্যমা-তর্জনির সমন্বিত হ্যাঁচকা টানে বেরিয়ে আসে দ্বিখণ্ডিত পেটের খাঁচা ছেড়ে। হলুদ ক্ষেতের ছোট দু'টি ঢিবির মতন প্রায় সমানাকৃতির খণ্ড দু'টিকে পাশাপাশি সাজায় কিরণ। পেট থেকে পাওয়া আবর্জনা একপাশে সরিয়ে রাখতেই আচমকা হিরণ কিছু একটা দেখতে পায় যা সম্পূর্ণ অমৎস্যসুলভ। যেটা জৈব জগতের বহির্ভূত কোনো বস্তু। সেটা অজৈব এবং ধাতব। চোখে আলো জ্বেলে হঠাৎ তা উর্ধ্বে তুলে ধরে হিরণ, এই দেখেন সবাই আমরা কী পেয়েছি! খালেখাজি, অংশীদারত্রয় এবং সম্মিলিত গ্রামবাসী সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে হিরণের উত্তোলিত হাতে রক্ত ও ময়লামাখা একটি মাদুলি। সম্ভবতঃ তামার ছিল আদিতে। জল-হাওয়ার সংস্পর্শে এখন ধারণ করেছে সবুজাভ বর্ণ। কেবল হিরণ নয় তখন সবার চোখেই জ্বলে আলো। এমনকি যার ঘরে মাছ দূরে থাকুক ক্ষুধার সাধারণ অন্নশূন্য; যে দারুণ উৎসাহে শুধু ধনবানের মাছসংগ্রহ, বিভাজন ও কাটাকুটির তৎপরতা স্বচক্ষে দেখে তৃপ্ত হতে এসেছে সেও দু'চোখ কপালে তুলে তাকায় রংচটা মাদুলির দিকে। মাদুলি তারা বহু দেখেছে। বলতে গেলে নারী-পুরুষ-বয়স নির্বিশেষে এ অঞ্চলের প্রায় সকলেই মাদুলিপ্রিয়। আর তারা শুনেছে তাদের পিতামহ-প্রপিতামহদের কেউ-কেউ কখনও-কখনও তাদের পূর্বসূরীদের কাছে এরকম আকস্মিক গুপ্তধনপ্রাপ্তির গল্প শুনেছিল। কিন্তু রুই মাছের পেটে ধাতুর মাদুলির ব্যাপার, না বাপু, এ তো কখনও শুনিনি আমরা!

লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় খালেখাজি। উঠোন তার, পুকুরের প্রধান শরিকও সে। কাজেই সদ্য-পাওয়া তাবিজের (মাদুলির একদিককার খোলামুখ মোমে আটকানো থাকায় সেটি তাবিজে রূপান্তরিত।) সঙ্গে তার নিজের ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত একটা অলৌকিক-ঐশ্বরিক মহিমা ভেতরে-ভেতরে আবিষ্কার করে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। ততক্ষণে জলে ধুয়ে নিলে হস্তান্তরিত মাদুলিটি সবুজাভ বর্ণের ফাঁকে এক-দুই কণা তাম্রদ্যুতি ছড়ায় খালেখাজির হাতে। শিহরণ ছড়ায় তার শরীরে। যার প্রমাণ তার কপালের ঘাম, দৃষ্টির তীব্র কৌতূহল তার মুখময় গুপ্তধন লাভের অপরিমেয় আনন্দ। প্রাণভরে স্পর্শ নেয় সে ধাতুর এবং আচমকা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলে চুমু খায় দুই বার। "সোবাহানাল্লা বলো তোমরা সবাই!"—খালেখাজির আহ্বানে জমায়েত কোরাসস্বরে ডাকে পরম করুণাময়কে। সেই উচ্চারণ এত স্বতঃস্ফূর্ত ও মন্ত্রমুগ্ধের মত হয় যেন খালেখাজির আহ্বান

ছাড়াই তারা তা করতো কিংবা এরকম মুহূর্তে সেটাই প্রথমতঃ করণীয়। ততক্ষণে আরো লোক জমে গেছে উঠোনে। বিভিন্ন রকম মাছের স্তূপ পড়ে থাকে স্তূপীকৃত ভাবেই। খণ্ড-বিখণ্ড রোহিত প্রায় অবহেলায় কাল কাটায় দা'য়ের সান্নিধ্যে। মাছ ছেড়ে একটিমাত্র ক্ষুদ্র বস্তুতে মানুষ সঁপে দেয় সমস্ত মনোযোগ।

উত্তেজনায় তারা টগবগ করে, আরে ভাই মাছ তো রোজ-রোজই ধরা যাবে কিন্তু এ-জন্মে মাছের পেটে তাবিজ পেয়েছো কেউ। কথাটা ভিড়ের ভেতর থেকে এলেও খালেখাজিরও তা অন্তরের কথা। কী আছে এর ভেতরে! সভয়ে মোমের স্পর্শ লব্ধ খালেখাজি কেঁপে ওঠে। সত্যিই যদি এটা কোনো অলৌকিক-ঐশ্বরিক বস্তু, বার্তাবহ এবং ইশারা হয়ে থাকে তাহলে একে মোমমুক্ত করবার অধিকার কী তার রয়েছে! সেই কি মাদুলিটা উন্মুক্ত করবার যোগ্য ব্যক্তি! মনে-মনে একবার নিজের পবিত্রতা সম্পর্কে হিসেব করে খালেখাজি গ্রামের সম্মানিত পুরুষ তথা তিন শরিকের দিকে তাকায় এবং তার সিদ্ধান্ত পেশ করে। ইমাম সাহেবকে ডাকা হোক! এর রহস্য উন্মোচন করবার যোগ্যতম পুরুষ তিনিই। কেননা, তিনিই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মানুষ। আমরা তো সারাদিন তার পেছনেই কাতারবদ্ধ হই!

মেহেদিরক্তিমশ্মশ্রু ইমাম আসেন দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে। দূত-মারফত খবর পেয়েই তাঁর মনে হয়েছিল এক চমকপ্রদ পুণ্যের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চলেছেন তিনি। দূর শৈশবে একবার কাকের বাসা ভাঙতে গিয়ে একপাতা আরবী হরফ আবিষ্কারের ঘটনা দীর্ঘদিন জমেছিল মনের কোণে। কিন্তু আজকের ঘটনাটিকে তাঁর কাছে মনে হলো বহু-বহুকালের পুণ্যের ফল। নিশ্চয়ই আপাতঃদৃষ্টে ভক্ষ্য রুইমাছের মারফত তাদের জন্যে এসেছে কোন শুভ বার্তা! সাদর সম্ভাষণে সবাই গ্রহণ করে পবিত্র পুরুষ ইমামকে। তাবিজখানা তাঁর হাতে অর্পণ করে প্রাথমিক উত্তেজনার ঘোর থেকে রেহাই পায় খালেখাজি।

পরম করুণাময়ের নামে তাবিজ হাতে নেয় ইমাম। মুহূর্তকাল ডান হাতের তালুতে রেখে ডান তর্জনি ও মধ্যমাব মাঝখানে শক্ত করে ধরলে একটি ত্রিভুজক্ষেত্র দাঁড়ায় সবার সামনে। এসময় ইমাম তাবিজে বাম হাতের স্পর্শ এড়িয়ে চলেন কড়াকড়িভাবে। দৃষ্টির সমান্তরালে এনে খুব কাছে থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকেন মাদুলি। তারপর আচমকা "বিসমিল্লাহ" বলে ঠোঁটে স্পর্শ করতেই সমবেত কণ্ঠে "সোবাহানাল্লা" ওঠে দ্বিতীয়বার। সেই উদাত্ত শব্দোত্থানে ইমামের মধ্যে জাগে এক অদ্ভুত তরঙ্গ। চোখ বুঁজে তালুবন্দী তাবিজটাকে একেবারে নাকের ছিদ্রে নিয়ে ঠেকান। এতে কেউ-কেউ ভাবে, নিশ্চয়ই মাছের গন্ধ পেয়ে ইমাম মুহূর্তে মাদুলিটা সরিয়ে নেবেন নাকের সন্নিকট থেকে। কিন্তু তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে বেশ কিছুক্ষণ ইমাম নির্বিকারভাবে সেটাকে বলতে গেলে ঠেসে ধরেন নাকের মধ্যে। ফলে ধারণাকারীরা মনে-মনে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে অনুমান করে হয়তো বা কোনো বিশেষ সুগন্ধই তিনি পাচ্ছেন এর গাত্রাবরণ থেকে। অথবা বাইরে মাছের গন্ধ থাকলেও তিনি তা পান না। ভেতরের অদম্য সুঘ্রাণ বাইরের ধাতব খোলস ভেদ করে ঠিকই ইমামের নাকে প্রবেশ করতে পারছে। জমায়েতের অনেকেই তখন ভেতরে-ভেতরে মাদুলির ঘ্রাণ প্রার্থনা করতে থাকে! হায়, একে স্পর্শ করার সৌভাগ্য কি হবে আমাদের!

চোখ মেলে ইমাম জানান, মাদুলির মধ্যে কী আছে তা জানা দরকার। কিন্তু ছুরি, চাকু বা অন্যতর কোন বস্তুতে এর মোম স্পর্শ করা যাবেনা। দেখা গেল ইমামের হাতই এর জন্যে যথেষ্ট। তিনি নখ কাটেন প্রতি বৃহস্পতিবার। আজ বুধবার। ছয়দিন বয়সের নখের শক্তিতে আস্থা রেখে প্রথমবারের মতন বাম হাতের পাঁচ আঙ্গুলে মাদুলিটা শক্ত করে ধরেন তিনি। তারপর যতটা সম্ভব আলতোভাবে ডান তর্জনির নখের খোঁচায় মোম সরাতে থাকেন একটু-একটু করে।

এরিমধ্যে তিনি বসে পড়েছেন চেয়ারে। পতিত মোম সঞ্চিত হতে থাকে তাঁর শাদা পাঞ্জাবির কোঁচড়ে। এসব তৎপরতা চলাকালে জনতার চোখেমুখে ভাঁজ পড়ে মুহূর্তে-মুহূর্তে। দুর্বোধ্য সব রেখা ফোটে চেহারায়। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসাভাব-বিনিময় করার কথাও তারা ভুলে যায়। ইমাম এবং তাঁর অধীনস্থ তাবিজ তখন সকল মনোযোগের কেন্দ্র।

হ্যাঁ, আছে! অবশ্যই ভেতরে কিছু আছে! শুভ সংবাদ ধ্বনিত হয় ইমামের কণ্ঠে। মোম সরে যেতেই একটা শাদা রঙের আভাস চোখে পড়ে। খুব খুঁড়ে দেখলে বঁট-ভাঁজ-করা শাদা কাগজও কেউ-কেউ বুঝতে পারে। খালেখাজি ততক্ষণে ঘেমে একাকার। জীবনের অপরাহ্নে এসে এমন সৌভাগ্যের দেখা পেয়ে সে ভুলে যায় যে পৃথিবীতে সে একা এবং নিঃসন্তান। ফুলে-ফুলে মধু খাওয়ার মতন গর্ভে-গর্ভে বীর্য নিষিক্ত করে গেছে সে আজীবন। এত পাপ সত্ত্বেও আজ তার জন্যে খুলে গেছে এক অলৌকিক দরজা। নিশ্চয়ই কখনও কোথাও কিছু পুণ্য জমা পড়েছিল! ঠিক তখনই একটা আশংকাও দুর্বল করে দেয় তাকে। দরজাটা কি কেবল তার জন্যেই খুলল! এমনও তো হতে পারে তা এ গ্রামেরই এমন কোন এক অখ্যাত-দরিদ্র মানুষের কপালের লিখন! একটু পরেই এর কল্যাণে সে তাদের মধ্যে সবচাইতে সৌভাগ্যবান বলে পরিগণিত হবে। ভগ্নহৃদয়ে খালেখাজি সৃষ্টিকর্তার নাম জপে মনে মনে।

ইমামের সুকৌশলে তাবিজের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে একখানা কাগজ। শূন্য মাদুলিতে ফের কোঁচড়ের মোম সযত্নে ভরে সেটা পাঞ্জাবির পকেটে রেখে দেন তিনি। কিন্তু খালেখাজির ধৈর্যের বাঁধ ততক্ষণে ভাঙো-ভাঙো। ইমামের এসব কার্যকলাপ তার ভাল লাগেনা। অধৈর্য জনতাও। যে-দুর্লভ বস্তু মাছের পাকস্থলী মারফত আজ তাদের কাছে এসে পৌঁছেছে ইমামের উচিত দ্রুত তার নিষ্পত্তি ঘটানো। ভাঁজ-করা কাগজ মুঠোবন্দী করে ইমাম বলেন, আপনারা সবাই "সোবহানাল্লা" পড়ুন একবার। যন্ত্রচালিতের মত সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করে জনতা। তখন ইমাম ধীরে-ধীরে "বিসমিল্লাহ" বলে উন্মোচন করতে শুরু করেন সদ্যপ্রাপ্ত গুহ্যিত বস্তু।

জাফরানে লেখা পবিত্র অক্ষব অভিভূত করে দেয় ইমামকে। তালু-পরিমাণ কাগজখানা সর্বসমক্ষে তুলে ধরলে অশিক্ষিত লোকটিও বুঝতে পারে কোন সুন্দর হস্তাক্ষরধারীর হাতে রচিত হয়েছে স্বরচিহ্নবিহীন বাণীসমূহ। নিজেকে আর সামলাতে পারে না খালেখাজি, ভাইসাব, অর্থটা বলেন, অর্থটা বলেন। আমরা সবাই এর অর্থ জানতে চাই!

জাফরানের রঙ এবং পবিত্র অক্ষর যে-পুলক এবং টানটান উত্তেজনা জাগায় ইমামের চোখে এবং শরীরে হঠাৎই যেন তা মিইয়ে যায়। তাহলে কি কোনো অশুভ সংবাদ! চকিতে একখণ্ড মেঘ ঢেকে দেয় জনতার কৌতূহল। তারা কি কোন অকল্যাণের জন্যে অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ! মাছের উপলক্ষ্যে সম্মিলিত গ্রামবাসীর দুঃখকষ্টের ওপর আরো এক পোঁচ কালি পড়বে অমঙ্গলের! ধক্ করে ওঠে খালেখাজির বুকের ভেতর, কী ইমাম সায়েব, কোনো খারাপ খবর! দাড়িতে হাত বুলাতে-বুলাতে ইমাম বলেন, না, ঠিক খারাপ কিছু নয় আবার ভাল কিছুও না! এটা একটা দোয়া। ভূত-পেত্নীর আছরের হাত থেকে যুবতী মেয়েদের রক্ষার দোয়া। বলে ইমাম কাগজ উল্টে অন্য পৃষ্ঠায় যান এবং তখন যে-ঘটনা ঘটে তাতে ভিড়ের প্রায় সকলেই চমকায়। ইমামের চোখে স্পষ্ট একটা ছায়া পড়ে এবং তার কপালে দুই থেকে তিনটি কুঞ্চনরেখা জাগে। ইতস্ততঃ ইমাম তাকান খালেখাজির দিকে। পুকুর ছুঁয়ে- আসা হাওয়ায় ঘাম শুকাতে শুরু করলেও ইমামেব প্রশ্নশীল দৃষ্টির প্রতিক্রিয়ায় খালেখাজির পুনরায় ঘাম ঝরে। যুবতী মেয়েরা গলায় মাদুলি দিয়ে জ্বীন-ভূত-পেত্নীর হাত থেকে রক্ষা পাক! কিন্তু এর সঙ্গে তার দিকে ইমামের এমন দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকানোর কী

সম্পর্ক! সে কী তবে ভেতরে-ভেতরে এ অঞ্চলের এমন কোন যুবতীকে ধরে এনে তার ধানের গোলায় ঢোকানোর গোপন পাঁয়তারা করছে যাকে রক্ষা করবে এই ঐশ্বরিক মাদুলি! নাহ্, সেসব দিন ফুরিয়েছে বহু আগে। নিজের সঙ্গে বফা করে খালেখাজি। তবু ইমামের চোখে দুর্বোধ্যতা কেমন ঝুলতেই থাকে। ভিড় ছেঁকে ধরে ইমামকে। বৃত্তের পরিধি কমাতে-কমাতে এমন দূরত্বে এসে যায় যে তারা ইমামের পাঞ্জাবির কিংবা কানের গোপন তুলোয় মেশানো শিরাজি আতরের গন্ধ পায়। এবারে কী পেলেন বলেন। উদ্গ্রীব তিন শরিক। ভিড়ের কৌতূহল আরো বেশী। যারা প্রতিবেশীর চুলোর ধোঁয়ার সূত্র ধরে হাঁড়ির ভেতরকার খবর নিয়ে তবে ক্ষান্ত হয় তারা সবটুকু মর্ম না জেনে ফিরে যাবে এমন আশা করে না কেউই। বলেন ইমামসাব বলেন, এরপর কী আছে বলেন! বাকীটুকু জানার ইচ্ছা দমিয়ে রাখতে পারে না তারা।

এবারে আর পবিত্র বাণীর পাঠোদ্ধারের প্রয়োজন পড়ে না। ভিড়ের মাথায় বিনা মেঘের বাজ ফেলে ইমাম স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করেন লিখিত শব্দাবলী। বর্ণগুলো পাশাপাশি কিছু অসংবদ্ধভাবে সাজানো কিন্তু তবু পড়তে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। পরম করুণাময়ের নাম না নিয়ে ইমাম পড়তে থাকেন,

"খা লে খা জি খু নি"

কী বলেন! আপনি এসব কী বলেন! আপনার মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! এসব কী আবোল তাবোল বলেন! কাগজে কী লেখা আছে সেটা পড়েন! ক্রোধে কাঁপে খালেখাজি। নিশ্চয়ই ইমাম তলে-তলে তাকে ফাঁসাবার কোন ষড়যন্ত্র আঁটছে। হয়তো পুকুরের মালিকানা নিয়ে অন্য তিন অংশীদারের সঙ্গে তার কোন গোপন আঁতাত হচ্ছে! আর উন্মাদ না হলে কী করে সে তাকে খুনী বলে সম্বোধন করে সবার সামনে! খালেখাজি ধমক লাগায় ইমামকে, কাগজে যা লেখা আছে তা ই পড়েন! ইমাম ফের ধীরে ও স্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করে। এবারে পূর্বেকার দুই শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয় আরেকটি শব্দ — একটি মেয়ের নাম —

"খা লে খা জি খু নি আ মি না"

বলে ইমাম কাগজটাকে ফেরায় জনতার দৃষ্টিপথে। তখন স্পষ্ট দেখা যায় লাল রঙের নয়টি বর্ণ ঠিক-ঠিক নয়টি স্বরচিহ্নে ঠেস দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়ানো। ঠেস দেওয়ার পরেও সেগুলি পড়ো পড়ো করে। খুব কাছে থেকে ভিড়ের অনেকেই শব্দ তিনটি পড়ার সুযোগ পায় এবং পড়ে বুঝতে পারে যে আমিনা নামের কোনো মেয়ে খালেখাজি নামের ব্যক্তিকে খুনী বলে অভিহিত করছে। কিন্তু পবিত্র বাণী-সংবলিত কাগজের অপর পৃষ্ঠায় মাতৃভাষায় রচিত অভিযোগনামার কী অর্থ এবং তা তাবিজের মধ্যেই বা ঢোকে কীভাবে আর ঢুকলেও তা মাছের পেটে যায় কী করে তার রহস্য ভেবে কোন কূলকিনারা খুঁজে পায়না গ্রামের মানুষ। স্বয়ং খালেখাজিও বিমূঢ়।

তখন নিস্তব্ধতার মধ্যে মেঝেয় খান্‌খান্ শব্দে কাঁচের প্লেট ভাঙার মত, নিথর রাতে হঠাৎ কুকুর কিংবা শেয়ালের হুল্লার মত, খুব ভোরে রাত্রি-ভেঙে মোয়াজ্জিনের আজানের মত, সহসা কাঁপিয়ে-দেওয়া ভূমিকম্পের মত হঠাৎ ভিড়ের পাঁজর বিদীর্ণ করে শরীরের সবটা শক্তি এক করে "ওহোহো, ওহোহো" শব্দে কেঁদে ওঠে গ্রামের মাঝারো কৃষক কেরামত। আমিনা তার একমাত্র মেয়ের নাম যে নিখোঁজ হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধের দিনে। কেরামতের আরো মনে পড়ে, স্কুলের সর্বশেষ শ্রেণীতে পড়া মেয়ের রূপের বার্তা তৎকালে সারা গ্রামে ছড়াতে-ছড়াতে এক পর্যায়ে কিংবদন্তীর রূপ নেয়। রোজই কোনো-না-কোনো জায়গা থেকে প্রস্তাব আসতো বিয়ের। কিন্তু কেরামতের খুব ইচ্ছে ছিল আমিনা লেখাপড়াই করবে। সে-বছর শহরে গিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আমিনা। পরীক্ষার আগেই সারা দেশ

আগুন হয়ে উঠল অকস্মাৎ এবং নিজ-নিজ গৃহও তখন আর নিরাপদ রইলোনা। এক রাতে কারা তার ঘরের দরজা ভেঙে অপহরণ করে নিয়ে গেল মেয়েটাকে। আর সে ফেরে না। একদিন, দুইদিন, তিনদিন — এক, দুই, তিন বছর — এভাবে পঁচিশ বছরেও দেখা নেই আমিনার। সবার কথামত, কেরামত ছুটে গেল খালেখাজির দরজায়। বাজারে ক্যাম্প-নেওয়া পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে ওর খুব খাতির। কিন্তু খালেখাজির এক কথা, আমিনা সম্পর্কে সে কিছুই জানেনা এবং তার করণীয়ও কিছু নেই। কেরামতের চোখের জলে খালেখাজির দুই পায়ের ধুলো মুছে যায়, তবু নির্বিকার ভাবে সে বলে, বাপু তোমার মেয়েকে যে জীন-ভূতে নিয়ে যায়নি সেটা কে বলবে! কিন্তু বহু আগেই সে মেয়ের গলায় তাবিজ ঝুলিয়ে দিয়েছে — কেরামত সেকথা বলে। সেই পবিত্র বাণীর কাছে কী করে ঘেঁষবে জীনভূতপেত্নী! অনেকেই বলল, মেজর তাকে পাচার করে দিয়েছে তাদের দেশে। কেউ বলল, ক্যাম্পের মধ্যে পাঁচজন-ছ'জন মিলে এক-একটি মেয়েকে ধর্ষণের বহু ঘটনা শোনা গেছে। কোন-কোন কিশোরী কিংবা যুবতী সেইসব বলবান বলাৎকারের ধকল সইতে না পেরে মৃত্যুবরণ করেছে। তা-ও যদি হয় আমিনার মৃতদেহটি কি পাওয়া যেত না। কেউ কিছু জানে না। আমিনা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

কান্নায় ভেঙে কেরামত মাটিতে বসে পড়ে যেন এক্ষুণি সংবিৎ হারাবে। দুই দিক থেকে ভিড়ের দুটি অংশ শক্তভাবে ধরে নির্ভরতা দেয় তাকে। "ওহোহো" "ওহোহো" শব্দে তবু সে কাঁদতেই থাকে। বিগত পঁচিশ বছর ধরে "কী হয়েছে আমিনার" নিজেকে এই প্রশ্ন করতে-করতেই বুড়ো হয়েছে সে। বুক ভেঙে কান্না পায় তার। একই সঙ্গে এক ধরনের অবর্ণনীয় আনন্দের অনুভূতিও কাজ করে। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর হঠাৎ আত্মজার নাম শুনে, হোক তা ইমাম বা অন্য কারো মুখে, হঠাৎই মনে হয় তার হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটি আসলে আছে আশেপাশে — একটু পরেই এসে পড়বে এবং ডেকে উঠবে "বাপজান" বলে। দীর্ঘ বন্ধ্যা যুগের পর এই প্রথম একটি সূত্র হাতের কাছে পাওয়া গেল যেখানে আপন হস্তাক্ষরে উপস্থিত তার মেয়ে আমিনা। অল্প ক' টি অক্ষরের মধ্য দিয়ে যেন সে কথা বলছে তীব্রভাবে। নিজের সত্তার জানান দিচ্ছে আর বিদ্ধ করছে তাদের নীরবতাকে। অভিযোগ করার মত, বিচারের ভার সঁপে দেওয়ার ভঙ্গিতে কান্নারত কেরামত তার দুঃখের দিনের বর্ণনা দেয়, আমি তার হাত-পা ধরে বললাম, দয়া করে আমার মেয়েটার ব্যাপারে একটা কিছু করেন। সে বলল, সে কিছু জানেনা। সে যদি কিছু না-ই জানে আমার মেয়ে তাকে খুনী ডাকে কেন! কেরামতের কাহিনী কেবল কেরামতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ছড়িয়ে পড়ে—বিস্তৃত হয় আরো-আরো মানুষের মধ্যে। ভিড়ের ভেতরেই স্বজনহারা লোকেদের মনে পড়ে তাদের হারানো ও নিহত আত্মীয়দের কথা। তারাও ধর্না দিয়েছিল খালেখাজির কাছে। কেউ-কেউ ঝোপেজঙ্গলে একটি-দুটি মৃতদেহ খুঁজে পায় — বিকৃত ও রক্তাক্ত। যারা দীর্ঘকাল খালেখাজির বিরুদ্ধে নীরব ঘৃণায়-ক্ষোভে-ক্রোধে ফুঁসতে-ফুঁসতে একসময়ে নেতিয়ে পড়েছে বয়োভারে, চকিতে গ্রামের এককালের অপরূপ সুন্দরী আমিনা নামের মেয়ের "খুনী" সম্বোধনে তারা তটস্থ হয় সহসাই। পরমা সুন্দরী আমিনাকে সহজেই ভুলতে পারেনি এরা। বহুদিন ধরে এ-অঞ্চলে আমিনাই প্রতীক হয়ে আছে নিখোঁজ রমণীদের। সবার বিশ্বাস, নিখোঁজ হওয়ার পেছনে যদি রূপলাবণ্য এবং নারীত্বই প্রধান হয় তাহলে সব বিচারে সে-ই ছিল সকলের সেরা। একটিমাত্র শব্দের সম্বোধনে খালেখাজির প্রকৃত চেহারাটা যেন বেরিয়ে পড়ে খোলস ছেড়ে। অনুপস্থিত আমিনা সবার কানে-কানে বলতে থাকে — নিখোঁজ মেয়েদের সর্বনাশ এবং অন্তর্ধানের কারণ খালেখাজি! তোমরা তার বিচার করো। বহুদিন ধরে তারা চেয়েছিল বিচার হোক। বিচার হোক তার কৃতকর্মের। কিন্তু এমন কোনো সূত্র তারা খুঁজে পায়নি যাতে

তাকে শনাক্ত করা সম্ভব অপরাধী হিসেবে। অনেকেই বলে সবার চোখে যখন সে খুনী, নিশ্চয়ই সে-ই অপরাধী। একথা সবাই মানতে নারাজ। তাদের কথা, প্রমাণ চাই একেবারে প্রামাণ্য। প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া তারা খালেখাজিকে দায়ী করতে অনিচ্ছুক। ততদিনে বহু সাক্ষীর কবরে গজিয়ে ওঠে ঘাস ও অন্যান্য গুল্ম।

মাছ, তাবিজ, তাবিজের অন্তর্নিহিত অভিযোগনামা প্রভৃতির সত্যতা নিয়ে বিকার বোধ করেনা কেউ। বরং যারা খালেখাজিকে পবিত্র পুরুষ বলে বিশ্বাস করতো তারাও এই আলৌকিক বার্তায় খুঁজে পায় ঐশ্বরিক মহিমা। ফলে, তাবিজের বার্তাকে সত্য বলে ভাবতে শুরু করে। কেরামতের দুঃখ ধীরে ধীরে সার্বজনীন রূপ নেয়। তার দুই দিককার সাহায্যকারী ছাড়াও ভিড়ের অজস্র মুখ তীব্র ঘৃণার কুঞ্চন এঁকে তাকায় খালেখাজির দিকে।

খালেখাজি ততক্ষণে বসে পড়েছে চেয়ারে। পুকুর ছুঁয়ে-আসা ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শও কোনো কাজে লাগেনা। জ্বরো রুগীর মত সে ঘামে। হঠাৎ কেমন ধাক্কা লাগে বুকের খাঁচায়। পঁচিশ বছর ধরে বহু নারীমুখের স্মৃতিতে জমে উঠেছিল তার সঞ্চয়। কিন্তু কোনোদিন সামনাসামনি এমন মারাত্মক অপবাদ কেউ দেয়নি তাকে। আজ একটিমাত্র শব্দ কেমন বদলে দেয় সমস্ত দৃশ্যপট। বয়স ও শরীর এবং অতীত-বর্তমান ইত্যাদির অতীত এক নতুন পরিচয়ে চিহ্নিত হয়ে যায় সে সবার কাছে। ভিড়ের ভেদী দৃষ্টি কেমন ক্লান্ত করে দেয় তাকে। ঘোরলাগা চোখে একবার তাকায় উঠোনের ছিন্নভিন্ন মাছের দিকে। রুই মাছের লাল রক্তের মাঝখানে ভেঙে গলে ছড়িয়ে পড়েছে সবুজাভ পিত্তরস। একটু দূরে ভিড়-অতিক্রান্ত এক কিশোর "কক্‌" "কক্‌" শব্দে একটা পোটকা মাছের পেটকে ফুলিয়ে চলেছে। মাছের স্তূপেব পাশ ঘেঁষে মুঠো-পরিমাণ একটি কাছিম কেটে পড়তে চাইছে সন্তর্পণে। 'টুপ' করে পুকুরের জলে নেমে পড়লে একটা মৃদু শব্দ জেগে মিলিয়ে যায় সঙ্গে-সঙ্গে। হঠাৎ "ঠাস্" শব্দে খালেখাজি এবং ভিড়ের লোকেরা ত্রস্তে দেখতে পায় সেই কিশোরের পায়ের নীচে থেঁতলে গেছে বিষাক্ত পোটকা মাছ।

আকাশের দিকে চেয়ে প্রবল নিঃশ্বাস নিতে চায় খালেখাজি। বুকের বামদিকে হাত রেখে খানিকটা আরাম খোঁজে। এতটা আরামই সে পায় যে ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে।

আসীন অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে খালেখাজি। যারা ভেবেছিল, দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে প্রমাণের অভাবে যাকে সামনাসামনি খুনী বলে ডাকা যায়নি, যাকে অজস্র অপরাধের দায়ে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা যায়নি, আজ দীর্ঘদিন পর একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণের সহায়তায় তারা খালেখাজিকে বাগে পেল; সুযোগ পেল তাকে অন্যায়কারী বলে চিহ্নিত করার, তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে, তাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে, সমস্ত অভিযোগ এড়িয়ে, তাদের এতটুকু সুযোগ না দিয়ে কেমন অবলীলায় কেটে পড়ল লোকটা!

বীরপুরুষ

সুদর্শন নন্দী

কারখানা গড়ার জন্য সদ্য কেনা জমিতে পার্টির পতাকা উড়ছে এই খবরটা হরিপদ দিতেই ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠলেন রামবাবু। চেয়ারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসলেন। টেবিলে জব্বর একটা ঘুষি চালিয়ে চেঁচালেন—একেই বলে বেইমানি। চব্যচোষ্য গেলালাম, পকেটে ছিঁড়ে যাবে বলে ব্যাগ ভর্তি করে মাল পাঠালাম, তবুও বেদখলের হুমকি? মামদোবাজি নাকি? আমারও নাম রামসুন্দর পাল। ত্রেতার রাম রাবণের মুণ্ডু ছিঁড়েছিল, কলির এই রাম তোদের পুরো রাবণ গুষ্টির ষষ্টিপূজা করে ছাড়বে' বলেই তিনি ফোনটা তুললেন,

— পার্টি অফিস? নির্মলবাবু আছেন নাকি?

— বলছি, ওপার থেকে আওয়াজ এল।

— রামসুন্দর বলছি। এটা কীরকম হল?

— খুব উত্তেজিত কী ব্যাপার। ভিতপূজা নিয়ে ঝামেলা?

— ভিতপূজার আগেই তো মশায় চিৎ করে ফেলেছেন, এত অ্যাসুওরেন্স দিয়ে এই ফল।

— খুলে বলবেন তো!

রামবাবু ফোনটা ডান কান থেকে বাঁ কানে নিলেন। বললেন — পার্টির ফ্ল্যাগ গেড়েছে মাঠে, পতপত করে উড়ছে। এমন তো কথা ছিল না? নির্মলবাবু, মানে এই শহরের শাসকগোষ্ঠীর সাংগঠনিক নেতা চেয়ারে আধশোয়া অবস্থা থেকে উঠে বসলেন। আজব বাত, আমাকে না জানিয়ে কী শুরু করেছে সব। পার্টিতে আর ডিসিপ্লিন বলে — উফ্ — মনে ভেবে বললেন — ইমপসিবল, ভুল দেখেছেন বোধ হয়।

— আপনাদের ঝান্ডার ডান্ডার গিঁঠে গিঁঠে গড় মশায়, অন্ধেও দেখতে পাবে আর খোদ হরিপদ আমার কাজের লোক দেখে এসেছে।

— তা হলে এটা গোবিন্দর কাজ। ভেবেছিলাম ব্যাটা ডি-রেলড্ হতে হতে আবার লাইনে এসে যাবে। না সোজা আঙ্গুলে আর হবে না দেখছি।

— সোজা বাঁকা যা করার করুন। আমি কিন্তু বিকেলেই গিয়ে উপড়ে দেব। রামবাবুর গলায় একপ্রকার হুমকির সুর।

নির্মলবাবু ঢোক গিলে বললেন — পাগল হলেন না কি মশায়! ওসব সেনসিটিভ বিষয়ে আপনি হাত দেবেন? গোবিন্দর লোকজন কম নেই। মেরে পা পাছা এক করে দেবে। চিন্তা করার কিস্যু নেই। ঐ এলাকার সাংগঠনিক দায়িত্বে আছে নরেশ। আমি কথা বলে দেখি।

রামবাবু এবার যুক্তি দিলেন — নরেশ এ কাজ কখনই করতে পারে না। কোন দেবতাকেই আমি নৈবিদ্যি দিতে বাকি রাখি নি। তবে আরেকটু খুলে বলি — কারখানাটা চালু হলে নরেশের ছটি আত্মীয়কে নেওয়ার কথা, আমি না করিনি।

'নরেশও ভেতরে ভেতরে ' মনে মনে বলে নির্মল বাবু বললেন — দেখছি, কী করা যায়। বিকেলে কথা বলব।

রামবাবু বললেন, — যা করার করুন। সামনের সোমবার ভিতপূজার অনুষ্ঠান হবে, এম. পি সাহেব আসবেন বলেছেন। আপনাদের পার্টি অফিসেও খবর এল বলে।

বলেই রামবাবু মনে মনে একটা তৃপ্তিলাভও করলেন। ভ্যাগিস এম. পি. সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছি। উপর থেকে চাপ পড়লেই সবাই বাপ বলবে। দেখি ঝান্ডা কদ্দিন ওড়ে!

ফোনপর্ব সেরে ঢকঢক করে জল খেলেন রামবাবু। ভাবলেন থানায় কেসটা জানিয়ে রাখি। বড়বাবু কদ্দুর কী করতে পারেন? খাবার বেলায় খাবেন, কানের ভেতর মুখ ঢুকিয়ে ঢেকুর তুলবেন আর এসময় আসবেন না তা তো হবে না। ভেবেই তিনি থানামুখো হলেন।

বড়বাবু থানায় একটা চুরির কেসে প্রায় রফা করে ফেলেছিলেন। রামবাবুকে দেখে বললেন — আরে আসুন আসুন, কী মনে করে?

-- যা ভেবেছিলাম তাই, গেড়ে দিয়েছে শালারা।

-- কোথায় কী গাড়ল? বড়বাবু জানতে চাইলেন।

—- কোথায় মানে? আমার কারখানার মাঠে পার্টির ঝান্ডা—-খোদ আপনাদের সরকারের। শু যো--। বড়বাবু সোজা হয়ে বসলেন। কারখানা হলে তার দুই বেকার ভাইকে চাকরি দিতে রামবাবু রাজি হয়েছেন। তার মানে নো কারখানা, নো চাকরি।

'বুঝলেন রামবাবু', বড়বাবু একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'নামটাই নির্মল ওর, ভেতরটা ব্যাটার মলে ভর্তি। আমি নিজে ওকে বলেছি যা কাশার পরিষ্কার করে কাশবেন, পরে না ঝামেলা হয়। অথচ —

- ও আর কাশবে কি। সবার কাশিই তো স্ট্রং অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আগেই থামিয়েছি। তবে নির্মলবাবু বলছিলেন গোবিন্দর কাজ এটা। পার্টি লাইন থেকে বেরিয়ে এসব করছে।

— কত গোবিন্দ দেখলাম মশায়। চলুন আজই নির্মলবাবুকে নিয়ে উপড়ে দিয়ে আসি। বলেই বড়বাবু ফোন করলেন পার্টি অফিসে।

—- নির্মলবাবু? নমস্কার, থানার বড়বাবু বলছি?

—- বলুন, কী খবর?

- রামবাবু এসেছেন। শুনেছেন তো সব।

- আমি গোবিন্দকে ডেকে আনতে লোক পাঠিয়েছি। মহা ঝামেলা শুরু করল ব্যাটা। এইমাত্র জেলা সম্পাদক ফোন করেছিলেন, এম. পি. সাহেব সোমবার আসছেন, সঙ্গে জেলা কমিটির সবাই। সেবার গোবিন্দকে ঘানিতে জুড়ে তেল বের করতে বললাম শুনলেন না, দেখুন এবার খেল! বড়বাবু মুচকি হেসে বললেন —- আজ সন্ধ্যাবেলা চলুন দেখি কী করা যায়।

সন্ধ্যাবেলা। আলো-আঁধারি অবস্থা। মাঠের মধ্যে তিনজনে হেঁটে গেলেন সেই ঝান্ডার কাছে। রামবাবু তাতে হাত দিয়ে উপড়াতে যাবেন, বড়বাবু বললেন -- এভাবে উপড়ে ফেলাটা কি ঠিক হবে? কোন ঝামেলা মানে —

— আমিও সে কথা ভাবছিলাম, নির্মলবাবুও সায় দিলেন। তার চেয়ে একটু তদন্ত করে পরিষ্কার হয়ে তুলে দেওয়াটা ঠিক হবে।

— কী রকম বীরপুরুষ মশায় আপনারা। রামবাবু আঁতে ঘা দিয়ে বললেন — আপনার দলের পতাকা, আমার জায়গায় পুঁতেছে, খোদ প্রশাসন থেকে বড়বাবু আছেন, তবুও উপড়ে ফেলতে ভয় পাচ্ছেন?

-- আপনি ঠিক বুঝবেন না, পাবলিক কী জিনিস সে আমরা হাড়ে হাড়ে চিনি। কিন্তু দরকার নেই, কাল সকালে আমি সার্কেল ইন্সপেক্টরকে নিয়ে ঝান্ডা আউট করে দেব। খুশি তো? নির্মলবাবু, আপনি আপনার দিকটা দেখুন।

সবাই ফিরে এল। পতাকাগুলো পতপত করে নাচছে। রামবাবুর মনে হল তাকে ব্যঙ্গ করে যেন উদ্দাম নৃত্য জুড়েছে। রুমাল দিয়ে ভেজা কপাল মুছে গাড়িতে উঠলেন।

পরের দিন সকালবেলা। হরিপদ এসে খবর দিল পতাকা যেই কে সেই, গাড়া রয়েছে। রামবাবু পথে নামলেন। এদিকেবড়বাবু সার্কেল ইন্সপেক্টারকে ফোন করলেন। ও প্রান্ত থেকে খবর এল, ইন্সপেকটর সাহেব এস. ডি. পি. ও অফিসে গেছেন। বড়বাবু ভাবলেন একটা মওকা পাওয়া গেছে, ওখানে কথাটা পাড়লে এস. ডি. পি. ও সাহেবেকেও জানানো যাবে, ঘাড়টাও হালকা হবে বেশ। ভেবেই ছুটলেন তার অফিসে।

অফিসে ঢুকেই রামবাবুকে দেখে থমকে গেলেন বড়বাবু। তাহলে কি তার নামে কমপ্লেন্ট করে দিয়েছেন রামবাবু?

বড়বাবু স্যালুট মারতেই এস. ডি. পি. ও সাহেব বললেন—বসুন, আপনাকে ডাকতে পাঠাচ্ছিলাম। সামান্য একটা লোক্যাল প্রবলেম, ট্যাকল করতে পারছেন না? ইন্সপেকটর সাহেব বললেন—কাল সন্ধেবেলায় গেলেন আর না উপড়ে চলে এলেন, বিশেষ করে নির্মলবাবু যখন সঙ্গে ছিলেন—অল্ কাওয়ার্ড!

রামবাবু বললেন, স্যার, আপনি সঙ্গে থেকে যদি ব্যবস্থা করতেন। সামনের সোমবার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছি। এম. পি. সাহেব আসছেন। জেলার প্রথম কারখানা, সেই হিসেবে —

এস. ডি. পি. ও সাহেব বিষয়টা সি. আই-কে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আজই সেট্ল্ করে রিপোর্ট দিন।

সি. আই বড়বাবু রামবাবু ফিরে এলেন। সি. আই অফিসে এসে নির্মলবাবুকে ফোন করলেন ইন্সপেক্টর সাহেব।

— নির্মলবাবু? সি. আই বলছি।

— নমস্কার স্যার, বলুন কীসের তলব।

— কে না কে এক গোবিন্দ রামবাবুর ফাঁকা মাঠে আপনাদের ফ্ল্যাগ উড়িয়েছে। ওটা বিকেলেই সরাতে হবে। আমি যাচ্ছি পাঁচটার সময়।

— আমি স্যার খবর নিয়েছি। গোবিন্দকে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কদিন আগে ঘুবঘুর কবতে দেখা গেছে ওখানে। আমি থাকব স্যার মাঠে।

বিকেল পাঁচটা। সি. আই. বড়বাবু পুলিশ নিয়ে মাঠে গেলেন। সঙ্গে রামবাবু নির্মলবাবু। মজা দেখতে লোকের ভিড় জমেছে বেশ। সি. আই সাহেব নির্মলবাবুকে কড়াসুরে বললেন, পোঁতাতে শিখিয়েছেন আর উপড়ে ফেলাতে শেখাননি লোকদের? নিজেও হাত দিতে কাঁপছেন, কী রকম বীরপুরুষ মশায়! এবার পতাকার কাছে এগিয়ে গিয়ে সি. আই সাহেব পতাকায় টান মারবেন এমন সময় নির্মলবাবু সাবধান করলেন — স্যার।

— কী হল?

— প্রচুর পাবলিক জমেছে। এর মধ্যে গোবিন্দর লোক যে আছে নিঃসন্দেহ। ঝান্ডা উপড়ে ফেললেই চার্জ করবে বোমা। আপনার এই কটা পুলিশ মান্ধাতার আমলের পয়েন্ট থ্রি নট থ্রি দিয়ে সামলাতে পারবে না স্যার!

থমকে গেলেন সি. আই সাহেব। কী ভেবে বললেন — রাইট্, আননেসেসারি ... কাল ফোর্স নিয়ে আসব। এস. ডি. পি ও সাহেবও থাকবেন। বলেই সবাই পিছুমুখো হলেন। রামবাবু মনে মনে আওড়ালেন — বী-র-পু-রু-ষ!

নির্মলবাবু বেগতিক দেখে পুরো ঘটনাটা জানালেন জেলা কমিটিতে, যদি উপর থেকে পুলিশ দিয়ে সুরাহা হয়। পতাকা যে তার লোক পোঁতেনি এবং সম্ভবত গোবিন্দব কাজ সেটিও নির্মলবাবু বারবার জানাতে ভুললেন না।

পরের দিন সকালবেলা। হরিপদ এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে — সব্বোনাশ বাবু, আরেকটা কালো পতাকা উড়ছে। উর্দুতে কী লেখা, আবার চাঁদ তারা আঁকা আছে।

মাথায় বাজ পড়ল রামবাবুর। মাঠটার উল্টোদিকে মুসলমান পাড়া। নিশ্চয়ই ব্যাটাদের মতলব আছে। হয়তো কালই না মসজিদ বানানোর জন্য ইট পড়ে। কিছুক্ষণ বাক্‌রহিত হয়ে দৌড়লেন জেলা সদরে। খোদ ডি.এম.-এর কাছে। সঙ্গে এম. পি. সাহেবের আমন্ত্রণ গ্রহণের চিঠি।

ডি. এম, এস. পি, আর এ. এস. পিদের নিয়ে মিটিংয়ে বসেছিলেন। সব শুনে বললেন, আপনার কেসটা শুনেছি। জেলা কমিটি থেকে কজন এসেছিল। এস. পি. সাহেব দেখবেন। এস. পি. সাহেব বললেন — কিন্তু ওরা তো পার্টির পতাকার কথা বলেছিল, আপনার কথায় মনে হচ্ছে — যাকগে মিঃ রায়, আপনি আজই বিকেলে দেখে আসুন। এস. পি সাহেব এ এস. পিকে নির্দেশ দিয়ে বললেন — থানায় আর এস. আই রেখে কী হবে, সামান্য একটা প্রবলেম যদি লোকালি সল্‌ভড্‌ না হয়। আন্‌নেসাসাবি প্রবলেম জিইয়ে বড় করা হচ্ছে।

এ. এস. পি সাহেব তাল দিয়ে বললেন, এবার থেকে থানার এস. আই. কনস্টেবলদের স্যার শাড়ি দিলে হয়, চরিত্রটাও ঠিক থাকবে আর বাংলার মরা তাঁত শিল্পটাও জেগে উঠবে।

এ. এস. পি তাঁর অফিসে এসে এস. ডি. পি. ও-কে ফোন করলেন, কাল দুপুরে রামবাবুর মাঠে যাব। গোবিন্দকে যেভাবেই হোক লক আপে ঢোকান। এস. ডি. পি. ও সে কথা সি. আইকে আর সি. আই জানালেন থানার বড়বাবুকে । খোদ এ. এস. পি সাহেব আসবেন শুনে বড়বাবু দৌড়লেন গাড়ি নিয়ে। "যেভাবেই হোক চোর চাই" এর মতন "গোবিন্দ চাই"। ছোটাছুটি করে বড়বাবুর ডাইরিয়া হয়ে গেল। গোবিন্দ ঢুকল লক আপে। গোবিন্দ কিছুতেই পতাকা পোঁতার কথা স্বীকার করল না। বড়বাবু ভাবলেন এটা ওর উপর- চালাকি। লক আপে চাবি মেবে শুতে গেলেন তিনি।

পরের দিন দুপুরে। এ. এস. পি., এস. ডি. পি ও, সি. ই, এস. আই, রামবাবু, নির্মলবাবু, নরেশবাবু, জেলা কমিটির প্রতিনিধি হাজিব। আস্তে আস্তে পতাকাব দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকে লোকারণ্য। কাছে গিয়েই এ. এস. পি বললেনও ওঠাও পতাকা। কজন গিয়ে দুটো পতাকা উঠিয়ে দিল। রামবাবুর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। পুলিশ রাইফেল নিয়ে পজিসনে। যদি চার্জ শুরু হয় তার মোকাবিলায়। এবার কালো পতাকা তোলার কথা। এস. ডি. পি. ও বললেন, স্যার, ব্যাপারটা খুব সেনসিটিভ্‌। উই আর গোয়িং টু মেক্‌ অ্যা সেকেন্ড অযোধ্যা। একটা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেলে —

অতঃপর ! অতঃপর ঠিক হল পুলিশ নয়, ই. এফ. আর নিয়ে এসে ঐ পতাকা তোলা হবে। জারি করা হবে একশ চুয়াল্লিশ। এবার চেপে ধবলেন নির্মলবাবু। বললেন, এক যাত্রায় পৃথক ফল কেন? হয় ঐ পতাকাও তুলুন, নয় আমাদেরগুলো যেখানে ছিল সেখানেই থাক। সব একসঙ্গে উঠবে। পার্টিকে জবাব দেব কি নইলে? নিরুপায় এ. এস. পি. ঐ তুলে-নেওয়া পতাকা আবার পুঁতিয়ে দিলেন। রামবাবুর দাঁতে দাঁতে মেঘ ডেকে উঠল।

* * *

পরের দিন। মাঠ খাঁ খাঁ। দু একজন ব্যাপারটা দেখার জন্য আসছে যাচ্ছে। ডি. এম., এস. পি খোদ ই. এফ. আর নিয়ে এসেছেন। পেপারে ঘটনাটা ছড়িয়েছে। খোদ সি. এম ধমকেছেন ডি. এম. কে। ফুল ফোর্স পতাকাগুলোর দিকে এগোচ্ছেন, হঠাৎ তিনটে ছোট ছেলে ছুটে এসে পতাকা উপড়ে নিয়ে দে দৌড়। ধর ধর করে তিনটেকেই ধরে ফেলা হল। এস. আই বললেন, ব্যাটা গোবিন্দর লোক। সি. আই বললেন, ইদ্রিসের লোক। ভ্যানে পোরা হল ছেলেদের। ইন্সপেক্টর সাহেব কষে একটা করে বীরপুরুষি চড় মেরে বললেন, বল কার লোক, কে পুঁতেছে? ভ্যা করে কেঁদে ফেলল বেচারারা। বললে গোলপোস্ট পাই নি তাই এগুলো চুরি করে এনে পুঁতেছিলাম বল খেলব বলে। কদিন ধরে মাঠে পুলিশ, গাড়ি দেখে খেলতে পাই নি। তাই এগুলো নিয়ে যাচ্ছি তালপুকুর মাঠে পুঁতে খেলব। সবার চোখ ফুটবল। ডি. এম. রেগে চেঁচালেন, অল রাবিশ। বলেই গাড়িতে করে চলে গেলেন। পিছনে ছুটলেন এস. পি, এ. এস. পি, এস. ডি. পি. ও, সি. আই, এস. আই ....

অবিকল্প

উমা বন্দ্যোপাধ্যায়

(এক)

সকালটা ঝকঝক করে উঠল। উইক এন্ডে অনেকদিন পর এমন ঝিলমিলে রোদ্দুর। ছুটিছুটি ভাব। তিন চারদিনের টানা বৃষ্টি কেটে দিন ঝরঝরে হয়েছে। রুকু রুনু সদ্য ঘুম ভেঙে বারান্দায় বেরিয়ে হুল্লোড় করছে। এমন সময় ফোনটা এল। রিসিভার কানে চিন্ময়-এর মুখটা কেমন বদলে যাচ্ছে। — কখন হল? হঠাৎ ই? ও। বর্ধমানেই তো? আ-চ্ছা বলে দেব। খুব ধীরে, প্রায় যন্ত্রচালিতের মতন রিসিভার নামালো চিন্ময়। মুখে দুশ্চিন্তার ধূসর মেঘ। কি হবে এখন? খবরটা মাকে দেওয়া কি ঠিক হবে? এরা সকলে শুনলে যে কি করবে? এমন দিনটা মাটি। কাল বিকেলের দিক থেকে আকাশ একটু-একটু করে পরিষ্কার হচ্ছিল। গোধূলির আলো মেঘ-ছায়ায় সুন্দর ফুটেছিল। আজ রবিবার তাই ওরা দু'ভাই আউটিং-এর প্ল্যানটা করে ফেলেছে। গত মাস দুয়েক ধরে বেছে বেছে প্রত্যেক শনি রবিবার আকাশ অন্ধকার করে আসে। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়। কতদিন সকলে মিলে কোথাও যাওয়া হয়নি। রুকু-রুনুরা হাঁপিয়ে উঠেছে। আজ চিন্ময়দের ফ্ল্যাটে সঞ্জয়বাও আছে। সঞ্জয়, রাণু আর রিঙ্কি। মা রাণু আর পিয়ার সাথে রান্নাঘরে। স্যান্ডউইচ বানানো হচ্ছে। সসেজ ভাজার গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে আছে। চিন্ময় একটা সিগারেট ধরিয়ে বারান্দার মোড়ায় এসে বসল। মণি-দিদা মারা গেছে। কাল শেষরাতে। মা জানলেই শোকের মেঘ-বৃষ্টিতে রবিবারের ছুটি ভেসে যাবে। মাকে নিয়ে বর্ধমান ছুটতে হবে তাকেই। সঞ্জয়কে তোয়ালে পরে বাথরুম থেকে বেরোতে দেখে চিন্ময় কান্না-গলায় বলল -- দাদা, একবার শুনে যাও। সঞ্জয়ের দু'গালে শেভিং ক্রীম পুরু হয়ে আছে। হাতে সেফটি রেজার।

— দাদা, একটা মিস হ্যাপ হয়ে গেছে।

— কি ব্যাপার রে? সঞ্জয় উদ্বিগ্ন।

— একটু আস্তে বল দাদা। ব্যালকনির দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সঞ্জয়ের দিকে সোজা তাকালো চিন্ময়।

— মণি দিদা কাল মারা গেছে।

-- হোয়াট! বর্ধমানের মণি দিদা? সঞ্জয় গোল বেঁটে মোড়াতে ধপ করে বসে পড়ল। মাথার ঘন চুলে সবক'টা আঙুল ডুবিয়ে চুলগুলো খামচে ধরল। চিন্ময় প্রায় ফিস ফিস করে বলল — আমি বলি কি দাদা, মাকে এখন — মানে আজকেই খবরটা না দিলে কি হয়? রাত্তিরের দিকে ফিরে এসে দেওয়া যাবে। এমনিতেই তো আমরা পৌঁছনোর আগেই ডেড্‌বডি বেরিয়ে যাবে। শেষ দেখা তো হবে না। এদিকে প্রোগ্রাম ক্যানসেল হলে বাচ্চাগুলো শক্‌ড্ হবে। আর পিয়া, বৌদি — বুঝতেই পারছ।

সঞ্জয় গম্ভীর, চিন্তান্বিত মুখে মাথা নাড়ে। — কিন্তু না বললে ব্যাপারটা জানাজানি হবে না! বর্ধমানে গেলেই তো মা জানতে পারবে ফোন এসেছিল।

—সে কোনক্রমে ম্যানেজ হয়ে যাবে। ঐ গণ্ডগোলের বাড়িতে কে আর.... যাক্‌গে লেট্‌স্ গেট রেডি।

সঞ্জয় বাথরুমে ঢুকে পড়ল।

অনেকগুলো কাক একসাথে খুব চেঁচামেচি করছে। রাস্তার ওপরের আকাশে অন্ততঃ আট-দশটা কাক চক্কর মারছে। চিন্ময় একটু ঝুঁকে রাস্তার দিকে তাকালে। একটা কাক মরে পড়ে আছে। বোধ হয় রাস্তার ইলেকট্রিক লাইনে শক খেয়ে মরেছে। কালো শরীর, ভাঙা ডানা, উল্টে আছে রাস্তার ধারে। আধখাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল চিন্ময়। মুড্‌টা অফ্ হয়ে গেছে। একটা কাঁটা খচখচ করে বুকে বিঁধছে। ভেজা মাটিতে রোদের অদ্ভুত গন্ধটা ক্রমশঃ ফিকে হয়ে আসছে। নেহাত বাচ্চারা আর মেয়েরা অশান্তি করবে তা-ই। নইলে এতটা রাস্তা ড্রাইভ করে যাওয়ার মুড আর নেই। মা এখন ডাইনিং স্পেসে খাবার টেবিল ঘিরে ঘোরাফেরা করছে। এটা ওটা টেবিলে নামাচ্ছে। বাস্কেটে সাজাচ্ছে। চিন্ময় পায়ে-পায়ে ঘরে এলো। মা'র মুখ আজ সকালের আকাশের মতন নির্মেঘ, শান্ত। কোথাও একটুকরো মেঘের কালিমা নেই। পিয়াকে খুব হাসিখুশী দেখাচ্ছে আজ। হাল্কা শরীর পালকের মতন মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। বৌদির উঁচু গলার হাসি অনেকদিন পর শুনল চিন্ময়। প্রেসারকুকারের গর্জন ছাপিয়ে ঢেউয়ের মতন বারান্দায় আছড়ে পড়ছে।

মণি-দিদা আসলে মায়ের নিজের মা নয়। সঞ্জয়দের দিদিমা মারা যাবার সময় ওদের মা, মাসি-মামার বয়স ছিল চার থেকে দশের মধ্যে। তখনই মণি-দিদা ও বাড়িতে আসে। ঘরসংসার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার জন্যই কতকটা। দিদিমার দূর সম্পর্কের এই বোন মনোরমা শেষপর্যন্ত মণিমাসি থেকে ওদের মণি-মা হয়ে যায়। সেই সূত্রে সঞ্জয়-চিন্ময়দের মণি-দিদা। গোলগাল ছোটোখাটো মানুষ ছিল মণি-দিদা। কষ্টি-পাথর গায়ের রঙ। চোখ দু'টি গভীর, মমতা-মাখানো। চিবুকের সুন্দর গঠনের জন্য মুখখানি সর্বদাই হাসি হাসি দেখাতো। মণি-দিদা মা-হারা সন্তানদের সমস্ত হাহাকার ভুলিয়ে দিয়েছিল। সংসারের পাঁচমিশেলি কানাঘুষোয় অনেকদিন পর দাদু নাকি মণি-দিদাকে মন্দিরে নিয়ে শাস্ত্রমতে বিয়েও করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর মর্যাদা দেননি। মা'র মুখেই এসব গল্প শুনেছে ওরা। মায়ের যখন তেরো বছর বয়স তখন এক গভীররাতে দাদুর ঘরের ভেজানো দরজা খুলে নিঃশব্দে ঢুকেছিল মণি দিদা। মিনিট-দশেক পরেই বেরিয়ে এসেছিল। তেরো বছরের বালিকা তাদের মা দেখেছিল তাদের মণি-মা'র পরনে ঘোর নীল বাহারি ঢাকাই শাড়ি। মণি-মা কি এক অপরিসীম পরাজয়ের গ্লানি তার ক্ষীণ পদশব্দে জড়িয়ে নিয়ে টানা বারান্দা পেরিয়ে ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। এসব গল্প বলতে বলতে মা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যেত। থেমে-থেমে প্রায় স্বগতোক্তির ধরনে বলত — মণি-মা'র বড় কষ্ট ছিল। তখন বুঝতাম না। মণি-মা'র সাথে বাবা কথাবার্তা বললে আমার বুকের ভেতরটা জ্বালা করে উঠত কেমন। কোথায় যেন একটু সূক্ষ্ম অসোয়াস্তি টের পেতাম আমি। তোদের অন্য মামা-মাসির কথা জানিনা। বাবাকে মণি-মার সাথে নিতান্ত সাংসারিক কথা বলতে শুনলেও আমি ছলছুতো করে ডাকাডাকি শুরু করতাম। না এলে কেঁদেকেটে অনর্থ বাধাতাম। অথচ মণি-মাকে আমরা ভাইবোনেরা কি যে ভালোবাসতাম! মণি-মা-ই আমাদের সর্বস্ব হয়ে উঠেছিল। নিজের মায়ের স্মৃতি ক্রমশঃ ফিকে হতে হতে একেবারে আবছা একটা নাছোড়বান্দা দাগের মতন লেগে রইল মনে।

সঞ্জয় বাথরুম থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ডেকে গেল — চিনু, হয়ে গেছে। চিন্ময় বাথরুমে ঢুকে পড়ল। শাওয়ারের জলে আকুল বৃষ্টিতে ভেজার মতন সমস্ত শরীর ভিজিয়ে নিতে নিতে চিন্ময় অপরাধবোধের গ্লানি ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। খবরটা মাকে দেওয়া হবে না, এক্ষুণি, এই ডিসিশানটা সে একা এমন করে না নিলেই

পারত। পরে দাদাও এর দায় নেবে না। তাহলে কি পিয়াকে বলা দরকার? ওর সাথে একটা আলোচনা.....। এসব ভাবনার মাঝে বেশ জোরে ডোরবেল বাজার আওয়াজ হল। পর পর তিনবার। কেউ কি দরজা খুলছে না! চিন্ময় শাওয়ার বন্ধ করে কান পাতল। রান্নাঘর থেকে পিয়ার গলা ভেসে আসছে — মা, কে ডাকছে দেখুন না।

হয়তো মা-ই দরজা খুলল. চিন্ময় মাথা মুছতে মুছতে রুকু, রুনুকে ডাকল — তাড়াতাড়ি স্নান করে নাও তোমরা। ক্যুইক। ন'টার মধ্যে বেরোতেই হবে।

পিয়া চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। খবরটা শুনে চিরুণী ওর চুলেই ঝুলে রইল। — কি বলছ তুমি? মণি-দিদা? ইস্, ভদ্রমহিলাকে আমার খুব ভালো লাগত। বঞ্চিত নারীত্বের প্রতিভূ।

পিয়া ড্রেসিং টেব্‌লের সামনে টুলে বসল। — তাহলে? চিন্ময় একটু থেমে বলল — মাকে এখন খবরটা দেওয়া হচ্ছে না. বুঝলে। মানে, আমি আর দাদা সেই ডিসিশান-ই নিলাম, চিন্তা-ভাবনা করে।

— কি? পিয়া খাপ-খোলা তলোয়ারের মতন লাফিয়ে উঠল। রাগ ঝলসে উঠল ওর দু'চোখে।

— এ খবরটা মাকে দেবে না? আ-হা হোয়াট এন আইডিয়া। কি ব্রেন তোমাদের! শাণিত বিদ্রূপে ফেটে পড়ে পিয়া।

— মনকে বোঝাবে, রক্তের সম্পর্ক তো নেই আর — অনেকটা আয়ার মতনই তো ছিল মণি-দিদা। দিদিভাই তো শুনলেই বলবে — ও তো বাবার রক্ষিতা ছিল। অমনি কি আর ছেলেপুলে মানুষ করেছে? মায়ের গয়নাগাঁটি অর্ধেকের ওপর নিয়েছে। টাকাকড়িও হয়তো .., এসব বলেই তোমরা পাপমনকে বোঝাও। আমার মত নেই, বাস্।

চিন্ময় একেবারে কুঁকড়ে গিয়ে দুর্বল গলায় বলল — আস্তে বল না একটু! জিনিসটা বোঝার চেষ্টা কর। খবরটা তো চেপে যাওয়া হচ্ছে না। রাত্রে দেওয়া হবে। নিজেদের জন্য কি আর! বাচ্চাগুলোর কথা ভেবেই। এখন নিয়ে গেলেও তো লাভ নেই। পৌঁছনোর আগেই ডেডবডি রওনা হয়ে যাবে। মুখাগ্নি তো ছোটমামা ই করবে। তুমি মেনে নাও প্লিজ। বৌদিকে দাদা বলবে কি না কে জানে। পিয়া যেমন হঠাৎ ঝল্‌সে উঠেছিল তেমনি হঠাৎই খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ে সংযত হয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুল বাঁধতে বসল। চিন্ময় খানিকটা দায়মুক্তির হাল্কা হাওয়া জড়িয়ে নিয়ে ডাইনিং স্পেসে পৌঁছে দেখল মা খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। চিন্ময় পেছন থেকেই বলল — রেডি হচ্ছ না মা? দেরি হয়ে যাবে যে।

মা দরজার পাল্লা ভেজিয়ে খিল তুলে দিতে দিতে শান্ত ভঙ্গিতে বলল — তোরাই যেতিস হৈ হৈ করে। আমি না গেলে কি হত রে চিনু। আমার কি আর বয়স আছে?

চিন্ময় একটু আবদারের ভঙ্গিতে ছটফট করে বলল — না না, ওসব শুনতে চাই না। তুমি না গেলে কি হয়! না মা, তোমাকে যেতেই হবে।

মা একটু হেসে ছেলেবেলার মত ডান হাত দিয়ে চিন্ময়ের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল। চিন্ময়ের চোখদু'টো কেমন জ্বালা করে উঠল হঠাৎ।

(দুই)

এয়ারপোর্ট পেরিয়ে গাড়িতে স্পীড তুলল চিন্ময়। হু হু করে খোলা হাওয়া কাটছে ওর সাদা মারুতি। পেছনে মেয়েরা চারজন বেশ ঠাসাঠাসি করে বসেছে। রুনুও আছে। রুকু সামনে বাবা, জেঠুর সাথে। ক্যাসেট প্লেয়ারে গান চালিয়েছিল চিন্ময়। পিয়া একটু পরেই বলল — বন্ধ কর। ভালো লাগছে না।

ওরা দু'ভাই আর পিয়া একটা দমবন্ধ গুমোটের মধ্যে রয়েছে। মা তো এমনিই কথা কম বলে। এখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। কথা বলছে রাণু। পিয়া ছোট ছোট উত্তর দিচ্ছে। তার অনিচ্ছার হাল্কা হাল্কা কথা কেমন আলগা করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। বাচ্চারা অনর্গল বকছে। দেউলপুরের বাগানবাড়িতে পৌঁছে মা প্রথম কথা বলল। — রাণু, কফির সরঞ্জাম বাস্কেটে রেখেছি। ফ্লাস্কে গরম জল আছে। আগে কফি দাও ওদের। হাল্কা কিছু খেতেও পার তোমরা। তাড়াহুড়োয় ব্রেকফাস্ট হয়নি। বেগুনি পাড় ধবধবে সাদা শাড়ি মায়ের ফর্সা শরীর জড়িয়ে আছে। হাওয়ায় রূপোলি চুলগুলি উড়ছে। চিন্ময় আর সঞ্জয় কোয়ারটেকারের খোঁজে বাড়ির বারান্দায় উঠল। পিয়া আর রাণু হাত ধরাধরি করে সতরঞ্চি বিছিয়ে নিচ্ছিল ঘাসে। সঞ্জয় বলল — ওখানে রোদ বেশি হয়ে যাবে। ভেতরে জিনিসপত্র রেখে ডাইনিং স্পেসেই বসব।

রুকু রুনু চেঁচামেচি শুরু করল — না-আ-আ জ্যেঠু। বাইরে না বসলে পিকনিক হবে না। বাড়িতে তো রোজই থাকি।

শেষমেষ দু'চারটে আমগাছের তলার ছায়ায় ভিজে ভিজে ঝরাপাতার ওপর সতরঞ্চি বিছিয়ে ওরা বসল। পাতার ফাঁকে ফাঁকে রোদ্দুর এসে ওদের ছুঁয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। রুকু রুনুর হাতে ধরা পলিথিনের প্যাকেট থেকে ওয়ার্ড মেকিং গেম বেরোল।

— জ্যেঠু, সক্কলে খেলব কিন্তু।

রাণু কফি বানাতে বানাতে চোখ না তুলেই বলল — না, তোমরা খেল।

রিঙ্কি আধশোওয়া হয়ে ওয়াকম্যানে গান শুনছিল। বলল — এমন কিছু খেল ঠাম্মাও যেন জয়েন কবতে পারে। পিয়া হাতে হাতে কফির কাপ ধরিয়ে দিল।

— রুকু, রুনু, তোমরা বাবা, জ্যেঠুর সাথে খেল। রিঙ্কি খেল না ওদের সাথে।

খেলা জমল না। আধঘণ্টা টানাটানি করে চলল। চিন্ময় শেষপর্যন্ত আড়মোড়া ভেঙে উঠে পড়ল। — নাহ্ রে, ব্রেন ইন্যাক্টিভ হয়ে গেছে। বয়স হচ্ছে তো। তোরা খেল্।

সঞ্জয় বলল — পিয়া একটা গান শোনাও। অনেকদিন শোনা হয় না।

রাণু আর মা একসাথে বলল — সেই ভালো।

রিঙ্কি সোজা হয়ে বসল। পিয়া হাঁটু ভাঁজ করে বসেছিল। ম্লান হেসে ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। — নাহ্ মুড্ নেই।

ওর না-এব মধ্যে কেমন একটা জেদ ছিল। কেউ আর দ্বিতীয়বার গাইতে বলল না। মা কেবল উদ্বিগ্ন গলায় বলল — তোমার শবীব খারাপ নাকি পিয়া?

— না না সেরকম কিছু না। হঠাৎ মাথাটা.....

চিন্ময় আচমকা খুব জমজমাট চেঁচামেচি করে রুকু, রুনুর সাথে ক্রিকেট খেলতে গেল লনে। কিছু সময় এলোমেলো বল করে ফিরে এসে সতরঞ্চিতে পা ছড়িয়ে হাতে ভর দিয়ে বসে পড়ল। হাত উল্টে, কব্জির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল — রান্নাবান্না সাড়ে বারোটার ভেতরই হয়ে যাবে বলল। খাওয়া হলে একটু তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ব। মা নিবিষ্ট হয়ে উল বুনে যাচ্ছিল। বর্ষার ভিজে ভাব শুরু হলেই মায়েরও উল বোনা শুরু হয়ে যায়। সকলের ফরমায়েসী সোয়েটার, না হলে, শীতের আগে শেষ হয় না।

— চারটেয় তো বেরোনোর কথা ছিল। মা বলল।

— তোরা ছুটির দিনটা একটু আমোদ করে নে। কদ্দিন পর সব একসাথে বেরিয়েছিস।

পিয়া চোখের ওপর আড়াআড়ি করে হাত রেখে চিৎ হয়ে বড় সতরঞ্চির একপাশে শুয়েছিল। রাণু ফিল্মফেয়ারের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল — তোমাদের বড্ড তাড়া। কাল থেকে তো বাবা আবার রুটিনড্ লাইফ। এই পিয়া, ওঠ না। চল্ তাস খেলি সবাই মিলে।

কিন্তু কোন খেলাই জমল না। দুর্ধর্ষ লাঞ্চের মেনু। রুকু রুনু খেতে খেতে দু'একবার বলল, দারুণ। রানু বলল — বেশ বানিয়েছে তো চিকেন বাটার মশালা। শীতকালে আর একবার আসা যাবে।

রিঙ্কি বলল — দূর। কাম্মা কাকামনিই তো জমিয়ে রাখে। আজ কারোরই মুড্ নেই। চিন্ময় তাড়াতাড়ি বলতে গেল — কেন, কেন? বাঃ সত্যি রে, ডিলিশাস। এই আউটস্কার্টে এই টেস্ট, ভাবা যায়! সত্যি মা, বহুদিন পরে.... মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামালো চিন্ময়। মায়ের দৃষ্টিতে শরতের রোদ্দুরের মতন স্নেহ। — তা খেলি কই তেমন? মা বলল। — শুধু তো নাড়াচাড়া করছিস।

সঞ্জয় জলের গ্লাসে দীর্ঘ চুমুক দিয়ে সোজা হয়ে বসল। — না মা, বয়স বাড়ছে। এতো খাওয়া ঠিক না।

সাড়ে চারটে নাগাদ চিন্ময়ের মারুতি দেউলপুরের বাগানবাড়ির গেট দিয়ে বেরোল। ফিরতি পথে সবাই চুপচাপ। রুকু রুনু মিনিট দশেকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। বিকেলের আলোয় ভাসছে বিস্তীর্ণ নীলাকাশ। বাঁদিকে ফাঁকা মাঠে অজস্র কাশফুল ফুটেছে। পিয়ার ঘুরে ফিরে কেবলই মণিদিদার মুখ মনে পড়ছে। নববধূ পিয়ার চিবুকখানি সস্নেহে ছুঁয়েছিলেন যখন, ওঁর স্পর্শ বেয়ে এক অদ্ভুত শান্ত শীতলতা পিয়ার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। মণিদিদাকে দেখেই পিয়ার যামিনী রায়ের আঁকা মাতৃমূর্তির মুখ মনে পড়েছিল। বিয়েবাড়ির হৈ চৈ মিটলেও মণিদিদা চলে যাননি। সযত্নে মায়ের গৃহস্থালি গোছগাছ করে দিচ্ছিলেন। টুকিটাকি সাংসারিক পরামর্শ দিচ্ছিলেন। এতবড় সংসারের কর্ত্রী তাদের শাশুড়িকে পিয়া বলতে শুনেছে—বাব্বা, মণি-মা না এলে যে কি হত! তারপর অনেকদিন ধরে একটু একটু করে মায়ের মুখে মণি-দিদার কত যে গল্প শোনা হয়ে গেছে। — মণি মা'র বুকের মধ্যে আস্ত একটা মরুভূমি আছে। তপ্ত ঝোড়ো হাওয়ার হাহাকার — গরম তৃষ্ণার্ত বালির ওড়াউড়ি। মা এই কিছুদিন আগেও বলেছেন। পিয়া আড়চোখে মায়ের দিকে তাকালো। মা জানলার কাচে আলতো কপাল ছুঁইয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। দৃষ্টিতে শূন্যতা।

(তিন)

বাড়ি ফিরে সকলেই ছড়িয়ে পড়ল যে যার ঘরে। একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান সারবে। ড্রইং রুমে কেবল চিন্ময় আর সঞ্জয়। চিন্ময় সোফায় গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করল। সঞ্জয় অ্যাকোয়ারিয়ামের রঙিন মাছেদের ঘোরাফেরায় চোখ রেখে স্থির বসে রইল। এইবার কথাটা মাকে বলতে হবে। কে প্রথম বলবে? কীভাবে যে মাকে কথাটা বলবে! সকালের ফোনের কথা পাশ কাটিয়ে কথাটা বলা — এসব ভাবনা ভারী পাথরের মতন বুকে চেপে বসে আছে। সঞ্জয় সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে রাখল। চিন্ময়ের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে বলল — কী ঠিক করলি চিনু? মাকে.....

দরজার বাইরে মায়ের কাশির শব্দ। মা ঘরে এল। সর্বস্ব হারানোর বেদনা মুখে। জল-ভারাক্রান্ত মেঘ চোখ দু'টিতে জমে আছে। মা চিন্ময়ের মুখোমুখি সোফায় বসে বলল — চিনু, মণি-মা কাল রাত্রে মারা গেছেন। আমাকে একবার বর্ধমান নিয়ে যাবি বাবা?

চিন্ময়কে কে যেন এক ধাক্কায় অন্ধকার খাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। তলিয়ে যেতে যেতে সে কোনক্রমে উচ্চারণ করল — তোমাকে কে বলল। মায়ের চোখ থেকে একটি দু'টি করে জলের ফোঁটা তখন গাল বেয়ে নামছে। কান্নাভেজা গলায় মা বলল — বর্ধমান থেকে চিঠি

এসেছে সকালেই। তোদের ছোটমামা একটা ছেলেকে পাঠিয়েছিল। চিনু যখন স্নান করছিলি তখনই ছেলেটা দিয়ে গেল। মা আঁচলের তলা থেকে একটা ছোট্ট চিঠি বার করল।

— পিয়া রাণু কেউই কাছাকাছি ছিল না। তোরাও না। ভাবলাম কেউই যখন খবরটা জানল না — এখন আর না-ই বা শুনল। তোদের আমোদ-আহ্লাদের দিনটা। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। না গেলে দাদুভাই, দিদিভাইদের মন খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া গিয়েও তো আর দেখতে পেতাম না।

চিন্ময়ের বুকের ভেতরে দশদিক ভাসানো বন্যার জল ঢুকে পড়ার প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছিল। ভীষণ কান্না পাচ্ছে ওর। চিন্ময় ছেলেবেলার মতন মায়ের কোলে মুখ লুকোল। চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ধরা-পড়া শিশুর মতন সঞ্জয়ের শরীর তখন কাঁপছিল। এক জটিল কানাগলির গোলাকধাঁধায় হারিয়ে যেতে যেতে সঞ্জয় চোখ বন্ধ করল।

বিচিত্রবীর্য

অভিজিৎ তরফদার

— কিছু হবে না তো?

কতবার উচ্চারণ করা হয়েছে এই বাক্যটি? যেন হওয়া-হয়ির দায়িত্ব কেবল আমাদের? তোমরা সব শঙ্খশুভ্র, দাগটুকুও লাগে না। যেন ভুলিয়ে ভালিয়ে আমরাই বাধ্য করেছি তোমাদের, কচিখুকি সব, এবং কখনো আগে নয়। সব হয়ে যাবার পর। শান্তিজল ছেটানো হয়ে গেছে। নাভিটুকুও পুড়ে আংরা। সেই শান্ত, শীতল শেষের সময়ে। মনে পড়ে দায়। যে দায়টুকু প্রকৃতির নিয়মে তোমাদেরই বইতে হয়!

হাসল রঞ্জন। জানলার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল। পর্দা তুলল না পুরো। পাশ দিয়ে দেখল, স্কুল ছুটি হয়েছে কোনও। দলে দলে মেয়ে যাচ্ছে। পর্দা পুরো তুলে দেখাবে নাকি? শিখিয়ে দেবে?

ওই দেখো একজন, তোমাদেরই, অথচ এখন তোমাদের নয়।

—কিছু হবে না, নিশ্চিন্ত থাকো।

এটা কি মিথ্যা বলল রঞ্জন? — না। এই আশ্বাসে এককণাও মিথ্যের খাদ মেলায় নি।

মিথ্যা কি বলে না রঞ্জন?

মোটেও না। যথেষ্টই মিথ্যা বলে। আকছার বলে। রঞ্জন জানে, বেঁচে থাকতে গেলে, বেচে থাকা মানে বুকের ধুকধুকিটা শুকিয়ে জীবনটা টেনে নিয়ে যাওয়া নয় কেবল, মিথ্যা ডাইনে বাঁয়ে বলতে হয়। সূর্য-চন্দ্র বদলা-বদলিরও দরকার পড়ে।

এই তর্কেই যেমন।

— কী খাচ্ছো?

— টিফিন।

— সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি। কী টিফিন?

— পরোটা আর আলুর দম। নেবে?

— দাও।

— তুমি কিছু আনো নি?

চোখ দুটোকে অফিসের জানলা গলিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেয়। গলাটাকেও ভাসিয়ে দেয় দুপুরের গনগনে হাওয়ায়। বলে, দিলে তো আনব!

তরু চুপ করে থাকে। ওর চোখ ছলছল করে ওঠে। বলে, না দিলেও নিজে ত কিনে খেতে পারো।

— সংসার তো করো নি। বিরাট হাঁ। নিজের জন্য টিফিনের পয়সা আলাদা করতে পারলে চিন্তাই ছিল না।

আর একটা পরোটা তুলে দেয় তরু। খেয়ে দেয়ে জল খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে তুলতে সিটে ফেরে রঞ্জন। টিফিন কেরিয়ার ধুতে উঠে যায় তরু। চুপিচুপি জানালার ধারে গিয়ে বাইরে

ফেলে দেয় শিপ্রার সাজিয়ে দেওয়া রুটি-তরকারি। তরু ফিরে আসার আগেই সিটে এসে বসে। ফাইলে মুখ আড়াল করে। ফিরতে ফিরতেও তরুর দৃষ্টি ছুঁয়ে যায় রঞ্জনকে। চোখ না তুলেও রঞ্জন বুঝতে পারে, সে চোখে মায়া।

অন্যদিন। অফিসে নয়। ময়দানে। ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে। গঙ্গা হয়ে আসা জলীয় বাষ্পে গলা ভিজিয়ে।

— লোকটাকে দেখো।

চোখ ঘোরায় তরু। একটা ঘোড়াকে লাগাম পরাচ্ছিল মানুষটা। জন্ম থেকে ঐ রকম, নাকি বোমাটোমা লেগেছিল বলা কঠিন। দু'টো চোখ দুদিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কপাল জুড়ে টিউমারের মতো উঁচু ঢিবি। চোয়াল দু'টো চৌকো। দাঁতের অর্ধেক মুখের বাইরে।

— মাগো। তাকানো যায় না। চোখ সরিয়ে নেয় তরু।

— হ্যাঁ। কিন্তু লক্ষ করলে দেখবে ওরও চোখে সামান্য করুণা আছে।

-- হ'তে পারে। কিন্তু তাতে কী যায় আসে?

— শিপ্রার নেই।

স্তব্ধ হয়ে যায় তরু। আস্তে আস্তে হাতের আঙুলগুলো এগিয়ে আসে। তৈরিই ছিল রঞ্জন। নিজের হাতের তালু পেতে টেনে নেয় তরুর আঙুল। কথা বলে। হাতের পাতায়, আঙুলের ডগায়। উত্তাপ। চোখের সাদায় রক্ত জমে তরুর।

এইভাবেই। ছোট ছোট মিথ্যা। প্রয়োজনীয় মিথ্যা। একটা পদ্ধতি। সিঁড়িভাঙা অঙ্ক। একটু একটু করে টেনে আনা নিজের দিকে। প্রথমে করুণা। করুণা থেকে স্নেহ। স্নেহ থেকে দুর্বলতা। দুর্বলতা থেকে প্রেম। প্রেম থেকে ....

হাসতে হাসতে বলেছিল তরু, — দাদা বউদি আজ বাড়িতে নেই, ঘাটশিলা বেড়াতে গেছে। কাজের লোকটাকেও ছুটি দিয়েছি। আজ আমি একদম একা।

কানের কাছে রক্ত লাফিয়ে উঠেছিল রঞ্জনের । ছ'মাস। প্রতিটি দিন। প্রস্তুতি। এইবার।

— চলো আজ হাফডে সি. এল নিয়ে নিই।

— একসঙ্গে? কি ভাববে সকলে?

-- গুলি মারো। তাছাড়া একসঙ্গে নেবার কী দরকার? আমি আগে গিয়ে দত্তদাকে বলছি। আমারটা। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে জি. পি. ওর সামনে দাঁড়াচ্ছি। পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে এসো।

পনেরো নয়, বারো মিনিট। কতখানি আগ্রহ তরুরও ছিল সেটা মিনিবাসে বসে বুঝল রঞ্জন। তরুর হাতটা হাতে নিয়ে। তালু ঘামছে। কাঁপছেও কি আঙুল?

পঁচিশ মিনিটের বাস রাস্তা, সাত মিনিট রিক্সা, দু' মিনিট তালাখোলা, ভেতরে ঢোকা, দরজা বন্ধ। পঁয়ত্রিশ মিনিটের মাথায় রঞ্জন এবং তরু।

ঠিক একান্ন মিনিটের মাথায়, — কিছু হবে নাতো?

ওমলেটটা ওল্টালে? একই চেহারা। ভাজা একটু বেশি, পেঁয়াজ সামান্য কম।

শিপ্রা। বিয়ের তখন তিনবছর বয়স। রেস্টুরেন্টে পর্দা-ঢাকা কেবিন, তখন ভিক্টোরিয়ার গাছের আড়াল অবধি মাসান্তিক অভ্যাস। আকাশ নীল, মেঘের রং সাদা, এবং কালো রাত্রিতে পৃথিবী চমকানো চাঁদ উঠলে রঞ্জন শিপ্রাকে এবং শিপ্রা, রঞ্জনকে ডেকে দেখায়। শিপ্রাই কথাটা জানতে চেয়েছিল।

একটা অনুষ্ঠান ছিল। অনেক লোক এক জায়গায়। অনেক পুরুষ একজায়গায় হ'লে আলোচনাটা পরমাণু বিস্ফোরণ থেকে রোনাল্ডো হয়ে কাঁচালঙ্কার দামে গিয়ে আটকে যায়।

মেয়েদের অন্যরকম। শাড়ি-গয়না-খোঁপা-ঐশ্বর্য রাই। কিন্তু তার চেয়েও মুখরোচক চানাচুর হামেশা জুটে যায়।

শিপ্রা ফিরে এসে শাড়ি-জামা-গয়নাগাঁটিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিছানায় ফেলে উপুড় হয়ে শুলো।

— ঠিক ঠিক বলো তো? তিন বছর সময়টা সত্যিই বেশি?

— আবার কী হল?

— যা হয়। কেন হল না। কিসের গোলমাল। গোলমালটা আমার না তোমার। ডাক্তার দেখাচ্ছি কিনা। কেউ কেউ ডাক্তারের নাম পর্যন্ত করে দিল।

কাছে টানে রঞ্জন, — আচ্ছা পাগল তো। তোমার এখন আঠাশ, আমার চৌত্রিশ। এত তাড়াতাড়ি কেউ পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে? দেখা যাক না আব দু'টো বছর।

— আর দেখাদেখি নয়। চলো, দুজনে মিলে ডাক্তারের কাছে যাই।

ডাক্তারও একই কথা বললেন। দরকার নেই। সব ঠিকঠাকই আছে। বছর দুই যাক্। তারপরও না হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বরং ঐ সব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে বারণ করলেন ডাক্তার। বেশি ভাবলেই নাকি 'ডিম্বাণু', 'শুক্রাণু' ওরা সব সাঁতার কেটে এদিক ওদিক পালিয়ে যায়।

দু' বছর গেল। জীবনের রং থেকে গোলাপি, আকাশনীল, বাসন্তী এইসব এবং জীবনের গন্ধ থেকে কদম, শিউলি, চাঁপা এরা, — ততদিনে বাদ গিয়েছে।

প্রায় ঘাড় ধরে নিয়ে গেল শিপ্রা। এবারে টেস্ট করানো হ'ল। শিপ্রার। রঞ্জনের। বুকপকেটে রিপোর্ট নিয়ে বাড়ি ফিরে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল রঞ্জন —

— দেখলে তো, সব নর্মাল। আর যেন কোনও রকম প্যানপ্যানানি না শুনি।

রিপোর্টগুলো খুলে দেখেছিল শিপ্রা। ইংরেজি পড়তে জানা, পাসকোর্সে জুলজি-বটানি থাকা, আর একটা ডাক্তারি রিপোর্ট পড়ে বুঝে ফেলা এক কম্ম নয়। তাই চোখ বুলিয়ে তুলে রেখেছিল। রঞ্জন জানত, পরে বান্ধবী সুরভির হাত দিয়ে পাঠিয়ে তার ডাক্তার হাজব্যান্ড-এর কাছ থেকে যাচাই করে নেবে।

রঞ্জন আঁচ করেছিল। শিপ্রা যেদিন নড়া ধরে নিয়ে গিয়েছিল সেটা ছিল অফিসিয়াল। তার আগেই আন-অফিসিয়ালি রঞ্জন একদিন গিয়েছিল প্যাথলজিকাল ল্যাব-এ। পরীক্ষা করতে দিয়েছিল। তারপর রিপোর্টটা নিয়ে, রঞ্জন-শিপ্রার পরিচিত নয়, অন্য একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। ভদ্রলোক বয়স্ক। দেখেটেখে চশমা খুলে টেবিলে রেখেছিলেন, সোজা তাকিয়ে ছিলেন রঞ্জনের দিকে, — সরি, কিছু হবার নয়। আপনার বাবা হবার ক্ষমতা নেই। স্পার্ম কাউন্টে জিরো।

রিপোর্টটা বাইরে বেরিয়ে কুচিকুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলেছিল। এটা ছেঁড়া গেল, কিন্তু পরেরটা? নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ায় মাঝে মাঝে। যথাসময়ে বুদ্ধিটা খুলে গেল। ঝাড়ুদার বাথরুম থেকে টেস্টটিউবগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। ওকে পাশে ডাকল। একটা পঞ্চাশটাকার নোট। রঞ্জনের নামওয়ালা টেস্টটিউবে সাত সন্তানের বাপ ছেদিলালের জিনিস টেস্ট হ'তে চলে গেল। তারই রিপোর্ট শিপ্রার বিছানায়। সেই রিপোর্টেই শিপ্রা এখন শরতের মেঘকাটা সূর্য।

কতদিন উড়ে বেরিয়েছিল শিপ্রা? ছ'মাস? একবছর? রঞ্জনের ছশ' বাষট্টি স্কোয়ার ফুটে আলো মুছে গিয়ে অন্ধকার গেড়ে বসতে ওই রকমই সময় লেগেছিল, রঞ্জনের মনে পড়ে।

বিয়ে-অন্নপ্রাশন-পৈতে -শ্রাদ্ধ। যাওয়া ছেড়ে দিল শিপ্রা। পুরনো বন্ধু, আত্মীয়স্বজন-বিশেষতঃ বয়স্কা মহিলা, — ছেঁটে ফেলল সম্পর্ক। রঞ্জনের সঙ্গেও সম্পর্কটার মাংসটাংস

খসে গিয়ে হাড়-চামড়াটুকু পড়ে রইল। প্রাত্যহিকতাটা থাকল। নমাসে ছ'মাসে শরীর। মনটা তুলে নিল শিপ্রা।

তার আর একটা কারণ, অমোঘ কার্যকারণ, অবশ্যই রঞ্জন। রঞ্জনের তখন খেলাটা শুরু হয়েছে। নেশা। শিপ্রা, এসব ক্ষেত্রে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কাজ করে নিশ্চয়ই, ধরতে পারছিল। গুটিয়ে গেল। রঞ্জনও হাতটা বাড়িয়ে দিল না।

শিপ্রা অবশ্য আশ্রয় খুঁজে নিল। ভগবান। ঈশ্বরেরা। অনেক, অজস্র, অসংখ্য। বারুইপুর থেকে উলুবেড়িয়া। যেখানে যে বলেছে। সিদ্ধি, সিঁদুর, টাকা, দুধ, আম, গাছে দড়ি বাঁধা পর্যন্ত। চাইলে বুকের রক্তও চিরে দিত। রঞ্জনের মাঝে মাঝে অবাক লাগত। ভয়। এ কী পাগলামি? কত নিঃসন্তান দম্পতি আরামসে রয়েছে। চাইলে অ্যাডপ্ট ও করা যায়! কথাটা একবার তুলেছিল। চোখ তুলে তাকিয়েছিল শিপ্রা। গলা শুকিয়ে গিয়েছিল রঞ্জনের। এই দৃষ্টি কোথা থেকে ধার করল শিপ্রা?

— ও তুমি বুঝবে না!

কথাটার আঁচ আগুনের হল্কার মত রঞ্জন অবধি এসেছিল। পালিয়ে বেঁচেছিল রঞ্জন। পালিয়েছে, কিন্তু বেঁচেছে কি?

গলা অবধি চাদরে ঢেকে শুয়েছিল তরু। ওইভাবেই উঠে বাথরুমে গেল। যাক। লজ্জা নারীর ভূষণ। খুলবে। সময় নেবে। অপেক্ষা করতে রাজি রঞ্জন।

সংসার। মাসের গোড়ায় টাকাটা ফেলে দেওযা। বাকি সবই শিপ্রা। তবে ইদানীং শিপ্রার এতটা সময় ঠাকুরঘর খেয়ে নিত যে মাঝে মাঝে দায়গুলো রঞ্জনের দিকে ধাওয়া করছিল। বাজার, কেরোসিন, গ্যাস, ইলেকট্রিক বিল। পরেশকে পেয়ে যে কী বাঁচা বেঁচেছে! বেকার ছেলে। মাধ্যমিক ফেল। বাবার কারখানা বন্ধ। এদিক ওদিক ধান্দা লাগিয়েছিল, হয়নি। দোকান করতে গেলেও মূলধন লাগে। কে যেন বুদ্ধি দিল। লেগে গেল। পাড়াব সবার হাতে চাঁদ। একদিন ইলেকট্রিক বিল দেওয়া মানে একটা সি. এল। গ্যাসের দু'দিন, তেমন তেমন হলে সাতদিনও লাগতে পারে। পরেশ সবার চোখের মণি। মাসে পঞ্চাশটা টাকা ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

বাথরুম থেকে বেরিযে রান্নাঘরে ঢুকেছে তরু। ঠুংঠাং আওয়াজ। চা বানাচ্ছে। আসছে। স্নান করেছে। ক্লেদমুক্তি। সাবানের গন্ধ। আঁচল দিয়ে মুখ মুছল, হাসিটুকু বাঁচিয়ে। হাসিতে প্রশ্রয়, — শুধু বিস্কুট আছে, বউদিটা যা কিপটে! তোমার নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে!

— পেয়েছিল। আর নেই।

পিঠে আদরের চাঁটি মারে তরু। হাত দিয়ে জড়ায় রঞ্জন। — আর না, অনেক হয়েছে।

— বেশ, তোলা থাকল।

চা খাওয়া শেষ। বিস্কুট। সন্ধ্যোয় কাজেব মেয়েটা আসতে পারে খোঁজ নিতে। তাড়াতাড়ি বেড়াল পার করে তরু। রাস্তায় নেমে ওপরে তাকায় রঞ্জন। জানলায় তরু। হাত নাড়ে। পা দু'টো কত হালকা! দ্রুত রাস্তা পার হয়।

এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে না। আজ তো প্রশ্নই ওঠে না। আগে অ্যাকাডেমিতে নাটক দেখতে হ'লে সাতদিন আগে টিকিট কাটতে হত। আজকাল দিনের দিন পাওয়া যায়। হলে ঢুকল রঞ্জন।

কতদিন পর! ফাঁকা হল। স্টেজের ওপর অভিনেতারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঐতিহাসিক পটভূমি। সেই কাহিনী বর্তমানে এনে মিশিয়ে দেওয়া। একটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার আছে। ভালই।

বাইরে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল। প্রায় নটা। পৌঁছতে কম করে দশটা। রাত হলে খাবার ঢেকে শুয়ে পড়ে শিপ্রা। অসুবিধা নেই। বাইরে থেকে হাতগলিয়ে দরজার হুড়কোটা খোলা যায়। রাতে শোবার সময় তালা লাগিয়ে রাখে।

অবাক কাণ্ড। আলো জ্বলছে। এমন হয়েছে কদাচিৎ। শনি, শীতলা কিংবা সন্তোষী মার পুজো করছে শিপ্রা। বাড়ি ফিরে দেখেছে আলোটালো জ্বালা, ধুপধুনোর গন্ধ, প্রসাদ-সিন্নি। পরেশকে হাতজোড় করে বসে থাকতে দেখেছে। বড়জোর নটা অবধি। এই এত রাতে? দশটা দশে?

বাইরে থেকে হাত গলানোর আগেই ঝনাৎ করে দরজা খুলে গেল। শিপ্রা। শিপ্রা?

সেজেছে। খোঁপায় ফুল। গন্ধ। স্নান করেছে। গন্ধ। চোখ থেকে উঠে গিয়েছে সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ, বিষণ্ণতা। পুরনো শিপ্রা।

— কী ব্যাপার? বলেই ফেলল রঞ্জন।

চোখ দিয়ে হাসল শিপ্রা। — শিগগির হাতমুখ ধুয়ে রেডি হয়ে এসো। ভাত বাড়ছি।

বাথরুমে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে বালতি থেকে জল তুলে গায়ে ঢালতে ঢালতে আফশোষ করছিল রঞ্জন। ধুয়ে গেল। তরুর গন্ধ। শিপ্রা শুয়ে পড়লে বেশ খেয়ে দেয়ে সিগারেট টানতো বাইরে বসে বসে। তরুর গন্ধটা জড়িয়ে থাকত মধ্যরাত অবধি।

একী করেছে শিপ্রা? ইলিশ মাছ, চিংড়ির মালাইকারি। আজ কী ছিল? বিবাহবার্ষিকী? চেষ্টা করেও মনে করতে পারে না রঞ্জন।

— বললে না, ব্যাপারটা কী?

— খেয়ে নাও।

খেল রঞ্জন। খুবই উপাদেয় হয়েছিল রান্না। কিন্তু কেন যেন স্বাদ পাচ্ছে না রঞ্জন। যতবারই চোখ তুলে তাকায়, চোখাচোখি হয়। স্থির তাকিয়ে আছে শিপ্রা। সে চোখে কৌতুক। চোখে চোখ পড়তেই নামিয়ে নিল সঙ্গে সঙ্গে।

খেয়ে দেয়ে এসে বিছানায় আধশোয়া রঞ্জন। হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে শিপ্রাও ঘরে। বড় আলোটা জ্বালাল, আলমারি খুলে একটা খাম বের করে ছুঁড়ে দিল। রঞ্জন অবধি পৌঁছলো না। মাঝবরাবর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিছানায়।

— কী এটা?

— খোলোই না। প'ড়ে দ্যাখো।

একটা রিপোর্ট। প্যাথলজিক্যাল। কী সব লেখা, তারপর — পজিটিভ।

— বুঝতে পারলাম না।

এগিয়ে আসে শিপ্রা। শিপ্রার নিঃশ্বাস এসে লাগে রঞ্জনের মুখে। — ওটা আমার রিপোর্ট, ইউরিনের। পজিটিভ। তাকিয়ে থাকে রঞ্জন।

রঞ্জনের গলা জড়িয়ে ধরে শিপ্রা। কানে কানে ফিসফিস করে —

— তুমি একটা হাঁদারাম। কিছু বোঝ না। তুমি বাবা হচ্ছ গো, বাবা!

গ্রসন

বিনতা রায়চৌধুরী

খিদে আর খাওয়া। এই দুইয়ের সম্পর্কের মধ্যে আর অন্য কোন পরিপূরক নেই। এই দারুণ সত্যিটা অনেক ছোটবেলা থেকেই বুঝে গেছে তপাই। খিদের সময় সাত রাজ্যের সৌন্দর্য এনে দিলেও চলবে না, তখন উদরপূর্তির জিনিসটাই চাই।

তপাই যখন খুব ছোট ছিল, তখনকার কথা স্পষ্ট মনে অছে ওর। বুড়িমা 'রোজ' খাটতে যেত। তবে সব দিন কাজ জুটত না। তখন কয়েকদিনের জমানো দু-চার টুকরো খাবারে তপাইয়ের পেট ভরত না। সেই পাঁচ-ছ' বছর বয়সে খিদে পেলে খুব কাঁদত তপাই। বুড়িমাকে আঁচড়ে কামড়ে, চুলের মুঠি ধরে টেনে মাটিতে শুইয়ে দিত। বুড়ি রাগ করত না, ওকে ভোলাতে চেষ্টা করত। মজার মজার গল্প বলত — বড় হয়ে তপাই কত লেখাপড়া শিখবে! ঘোড়ায় চড়ে রাজার কাছে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব তপাই চুপ করে শুনত একটু, আবার কাঁদত। রাজা, দত্যি, দানো, কোন গল্পই তপাইয়ের ছোট পেটটাকে ভুলিয়ে রাখতে পারত না।

এ-রকমই একদিন তপাই কাঁদছিল, বুড়িমাকে মারছিল। সমানে একঘেয়ে ঘ্যানঘ্যানে সুরে বলে যাচ্ছিল — খেতে দে, খেতে দে। ওকে কিছুতেই ভোলাতে না পেরে বুড়ি হাত-পা নাড়িয়ে চোখ বড় বড় করে বলল — 'তপাই চুপ কর বাবা, তোকে কাল একটা সুন্দর নীল পাখি এনে দেব।' তপাই সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গিয়ে বুড়িমার থেকেও চোখ বড় বড় করে বলল — 'নীল পাখিটা আমি খেয়ে ফেলব বুড়িমা।'

এইরকম করে ঘস্‌টে ঘস্‌টে একটু বড় হয়ে গেল তপাই। বুড়িমার বড় সাধ, তপাই একুট লেখাপড়া শিখবে। স্বপ্ন কে না দেখে! বুড়িমা বহু কষ্ট করে ওকে কর্পোরেশন স্কুলে ভর্তি করে দিল। পয়সাকড়ি কিছু লাগবে না। তপাই রোজ স্কুলে যায়। কামাই হয় না একদিনও। বুড়ি প্রত্যেক দিন 'রোজ' খাটতে যায়। পয়সা আনে। রান্না করে। তপাই পড়ে নামতা, বর্ণপরিচয়। ঝুপড়ির মধ্যে আলো ঢোকে না, মাঝে মাঝে কুপি জ্বালে বুড়ি। কাজ হলেই আবার নিবিয়ে দেয়। তেলের অনেক খরচ। তপাই ঝুপড়ির বাইরে বসে পড়ে। বড় বড় বাড়িগুলো আর দোকানগুলো থেকে কত আলো এসে পড়ে রাস্তায়। তপাইয়ের কোন অসুবিধে হয় না।

এ পাড়া ও পাড়ার ঝুপড়ির ছেলেদের সঙ্গে তপাই মাঝে মাঝে খেলতে যায়। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই খেলার মাঝখানে ফিরে আসে ঝুপড়িতে। বন্ধুরা ডাকাডাকি করে কিন্তু ওর ভাল্লাগে না। ঝুপড়ির বাইরে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে কত কী ভাবে। এখন খিদে পেলে আর ছোটবেলার মত কাঁদে না। বুড়ির চুল ধরেও টানে না। টিনের বাক্সটা থেকে বই বার করে পড়ে কিংবা ছেঁড়া খাতায় অঙ্ক কষে। পড়াশোনার মধ্যে একটা নেশা পায় ও। কিন্তু খিদের মত বুনো জন্তুর আক্রমণে সব নেশাই কেটে যায়। সে-দিন বড্ড খিদে পাচ্ছিল

তপাইয়ের। পেটটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। কিচ্ছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ঝুপড়িতে হেলান দিয়ে বসে ও মনে মনে একটা খিদের নামতা বানায় — 'খিদে এক্কে খিদে, খিদে দু-গুণে খাবার নেই, তিন খিদে পেট খালি, চার খিদে খাবার খুঁজি, পাঁচ খিদে খাবার, ছয় খিদে খেতে বসি, সাত খিদে পেট ভরে না, আট খিদে খাই খাই, নয় খিদে এত্ত খাবার, দশ খিদে সব শেষ।' নামতাটা বানিয়ে নিজের মনেই একচোট হাসল তপাই। আবার বলল, আবার বলল। এত সুন্দর একটা নামতা বানাতে পেরে খুব খুশি হল। তাছাড়া খিদের সঙ্গে খাবারের যেমন ভাব, ওর সঙ্গেও তো ওই দুটো জিনিসের সে-রকম ভাব।

এরকমভাবে নিজের সঙ্গে খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল তপাই। বুড়ি এসে ডেবে তুলল। দু-মুঠো মুড়ি দিল ওকে কাগজের ঠোঙায়। তপাই হাত পেতে মুড়ি নিয়ে বলল — 'তোর নেই?'

—আছে। নিজের জন্য রাখা একমুঠো মুড়ি দেখাল বুড়ি। তপাই হাসল। মুড়ির ঠোঙাটা এ-হাত থেকে ও-হাতে নিল কয়েকবার। তারপর একটু একটু করে খেতে লাগল। গপ্‌গপ্ করে কখ্‌খনো খায় না ও। তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলেই আবার খেতে ইচ্ছে করবে। তাই একটু একটু করে অনেকক্ষণ ধরে খেয়ে খিদেটাকে শায়েস্তা করবে তপাই। তারপর পড়তে বসবে। বুড়িমা ততক্ষণে ভাত রাঁধবে। ভাতের গন্ধ খেতে খেতে তপাই পড়বে।

সেই বয়স থেকে অনেকগুলো পরিবর্তন এসেছিল তপাইয়ের। খিদে হজম করতে শিখেছিল, মনে মনে পদ্য বানাতে শিখেছিল, ছবি আঁকতে শিখেছিল, বুড়িটার জন্য নতুন করে মায়া হতে শুরু হয়েছিল। আর? ওর ঝুপড়ি থেকে ডানদিকে দূরে কোনার বাড়িটা থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে রোজ সকালে স্কুলে যেত। সেই দৃশ্যটা দেখার একটা ভীষণ নেশা শুরু হয়েছিল। মেয়েটা ওর থেকে অন্তত বছর চারেকের বড় হবে। পায়ে নিউকাট সাদা জুতো আর সাদা স্কার্ট-ব্লাউজ। চুলে বাঁধা সাদা ফিতে। খট্‌খট্ করে হেঁটে যেত। কী যে ভাল লাগত তপাইয়ের! ওর ঝুপড়ির সামনে দিয়ে কত দিন হেঁটে গেছে। চোখে চোখ পড়েছে কত দিন, তপাই লজ্জায় সিঁটিয়ে গিছে, কিন্তু মেয়েটার মুখের কোন ভাবান্তর হয়নি। হয়ত দেখেছে কিন্তু নজর করেনি। কী ফর্সা মেয়েটা। রোজ নিশ্চয়ই দুধ দিয়ে চান করে ও, ভাবত তপাই। তপাই মনে মনে মেয়েটার নাম রেখেছিল 'দুধসাগর'।

তপাইয়ের মনে হয়, ওদের যখন চোদ্দ-পনেরো বছর বয়স তখন থেকে ওর বন্ধুদের চেহারা বদলাতে শুরু করেছিল। ও তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারত না। অবশ্য এ নিয়ে কোন দুঃখ ছিল না ওর। ছোট থেকেই ও একা থাকতে ভালবাসত। সকালবেলায় একা একা তপাই একদিন বসেছিল ঝুপড়ির সামনে। এমন সময় ন্যাড়া, বুয়া, নান্টুরা এসে ওকে ডাকল — 'এই তপা, মিছিলে যাবি?'

'নাঃ।'

'কেন, চল্ না। খেতে দেবে। আমাদের আর অন্য কোন কাজ নেই। শুধু মিছিলের সঙ্গে যাওয়া, আর দু'চারটে কথা বলে চেঁচানো।'

'না, ধুস্, আমার ভাল্লাগে না। সেই তো অমুক জিন্দাবাদ আর তমুক জিন্দাবাদ। এই চিহ্নে ভোট দিন। যাদের নাম করে চেঁচাচ্ছিস, তাদের দেখিসওনি কোনও দিন চোখে।'

'দূর ওসব কিস্‌সু না। আমরা চেঁচাব আর ওরা আমাদের খাওয়াবে। ব্যস্, মিটে গেল। নগ্‌দা-নগ্‌দা।'

'না না, আমি মিছিলে-টিছিলে যাব না। এমনিতে খেতে দিক না!' মুখ ভেংচানোর মত ভঙ্গি করল তপা, তারপর বলল — 'আমি স্কুলে যাব।'

এখন মনে হয় সেই বয়সেই কত বড় হয়ে গেছিল তপাই। পেটে ঠিকঠাক খাবার না পড়লে কি তাড়াতাড়ি বয়স বেড়ে যায়? হবে হয়ত। তবে বয়স বাড়ুক আর না বাড়ুক, মিছিলে যেতে সত্যি ওর ভাল লাগে না। আরও বেশি খারাপ লাগে মিছিলের লোকগুলোকে।

পড়াশোনায় বড্ড মন ছিল তপার। ওর মত অবস্থার ছেলের পক্ষে যেন একটু বাড়াবাড়িই ছিল সেটা। কর্পোরেশন স্কুল থেকে অন্য একটা স্কুলে ভর্তিও হয়েছিল বহু চেষ্টা করে। মাইনে টাইনে সেখানেও দিতে হত না। চলছিল মোটামুটিভাবে। কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে গেল।

তখন তপাই সেভেনে উঠেছে। একদিন বুড়িমার বেমক্কা জ্বর এল, চলল কয়েকদিন ধরে। আস্তে আস্তে ঘরের খাবার সবই ফুরল। যে ক'টা টাকা হাতে ছিল, তাও গেল। বুড়ি তখন 'রোজ' খাটা ছাড়াও দু-একটা কাজ করে এখানে-ওখানে, পয়সা অল্পই পায়, তাও কামাই করলে সে-সব দরজা বন্ধ হয়ে যাবে, এই ভয় ছিল। চার দিনের দিন বুড়ি দেখল ঘরে খাবারও নেই, পয়সা নেই। অর্থাৎ বুড়িকে বেরোতেই হবে। অথচ শরীরটাকে খাড়া করে তোলার শক্তিও নেই। তবু বুড়ি ওঠার চেষ্টা করল। তপাই জিগ্যেস করল — 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'ঘরে কিছুই নেই রে তপা, তাছাড়া তিন-চার দিন হয়ে গেল। না বলে-কয়ে কামাই। আজ যেতে চেষ্টা করি।'

তপাই এগিয়ে গিয়ে বুড়ির গায়ে হাত দিল। বেশ জ্বর, গা-টা যেন কাঁপছে একটু একটু। কী হ'ল তপাইয়ের, চোখ পাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল — 'বিছানা থেকে উঠে বাইরে যাবি তো থান ইট দিয়ে তোর মাথা গুঁড়ো করে দেব।' চমকে গেল বুড়ি। তপার চোখে আগুন। টেনে বিছানায় শুইয়ে দিল বুড়িকে, ধমকে উঠল —'একদম শুয়ে থাকবি।' বুড়ি বারবার ঢোক গেলার চেষ্টা করে, গলায় কথা আটকায়, না কান্না, বুঝতে পারে না। বুড়ি তপার রাগ দেখে না, দেখে অন্য কিছু, যা খালি চোখে দেখা যায় না। বুড়ির চোখে জল উপছে পড়ে। হন্‌হন্‌ করে তপা বেরিয়ে যায়। বুড়ির মুখের ফাটা চামড়ার উপর দিয়ে ব্যথা গড়ায়। তপার গালাগালি চেখে চেখে বালিশে মুখ গুঁজে ফোঁপায়।

তপা ফেরে সন্ধের আগে। হাতে পাঁউরুটি, আর ভাঁড়ের চা। ঘরে ঢুকে বলে — 'কেমন আছিস বুড়িমা?' গলাটা বড় নরম শোনায় তপার। বুড়ি কোন কথা বলে না। তপা বলে — 'চা আর পাঁউরুটি খা। আর এই নে এই ক'টা টাকা তোর কাছে রাখ।' বুড়ি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তপা ভাবে, বুড়িমা বোধহয় রাগ করে আছে, বলে — 'সত্যি কি তোর মাথা ইট দিয়ে ভেঙে দিতাম নাকি!'

হো হো করে হাসে তপা — 'রাগ করে বলেছিলাম রে বুড়িমা।' হঠাৎ তপাকে অবাক করে দিয়ে বুড়ি হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে — 'তপা রে, তুই যদি আমার পেটের ছেলে হতিস, তাও.......'

'থাম তো', হেঁকে ওঠে তপাই, 'যার পেটের ছেলে সে তো মনের দুঃখে কেঁদেককিয়ে বেড়াচ্ছে আমার জন্য।' বুড়ি চোখের জল মোছে, বলে —'না রে তপা, হয়ত বেচারার আর কোন উপায় ছিল না। তবু নিজের....।'

'নিজের মা, নিজের বাপ, ওসব কিস্‌সু ভাবি না আমি। ফেলে দিয়ে গেছে, তুই তুলে এনেছিস, ব্যস্‌। তুই আমার বাপ-মা।' বুড়ির দিকে পাঁউরুটি আর চা এগিয়ে দেয় তপা। টাকা-পয়সাগুলো বুড়ির বালিশের তলায় গুঁজে রাখে। বুড়ি চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে বলে, 'টাকা কোথায় পেলি?'

'ভয় নেই, চুরি করিনি।'

বুড়ি মাথা নাড়ে —'না না, সে আমি জানি। তপা আমার সে-ছেলে নয়। সে লেখাপড়া করে, স্কুলে যায়।'

'যারা চুরি করে, তারা কোনদিন স্কুলে যায়নি, তা নয় রে বুড়িমা। তবে আমি চুরি করিনি। কী করেছি জানিস?'

'কী করেছিস?' বুড়ির মুখে কৌতূহল।

পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে বলে তপাই — 'একটা চক্ নিয়ে চলে গেছিলাম স্কুল পার হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে। সেখানে ফুটপাতের একটা পরিষ্কার জায়গায় বসে একটা ছবি আঁকলাম।

'ছবি আঁকলি, সে আবার কী?'

'হ্যাঁ ছবি আঁকলাম, একটা ছেলে হাত পেতে বসে আছে। ঠিক যেন আমি।'

'সে কী রে, লোকে পয়সা দিল?'

'দিল, ছবিটা আঁকা ভালই হয়েছিল। যেই হেঁটে যাচ্ছে, ছবিটা দেখছে, কেউ একটু হাসছেও, দু-দশ পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে।'

'তপা, তুই ভিক্ষে করলি? তোকে স্কুলে পড়ালাম...'

'ভিক্ষে কোথা? ছবিটা এঁকেছি, তাই জন্যই তো পয়সা পেয়েছি। এটা কি ভিক্ষে হল?'

বুড়ি আর কোন কথা বাড়াল না।

সেই থেকেই তপার পড়াশোনায় একটা ভাঁটা পড়ল। বুড়ি অবশ্য খুব বেশি দিন শুয়ে থাকেনি। তবু তপার পড়াশোনা আর বেশিদূর এগোল না। স্কুলের মাইনে দিতে না হলেও, বইখাতা কেনা দরকার। এতদিন চেয়েচিন্তে চালানো গেছে কিন্তু আর চলে না। এখানেই শেষ হয়ে গেল বুড়িমার স্বপ্ন আর তপার শখ। পড়াশোনা তপার মত ছেলের কাছে শখ ছাড়া আর কী? কিন্তু তারপর থেকে ও যেন কেমন পালটে যেতে থাকল। ঝুপড়িতে সারা দিন বসে থাকতেও ভাল লাগে না, আবাব বাইরে ঘুরতেও ভাল লাগে না। শুধু সকালের দিকটা ও ঝুপড়ির সামনে বসে থাকত। দুধসাগর স্কুলে যেত তখন। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়িটা থেকে বেরোত সাদা স্কার্ট, সাদা ফিতে, সাদা জুতো — খট্-খট্ খট্।

হঠাৎ তপা একদিন দেখল ওর দুধসাগর স্কার্ট পরেনি, ফিতে বাঁধেনি। একটা ঘন নীল রঙের শাড়ি পরে কাধে একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়িটা থেকে বার হল। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে ও-ধারের বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। তপাই অবাক হয়ে গেছিল, আর সেই দুধসাগর বলে মনে হচ্ছিল না তাকে। একেবারে বদলে গেছে, দারুণ সুন্দর লাগছে। তপার ইচ্ছে করছিল, ছুটে গিয়ে মাটিতে বসে নীল শাড়ির হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে। পারেনি, পারা যায়! সেই থেকে ওকে আর দুধসাগর বলে মনে মনে ডাকেনি তপাই। আর একটা নাম দিয়েছিল — রানীজি। তপা বুঝেছিল, স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকেছে রানীজি।

বুড়ি চেয়েছিল, তপা যখন কিছুই করছে না, পড়াশোনাও না, তখন একটা কাজ করুক। একদিন বলল, —'তপা, নাই যদি পড়বি, তাহলে একটা কাজ টাজ কিছু কর।'

'কী কাজ করব?'

'যা হোক, দু-একটা বাড়িতে আমি বলে দেখতে পারি। আমাকে এখানে অনেকে চেনে, হয়ে যেতে পারে।'

'চাকরের কাজ আমি করব না।'

'তাহলে অন্য কিছু কর, বসে থাকবি কেন?'

'যা তো, ভাল্লাগে না আমার।' তপা বুড়িকে তাড়া লাগায়।

সত্যি, কিছু ভাল লাগত না তপার। মাঝে মাঝে দু-একটা কাজ করেছে। কোনটাতেই মন লাগেনি। একটা কাজেও লেগে থাকতে পারেনি। অথচ বুড়ির খাটুনির পয়সায় বসে বসে খেতেও ভীষণ খারাপ লাগে।

ন্যাড়া, নান্টু, ব্রজ এখন একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। ওদেব হালচালই অন্যরকম। মোড়ের পার্টি অফিসে ওদের জমাটি আড্ডা। যখন তখন পোস্টার সাঁটছে, পার্টির চাঁদা তুলছে। মিছিল করছে। অমুকদা-তমুকদার সঙ্গে ওদের এখন ওঠাবসা। সেই ব্রজ ন্যাড়াদের আর চেনা যায না। ভাল জামা, ভাল প্যান্ট, চুলে টেরি। হাতে দামি সিগারেট। অবশ্য

ভোটের সময়। ওরা এখনো তপাইকে ডাকে। কিন্তু তপাইয়ের ভাল লাগে না। পার্টি অফিসে এক-একদিন গেছে, বিশ্রী লাগে ওর। দুর্বোধ্য সব আলোচনা, কিছুই বোঝে না। যেটুকু বোঝে খুব খারাপ লাগে। তাই আর যায় না।

ওর অবস্থার কথা জেনেই বোধহয় নান্টু ওকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল সেদিন। তপাই নেয়নি। কেন নেবে, সে কি ভিখারি? বড় হয়ে যাওয়ার পর রাস্তার ধারে বসে ছবি এঁকে পয়সা রোজগার করতেও বাধে তপাইয়ের। তবে ছবি আঁকতে ভাল লাগে বলেই বোধহয় একা একা কখনো কখনো ছবি আঁকে তপাই। আর সারা দিনের শত অকাজের মধ্যেও একবার যদি রানীজিকে দেখতে না পায় তাহলে খুব খারাপ লাগে। কোন দিন ও রানীজির সঙ্গে কথা বলেনি। চেষ্টাও করেনি। দূর থেকেই একবার দেবীদর্শনে তৃপ্ত ও। তবে সেই হাসিখুশি ঢেউখেলানো দুধসাগরের চকচকে চেহারার উপর একটা গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে দিয়েছে যেন কেউ। রানীজির গর্বিত ভঙ্গি, চারদিকে উপেক্ষার দৃষ্টি .. তপার কেমন একটা কষ্ট হয়।

এসব যাক। কিন্তু তপাইয়ের নিজের যে একটা কিছু করা খুব দরকার। বেকার বসে থাকতে থাকতে যেন ওর গায়ে পোকা কুটকুট করে। মেজাজটা আরও খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে।

বুড়িমার শরীর ভাল যাচ্ছে না বেশ কিছুদিন ধরে। রোজ ঠিকমত কাজে যেতে পারে না। আগের চেয়ে অনেক বেশি বয়স লাগে বুড়িমার। চিরকালই ওকে বুড়িমা বলে ডেকে এসছে তপাই, কিন্তু তখন সত্যি তেমন বুড়ি ছিল না। আজকাল বড্ড যেন বুড়িয়ে যাচ্ছে বুড়িমা। অসুখেও ভুগছে সমানে। তাই নিয়েই কাজ করে।

টাকা রোজগারের জন্য একটা কিছু করা দরকার ওর। কিন্তু কী করবে বুঝতে পারে না তপাই। এমনিতে এদের কাছে চাইলে এখুনি ওরা টাকা দেবে। তপাইয়ের খিটখিটে মেজাজ হলেও, ওর পেটের সামান্য ইংরেজী-জানা বিদ্যে, ওর সরলতা-সততার জন্য ওরা ওকে একটু সমীহ করেই চলে।

একদিন নান্টু আর ন্যাড়া এল তপাইয়ের কাছে। সঙ্গে আরও দুটো ছেলে — পল্টু আর গণেশ। এ পাড়ারই ছেলে সব। ন্যাড়া বলল —'একটা কথা বলতে এলাম তপাই, ক্ষেপে যাস না। পার্টির কথা বললেই তো তুই ক্ষেপে উঠিস।'

— 'মিছিলে যেতে হবে? ভোট এসে গেছে? লোক জুটছে না?'

— 'না না, সেসব নয়। শোন, ভোট এসে গেছে এটা সত্যি। আমরা দেয়ালে দেয়ালে আমাদের পার্টির ক্যানভাসিং স্লোগানও লিখে ফেলেছি। কিন্তু ভেবে দেখলাম নতুন পাড়ার কোন দেওয়ালে আমরা কিছু লিখিনি।'

'তো কী? লিখে ফ্যাল, দেরি করছিস কেন?'

'শোন না, নতুন পাড়াটা ওদের দখলে, মানে আমাদের বিরোধী দলের। ওখানে গিয়ে দেওয়ালে পোস্টার লিখতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। যাকে তাকে দিয়ে তো আর কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং লেখানো যায় না। এসব ব্যাপার অনেক 'ইমপ্রেশন ক্যারি' করে। আমরা যে ছেলেটাকে দিয়ে লেখাই তার সঙ্গে একটা ঝামেলা হয়েছে। তাছাড়া ঝামেলা না হলেও বেপাড়ায় গিয়ে ও পোস্টার লিখতে রাজি নয়। ওরা শাসিয়েছে, কেউ ওদের দেওয়ালে পোস্টার লিখলে পেটো ঝেড়ে উড়িয়ে দেবে।'

'তাহলে দরকার কী শত্রুপক্ষের ডেরায় গিয়ে দেওয়াল রঙ করার?'

'আঃ, এসব তুই বুঝবি না। এতে অনেক 'ইমপ্রেশন ক্যারি' করে।'

'ওরা তোদের 'ক্যারি' করার জন্য দেওয়াল ফাঁকা রেখে দিয়েছে নাকি?'

'আরে সেই জন্যই তো তোর কাছে আসা। আমরা দেখে এসেছি ও-পাড়ার একটা দেওয়াল এখনো পরিষ্কার রয়েছে। একটা আঁচড়ও পড়েনি। হয়তো শিগগিরই ওরা ওটাতে লিখে ফেলবে।'

'আমার কাছে কেন?'

'হ্যাঁ, তোর হাতের লেখা ভাল, আঁকতেও পারিস তুই। যদি তুই ওই দেওয়ালটায় আমাদের স্লোগান আর সিম্বলটা এঁকে লিখে দিস, খুব উপকার হয়। অবশ্য তার জন্য তোকে আমরা পারিশ্রমিক দেব। তোর ইচ্ছে মত।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল তপা, দেয়াল এঁকে পয়সা রোজগার, মন্দ কী? সে তো কোন পার্টি-ফার্টিতে যাচ্ছে না। এটা স্রেফ একটা কাজ।

'তুই ভাবিস না তপাই, তোকে আমরা গার্ড দেব। আশেপাশেই থাকব। তবে আমাদের তো চেনে — একেবারে ভিতরে যেতে পারব না। শুধু ন্যাপলা তোর রঙের বালতিটা নিয়ে যাবে।'

রাজি হয়ে গেল তপাই। কথা দিল, আজই রাতে যাবে। ওদের মতে একটু রাত করে যাওয়াই ভাল।

তপাই যখন নতুনপাড়ায় ঢুকল, তখন খাঁ খাঁ করছে পাড়াটা। একটু বুক ছমছম করল তপাইয়ের। এখন দিনকাল সুবিধের নয়। সব সময় কেমন একটা থমথমে ভাব। ভোটের দিন যত আসবে, এই চাপা উত্তেজনাটা ততই বাড়বে। নির্দিষ্ট দেওয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল দুজনে। তারপর ন্যাপলার হাত থেকে রঙের বালতি আর তুলি নিয়ে পাশে রাখল। চটিটা খুলে হাঁটু ভেঙে বসল।

আগে তুলে নিল ছোট তুলিটা।

আঁকতে আঁকতে একেবারে মগ্ন হয়ে গেছিল তপাই। কোনদিকেই ওর খেয়াল ছিল না। হঠাৎ একটা সিটি বাজল। তারপর আবার পর পর দুবার সিটি। ন্যাপলা ফিসফিস করে চিৎকার করে উঠল —'তপাই পালা।' বলেই ছুটল। কিছু না বুঝে তপাই প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। তারপর ন্যাপলার দেখাদেখি রঙ-তুলি ফেলে দৌড় লাগাল।

বু-ম্, শব্দ করে ফাটল বোমাটা। তপাইয়ের মনে হল ওর কোমরটা ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে গেল। মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ল দড়াম করে। তবু তাড়া-খাওযা জন্তুর মত পালানোর জন্য বুকে হাঁটতে চেষ্টা করল।

মধ্যরাতে পার্টির ঘরে জোড়া বেঞ্চিতে শুইয়ে ন্যাড়ারা ওর পিঠের থেকে অজস্র ধারায় বয়ে যাওয়া রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করছিল।

'একটু জল দে।' নিঃশ্বাস টেনে বলল তপাই। ব্রজ জল দিতে দিতে বলল, — 'আমরা ছাড়ব না তপা, আমরা এর বদলা নেব।'

—'চুপ কর, কিসের বদলা? আমি তোদের কেউ নই। পয়সা নিয়ে কাজ করতে গেছিলাম। খবরদার, আমি মরে গেলে আবার শহিদ-বেদি-ফেদি তুলিস না। তোরা তো রাস্তার পথচারী মরলেও তাকে পার্টির লোক বানিয়ে ফেলিস।'

হাঁফাচ্ছিল তপাই, শরীরটা কাঁপছিল থরথর করে। ন্যাড়া কাঁদতে কাঁদতে বলল — 'কেন তোকে ডাকলাম তপা, তুই তো কোন দিন এ সবের মধ্যে ছিলি না।'

'কাঁদিস না, বুড়িমাকে একটু দেখিস।'

শরীরটা কুঁচকে চুপ করে গেল তপাই। চোখ বন্ধ হয়ে গেল। সব অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগে তপাইয়ের চোখের সামনে একবার দুধসাগরের ছবিটা ভেসে উঠল। তারপর ছোটবেলার সেই খিদের নামতাটা মনে পড়ল — 'খিদে এক্কে খিদে, খিদে দু-গুণে খাবার নেই, তিন খিদে পেট খালি.....

তৃতীয় নয়ন

সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত

ভোররাতে আমার গোঁ-গোঁ চিৎকারে তোদের সেদিন ঘুম ভেঙে গেল। আমি ঠিক কী বলতে চাইছিলাম জানি না। বোধহয় তোদের কারও নাম ধরে ডাকতে চাইছিলাম। জুলু কিংবা বউমা, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দই বেরল না। মনে হল, রাতের অন্ধকারে একা সমুদ্রের জলে নেমে আমি ঢেউয়ের সঙ্গে লাট খাচ্ছি। ঢেউয়ের পর ঢেউ যেন পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে পাক খাওয়াচ্ছে আমাকে। অন্ধকারে ঝক-ঝক করছে সাদা ফেনা। পারে কেউ নেই। একটা নুলিয়াও না। আমি দু-হাতে বালি আঁকড়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঢেউ এসে আবার তুলে নিয়ে পাক খাওয়াচ্ছে আমাকে।

তোরা অবশ্য অনেকদিন আমাকে বলেছিস দরজায় খিল না দিয়ে শুতে। উনসত্তর বছর বয়স হল। টুক-টাক লেগেই আছে। আজ দাঁতের ব্যথা তো কাল বাতের ব্যথা। আজ প্রেশার তো কাল পেট গোলমাল। তোদের বাবা মারা গেছেন আজ সাত বছর হল। একা ঘরে শুই। কী দরকার আমার দরজা বন্ধ কববার? তবে ওই! যাকে বলে অভ্যেস। আমার মতো বুড়ির ক্ষেত্রে তোরা বলবি বদভ্যেস। ঠিকই তো! কী বিপদেই আমি ফেলেছিলাম তোদের সেদিন। বউমার পেটে বাচ্চা। সে তো কিছু করতেই পারবে না। তুই একাই দমাদ্দম দরজা পেটাতে লাগলি। পুরনো আমলের সাবেকি দরজা। ও ভাঙার হিম্মত তোর নেই। বেগতিক দেখে বউমাই বুদ্ধিটা দিল — 'করছ কী, আর দেরি কোরো না, শিগগির গিয়ে তিন তলা থেকে মামুকে ডেকে তোলো।'

ডাকতে অবশ্য হয়নি। বাদলের ঘুম বরাবরই খুব পাতলা। তোদের বাবা ঠাট্টা করে বলত, — 'ওয়াচ ডগ'। সেই ষোলো বছর বয়সে নিজের বাড়ি ছেড়ে তোদের বাবার ব্যবসায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ল একেবারে। এখন ও দোকানের ম্যানেজার আর বাড়ির কেয়ারটেকার। ও যে আমার দূরসম্পর্কের পিসতুতো ভাই সে কথা কবেই ভুলে গেছি। লুঙ্গি পরে, গেঞ্জি গায়ে হাওয়াই চটি ফট-ফট করতে করতে নেমে এসে বাদল বলল, — 'ওভাবে হবে না, টেনে দরজায় লাথি মার।' তুই তখন দমছুট। বাদল পরিস্থিতি বুঝে তোকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে বলল, — ' জুলু, তুই যা, ডাক্তার চৌধুরিকে এক্ষুনি ফোন কর।' বলতে-বলতেই দরজায় কষে দু-তিন লাথি। পঞ্চান্ন বছরেও গায়ে জোর ধরে বটে বাদলা। মড়াৎ করে ছিটকিনিটা ভেতর থেকে দুমড়ে গেল।

হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা। মাথার কাছে রাখা টুলটায় জলের জাগ আর গ্লাস। বউমার ধাক্কা লেগে খনখন শব্দ করে গ্লাসটা পড়ে গেল। বাদল চট করে বউমার কনুইটা ধরে ফেলে বলল, — 'সাবধান! বিপদের উপর বিপদ বাড়িও না।'

টুক করে বেড-সুইচটা টিপে আলো জ্বালিয়ে একটানে মশারি খুলে ফেলল বাদল। বউমাকে বলল, — 'পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দাও তো। ইস! এ যে ঘেমে জল! ম্যাসিভ অ্যাটাকই মনে হচ্ছে।' বউমা তখনও বুঝতে পারেনি। বলল, — 'স্বপ্ন টপ্ন দেখে বোবায়

ধরেছে নাকি মামু?' বাদল কথার উত্তর না দিয়ে তখন আমার চোখ টেনে ধরে ভেতরে
মণিটা দেখছে। দু-হাতে গালে দুটো আলতো চড় কষিয়ে ডাকল — 'শশীদিদি, ও শশীদিদি।'
আমি গোঁ-গোঁ করতে লাগলাম। মনে হল, বাদল না [illegible] নিশ্চয়ই নুলিয়া! আমাকে
বাঁচাবে। নুলিয়া খপ করে আমার ডান হাতটা তুলে বা[illegible] ওপর ফেলে দিল. বলল, —
'নাঃ এদিকটা ঠিকই আছে।' কিন্তু তারপরই বাঁ হাতটা আর তুলতে পারল না। সেটা খামচে
বালি ধরে আছে। কী তার জোর! ওটা যেন আমার হাতই নয়! অথচ কে কবে সমুদ্রের বালি
খামচে ধরে রাখতে পেরেছে বল? আমিও তো চাইছি নুলিয়ার হাতটা ধরতে। কিন্তু হাতটা
ক্রমশই চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছে। ওঃ মাগো! সে কী ভয় আমার! নুলিয়াটাও হাল ছেড়ে
দিল। ঠোঁট নেড়ে কী একটা যেন বলল। তখন বুঝিনি। এখন বুঝেছি। ও বলেছিল, —
'লেফট সাইড প্যারালাইজড'।

বউমা বেচারি শুনেই কাঁদতে শুরু করল। পেটে বাচ্চা থাকলে ওরকম হয়। যখন-তখন
শরীর আনচান করতে থাকে। বাদল ওকে ধরে ঘরের ভেতর চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। বাড়ি
কাঁপিয়ে হাঁক দিল — 'জুলু'। তুই এসে মাথা চুলকে বললি — 'ডাক্তার চৌধুরিকে তো
পাচ্ছি না। মনে হয় রাতে টেলিফোন নামিয়ে রাখেন।' বাদল বলল, — 'তাহলে ছাড় ওকে।
হসপিটালের ইমার্জেন্সিতে ফোন কর। বল্, অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে। আর সেটাও না পেলে
গাড়িটা বার কর। বডি পিছনের সিটে ফেলে চালিয়ে যাবি। আমি থাকব সঙ্গে। তোর মার
সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে।'

কাজের মেয়েটার জিম্মায় বউমাকে রেখে শেষটায় তোরাই গাড়ি চালিয়ে আমাকে নিয়ে
গেলি হাসপাতালে। বাদল লুঙ্গির ওপরেই একটা জামা চাপিয়ে নিল, আর তোর পরনে
ছাপ-চক্করওয়ালা রাত-পোশাক। যা দেখাচ্ছিল তোদের দুজনকে! হাসার অবস্থা থাকলে
হেসেই ফেলতাম। কিন্তু ততক্ষণ আমি নিথর হয়ে গেছি। বাদল আমার মাথাটা কোলের
ওপর রেখে পাল্স ধরে বসে আছে। রাস্তা তখনও শুনশান। তুই স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলি।
মাঝে-মাঝে বলছিলি, —'মামু? মা বেঁচে আছে তো? একদম চুপ করে গেল যে!'

এই শহরে আমাদের নাম আছে। তোদের বাবাকে সবাই এক ডাকে চিনত। বাদল প্রায়
বিদ্যুৎ গতিতে একটা কেবিন যোগাড় করে ফেলল। ডাক্তার এল, সঙ্গে নার্স, যন্ত্রপাতি।
ওষুধ বিষুধ, ইঞ্জেকশন। ততক্ষণে শ্বাসের কষ্ট শুরু হয়ে গিয়েছে আমার।

এরপর, যেমন হয়, ফোন-টোনের পালা। বাদলই তোকে বলল, — 'আগে নীলুকে
খবর দে। আজ রবিবার। বম্বেতে হাফ চার্জে মারতে পারবি।' তুই বললি — 'দাদা তো
অনেক সময় অফিসের ট্যুরে রোববারেও বাইরে থাকে, ফোনে যদি না পাই?' বাদল বলল,
— 'তাহলে তোর ভাবিজিকে জানিয়ে দিবি। দেরি করিস না। ব্যাপারটা আর্জেন্ট।'

ফোনে যথারীতি নীলুকে পাওয়া গেল না। ও গোয়া গেছে। বুধবারের আগে ফিরবে
না। আমার সিন্ধি বউমা ফোন ধরল। সব শুনে-টুনে ভাঙা গলায় বলল, — 'সোর্বোনাশ!'
এরপর আমার দুই মেয়ে আর দুই জামাইয়ের পালা। বড় মেয়ে মিলি বেহালায়, আর ছোট
মেয়ে কলি সোদপুরে। দুজনেই শুনে ফোঁচ-ফোঁচ করে কাঁদতে শুরু করল। বাদল চাঁছাছোলা
ভাষায় দুজনকেই ধমক দিয়ে বলল, — 'অ্যাই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ বন্ধ কর তো! এক্ষুনি জামাইকে
নিয়ে চলে আয়। এখানে জুলু একা। বউমার পেটে বাচ্চা। আমি একটা আধবুড়ো লোক,
কাঁদবার মেলা সময় পাবি। তোদের তো ঠিক নেই, এই কাঁদছিস, এই বলে বসবি, যাঁব কী
কঁরে মাঁমু, ছেঁলের পঁরীক্ষা।'

ওরা আসতে আসতে বেলা ভাটিয়ে বিকেল হয়ে গেল। রেলপথেও দুশো কিলোমিটার
দূর তো আর কম নয়। ততক্ষণে আমি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। অক্সিজেন সিলিন্ডার

দিয়েও শ্বাসকষ্ট এতটুকু কমানো যায়নি। তারপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কোত্থেকে এসে জুটেছে দলা-দলা কফ। নিম্নচাপের সময় আকাশে যেমন ঝাঁকে-ঝাঁকে মেঘ ভেসে আসে। তোদের নিচে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চৌকোনো লনটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছিস তোরা। বড় জামাই রমেশ আবার একটু বেশি ইংরিজি বলে। এসেই সবজান্তার মতো তোকে ডেকে এক পাশে নিয়ে বলল, — 'জুলু, বি স্টেডি। শি উইল বি অলরাইট। হাউ ইজ অজন্তা?' এরই মধ্যে বড় ডাক্তার বেরিয়ে আসছেন দেখে বাদল পেছন-পেছন দৌড় লাগাল। উনি মুখ না ফিরিয়েই গট-গট করে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন — 'বাড়ি চলে যান। এখানে ফর নাথিং বসে থেকে তো লাভ নেই কিছু। .... কী?.... না, না, বাহাত্তর ঘণ্টার আগে আমরা হোপ-টোপ কিছু দিতে পারব না।'

তোরা চলে এলি। ইনটেনসিভ কেয়ারে আমি পড়ে আছি। কিন্তু তখনও আমার নিজেকে একা-একা মনে হয়নি রে! আমার চারদিকে তখনও কত লোক! আমার শরীব বিদ্ধ করে কত যন্ত্রপাতি! সবাই মিলে আমার এই ঊনসত্তর বছরের জীবনটাকে টিকিয়ে রাখার কত চেষ্টা করছে! এক অসম যুদ্ধে এরা সবাই আমার সহযোদ্ধা। রাত দুটোর দিকে শ্বাসকষ্ট ধরে এল। পাম্প করে বুক থেকে তুলে ফেলা হয়েছে দলা-দলা কফ। ডাক্তারবা বলাবলি করছে — 'মহিলার হার্ট খুব স্ট্রং!' আঃ কী যে গর্ব হচ্ছে আমার তখন! আছে, আছে! আমার শরীরের যন্ত্রপাতির সবকটাই বিকল হয়নি তাহলে! ইউরিনে অবশ্য রক্ত আসছে তখনও।

পরদিন তোরা দল বেঁধে এলি, তখন সকাল ন'টা। তবে তোদের সঙ্গে বউমাকেও নিয়ে এলি কোন আক্কেলে? পোয়াতি মানুষকে কেউ এসব দৃশ্য দেখায়? তার মাত্র আধঘণ্টা আগে আমাকে কেবিনে ফেরত আনা হয়েছে। যন্ত্রপাতিরা অবশ্য ঘিরে রয়েছে আমাকে। যেন দাবার বোর্ডে বোড়েরা ব্যূহ তৈরি করে রেখেছে আর তাদের আড়ালে নিরাপদে পড়ে আছি আমি রাজা। তোরাও ঘিরে ধরলি আমাকে। আহা! বড় তৃপ্ত রে! ছেলে-বউ, মেয়ে-জামাই — সংসারী মানুষ যা যা চায় তার সবই তো আমার আছে। মিলি ঝুঁকে পড়ে দু'বার ডাকল — 'মা, ও মা, চোখ খোলো, তাকাও না, আমরা সবাই এসেছি।' আমার ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল সেই স্বর। আমার মনে হল, আমি সাড়া দিয়েছি। কিন্তু নার্সটা এসে বলল, 'খবর্দার! একদম মা মা করবেন না। এখনও ডিপ কোমা চলছে।' রমেশ আবার কী একটা মাথামুণ্ডু বলল ইংরিজিতে। বাদল এসে তোদের তাড়া দিয়ে বলল — 'চল্, তোদের নিচের ক্যান্টিন থেকে চা খাইয়ে আনি।'

হোক হাসপাতালের ক্যান্টিন, তবু ক্যান্টিন তো বটে। সেখানে মেজাজ একটু ঢিলেঢালা। রমেশ ফাঁক বুঝে ছোটশালী কলির কানে-কানে কী বলল। কলি ছদ্ম কোপে মুখ বাঁকিয়ে বলল — 'ইস্! বয়েই গেছে।' ওর বর স্বপনও হাসছিল। দেখতে-দেখতে হাসিটা ডিম-লাইটের মতো ছড়িয়ে পড়ল তোদের সবার ঠোঁটে। বাদল বলল — 'বাবাজিরা, চায়ের সঙ্গে একটু টা-ও হোক। দুটো করে সিঙাড়া দিতে বলি?'

চাটনি দিয়ে সিঙাড়া এল। তোরা তাতে সবে দু'এক কামড় দিয়েছিস কি না, ওপরে আমার হঠাৎ সারা শরীর মুচড়ে উঠল। ওঃ মাগো! চার-চারটে ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়েছি আমি শশিমুখী, এমন উৎকট বমির দমক কখনও কি সামলেছি? আমার সব ফৌজকে ঠেলে তিরের মতো সেই বমির দমকটা যে উঠে এল শরীরের কোন অন্ধকার কোণ থেকে! প্ল্যাটফর্ম কাঁপিয়ে একটা মেল-ট্রেন যেন চলে গেল, আর যেমন ধুলো-বালি কিংবা শুকনো পাতা উড়ে যায়, তেমনই আমার ভেতর থেকে ঝলকে-ঝলকে উঠে এল রক্ত! চাপ-চাপ, কালো-কালো! নার্সটা ভয় পেয়ে হট্টগোল তুলে দিল। তিন মিনিটের মধ্যে আমার পাশে

আবার ডাক্তারদের ফৌজ। তিরের বদলে পাল্টা তির। যেন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ চলছে। এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে ইঞ্জেকশন। কাজ হল। এর বাণ ওর বাণকে কেটে দিল। আঃ শান্তি! একজন ডাক্তার নার্সকে বলল — 'ছ'ঘন্টা পর পর দিয়ে যাবেন।'

তারপর থেকে বিকেল পর্যন্ত আমি ডাক্তারদের ভাষায় যাকে বলে 'স্টেডি'। তোরা আবার এলি দল বেঁধে। দু-চারবার মা মা করলি। বোধহয় কলিই হবে, মুখটা একেবারে আমার মুখের কাছে এনে বলল — 'বম্বে থেকে কল্পনা ভাবি ফোন করেছে মা। বিন্দিকে নিয়ে একাই আসছে কালকের ফ্লাইটে....বুঝলে?....ও মা, শুনছ? আমার চোখ দুটো তখন খোলা। কিন্তু চোখে ছানি পড়ল কবে? নাকি ছানি নয়, চাপ-চাপ কুয়াশা? কুয়াশার মধ্যে ভেসে-ওঠা অস্পষ্ট একটা মুখ। কতদূর থেকে কথা বলছে যে? কিঁ কিঁ করে একটা শব্দ হচ্ছে আমার কানে। — 'ডিপ কোমা, ডিপ কোমা, ডাকবেন না, ডাকবেন না।' — নার্সটা বলছে।

তবু ভাল। কষ্ট তো তেমন কিছু নেই। বাড়ি ফিরে তোরা সবাই একটু রিল্যাক্সড। জামাইরা কাল ফিরে যাবে। তবু মিলি আর কলি দুজনেই বাড়িতে তোদের বাচ্চাদুটোকে ফোন করলি। — 'হোমটাস্ক করেছ তো? টিউটর এসেছিলেন? দুপুরে ঠিকমতো খেয়েছিলে আম্মার কাছে?' এই সব টুকিটাকি। তখন টিভিতে খবর হচ্ছিল। তোরা এ চ্যানেল, সে চ্যানেল ঘুরিয়ে একটা সিনেমা দেখতে লাগলি। মার ছবি। মাঝে-মাঝেই হেসে উঠছিলি তোরা। এরই মধ্যে বাদল একবার ফোন করল হাসপাতালের আউটডোর থেকে। জুলু উঠে ধরলি। রমেশ কোণের সোফাটা থেকে বলল — 'ও কে?' তুই মাথা নাড়লি।

রাত বারোটার পর আবার মেঘেরা আসতে লাগল দল বেঁধে। তোরা তখন ঘুমে। দলা-দলা কফ আবার আমার টুঁটি চেপে ধরল। এই প্রথম দেখলাম, আমি একা। কেউ কোথাও নেই। রাতের নার্সটা কোথায় আড্ডা মারতে বেরিয়েছে। অক্সিজেন সিলিন্ডারটা আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একঠেঙে প্রহরীর মতো। হাঁ-হাঁ করে পাঁজর ফাটিয়ে শ্বাস নিতে লাগলাম আমি। নার্সটা বোধহয় কাছাকাছিই ছিল। একবার এসে সিলিন্ডারের প্রেশারটা বাড়িয়ে দিয়ে আবার কোথায় চলে গেল। আহা, বেচারি সিলিন্ডারটা! ওটার কী দোষ বল্? ওর খোলের ভেতর যতটুকু শ্বাস আছে সব উজাড় করে ঢেলে দিয়েও আমার শ্বাসের কষ্ট একটুও কমাতে পারল না। একা একা শুয়ে শ্বাসটানের খেলা দেখতে লাগলাম আমি। যেন একটা সার্কাস হচ্ছে। শুধু, একটাও দর্শক নেই।

ভোরের এক্সপ্রেস ট্রেনটায় জামাইরা চলে গেল। জুলু গাড়ি নিয়ে স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে এলি। সকাল ন'টায় আমার সিন্ধি বউমা এল। সঙ্গে নাতনি বিন্দি। ভোর চারটেয় দমদমে সে নেমেছে। বিন্দি আর ছোট বউমাকে বাড়িতে রেখে তোরা সবাই হাসপাতালে এলি। তখন আমার আর শ্বাসকষ্ট নেই, তবে শরীর কাঁপিয়ে মেল-ট্রেনটা আরও দুবার চলে গেছে। ঝলকে-ঝলকে উঠে এসেছে রক্ত। ইউরিনের সঙ্গে রক্ত অবশ্য বন্ধ। শুনে জুলু বলেছিল — 'যাক!' নার্সটা বলেছিল — 'যাক কী? পেচ্ছাপই তো বন্ধ! এবার পেট ফুলে উঠবে দেখুন না!' করিডরে তখন বাদল দৌড়চ্ছে বড় ডাক্তারের পিছন-পিছন, আর উনি ঘাড় নেড়ে বলছেন, 'নো হোপ, নো হোপ, অ্যাবসলিউটলি নো হোপ।'

বাড়ি ফিরে ঝিম মেরে বসে আছিস তোরা। অবশেষে মলি, হ্যাঁ মলিই প্রথম বলল — 'বড্ড কষ্ট পাচ্ছে মা, চলে যাওয়াই ভাল।' কলি বলল — 'ঠিকই। শেষটায় তো বোসবাবুর মতো অবস্থা হবে।' বোসবাবু এখানে ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন। তোদের বাবার অ্যাকাউন্ট ছিল সেখানে। এই সূত্রেই আলাপ, তারপর বন্ধুত্ব। আমাকে ডাকতেন, 'মহাশয়া' বলে। আমি বলতাম, 'বোসমশায়'। রিটায়ার করার পর হঠাৎই স্ট্রোক হয়ে বিছানায় পড়ে গেল মানুষটা। ডাক্তার-নার্সের কোনও ত্রুটি হয়নি। তবুও ঘরের পাশ দিয়ে হাঁটলে চামসে গন্ধ

পাওয়া যেত। নাক চেপে যাতায়াত করতে হত। বিছানা নোংরা পড়ে থাকত। এছাড়া ছিল বেড-সোর। রাতের নার্সটা হয়তো তখন টিভিতে 'বুনিয়াদ' দেখছে আমাদের সঙ্গে বসে। বোস-গিন্নিও আছেন। মাঝে-মাঝেই আমাকে বলতেন — 'এভাবে পড়ে থেকে লাভ কী বলুন তো দিদি? টাকা ঢেলে যদি সুরাহা হয়, তবে বুঝি!' আমিও বলেছি — 'সেই তো। এত কষ্ট! চলে যাওয়াই ভাল।'

তোদের বাবার কথাই ধর না। হার্ট অ্যাটাক হয়ে দশ দিন পড়েছিল মানুষটা। একবারও জ্ঞান ফিরল না। মুখ দিয়ে শুধু গ্যাঁজলা উঠত। খবর পেয়ে নীলু এল বম্বে থেকে। ও তখনও এত বড় পোস্টে ওঠেনি। কল্পনার সঙ্গে প্রেম চলছে। তিন-চারদিন যেতে-না-যেতেই উসখুস। তোকে বলল, — 'সাহেবি ফার্মের ঝামেলা কী জানিস, ওরা অসুখ-বিসুখ বুঝতে চায় না, এক যদি একটা কিছু হয়ে যায় তবে.....।' দু-তিনদিনের মধ্যেই বাড়িতে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠে গেল। — 'সেই তো। এভাবে পড়ে থেকে কী লাভ? একটা কিছু যদি হয়ে যায় তো...।' শেষটায় তো আমি সেই সুরে সুর মিলিয়েছিলাম। তোদের বাবা হয়তো মুখে বলতে পারেনি, কিন্তু মনে-মনে কি আর বোঝেনি? বলতে পারলে হয়তো বলত, —'শশী, তুমিও?' — 'চলে যাওয়াই ভাল।' কতবার কতজনকে বলেছি। এমনকী তোর বাবাকেও। অথচ, বোসমশায় কিংবা তোর বাবা, এদেরও মনে যে বাঁচবার ইচ্ছে ছিল সেটা আমরা কে কবে বোঝবার চেষ্টা করেছি বল?

এই তো দ্যাখ্ না, ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দিয়েছে, তোরাও টেনশন সহ্য করতে পারছিস না, অথচ এখনও কেমন নির্লজ্জের মতো হাঁ-হাঁ করে বাতাস টানতে-টানতে বেঁচে থাকছি? সমুদ্রের জল হিড় হিড় করে আমার পা ধরে টানছে, তবুও মরিয়া হয়ে খামচে বালি আঁকড়ে রয়েছি। এত কষ্ট করে দম না টেনে দু-সেকেণ্ড দমটা বন্ধ করে রাখলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তবুও পারছি কি বল্? কলি বলছে — 'এরপর একটা গ্যাদা বাচ্চা নিয়ে অক্তস্তা এই স্ট্রোকের রুগী সামলাবে কী করে? যতই নার্স রাখিস না জুলু, বাই চান্স যদি মা বেঁচে ওঠে, বাড়ির লোকের হুজ্জুত কিছু কম হবে না।' সিন্ধি বউমা বলছে — 'তাছাড়া এক্সপেনসিভও হোবে। কিওর তো হোবে না'। তবু দ্যাখ, কী রকম দুর্মতি আমার। আমি তোর মুখের দিকে চাইলাম। জুলু। তুই আমার সবচেয়ে ছোট ছেলে। তোর বাবা বলত — 'জুলুকে কিন্তু তুমি একটু বেশি ভালবাস।' আমি কোনও দিন স্বীকার করিনি। সত্যি কথাটা কে কবে স্বীকার করেছে বল্? তুই আমার একটু বেশি বয়সের সন্তান। তোর জন্মের সময় টিটেনাস হয়ে মরতে-মরতে বেঁচে উঠি। হয়তো সেইজন্যই....

সেদিন রাতে বউমা তোকে বলল, — 'ছোড়দিভাই যা বলছিল....সত্যি....এরপরে কী হবে বলো তো?' তুই প্রথমে বললি 'হুঁ।' তার পর পাশ ফিরে শুতে-শুতে একটা হাই তুললি। শহরের চার্চের ঘড়িতে তখন রাত বারোটার ঘণ্টি পড়ছে। এক-দুই-তিন। তবু তারই মধ্যে আমি কান পেতে রইলাম। আর সেই ঘণ্টাধ্বনির মধ্যেই স্পষ্ট শুনলাম, তুই বললি — 'সত্যিই মার এখন চলে যাওয়াই ভাল'।

কথাটা প্রতিধ্বনিত হল। ঘণ্টার শব্দের মতো। ডাক্তাররা বলল। নার্স বলল। তারপরেও সমস্বরে আরও কারা বলল। আমার হার্ট। আমার লাংস। আমার কিডনি। সবাই বলল। এক এক করে সবাই হাত ছেড়ে দিল আমার। শেষ-রাতে যন্ত্রপাতি প্রায় সব খুলে নিয়ে ডাক্তাররা নাঙ্গা, বিবস্ত্র করে ফেলে রাখল আমাকে। ভিজিটিং আওয়ারের আগেই তোদের ফোন করে ডাকা হল। বাদল কোথা থেকে একটা গীতা যোগাড় করে এনেছে। আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে পাঠ করতে লাগল। তোরা কাঁদছিলি। কাঁদবিই তো। কষ্ট কি আর তোদের হচ্ছে

না? তবে আমারও বোধ হচ্ছে, লজ্জা হচ্ছে। বুঝছি, আর বেঁচে ওঠা ভাল দেখায না। রাত ছাড়িয়ে শেষ স্টেশনে ঢোকার আগে মেল ট্রেনের গতি যেমন ঢিলে হযে যায়, তেমনই আমিও ঢিলে দিয়েছি যুদ্ধে। ইচ্ছে আর শক্তি কোনওটাই অবশিষ্ট নেই। দেখতে-দেখতে একটা অন্ধকাব সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল ট্রেনটা। নিশ্ছিদ্র, নিরন্ধ্র অন্ধকার। বাতাস ঢোকার ফুটোটি পর্যন্ত নেই।

চশমাটা খুলে গলাটা সামান্য ঝাড়ল বাদল। তারপর সাদা চাদরটা টেনে দিল আমার মাথা পর্যন্ত। মঞ্চে যেমন যবনিকা পড়ে। আমার নাটক শেষ, তোরা কাঁদছিলি।

রাস্তায় লাশ

শুভমানস ঘোষ

খুব ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল। ডাকাতে বৃষ্টি নয়, দুচার ফোঁটা। রাস্তাঘাটও ভাল করে ভেজেনি। চোখে লেপ্টে-থাকা ঘুম নিয়ে কাউকে উঠতে হয়নি জানালা বন্ধ করতে। কারুর ঘুমের দরজায় পাতলা চাদরের জন্য টোকা পড়েনি একবারও। কিন্তু এই সময় — এই প্রথম সকালে চাদর খুঁজতে হচ্ছে মণিদীপাকে। এই এক হয়েছে! মণিদীপা ভাবছিলেন। এই ঠাণ্ডা, এই গরম। বৃষ্টিটাও যেন ক্ষেপে গিয়েছে। বিনা নোটিশে দুমদাম এসে পড়ছে। শীতকালকেও রেয়াত করা নেই। সারা শীতকাল জ্বালিয়েছে, আর এখন এই গরমে তার হয়েছে পোয়া বারো। মস্তান গুণ্ডাদের হার মানায়। চৈত্রের শেষ থেকে সেই যে কালবৈশাখীর টুঁটি চেপে ধরেছে, ছাড়ার নাম নেই। তবে মধ্যে মধ্যে একটু টিপুনি আলগা করে বটে। কিন্তু সে-ও স্রেফ মজার খেলা তার কাছে। ফাঁক পেয়ে কালবৈশাখী সবে একটু ধুলো উড়িয়েছে অমনি মাথার উপর বৃষ্টির থাবা। যেন বেড়াল ইঁদুর ধরেছে।

এই রকম হচ্ছে কেন? চাদর দিয়ে মণিদীপা শরীর ঢাকছিলেন। একদিন কামাই গিয়েছে বৃষ্টির, দত্যিদানোর মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে গরম। সারাটা দিন টগবগে গরমে ভাজা ভাজা হয়ে যেতে হাবে। তার পরেই বৃষ্টি। নাও চাদর চড়াও গায়ে। এই রকম হবে কেন? প্রকৃতির মধ্যেকার মিলমিশের সুতোগুলো ছিঁড়ে গিয়েছে সব?

সাতটা পাঁচ। সুধাময় উঠে পড়েছিলেন। জানালার দিকে পিঠ করে বসে আছেন। খবরের কাগজে মুখ ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। শুধু চকচকে ফর্সা টাকটা দেখা যাচ্ছিল। উল্টো দিকের চেয়ারে মিলি। তাঁদের একমাত্র সন্তান। সামনের বার মাধ্যমিক দেবে।

বেশি সময় ছিল না। তবু তার মধ্যে মণিদীপা এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন বাইরেটা। রোদ্দুরে কাঁচা সোনা। ছোঁয়ার অপেক্ষা, হাতে উঠে আসবে রঙ। মানে হয়? মণিদীপার মনে হল। আরও মনে হল, এক্ষুনি যদি ঘোর করে আসে মেঘ তখন সমস্ত রঙ মাটি।

গলা চড়িয়ে মণিদীপা কাজের মেয়েটাকে ব্রেকফাস্ট দিতে বললেন। খরমর করে উঠল কাগজ। আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন সুধাময়। আকারে ছোট কিন্তু পরিচ্ছন্ন গোল মুখ। হাই পাওয়ার চশমার মধ্য দিয়ে বিন্দু হয়ে যাওয়া তীক্ষ্ণ দুই চোখে বুদ্ধির আভা। হাসছিলেন। কাগজের ভাঁজ মেলানোর ফাঁকে যেন চাঞ্চল্যকর কোনও খবর শোনালেন, ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিল টের পেয়েছিলে?

মণিদীপা মাথা নাড়লেন। গলা তুলে হাঁক দিলেন ফের, শঙ্করী!

— বৃষ্টি হয়েছিল! কোথায়! মিলি বলল। অবাক হয়েছে।

সুধাময় তখনও কাগজ গোছাচ্ছেন। বললেন, হ্যাঁরে, খুব ভোরের দিকে। স্লাইট। ঘুমচ্ছিলিস, জানতে পারিসনি।

ব্রেকফাস্ট এসে গিয়েছে। মণিদীপার জন্যে শুধু চা, বড় বড় চুমুক দিচ্ছিলেন। দ্রুত একবার দেখে নিলেন বারান্দার দেওয়াল ঘড়ি। তার পর সুধাময়ের হাতেব কাগজটা। না,

মণিদীপার আজ কাগজ নেড়েচেড়ে দেখার সময় নেই। দশটা পাঁচে ক্লাস। নটার মধ্যে বেরোতে হবে। অন্যদিনে সুধাময় আর মেয়ের সঙ্গে ব্রেকফাস্টের টেবিলে কিছু সময় দিতে পারেন। ওই সময় সুধাময়ের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে নেন। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, বা বধূহত্যা-টত্যা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে মন্তব্য চালাচালি করেন। মিলিও যোগ দেয় তাতে। তবে ওর কথায় মন্তব্যের চেয়ে বেশি থাকে প্রশ্ন। খুব বেশি প্রশ্ন হলে মণিদীপা উত্তর দিতে চান না। চেয়ার ঠেলে উঠে পড়তে পড়তে বলেন, বাকিটা বাবার কাছ থেকে জেনে নাও। আমায় বেরোতে হবে।

এই সময় সুধাময় অস্বস্তিতে পড়েন। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি অজ্ঞ এমন নয়। তবু এ নিয়ে কথা বলা মানে ভেতরে সিদ্ধান্তের পাকা ভিত চাই। যারা রাজনীতির মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তাদের পক্ষে এটা সুবিধেজনক। যেমন মণিদীপা। ওর সাবজেক্ট পোলিটিক্যাল সায়েন্স। আর সুধাময়ের ইংরেজি। কাজেই মেয়ের প্রশ্নের উত্তর মণিদীপার কাছ থেকে আসুক এটা সুধাময় চাইতেই পারেন।

সুধাময়ের আজ তাড়া নেই। আড়াইটের পর সিন্ডিকেটের মিটিং আছে। বারোটা নাগাদ বেরোলেই চলবে। মণিদীপার যেমন আজ মঙ্গলবার, তেমনি তাঁর ব্যস্ততম দিন হল বৃহস্পতি। ওইদিন নিজের ক্লাশ ছাড়াও ভিসির ঘরে মিটিং এ্যাটেন করতে হয়। বিকেলে অন্য ইউনিভার্সিটির পার্টটাইম ক্লাশগুলো ওই দিনই। সারাদিন দম ফেলার সময় থাকে না। অবশ্য শনিবার বাদ দিলে সপ্তাহের পাঁচ দিন তাঁর অল্পবিস্তর একই অবস্থা। একের পর এক মিটিং, ক্লাশ আর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের নানা ঝক্কি ঝামেলায় উত্যক্ত হতে হয়। সে দিক দিয়ে আজ মঙ্গলবার অনেকটা ফ্রি।

এক কাপ চা আগেই হয়েছে। সুধাময় গলা তুলে কাজের মেয়েটাকে আর এক কাপ চা বলে দিলেন। তার পর চেয়ারে পিঠ দিয়ে কাগজের মধ্যে ঘাড় গুঁজে বসলেন। পড়াশোনা আছে। মিলি চলে গেল তার ঘরে।

মিনিট পাঁচ। বারান্দার দেওয়াল-ঘড়ির আওয়াজ থেমে গেল। চুরমার হয়ে গেল সকালের দীর্ঘসূত্রী মেজাজ। পাশবিক চিৎকারে আকাশ ফালা ফালা হয়ে গেল।

সুধাময় কাশ্মীরের অনেকটা ভেতর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলেন। অপহরণ, গোলাগুলি, খুনজখমের থকথকে লাল কাদায় যেন হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল তাঁর। তার সঙ্গে বাইরের চিৎকার এমনভাবে মিলে গেল সুধাময় তক্ষুনি ভাবতে পারলেন না, তাঁরই বাড়ির বাইরে কোনও ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। বীভৎস, ভয়ংকর।

চমক ভাঙল মিলির আর্তনাদে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসা আতঙ্ক নিয়ে সে ছুটে এসেছে। কাঁপছে ঠক ঠক করে। কাগজ ফেলে উঠে পড়লেন সুধাময়। চোখ থেকে সপাটে চশমা খুলে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হল? অমন করছিস কেন?

মিলি তখনও কাঁপছিল। ঠোঁট একেবারে শাদা। বাবার কাছ ঘেঁষে অস্ফুটে বলল, খুন।

— খুন!

সুধাময় ও মণিদীপা একসঙ্গে বলে উঠলেন। বাথরুম থেকে চান শেষ না করে বেরিয়ে এসেছিলেন মণিদীপা। বাইরের চিৎকার তাঁর কানেও পৌঁছেছিল।

মিলি কাঁপা কাঁপা গলায় কোনও রকমে বললে, কেষ্টদা .... অনেকগুলো ছেলে....খুন.....

সুধাময় দৌড়ে গেলেন পাশের ঘরে। টান মেরে খুলে ফেললেন জানালা। দু তিন সেকেণ্ড। সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেল তাঁর। মণিদীপাও তাঁর বাহু আঁকড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন।

ছজন যুবক। হাতে তাদের শোর্ড আর ভোজালি। কেষ্টর গলার ওপর কোপ মারছে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটছে। মাথা-কাটা মোরগের মতো কেষ্টর সারা শরীর ছটফটিয়ে উঠছিল। অশ্রাব্য ভাষায় ছেলেগুলো গালাগালি ছুড়ছিল। ওদের দেখে একেবারেই মানুষ বলে মনে হচ্ছিল না। পাশবিক জিঘাংসা পাক দিয়ে উঠছিল ওদের শরীরে।

সুধাময়ের মাথা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি বসে পড়লেন খাটের ওপর। গোটা ব্যাপারটা বায়োস্কোপের ছবির মতো লাগছিল তাঁর কাছে। অবচেতন চেতনের মাঝের সুঁড়িপথটা হারিয়ে গিয়েছে।

কিছু পরে ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে এল সুধাময়ের। ততক্ষণে খুনীরা চলে গিয়েছে। রাস্তার ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে কেষ্ট। ওর গলায় খাদের মতো মস্ত হাঁ। চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে রক্ত। লাল হয়ে যাওয়া মাটিতে মিশে যাচ্ছে। কেষ্ট মারা গিয়েছে।

—স্কাউন্ড্রেল্‌স্‌।

দাঁতে দাঁতে চেপে সুধাময় উচ্চারণ করলেন। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। মণিদীপা কিছু বলছিলেন তাঁকে। ঘুরে দাঁড়ালেন। বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছেন মণিদীপা। পাশে মিলি। ওদের চোখে ভয়। পেছনে উঁকি মারছে কাজের মেয়েটি। সুধাময় তাকাতে মণিদীপা ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, তুমি চলে এসো। বলে দ্রুত জানলার কাছে চলে গেলেন। চট করে একবার বাইরে তাকিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলেন।

অন্ধকার নেবে এল ঘরে। সুধাময় বিরক্ত হলেন। বললেন. জানলা বন্ধ করলে কেন?

মণিদীপা গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, তুমি কথা বলবে না। যাও কাগজ পড়ো গিয়ে।

সুধাময় জানেন তর্ক করে ফল নেই। বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। পাশের ঘরে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়ালেন হঠাৎ। ভারী উল্লেখযোগ্য একটা কথা মনে পড়ে গিয়েছে।

যে ছেলেটা আজ খুন হল সে তাঁরই ছাত্র ছিল এক সময়। সে বহুকাল আগের কথা। সুধাময় তখন সবে বি.এ পরীক্ষা দিয়েছেন। খুব টিউশ্যনি করতেন সে সময়। তখনই অল্প কয়েক মাস কেষ্টকে পড়িয়েছিলেন। আর তার ফল কী হল তা জানতে খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। বছর পাঁচেকের মধ্যে এ তল্লাটের সব চেয়ে কুখ্যাত গুণ্ডা হিসেবে সে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কোমরে ভোজালি নিয়ে প্রকাশ্যে তার চলাফেরা। বুকখোলা জামা। গলায় মা কালীর খাঁড়াওলা হার। মুখে জলন্ত সিগারেট। মাঝে মাঝে দলবল নিয়ে বেপাড়ায় গিয়ে মারপিট করে আসত। এই সময় প্রায়ই দেখা হয়ে যেত কেষ্টর সঙ্গে। সুধাময়কে দেখে সে সিগারেট ফেলে দিত। কপালে হাত ঠেকিয়ে ফিল্মি কায়দায় নমস্কার জানাত। বলত, ভাল আছেন মাস্টারমশাই?

সুধাময় হেসে ফেলতেন। বলতেন, তোরা যা শুরু করেছিস ভাল থাকা যায়?

উত্তরে কেষ্ট হিন্দিতে একটা কবিতা বলে উঠত। বাঁচতে গেলে লড়তে হবে — ওই জাতীয় কিছু।

সুধাময়ের ঠোঁটে হাসি। মনোযোগ দিয়ে দেখলে তাতে অনেকখানি তিক্ততা খুঁজে পাওয়া যাবে। মণিদীপা তীক্ষ্ণ চোখে সুধাময়কে দেখছিলেন। হাসি দেখে সপাটে প্রশ্ন ছুড়লেন, হাসছ যে?

ধরা পড়ে গিয়েছেন এমন অপ্রতিভ ভঙ্গিতে সুধাময় তাড়াতাড়ি বললেন, না না, হাসব কেন? বাইরে একজনকে কুপিয়ে মারা হল। আমরা কোথায় পৌঁছেছি — এই সব ভাবছিলাম।

মণিদীপার চোখে চশমা ছিল না। কাঁধে ভিজে টাওয়েল। চুল মুছতে মুছতে বললেন, ভেবে লাভ নেই। সবটা ভাগ্য বলে মেনে নাও। দেখবে আর ভাবতে হচ্ছে না।

সুধাময় জোরে শব্দ করে হেসে উঠলেন। চমৎকার বলেছেন মণিদীপা। ভবিতব্য। কথাটার মধ্যে নিরাপত্তার বেড়া দেওয়া তীক্ষ্ণ এক আধ্যাত্মিক আরাম আছে। দুর্দান্ত শীতের সকালে রোদ্দুরে পিঠ মেলে দেওয়ার মতো।

মিলির দিকে তাকালেন সুধাময়। ওর চোখে এখনও ভয়। জীবন সম্পর্কে কঠিন হতাশা আর তিক্ততার বোধও। মেয়ের মাথায় হাত ছুঁইয়ে অস্ফুটে বললেন, কী রে, ভয় পাচ্ছিস?

উত্তরে মিলি উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, যারা কেষ্টদাকে খুন করল তাদের সবাইকে চিনি বাপি।

মণিদীপা রেগে উঠলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, এ সব নিয়ে তুমি কথা বলবে না। বন্ধুদের সঙ্গেও আলোচনা করবে না।

ছেলেগুলোকে সকলেই চেনে। সুধাময়ও। মিলিদের স্কুলের সামনে এক চায়ের দোকানে ওদের আড্ডা। হাত-কাটা স্বপন ওরফে বেটুয়া ওদের নেতা। বোমা বানাতে গিয়ে ওর একটা হাত উড়ে গিয়েছিল। সুধাময় জানেন, কেষ্টর সঙ্গে বেটুয়ার হিস্যার লড়াই বহুদিনের। আজ সুযোগ পেয়ে বেটুয়া কেষ্টকে ছেঁটে দিল। আবার সুযোগ পেলে কাল কেষ্টর দলবল বেটুয়াদের কাউকে উড়িয়ে দেবে। এইভাবে ঘুরন্ত চাকার মতো তিনশো বছরের মহানগরীর বুকে একটার পর একটা লাশ পড়তে থাকবে। তখন ইউনিভার্সিটির আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন ড. সুধাময় চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর বিদুষী স্ত্রী জানালা এঁটে অন্ধকার ঘরে বসে ভবিতব্যের মালা জপবেন।

এই বার আর হাসি ঠেকানো গেল না। সশব্দে হাসলেন সুধাময়। হাসতে হাসতে বললেন, বাইরে খুন হচ্ছে, আমরা খরগোশের মতো কান দিয়ে চোখ ঢেকে ভাবছি, ভারী নিরাপদ আমরা। ট্র্যাজেডি!

মণিদীপার ভুরু কুঁচকে গেল। সুধাময়ের দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে বললেন, এটা খুব নতুন কোনও সমস্যা নয়। তোমার আগে হাজার হাজার বছর ধরে বহু শান্তিপ্রিয় মানুষকে এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

— শান্তিপ্রিয় মানুষ? সুধাময় যেন নড়েচড়ে দেখছেন কথাটা। কতটুকু ওজন-টজন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখে জমাট হয়ে উঠল বিরক্তি। শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল। মণিদীপার দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কথাটা এত বেশি ফ্লেক্সিবেল যে ওর ওপর ভরসা করা যায় না। মুখে শান্তির কথা বলব আবার বারুদও গরম রাখব — এই ইন্টারন্যাশানাল হিপোক্র্যাসি এত বেশি দেখছি যে ওই শান্তিপ্রিয় কথাটা আমার ডিকসনারির বাইরে করে দিয়েছি। আধ্যাত্মিক শান্তি কী জানি না, কিন্তু তথাকথিত শান্তি যদি কোথাও থাকে সে কবরখানায়। তাই শান্তিপ্রিয় বলতে আমি মৃত মানুষ ছাড়া আর কাউকে বুঝতে রাজি নই। তবে হ্যাঁ, আর এক ধরনের শান্তিবাদ আছে। আমাদের ভারতবর্ষই না কি তার আঁতুড়ঘর। ঠিক যেমন আমাদের জানলা খুলতে ভয় তেমনি অসহায় শান্তিবাদের প্রবক্তা হল আমাদের রাষ্ট্রনায়করা।

মণিদীপা রেগে গেলেন। কড়া চোখে সুধাময়ের দিকে চেয়ে শুধোলেন, এত কথার মানে? পরিষ্কার করে বলো কী বলতে চাও।

সুধাময় শীতল হয়ে গেলেন হঠাৎই। নিস্পৃহ স্বরে বললেন, কিছু না, কিছু না।

—নিশ্চয়ই কিছু। আমি জানতে চাইছি।

— কী হবে জেনে। যদি কিছু করা যেত তবেই ফল হত বলে।

— কী করবে তুমি? ছেলে-পড়ানো ছেড়ে ময়দানে নেবে পড়বে না কি?

— যাহ্! কী যে বলো। তবে ব্যাপারটা কল্পনা করতে মন্দ লাগে না।

— ও। তাই বলো। তুমি চাইছ আমরা মস্তানদের টিট করতে রাতারাতি রাস্তায় নেবে পড়ি। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া?

হাসিতে মাখামাখি হয়ে গেল মণিদীপার শেষ কথাগুলো। তখনই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন সুধাময়। চাবুকের মতো ছুটে এল তাঁর জবাব, আইন হাতে তুলব বলিনি। আমার এটাই শুধু বলার ছিল, যে ছেলেটাকে কুপিয়ে মারা হল তাকে এ্যাটলিস্ট রাস্তা থেকে তুলে হাসপাতালে পাঠানো হোক।

—পাগলের মতো কথা বোল না। মণিদীপা বললেন, তুমি ওকে হাসপাতালে পাঠাবে, তার পর হাসপাতালে যেতে হবে তোমাকেই।

সুধাময় উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, তাই বলে ছেলেটার ডেডবডি পড়ে থাকবে রাস্তায়? আমরা শান্তিপ্রিয় নাগরিক সামনে মড়া নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে স্যান্ডুইচ গিলব? পশুদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ রইল কই?

মণিদীপার চোখে অস্বাভাবিক এক আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। সুধাময়ের কথাগুলো আঁচ উঠে যাওয়া জ্বলন্ত উনুনের মতো পুড়িয়ে দিয়েছিল ওঁকে। কিন্তু সুধাময়কে সমর্থন করে কোনও কথা মুখে এল না। দু-চোখে একরাশ কঠিন যন্ত্রণা নিয়ে চেয়ে রইলেন অন্যদিকে।

এই সময় বাইরে থেকে ভেসে এল তুমুল স্লোগানের শব্দ। মণিদীপাকে বাধা দেওয়ার সুযোগ না দিয়ে এগিয়ে গিয়ে সুধাময় জানালা খুলে ফেললেন। তার পর অবাক গলায় উচ্চারণ করলেন, স্ট্রেঞ্জ!

জানালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মণিদীপা আর মিলি। বড় বড় চোখে তারা দেখছিল ব্যানার, ফেস্টুন, ঝাণ্ডা উঁচিয়ে প্রচন্ড স্লোগান তুলে তেরঙার দল পৌঁছে গিয়েছে ঘটনাস্থলে। প্রকাণ্ড একটা ঝাণ্ডা দিয়ে কেষ্টর দেহ ঢেকে দেওয়া হয়েছে। মুহুর্মুহু গর্জন উঠছে, যুবনেতা কেষ্ট মিত্রকে মারল কে।

— লাল গুণ্ডা আবার কে।

ওই গুণ্ডাদের চিনে নিন।

— এই মাটিতে কবর দিন।

এই সময় সুধাময় চশমার প্রয়োজন অনুভব করলেন। ডাইনিং টেবিলে ফেলে এসেছিলেন। তাড়াতাড়ি এনে চোখ ঢাকলেন। বাইরে তাকিয়ে অবাক গলায় বললেন, সে কী — কেষ্ট আবার যুবনেতা হল কবে?

মণিদীপা কথা বললেন না। একদৃষ্টে দেখছিলেন বাইরে। বললেন, মস্তানরা যখন বেঁচে থাকে তখন সব দলই ওদের ব্যবহার করে। তবে তখন নিজের লোক বলে দাবি করে না। মরলেই করে।

সুধাময় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। নাকের নিচে চশমা ঠেলে দিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর বলেছ মণি। যে কোনও মৃত্যুই বড় পবিত্র জিনিষ। ওটাকে মূলধন করার সুবিধে হচ্ছে এক পয়সাও সুদ দিতে হয় না।

সুধাময় হাসছিলেন। তা দেখে মণিদীপাও হেসে উঠলেন মাখনের ভেতর দিয়ে চলে গেল ছুরি। বাইরের নিষ্ঠুর ঘটনাটা এইমাত্র পোলিটিকাল ডাইমেনশ্যান পেয়ে গিয়েছে। ভেতরের দিকের কুরে-খাওয়া যন্ত্রণা সরল হয়ে গিয়েছে অনেক। তাই মণিদীপা এখন হাসতেই পারেন। এমনকি, এমন ভাবতেও বাধা নেই, বাইরে বেরিয়ে কেষ্টর মাছি-লাগা লাশটা দেখে এলে হয়।

ওদিকে সুধাময়েরও মনে হচ্ছিল, ঘটনার মোড় যখন ঘুরে গিয়েছে — মণিদীপাও হাসছে-টাসছে — গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে এক চক্কর দিয়ে আসবে কি না। আফটার অল, পাড়ায় তাঁদের আলাদা ডিগনিটি। সভা-টভা হলে সভাপতি হতে লোকে তাঁকেই ডাকে। এমনকি বিপদে-আপদে পরামর্শ নিতেও আসে। এই সময় বাইরে না যাওয়া খারাপ দেখায়। ওই তো হাঁপানি রোগী রাসবিহারীবাবু পৌঁছে গিয়েছেন। এ ছাড়া আরও অনেককে দেখতে পাচ্ছেন।

মণিদীপা রাজি ছিলেন না। কিন্তু সুধাময়কে আটকে রাখা গেল না। বিশেষ করে-যাবার সময় মণিদীপার 'তুমি আবার কী করবে' সুধাময়কে উত্তেজিত করে তুলল। এতটাই যে পাঞ্জাবি খুঁজে দেখার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন। গেঞ্জির ওপর পাতলা চাদর ফেলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

বাইরে তখন স্লোগানে আকাশ গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। কাজেই হাঁকডাক করে কর্তৃত্ব দেখাবেন চান্স পেলেন না। অগত্যা এগিয়ে গেলেন রাসবিহারীবাবুর দিকে। চেঁচিয়ে বললেন, দেখেছেন কাণ্ড! এক ঘণ্টা হতে চলল। এখনও পুলিশ এল না। ওয়ার্থলেশ!

রাসবিহারীবাবু তাকালেন। শূন্য দৃষ্টি। ভাবতেই মাথায় বিদ্যুতের চমক। রাসবিহারীবাবু কেষ্টর কাকা। আপন কাকা। অবশ্য কেষ্ট কাকা-ফাকার ধার ধারত না। বেশ কিছুকাল আগের কথা। দলবল নিয়ে কাকাকে লুঠ করে কেষ্ট নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতিয়েছিল। তারপর থেকে কাকা-ভাইপোয় মুখ-দেখাদেখি ছিল না।

কাজেই সান্ত্বনা দেওয়া দরকার রাসবিহারীবাবুকে। মুশকিল হয়েছে, সান্ত্বনার ভাষাটা বড় টাফ। বড্ড ইংরেজি শব্দ এসে পড়ে। বার তিনেক থামতে হল। যথাসাধ্য বাংলায় কয়েকটা কথা বললেন। কিন্তু বলছেন কাকে? তাঁর কানে ঢুকলে তো? অহংয়ের ওপর ঠং করে ইটের টুকরো এসে লাগল। নেহাতই অযৌক্তিক, মনে মনে ইডিয়েট বলে সুধাময় সরে এলেন।

আকাশে ঘুষি মারার ধূম পড়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবি আর চুড়িদার-পরা এক মাংসল ভদ্রলোক লিড দিচ্ছিল স্লোগানের। কীভাবে এ যুবনেতা হয়, কে জানে! লেকচার প্লাটফর্মের দিকে যাওয়ার মতো সুধাময় এগিয়ে গেলেন। নিপাট আত্মবিশ্বাসে মাখামাখি দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব। দাঁড়িয়ে পড়ে অধ্যাপকসুলভ অ্যাকাডেমিক মেজাজে বললেন, এক মিনিট।

বেশ গলা তুলে বলতে হল কথাটা। স্লোগান থেমে গেল। সুধাময় দেখছিল তথাকথিত যুবনেতাকে। চুলে পাক ধরে গিয়েছে। জোয়ার চলে যাবার পর হা হা পলিমাটির আঁকিবুঁকি মুখে। একটু যেন ট্যারা না? এই লোকটার সঙ্গে কথা বলতে হবে? তবু বলতেই হল, কী ভাবছেন আপনারা? ডেডবডি রাস্তায় পড়ে থাকবে? আপনাদের পুলিশ ফোর্স তো এখনও দয়া করে এসে পৌঁছুলেন না।

রীতিমতো কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। অজস্র ছাত্রছাত্রী একবার শুনলে বলে দেবে এস.সি.-র গলা। কিন্তু যুবনেতা একটুও টসকাল না। ইঞ্জিনের কপালের গর্ত থেকে ধুলোওড়া আলোর পাইথন বেরিয়ে পড়ল। তার সামনে উলঙ্গ সুধাময়। অসহায়ের মতো তাঁকে শুনতে হল যুবনেতার মন্তব্যগুলো, তাতে আপনার কী ইয়েটা ছিঁড়ছে মশাই। পুলিশ কি আমার শ্বশুর খোঁজ রাখব? যান্ যান্ পাতলা হোন। যত্তসব ফর নাথিং ঝঞ্ঝাট।

ফের সবেগে স্লোগান চালু হয়ে গেল। কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছিল সুধাময়ের। লাল হয়ে গিয়েছে গাল। টাল সামলাতে পারছেন না। সারা শরীরে সর সর করে চলতে শুরু করেছে স্নায়ুকীটেরা। কষ্ট হচ্ছিল, তবু ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে নিলেন নিজের জানালায়।

দূরত্বটা যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই শুনতে পায়নি ওরা? পরক্ষণে বিদ্যুতের চমক। যুবনেতার গলার ভলিউম বড় কম ছিল না। স্লোগানও থেমে গিয়েছিল তখন।

ফিরে যাবেন? কেউ চাইছে না তাঁকে। বাইরে দুর্যোগ, বেরিয়ে এলেন। কিন্তু একজনও নেই তাঁর কাছে পরামর্শ চাইছে। ওই তো পাড়ার আরও সব সুধীজনেরা উপস্থিত আছে। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। এতক্ষণ তার একটা বড় নির্জীব উপাদান ছিল ডেডবডি। এইমাত্র তার সঙ্গে আর একটা ডিগনিফায়েড প্রাণী ইনক্লুডেড হল : অধ্যাপক ড. সুধাময় চ্যাটার্জী। এ বার মজাই আলাদা। হতাশা চুঁইয়ে পড়ছিল চোখ থেকে। তাকিয়ে ছিলেন দূরের জমায়েতের দিকে। আচ্ছা এমন তো হতে পারে, এই সব নোংরা খুনজখমের সঙ্গে সুধাময় জড়িয়ে পড়ুন চাইছে না তারা। ভাবামাত্র সুধাময় উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সকলেই তাঁর স্টেটাস আর ডিগনিটি বড় করে দেখছে। তাঁর মধ্যেকার সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই। কিন্তু কেন? তিনি পণ্ডিত বলে? লাখ মানুষের মিছিলে সামিল হয়ে সগর্বে বিশাল করে তুলছেন তাঁর সামাজিক দায় — এমন কখনও হতে পারে না? সবটাই ছবি? তা হলে এই যে তিনি শো-কেসে বসে পাড়ার মাথা উঁচু করার অবরুদ্ধ দায় বয়ে মরছেন — এও তো ছবি। তবে? কিছুতে হিসেব মিলছিল না।

এই সময় দ্রুত ঘটনার ক্লাইমেক্স ঘনিয়ে এল। পাল্টা স্লোগানের আওয়াজ শুনে সামনের দিকে চেয়ে সুধাময় চমকে উঠলেন। না, পুলিশ নয়। এসেছে লাল পার্টির বিশাল এক মিছিল। আগুনের মতো অজস্র ঝাণ্ডা হাওয়ায় পাল্টি খাচ্ছিল। তেরঙাদের তিনগুণ লোক এনেছে তারা। কয়েকজন এম.এল.এ. আর কাউন্সিলারও ছিল। এই সময় একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা দেখতে হল সুধাময়কে। মাথা ঘুরে গেল তাঁর — বেটুয়া! এই তো একটু আগে কেষ্টকে খুন করেছে। সকলেই দেখেছে। সেই বেটুয়া!

আর ভাবা গেল না। জমায়েত দর্শকরা সশব্দে পালাচ্ছে। দুমদাম ঝাঁপ পড়ে যাচ্ছে দোকানের। আশেপাশে বাড়ির জানালাগুলোও বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সুধাময় একা। হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে নতুন মিছিলের স্লোগান শুনে যাচ্ছিলেন :

সমাজবিরোধীদের আশ্রয় দিয়ে পাড়ার শান্তি নষ্ট করা চলবে না।

— চলবে না, চলবে না।

— সমাজবিরোধী কেষ্টাকে মারল কে?

— এই জনগণ আবার কে।

সমাজবিরোধীদের মদতদাতা দূর হঠো।

— দূর হঠো, দূর হঠো।

তেরঙাগুণ্ডারাজ নিপাত যাক্।

— নিপাত যাক্, নিপাত যাক্।

অপরপক্ষও চুপ করে রইল না। তারাও দ্বিগুণ তেজে চালু করে দিল স্লোগান। একটু একটু করে দু দলের মধ্যে ফাঁক কমে যাচ্ছে। মাঝখানে সুধাময়। প্রতিস্পর্ধী দু পক্ষকে দু পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন একা। আর কোনও ছবি নয়। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছিল তাঁর। চোখ দিয়ে ঠিকরে পড়ছিল আলো।

বোমা পড়ল। পর পর দুটো। গুলিও চলল আকাশের দিকে। এই বার চমকে উঠলেন সুধাময়। চেয়ালের জাঁতাকল খুলে গেল। আর তার পরেই তাঁর মগজে জেগে উঠল টেলিপ্রিন্টারের খট্‌খট্। মগজের পরিষ্কার বার্তা, পালাও। অনেক বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। সেই সঙ্গে ছোট ফুটনোট :

সোস্যাল রেসপন্সিবিলিটির মানে এই নয়, ফর নাথিং মরতে হবে।

ঝাঁকি দিয়ে উঠল সুধাময়ের সমস্ত শরীর। আর তখনই শুনলেন, দেখলেন, মণিদীপা আর মিলি তাঁকে ডাকছে। জানালায় অনেকখানি ঝুঁকে এসেছে তাদের শরীর। চটপট ফিরে আসার গলা-ফাটানো ডাক। সুধাময় জানেন সাড়া না দেবার অর্থ, এখনই হয়তো কাটা গাছের মতো মাটিতে শুয়ে পড়তে হবে। কেষ্টর পাশে আর একজনের রক্তাক্ত জায়গা তৈরি হয়ে যাবে।

পালিয়ে যাবেন? এক সেকেণ্ড। দু সেকেণ্ড। খট্ খট্ খট্। আবার চালু হয়ে গিয়েছে টেলিপ্রিন্টার। অবাক হয়ে গেলেন সুধাময়। এ খবরের সোর্সটা ধরতে পারলেন না একেবারে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতে লাগলেন বার্তা, পালিয়ে যাব? ওই মজা-দেখতে-আসা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের মতো? জীবনে কখনও এমন উলঙ্গভাবে পালাইনি। বহুবার অনেক বিপজ্জনক ঘটনার মুখে পড়েছি। প্রাণ যাবার ঝুঁকিও ছিল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে লড়ে গিয়েছি, পালাইনি। আর আজ কিনা কুকুরের মতো ল্যাজ দু পায়ের ফাঁকে গুঁজে পালাতে হবে? নো। নেভার।

দু পাশে বারুদের স্তূপ আর পেছনে স্ত্রী-কন্যার হাতছানি উপেক্ষা করে সুধাময় দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমশ পাহাড়ের মতো বিশাল হয়ে উঠছিলেন। বুকটা চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে ডাইনে-বাঁয়ে। দেখতে দেখতে সুধাময়ের পা দুটো চিনের প্রাচীরের মতো মস্ত লম্বা হয়ে উঠল। মাথা আকাশের মেঘ ফুঁড়ে ক্রমাগত উঠে যাচ্ছিল আরও ওপরে। এই বার তিনি পেয়ে গিয়েছেন ঈগলের চোখ। ঝুলনবাড়ি হয়ে যাওয়া নিচের পৃথিবীর সমস্ত কিছু দেখতে একটুও অসুবিধে হচ্ছিল না তাঁর। তিনি দেখছিলেন ভাগাড়ে মরে পড়ে আছে একটা গোরু। তাকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে একঝাঁক শকুন।

সমুদ্রের নিলয়

আফসার আমেদ

গহর আলি আলেয়ার স্বামী। আলেয়ার বয়স এখনো কাঁচা। বছর আঠার হবে। গহর আলি তার বাপের বয়সী। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। আলেয়া স্বামীকে স্বামী বলেই জানে। গহর আলির কাছেই আলেয়া এই বয়স পেয়েছে। ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে। যেন গহর আলির স্পর্শেই এই স্ফূর্তি। আজ চারবছর গহর আলি তাকে নিকে করেছে। দুটি পুত্রসন্তান তার গর্ভে জন্মেছে। গহর আলির প্রথম পক্ষ লালমন। আলেয়া বড়বুবু বলে ডাকে। তার চৌদ্দটা ছেলেমেয়ে। একা এত ছেলেমেয়ে আর এই সংসার চালাতে প্রাণপাত করতে হত বড়বুবুকে। আলেয়া এসে অনেক সুসার হয়েছে। এত ছেলেপুলেদের সামলানো, চাষবাসের নানা ঝক্কি-ঝামেলা। তার পরেও আছে স্বামীর অবসাদে বিষাদে অবসরে বিশ্রামে ফরমাস খাটা, সেবায় লাগা। আলেয়া এলে চারদিকটা বেশ সামলে নেয়া যায়। এটা জানে আলেয়া। প্রথম প্রথম লালমন তার ওপর প্রতিহিংসার মনোভাব দেখিয়েছে। তারপর কেমন মানিয়ে নেয় তাকে বড়বুবু। মানিয়ে যায় আলেয়া।

গহর আলির বয়স এখনো পঞ্চাশ ছোঁয়নি। শক্তসমর্থ চেহারা। সুন্দরবনের মৌসুনি দ্বীপে আটদশ বিঘে জমির সাম্রাজ্য গহর আলির। তার মধ্যে পুকুর বাগান ঘর বাকুল, আনাজবাড়ি। অসুরের মত খাটতে পারে গহর আলি। সারাক্ষণ চাষবাস আগান বাগানে মিশে থাকে। ছোট ছোট ঘর দালান দিয়ে টানা বাড়ি বানিয়েছে। বাকুলে রান্নার চালা, মুরগির দরমা। তারপরেই আনাজবাড়ি। চারধারে তাল খেজুরে ছাওয়া। এই পৌষে খেজুর গাছে রসের মিষ্টি গন্ধ। চারা নারকেল গাছেই কাঁদি কাঁদি নারকেল ফলেছে। একটা পেয়ারা গাছ। একটা নোনাফলের গাছ। কলাবাগান। বাবলার সারি জমির আলে, পুকুরের চারধারে। বাকুলের মাঝখানে ঢেঁকিঘর। ঢেঁকিতে পাড় দেবার সময় পেয়ারা গাছের একটা ডাল ধরা যায়। নোনাগাছে, পেয়ারাগাছে কতকগুলি পাখি আসে সকাল সন্ধে দুপুর। নানা তাদের রং, নানা গড়ন। নানা তাদের কথাবার্তা। এই সবের ভেতর আলেয়াকে গহর আলি অধিকৃত করেছে। সামনেই সমুদ্র। বাতাসে অবিরত তার শব্দ বয়ে আনে। নোনা বাতাসে সিঁদরি পোকা উড়ে বেড়ায়। পাকা পেয়ারায় পাখি ঠুকরে যায়। ঢেঁকিতে চালের গন্ধ। গাছে গাছে খেজুর রস। এই সবের ভেতর থেকে ধরা পড়ে যায় আলেয়া গহরের হাতে। ধরাও দিয়েছে দ্বিধাহীন। গ্রীষ্মের কুমড়ো বাড়িতে, সন্ধ্যার আধো-আঁধারে যখন সমুদ্র গর্জন করে। বাতাসের সাঁ সাঁ দ্বীপ জুড়ে থাকে। একটা নৌকোর মত দ্বীপটা যখন দুলতে থাকে। জোয়ার আসে। সাবাড়ের ঘাটের নৌকো নোঙর তোলে। ঢেউ আছড়ায় প্রলয়ের মত। বাপ-মা মরে যাওয়া আলেয়া, চাচির সংসারে থাকত। ছোটবেলা থেকেই এর-বাড়ি ওর-বাড়িতে ঢেঁকিতে আগানে-বাগানে খেটে নিজের পেট চালাত। গহর আলির কুমড়োবাড়িতে এসে আটকে যায়। গহর আলি কত সহজ-স্বচ্ছন্দে তাকে অধিকৃত করে। আর এই এখানে গহরের আলেয়াকে প্রয়োজনও ছিল। আলেয়া জড়িয়ে যায় গহরের সংসারে। দুই সন্তানের জননী হয়েছে।

গহরের সংসার ঘন জমাট। এমনভাবে সংসার পেতে রেখেছে গহর আলি, যে সেখানে আটকে না পড়ে উপায় ছিল না।

সন্ধের সময় কুমড়োবাড়ি থেকে সাঙাতের বাড়ি নিয়ে গিয়ে গহর তাকে নিকে করে, মোল্লা ডেকে। সেই রাত্তিরেই তাকে ঘরে নিয়ে আসে। বড়বুবু লালমনের সে কি জুলুম! একটা ঝাঁটা দিয়ে মারতে মারতে বার করে দিল। চাচির বাড়ি চিল্লিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেছে। পরদিন সেখান থেকে গহর আলি তার হাত ধরে নিয়ে আসে গহর আলির সংসারে।

সে সংসারেই এই চারবছর থেকে গেল। গহর আলি তাকে আশ্রয় দিল। বাদার দেশ। শীত-বর্ষা, ঝড়-ঝাপটায় এই দ্বীপটা মাঝে মাঝে দুলে ওঠে। নানা পোকামাকড়। সমুদ্রের চরে নানা ঝিনুক, সামুদ্রিক জীব। সমুদ্রের অবিরত গোঙানি বুকে এসে লাগে। আলেয়া এই গর্জনের ভিতরে শান্ত হয়ে থাকতে চেয়েছে। শান্ত হতে চেয়েছে গহরের বাহুতে বুকে। জীবনের স্বাদ তার ওপর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ে। তার মধ্যেই তার থাকার অভ্যাস গড়ে উঠছে। গহর আলিকে বাদ দিয়ে গহরের এই সাম্রাজ্য অবান্তর। তার আকাঙ্ক্ষায় সে নিরুচ্চার। সংসারের প্রয়োজনে তার প্রয়োজন গহরের কাছে। কাদার তালের মত নীরব থাকে, সংসারের হাত তাকে প্রতিমা গড়ে, তাতেই শান্ত, তৃপ্ত থাকতে চেয়েছে। তাছাড়া, দ্বীপের সমুদ্র, চাষবাস, বর্ষাবাদল, পোকামাকড়, নোনা হাওয়া, নির্জনতা তাকে গহরের কেন্দ্রে সমর্পিত করতে চায়। এসবই গহরকে কেন্দ্র করে পরিধি।

তাই গহরের সংসারে আলেয়ার কোনো আপত্তি থাকে না। কারণ সে জানে তার নীরব স্বভাবের জন্যে গহর তাকে মনে রাখতে পারে। সমুদ্র নিশুতে গোঙায় যখন, শন শন এক হাওয়ার প্রবাহ থাকে চারধারে। হ্যারিকেনের কলে হাত ছুঁইয়ে নরম করে ফেললে আলোটা হামাগুঁড়ি দিয়ে ঢোকা তার ঘরের মধ্যে এক শান্ত শীতলতা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। বিছানায় বসে পা মেলে ধরে আরো নির্জন হয়ে ওঠে তখন আলেয়া। নাকের নাকছাবির টুকরো পাথর ঝিকমিক করে ওঠে। গহর এসে তার পিঠে হাত দেয়। সেই ছোঁয়ায় শরীরের কোনো প্রতিক্রিয়া জানতে দেয় না। ধীরে ধীরে সে সমর্পিত হয় গহরের মধ্যে।

এই ব্যবস্থা, পরিস্থিতির ভেতরই গাজি আসে। গাজি আলেয়াকে মনে করে আসে না নিশ্চয়। এখানে এসে আলেয়াকে বুঝি তার মনে পড়ে যায়। না হলে প্রথম এক-দুদিন এদিক ওদিক আনখান ঘুরে তার চারপাশে থাকে কেন? কোনো ঘ্রাণ বুঝি তাকে টানে। তার খালাতো ভাই গাজি। মেটেবরোজের বড়তলায় এক মুদিখানায় কাজ করে। আলেয়ার সঙ্গে ভাবসাব ছিল। এই দ্বীপেই আলেয়ার খালার বাড়ি। উত্তরছাড়ে বাগডাঙায়। এদিকে বালিয়াড়ার পথটুকু পায়ে পায়ে চলে আসতে কতক্ষণ আর লাগে। গাজি বলেছিল, তাকে সে বিয়ে করবে। গাজি তাকে আর বিয়ে করতে পারে নি। মেটেবরোজ থেকে চার-ছ মাস পরে এসে মনে পড়ত গাজির, সে নাকি আলেয়াকে ভালোবাসে। তারপর ফিরে গিয়ে আরো চার ছ মাস ভুলে থাকত। এই ফাঁকে গহরের সঙ্গে আলেয়ার বিয়ে হয়ে যায়। এবং আলেয়া মনে করে এটাই ঠিক হয়েছে। গাজির ওপর তার প্রকৃত প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

গাজি এলে এমন তার চারপাশে ঘোরাফেরা করে। গহরের কাছে সমর্পিত হয় হয়ত সেই মুহূর্তে। একটা কালো পোকার ডানার ভোঁ ভোঁ শব্দ শুনতে পায় সে-সময়। অদ্ভুত তার শব্দ। চারপাশের শব্দ তাকে উদ্বিগ্ন করে রাখে। গহর তাকে আশ্রয় দিয়েছে। ভাল যে তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা খুব কম হয়। তার সংসারে খাওয়া পরা যা যা প্রয়োজন বড়বুবু দেয়। দিনমানে প্রায় কথাবার্তাই হয় না আলেয়ার সঙ্গে গহরের। ব্যাপারী, সমুদ্রের জেলে মানিষ্যি এলে তাকে কেউ কেউ গহরের মেয়ে শুধায়। আসলে "মেয়া" — বউ। এ কথাটা বুঝে কেউ কেউ তাকে ঘুরেফিরে দেখে। আকাশে বিদ্যুৎ যেমন চমকায় তেমন চমকে চমকে ওঠে আলেয়া।

সারাদিন তার কারো সঙ্গে না-কথা বলে কাটে। পৌষের নরম বাতাসমাখা রোদ ফুর ফুর করে ওঠে তার মধ্যে। গাজি কলকেতা থেকে এসেছে। এ-ঘর সে-ঘর এ-পাড়া ও-পাড়া ঘোরাফেরা করছে। গোয়ালের ভেতর যখন ছিল তখন বাগানের ওপর দিয়ে রেডিও বাজাতে বাজাতে গাজি চলে যায় বালিয়াড়ার দিকে। গাজি কি তাকে দেখতে চেয়েছিল? তখন আলেয়া বেরয় নি গোয়ালের ভেতর থেকে।

এখনো ঘোরের মধ্যে আছে আলেয়া। চমকিত। এই আগান বাগান পুকুর ডোবা খেতের চৌহদ্দির ভেতরে তাকে আশ্রয় দিয়েছে গহর আলি। সে চমকানি তাকে ঘিরে থাকে। একটা অদ্ভুত মেঠো গন্ধ পায় সে বরাবর। একা থাকার ভেতর। সারাক্ষণ ত সে একা থাকে। হয়ত ধান ভাপায়, সেদ্ধ করে, শুকায়, ধানে 'পা দেয়', নয়ত খেজুর রস জ্বাল দেয়, ভাত রাঁধে, ধান ভানে ঢেঁকিতে। কিংবা দা নিয়ে পালাপুলি কাটে। গোল কাড়ে, ঘুটে দেয়। এক চমকিত বোধ নিয়ে থাকা। অবিরত এক গুনগুন চলে ভেতরে ভেতরে। দু-চার কথা হয় মাসুরার সঙ্গে। বড়মেয়ে। গহরের বড়মেয়ে। তারও সম্পর্কে বড়মেয়ে। লালমন বড়বুবু চরকির মত সংসারে থাকে। অতগুলো ছেলেপুলে নিয়ে হিমশিম। মাসুরাও তার ভাইবোনদের সামলায়। মাসুরার শাড়ি পরাব বয়স হয়ে গেছে। মাসুরা তাকে ছোটমা বলে সম্বোধন করে। মাসুরাব সঙ্গে আলেয়াব মা মা ভাবটা আরো জোরে চেপে বসে। চোখের পাতা তোলা ফেলায় এক প্রবীণ গড়ন সে পায়। কিন্তু মাসুরা 'ছোটমা' বলে ডাকলে ভেতরে কেঁপে ওঠে আলেয়া। সাজু তাকে মা বলে ডাকে না। কোনোরকম সম্বোধন তার নেই। বড়বুবুর বড ছেলে। তার সম্পর্কে ছেলে। বয়সে তার থেকেও বড় সাজু। তার বউ নাদিরার সঙ্গে কথা হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু সাজু এটা ওটা চাইতে এলে কোনো সম্বোধন না করেই চেয়ে নেয়। সাজুব সামনে বয়স বেড়ে ওঠে আলেয়াব। নিপাট এক জননী ভাব। এক গম্ভীর অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে সাজুর সামনে। হাতে পায়ে স্নায়ুপেশীতে এক দৃঢ়তা এসে জমা হয় আলেয়ার। সাজু তার সামনে কত ছোট হয়ে যায়।

বাগানের ছাড়ে ধান উঠে যাওয়া মাঠে লঙ্কা বুনছে গহর আলি। এই অবয়বটা চোখে পড়লে কেমন ধ্বক করে ওঠে আলেয়ার ভেতরে। একজন প্রবীণ পুরুষ। বাপ বেঁচে থাকলে, তার চেয়েও বয়সে বড হবে গহর। এই প্রবীণতা তাকে অধিকৃত করেছে। তার বিবাটত্বের কাছে সে এতই ক্ষুদ্র যে সারাক্ষণই অধিকৃত থেকে যায় আলেয়া। সমর্পণে ভেঙে থাকে। গাজি বালিয়াড়ার হাটে যাচ্ছিল যখন রেডিও বাজাতে বাজাতে, গাজিকে দেখার বড় ইচ্ছে হয়েছিল আলেয়ার। কতদিন পরে দেশে এল। কিন্তু বেবতে পারেনি গোযাল থেকে। গহরেব বিরাটত্ব, আগান-বাগান ক্ষেত-জমি সর্বকিছুর ভেতর সে স্বেচ্ছাসমর্পিত।

বাস থেকে শাসমল বাঁধে নেমে, ভটভটি করে দ্বীপে এসেছিল গাজি। দ্বীপের সবটা জুড়েই তার ঘোরাফেরা এখন। কখন যে কোথায় যায়। সামনে এসেই পড়ে কখনো কখনো। কথা হয় না। চোখের দেখা। গাজি ছদিন এসে শুধু রেডিও নিয়ে ঘোরে। নতুন মশলা ভরেছে রেডিওতে। গমগম ঝমঝম করে রেডিও বাজে। সুন্দর সুন্দর গান বাজে।

সাজুকে ভিন্ন করে দিয়েছে বড়বুবু। গহর আলি নয়। সাজুর বউয়ের সঙ্গে লালমন বুবুর পটছিল না। সারাক্ষণ খিটিমিটি চুলোচুলি লেগেই থাকত। মাসকযেক হল আলাদা করে দিয়েছে। সাজুর বউ নাদিরা পাঁচ বছর বিবাহিত জীবনে সংসারে অনেক কষ্ট পেয়েছে। বড়বুবু তাকে খাবার কষ্ট দিয়েছে। গালমন্দ, মারধোর করেছে। মুখে মুখে চোপা করার স্বভাব নাদিরার। কিন্তু কি ভাল মেয়েটি। অথচ খাওয়ার কষ্ট আলেয়াকে দেয়নি বড়বুবু। আলেয়াকে মেনে নেয়াটা তার পক্ষে অনিবার্য ছিল।

সাজু ঘর বানিয়েছে পুকুরধারে, আনাজবাড়ির পাশে। আলেয়া দেখল নাদিরা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁটা দিয়ে মুরগি তাড়ায় খেদিয়ে। 'শুয়োর বরা, মর মর।' তারপর গদ গদ করছে। এ বাড়ির মুরগি তার উঠোনতলার ধানে পড়েছিল। কট কট করে শাশুড়িকে গালাগাল দেয়। কিন্তু মাসুরা লুকিয়ে লুকিয়ে তার ভাবির কাছে যায়। ঘরের এটা ওটা লুকিয়ে দেয়। এসব আলেয়ার দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু বড়বুবুকে এসব বলেও দেয় না। মাঝে মাঝে শাশুড়িকে লুকিয়ে নাদিরার সঙ্গে কথা বলে। সেও এটা ওটা আঁচলে লুকিয়ে দিয়ে আসে। নাদিরা আবার তার শোধ দেয়। চালভাজা দিলে একফালি নারকেল দেয়। একবাটি গুড় দিলে একটু শাকের তরকারি খাইয়ে দিয়ে যায়। নাদিরার ভয়ানক আবেগ। বড় মায়া তার। একটুতেই তার চোখে জল আসে। অথচ বড়বুবুর সঙ্গে যখন ঝগড়া করে মনেই হয় না নাদিরা এত ভাল। বড়বুবু তাকে খেতে না দেয়া মারধোর করার পর, কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস ফিস কথা বলতে বলতে গলা ধরে উঠত তার। কেঁদে উঠত। সারা শরীর জুড়ে কান্না উথলে উঠত। সে কান্নার ছোঁয়ায় তাপে দুলে উঠত আলেয়ার শরীর। এইভাবে গলা জড়িয়ে নিরিবিলিতে দুজন কতক্ষণই না কাঁদতে পারে। একা একা তেমনভাবে তার কখনোই কান্না আসত না। কেঁদে কেঁদে কেঁদে কেঁদে হালকা হয়ে উঠত।

আলেয়া গোবরের তালে জল ঢেলে ছানতে থাকে। ছেলে দুটো আরো চার পাঁচটি শিশুর ভিড়ে উঠোনে আছে।

সাজু পুকুর থেকে হাত পা ধুয়ে এল। দড়ির ওপর থেকে গামছা নেয়। হাত-মুখ-পা মোছে। চাটাই মেলা বাকুলে কাঁথা-বালিশ বুকে করে করে এনে শুকোতে দেয় নাদিরা। তারপর সোজা রান্নাঘরে ঢুকে যায়। এক জাম পান্তা নিয়ে এসে সাজুর সামনে বসিয়ে দেয়। সাজু বাঁ পা-টা ভাঁজ খাইয়ে হাঁটুটা ওপর দিকে তুলে, ডান দিকের পা ভেঙে বসে। সাজু পান্তা খায়।

একটা শালিক পাখি গহর আলির ঘরের বাকুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দানা খুঁটে খাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। কী সুন্দর তার রং, গড়ন। নরম পা। রঙিন চোখ। একটি নরম ভাললাগা বোধের মধ্যে তলিয়ে যেতে পারছিল আলেয়া। একটা স্বপ্নের মত কিছু। যেন কিছু স্বপ্ন বা রূপকথার মত রং মিশে যায় তার মধ্যে। নড়াচড়া করে। উথালপাথাল করে। গড়িয়ে যায়। বাতাস রোদ আর চারদিকের স্ফুট প্রান্তর গাছপালা এসব যেন সে নিজেই গড়ে তুলছে। নিজেই জাগিয়ে তুলছে। এসব যেন সে নির্মাণ করে নিজের মধ্যে। সমুদ্রের বাতাস গোঙানি, সে যদি বলে আছে, তাহলে আছে। না হলে নেই। সে যদি বলে ছোট পাখিটার চলাফেরা আছে, তাহলে আছে। এরকমভাবে গড়ে তোলে। আঁচড় কাটে তার মধ্যে। এসময় শাদা কাগজের মত মনটা হয়ে যায়। একটু একটু করে আঁচড় পড়ে। নানা রঙে তাকে ধরতে থাকে। নানা দোলায় সে দুলে ওঠে।

চমকিত বোধ। বাকুল বাগানে এক শান্ত নীরবতা। সে আর কিছু আকাঙ্ক্ষা করতে পারে নি। গহরকে বিয়ে করে তার সংসারে থাকাটাই সীমা মনে করেছে। এর মাঝে যা কিছু আছে রং স্বপ্ন রূপকথা তা ভাবনার ভাল লাগার মধ্যেই সীমায়িত রাখতেই সে ভালোবাসে। গাজিকে সে আর চায় না। চেয়েছিল। কিন্তু গহরের সংসারে তার আর কী কষ্ট! গহরের নেতৃত্বে থাকাটাই ঠিক মনে করেছে। গাজিকে এড়াতে চায়। গহর তাকে বিয়ে করে তার মধ্যে যে প্রবীণতা জুড়ে দিয়েছে, সেই অবস্থার মধ্যে আলেয়া সমর্পিত থাকতে চেয়েছে। আর যা অবশেষ আছে তা কল্পনা স্বপ্ন রূপকথা। নানা-রঙের ছড়াছড়ি। এখানে বাধা দেবার কারো হাত নেই। এমনভাবে আলেয়া নড়াচড়া করে।

তালগাছগুলোর পাতাগুলি নেই। পাতা কেটে নেয়া হয়েছে। তাদের কোমর বেয়ে সমুদ্রের নিলয়। এক অনন্ত সেখানে এঁটে আছে গোয়ালের পেছনে, পুকুরের ধারে। খিড়কির ঘাটে। বিশাল এক শূন্যতা। নিচে মাটিতে সেই প্রান্ত দিয়ে পুবে চলে এসেছে গহর আলির এই ঘর ভিটে আগান বাগান। সেখানের আশ্রয়টাকে আঁকড়ানো তাই তার সত্যি মনে হয়। গহর আলির মধ্যে ধরা পড়বার যথেষ্ট পারিপার্শ্বিকতা তাকে গড়ে দেয়।

কিন্তু রং স্বপ্ন কল্পনা রূপকথা অন্য জিনিষ। তার মনে হয় তার জীবনের সঙ্গে মেলাবার এ বস্তু নয়। এটা একটা মুহূর্ত, ভাব — জীবনের অন্য আস্বাদ।

'চাষবাড়ি'তে মানুষ এসে গেছে। ধান কাটা, তোলা ঝাড়া, নৌকো ভরে নিয়ে যাওয়া চলছে। চাষবাড়িতে মরদ মেয়া, ছেলা পুলা। কাঁথি নামখানা কাকদ্বীপ ডায়মণ্ডহারবারের লোক। জঙ্গল হাঁসিল করা লোক। সমুদ্রের গা বেয়ে জেলেদের বাস। বাতাসে ভুরিমাছের গন্ধ। বোল্ডার, পাথর, বেলাভূমি — নৌকো ভটভটি পা-ছুঁয়ে ধু ধু সমুদ্র গাং চিল।

মাসুরা সাজুদের চালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বড়ভাইয়ের ঘরের সামনে। ভাবি নাদিরা তার সামনে মিটিমিটি হাসছে। 'শাউড়ি কুথা গেলা?'

'কুথা গেলা দেহো। পানি আনতে যাবি ভাবি?'

'ঢের কাম বাকি। অখন নয়।' —সাজুর দিকে তাকায় নাদিরা। 'তমার পা মেলে বইস্যা কাটলে হইবা? পান্তা বেলায় পান্তা খাইলে। বাকুলের শুকনা গোড়েখান চ্যালা কইরা দেও। — তা বাদে ধান ঝাড়তে যাবা।'

সাজু উঠে দাঁড়ায় 'কুড়ালে ডাঁপ পরাইতে লাগবা।' বলে দুহাত শূন্যে তুলে আড়ামোড়া ভাঙে। এতে কোমরে লুঙ্গির ওপর জড়ানো গামছাটা খসে মাটিতে পড়ে যায়। সেটা উবু হয়ে তোলে, ঝাড়ে।

'কুড়ালে ডাঁপ লাগানো আছে।'

'কে লাগালা?'

'মুই।'

'হারে, মেয়া মরদ অইল দেহি।'

নাদিরা হাসে। মাসুরার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

সাজু কুড়াল আনতে ঘরে যায়। কুড়াল টেনে এনে লুঙ্গির ওপর আবার গামছা জড়ায়। কাঁছা মারে। 'খামারে ধান ঝাড়তে ঢের বাকি, জনগুলা আগেভাগে চলে যাবা। মোর ফুরোন দিইতে রোদ গড়াইবা।'

নাদিরা হাসে — 'রোদ গড়াইলে গড়াইবা।'

'গাজি যে রেডিয়া আনবা সাঁজ বেলাকে?'

'তাই ত।' ভাবে নাদিরা। 'ত্বরা কইরা ফাড়ো, হাত চালাইয়া ধান ঝাড়বা।'

সাজু দ্রুত নেমে আসে বাকুলে। বাবলাগাছের গুঁড়িতে কুড়ালের কোপ বসায়।

নাদিরা ও মাসুরা ওরা ভাবি-ননদে কত কথা বলে, এ-ওর দিকে গলা বাড়িয়ে।

তালগাছের গায়ে গায়ে ঘুটে দেয় আলেয়া। বাকুলে ঢেঁকিটা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। পেয়ারাগাছের ডালটা তার দিকে ঝুঁকে আছে। খেজুর-গাছগুলিতে রসের গন্ধ। মাতাল-করা রসের গন্ধ। মুরগিগুলোর চলাফেরা। চুন-মাখানো রসের কলসিগুলোকে রোদ খেতে দেয়া হয়েছে খেজুর ছাড়ে। তার ভেতর কালো কালো মাছি ভরে আছে। ভন ভন একটা শব্দ হচ্ছে। বড়বুবু এদিকে বাকুলে নেই। বড়বুবুর মেজ সেজ নসেজ ছেলে পিঠোপিঠি আর

দুজন, ওরা সব চাষের কাজে আছে। অন্যের চাষে খাটে। গহরও খাটে। বাচ্চা ছেলেমেয়ে গুলোই উঠোন বাকুল ঘর জুড়ে থাকে। ওদের মাঝেই তার দুই খোকা আছে। আসলে গহরেরই ত সেই দুই খোকা। মেশামেশি হয়ে থাকে।

ধান ঝাড়ার পটাপট্ শব্দ এদিক-ওদিক ছড়ানো-ছেটানো। মাঠে মাঠে ধানের বোঝা মাথায় করে নিয়ে যাওয়া জনেরা ছড়িয়ে থাকে। পুবদিকে বাঘডেঙা থেকে ইটের রাস্তা বেরিয়ে এসেছে বালিয়াড়া পর্যন্ত। স্কুল, মক্তব বালিয়াড়ার হাট, দোকানদানি। পশ্চিমে থই থই সমুদ্র। দ্বীপটা জুড়ে সমুদ্র আছে। জল আর জল। অকূল পাথার। এখানের বাতাসে লবণ উড়ে বেড়াচ্ছে।

'পেছন থিক্যা চিনা যায় না তুমারে।'

পেছনে ফেরে আলেয়া। গহর আলি কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে গহর আলি।

'বেলা যায়, এখনো গোসল হয় নাই, খাওয়া হয় নাই?'

আলেয়া জানে, বড়বুবুর অনুপস্থিতিতে এই লোকটা তার সঙ্গে আলাপ করার সাহস পায়। রাতে গহরের এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার হক আছে, বড়বুবু তাতে বাদ সাধে না। কিন্তু দিনমানে মাগ-ভাতারের আলাপচারিতায় আপত্তি আছে। বড়বুবু পাড়ায় কোথাও গেছে বলে, গহর লঙ্কাবাড়ি থেকে উঠে এসেছে। উঠে এসেছে আলেয়ার পেছনে। তালগাছে ঘুটে দিতে দিতে মুখ ফিরিয়ে ধরেছিল আলেয়া। আঁচলটা গলা থেকে খসে পড়ল। হাতের গোবরের তাল ধরে আছে। ঠোঁটে মুখে কাঁপুনি। চোখেরপাতা ওঠে নামে। পাশ ফিরে মূর্তিব মত দাঁড়িয়ে আছে আলেয়া। গহরের সামনে। গহরের মুখে হাসি খেলে বেড়াচ্ছে।

গহর তার সামনে এমনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। 'জিবেন দেও, গা ধোও ধোও। বাকুলপানে এস দিনি।'

গহর বাকুলের দিকে চলে যায়।

আলেয়া গোবরের তাল রেখে ধীর পায়ে পুকুরের দিকে এগচ্ছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে তার। শরীরে এক কাঁপুনি। ঠোঁট দুটো এখনো কাঁপছে তার। শরীরে গুরু গুরু ভাব।

ঘাট থেকে হাত-পা ধুয়ে এসে দেখল গহর দাওয়ার বাড়ে বসে পা ঝুলিযে আছে। মুখ গুঁজে ছিল, ছায়া দেখে সামনে তাকায় গহর। 'পানি দ্যাও।'

কলসি থেকে ঘটি ভরে জল আনতে গিয়ে আলেয়া বুঝতে পারে গহর আলি তাব দিকে তাকিয়ে আছে। জল ঢালতে গিয়ে হাতের ঘটি কেঁপে যায় কেন?

দুহাতে জলের ঘটি ধরে গহরের কাছে আসে। একটা শিশু হামা দিয়ে তার দিকে আসছে। বাড়িয়ে দেয় জলটা। শিশুটা এসে তার পা জড়িয়ে ধরেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। এই শিশুটি তার নয়, বড়বুবুর। তাকে কোলে তুলে নিচ্ছে না। গহরের সামনে দিনমানে এমনই কাঁপুনি, জড়তা আসে তার। স্বামীর সঙ্গে খুনসুটি করবে? কীভাবে পারবে? লোকটার বয়স তার বাবার বয়সের থেকেও বেশি। আর বড়বুবু দিনমানে গহর আলির সঙ্গে একসাথ পছন্দ করবে না। অদ্ভুত জড়তায় একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে আলেয়া। পা ধরে আছে শিশুটি। তাকেও কোলে তুলতে পারছে না। আহা!

'গা কিটাচ্ছে — দ্যাও ত এট্টু কিটায়ে।'

পা টানতে শিশু উল্‌টে পড়ে যায়। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসে।

পিঠের সিঁদারিপোকার ঘায়ে নখ দিয়ে ওসকায়। গহর আলির মাথা, পাকা চুলে ভরে গেছে। বাবার মতই মনে হয় তাকে। স্ত্রীত্বের লজ্জায় এক কাঁপুনি। জড়তা। নখ দিয়ে এমন সিঁদরিপোকার ঘা মারে গহর আলির সারা গায়ের। শিশুটি হামা দিয়ে তার পায়ের দুই ফাঁকে

খেলছে। ছোট ছোট নরম হাতগুলি পায়ের ওপর আঁচড় কাটছে। আলেয়া আধভাঙা দাঁড়িয়ে ঘা মারছে। অদ্ভুত তার নুয়ে পড়া। এতে বুকটার ভারি হয়ে ওঠা অনুভব করে। সকল জননীত্ব এসে তার বুকে ভার করেছে। কলার কাঁদির মত ভার হয়ে ঝুলে আছে তার স্তন দুটি। তার ভীষণ ভার। পায়ে শিশুর হাতের আঁচড়ানি, কাতরতা। বুক টন টন করে ওঠে! স্তন উসখুস করে। স্তন দুটি দুধে ভরে গেছে। টন টন করে ওঠে। শিশুটি পায়ের তলায়।

বাড়ির পেছনে বড়বুবুর গলা পাওয়া যায়। গহরের পিঠ থেকে হাত দুটো সরিয়ে নেয়। পায়ের তলায় শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে ঢুকে যায়। কোলে বসিয়ে শিশুকে স্তন দেয়। বুক টন টন করছে। একেবারে পেনিয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে যন্ত্রণা সরায়।

বড়বুবু তার কোনো আধলা ছেলেকে বকছে। বকতে বকতে সেই ঘরে ঢুকে পড়ে। আলেয়াকে দেখে থমকে যায়। ঘরের এখান থেকে ওখানে যায়।

আলেয়া জুড়িসুড়ি মেরে যায়। সঙ্কুচিত ভাব। জড়তা নিয়ে ঐভাবে বসে থাকে। দিনের বেলাতেও পাতলা অন্ধকার রয়েছে সে ঘরে। স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঠাণ্ডা ভাব। চোখ বুজে আসে। ঘুম ধবে যেন।

মরা রোদের ওপর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। গাছে পালায় কুয়াশার স্তর। কাঁপুনি, ঠাণ্ডা। মাথার সিঁথেনের কাছে সমুদ্র গর্জন করে! দিগদিগন্ত কেমন আলগা ছেঁড়াখোঁড়া হয়ে উঠছে। গহরের আগান বাগান ঘর ভিটেটুকু দৃশ্যের অখণ্ডতায় পেতে আছে। খেজুর গাছ থেকে রস ঝরে যায়। টুপ টুপ করে ঝরে। রসের গন্ধ ঠাণ্ডা হাওয়ায় থই থই করে। টিনে রস ফোটানো হচ্ছে। বড়বুবু আর গহর আলি দুজনে একসঙ্গে রস ফোটায়। তাদের আধলা দুই ছেলে পাতাপুতির জ্বাল দেয়। আলেয়া ভাত চড়ায়। গনগনে আগুন তার চারপাশে। শিশুরা উঠোনে। তাদের নিয়ে থাকে মাসুবা। এখন মনে হয় গহরের আগান বাগান ঘর ভিটের বাইরে কোনো দৃশ্য নেই আর। যেন সব সমুদ্র. কোনো মাটি-পাথর নেই আর।

নাদিরা এখনো রান্না চড়ায় নি। আলেয়ার বড় ব্যাটার বউ। আলেয়ার থেকেও বড়। গলায় একটা চাদর বেঁধে তাদের উঠোন থেকে সাজু নেমে এল। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। মা-বাবা কারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই সাজুর। মা-বাপের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। গহর আলি আব লালমন বুবু বউ-ব্যাটাকে মারতে মারতে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। পরের ঘরে দু-দশদিন সাজু নাদিরাকে নিয়ে থেকে ছিল, তারপর সার্লিশ বসে। গহর আলি সাজুকে একটুকরো জায়গা দেয়। তাতে ঘর তোলে সাজু। বাপ-মায়ের সঙ্গে সাজুর কোনো 'ল্যাপসা' নেই। নাদিরা আর সাজু তাদের ছোটমাকে শত্রু মনে করে না।

আলেয়া দেখল সাজু একগাছা বিঁড়ির আগায় পাছায় ফুঁ দিয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিয়ে চুলোর দিকে এগিয়ে আসছে। আগুনের দিকে মুখ ডুবিয়ে টুপ করে বিড়িটা ধরিয়ে নেয়। উবু হয়ে বিড়িতে আগুন জাগিয়ে তুলতে তুলতে সাজু বলল — 'ছোটমা, বাপ একখান গাছ দিল নাই বলে মোর মেয়া ছেলারা গুড় খাবে নাই, ই ত নাই। হাট থিক্যা কিনা খাই। — বাপ কেন বালিয়াড়া হাটঘরে কাসেমরে কয়েচে, সাজু মেয়াডারে গায়ের কাপড় খুইলা চাবকাইবে। কে তোদের জ্বালুন কুটো লিইছে? মোর মেয়াকে উ শিক্ষা দিই নাই। — মাকে বলিস, তুরা মরে পড়্যে থাইকলে দেখতে যাব নাই।'

আলেয়ার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে! 'বাপ মা হয় নাই তুমার? ও কথা কও তুমি?'

'আমারে যেমন বাসবা তেনাদের তেমন বাসবা—ই ত রাস্তায় পড়ে রইছে।'

'গুণ্ডার বাপ, বাপ মায়ের বদলা লিওনি। কথা কইতে পারলে কথা কওয়া হয়ে যায়।' এই কথার চাপে আলেয়া কেমন পরিণতবয়স্কা হয়ে ওঠে। প্রবীণ বয়স্ক। সাজুর সে যে মা এটা প্রকাশ পায়।

সাজু এই কথার ধাক্কায় একটু জড়সড় হয়ে উঠল। গুটিয়ে যায়।

আলেয়ার চোয়াল শক্ত। শরীরে এক প্রবীণতা তাকে এক ঋজু ভাব দিয়েছে। দিয়েছে কঠিনতা। চুলোর আগুন বাড়ায়। দাউ দাউ করে ওঠে আগুন। সেই আগুনে আলেয়ার চোখ দুটি জ্বলন্ত হয়ে ওঠে। তপ্ত হয়ে ওঠে। চূর্ণকুন্তলে ভিজে ভাবটা চলে যায় কপাল থেকে।

সাজু চলে গেল।

নাদিরা লক্ষ করছিল। সেও এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে তার কাছে চলে যাবে। 'ছোটমা, গুণ্ডার বাপ দুঃখ জানাইছিল? অর বড়া রাগ। মানুষডারে নিয়া পারি নাই।'

'সইয়া করো কেনে।' আলেয়ার চোয়াল আবার শক্ত হয়ে ওঠে।

'সইয্য ত করচি ছোট মা।'

'দেখবি তুদের সুনার সুমসার হবে।'

নাদিরা ফিরে যায়। বড়বুবু গুড়শাল থেকে ফিরছে।

বাকুলের মাঝখানে উদোম চুলোয় রান্না করছে আলেয়া। এখন কেমন ম্লান হয়ে আসছে বাইরের আলো। বাইরে শীত এসে জড়াচ্ছে। আগুনের কাছে কোনো শীত নেই। আলেয়ার কোনো শীত নেই। তাপে তাপে চনমনে হয়ে উঠছিল। আগুনের শিখা জবাফুলের মত ছড়িয়ে পড়ছিল। পাতার জ্বালের অগ্নিকণা উড়ে যায়। হাঁটু দুটো তপ্ত হয়ে উঠছে। অগ্নিপ্রভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে মুখ। আলেয়ার হঠাই মনে হল, গাজি এসেছে। গাজি এসেছে, আবার চলে যাবে। আলেয়ার খালাতো ভাই। গাজির সঙ্গে আর আলেয়াব বিয়ে হল না। গহর তাকে অধিকৃত করে ফেলেছে। এখানেই আলেয়ার বেশি নিশ্চিন্ততা। তবে গাজি এলে তার ভাল লাগে। তবু ত জানাশোনা ছিল। ভাবসাব। গাজিকে দেখতে পেলে ভালই লাগে আলেয়ার। একটা রেডিও এনেছে। ঝম ঝম করে বাজাচ্ছে। কিন্তু গাজিব প্রতি আবেগ আকাঙ্ক্ষা তার ফুরিয়ে গেছে। অবশিষ্ট আছে যা, তা হল চোখের দেখা। চোখের দেখার আবেগেই আলেয়া নরম হয়ে উঠছে বার বার। ভিজে হয়ে উঠছে। গাজি কথা বলতে এলে বলবে না। তাকে এ ঘরে আসতেও বলবে না। সে ত গাজির কাছে আর কিছু চায় না!

সন্ধ্যা নেমে গেছে।

সাজুর দালানে গাজি এসেছে। রেডিও বাজাচ্ছে। খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে পা মেলে বসে আছে। পাশে নাদিরা রান্না করছে। আব-একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে ছেলেকে কোলে নিয়ে বসে আছে সাজু। নাদিরার হাসি হাসি মুখ। এখান থেকে দেখতে পায় আলেয়া। গাজি এদিকে তাকিয়ে আছে। আলেয়াকে দেখছে বুঝি। মাঝে মাঝে মুখ তোলে, গাজিকে দেখে আলেয়া। ভেতরটা কেঁপে ওঠে মাঝে মাঝে। ভেতরে দোলা খায়।

মাসুরা পাশে এসে বসেছে। পাশ ফিরে মাসুরাকে দেখে আলেয়া। মুখ গুঁজে কাজ করে। আর গাজির দিকে তাকানো যাবে না। মাসুরা হাঁটুর ওপর হাত দুটো চেপে বসে আছে। মাসুরাকে লক্ষ করে আলেয়া। মাসুরা তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে।

বড়বুবু হাঁসমুরগি তুলছে। গহর আলি গরু তুলে দিয়ে, খড় কুঁচোতে বসেছে লম্ফের আলোর ডেলা নিয়ে গোয়ালের সামনে।

ভাত হয়ে গেছে। তরকারি হয়ে গেলে বড়বুবু বাচ্চাদের খাওয়াতে বসাবে। একই সঙ্গে আলেয়ার দুটি শিশুও খেয়ে নেবে। শিশুর ভিড়ে হারিয়ে থাকে এই দুটি শিশু। মাঝে মাঝে চিনতে ভুল হয় আলেয়ার।

আলেয়া পাশ ফিরে দেখল মাসুরা মুখটা বাড়িয়ে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছে সাজুদের উঠোনের দিকে। মাসুরার মুখে কেমন আলোকিত প্রসন্নভাব। খুশি আনন্দ ভরে আছে।

আলেয়া চমকায়। গাজি এদিকে তাকিয়ে আছে হাসিমুখে। ছটফট করে ওঠে আলেয়া। মাসুরাকে দেখে। মাসুরা হাসছে। গাজি হাত তুলছে, মাসুরাও হাত তুলছে — জড়সড় হয়ে যাচ্ছে। এটা কী রকম! গাজি, মাসুরাকে নাচিয়ে তুলেছে। মাসুরাকে বশ করেছে। কখন গাজি মাসুরাকে তার আকর্ষণে টানল? সহসা টালমাটাল হয়ে উঠল আলেয়া। মাথার ভেতর চিন চিন করে। ভেতরটা কেঁপে ওঠে, দুলে ওঠে। গাজি মাসুরাকে বশ করেছে। গাজিব গভীর সম্মোহনে মাসুরা দুলে উঠেছে। সহসা কেমন ভার হয়ে উঠল আলেয়া। রাগে চিন চিন করে উঠছে সে। গাজি আর মাসুরার প্রতি রাগে কঠিন হয়ে উঠছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। শরীরের ভেতর এক ইড়িশবিড়িশ। গাজি কেন মাসুরার দিকে নজর দিল? আগুনের তাপে আরো রাঙা হয়ে উঠছে আলেয়া। চোখের পাতায় ভিজে ভারি ভাবটা সরে যাচ্ছে। দীর্ঘ গরম নিশ্বাসপতন হয় তার। গাজির ওপর ক্ষেপে ওঠে। সেদিকেই তাকিয়ে আছে মাসুরা। আলেয়া সাপের মত ফুঁসছে। আলেয়া মুখ গুঁজে ধরে ছিল। পাশ ফিরে দেখে মাসুরা পাশে নেই। মাসুরা খাটের দিকে চলে গেছে।

আলেয়ার রান্না শেষ। হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি চাপায়। আগুন নেভায়। কিন্তু চুলোব ভেতর আগুন ধিক ধিক করছে।

মাসুরা এখনো ফিরছে না। খাবার ঘরে ছেলেপুলেদের খাওয়াচ্ছে বড়বুবু। দরজার মুখে আলেয়া বসে আছে। সাজুর ঘরে রেডিও বাজছে। দূরে দূরে পাড়ায় ঘরে ঘরে চাষবাড়িতে আলো জ্বলে উঠেছে। গাজি কেন এল? আর এল যদি ত মাসুরাকে ফাঁদে ফেলল কেন? আলেয়া ছটফট করে। গাজির এটা অন্যায়। আলেয়া সম্পর্কে মা হয়। মাসুরাকে গাজির কবল থেকে রক্ষা করতে হবে। মাসুরা নেচে উঠেছে গাজির প্রতি। মাসুরার কম বয়স। ঘুরে ঘুরে রেডিও বাজাচ্ছে। হাতে ঘড়ি। গায়ে জামা, পরনে প্যান্ট। 'সিনেমা আর্টিস্ট'দের মত চুল কাটা। গাজি কেন মাসুরাকে ধরল? তার ত মেয়ে। গাজির অন্যায়। গাজি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। বিয়ে করতে পারে নি। কলকাতা থেকে ফিরলে এখানে এই বাকুলে ঘোরাফেরা করত। একে অপরের চোখের দেখা হত। প্রেম ভুলে যায় কেমন করে গাজি? এরই মধ্যে মাসুরা ডাগর হয়েছে ত গাজি তার দিকে দৃষ্টি দিয়েছে।

বসে বসে দাহ অনুভব করে আলেয়া। একটি মুহূর্তে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছে গাজি। গাজি মাসুরার সঙ্গে কেন প্রেম করবে? এটা ঘটতে দেয়া যেতে পারে না। অন্য কেউ নয়, সেত গাজি। গাজি তার পূর্ব-প্রেমিক। এখনো কি দেখার টান ছিল না উভয়ের মধ্যে? যেটুকু অবশেষ ছিল, সেটুকুকেই গোপনে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছে। সেখানে ঢুকে পড়েছে মাসুরা। মাসুরাকে ভুলিয়ে ফেলেছে গাজি। এক অসহায়তা বিপন্নতা এসে আলেয়াকে আলোড়িত করে। গাজি অন্যায় করছে। তার প্রতি অন্যায় করছে। তারই ঘরের মেয়ে মাসুরা। মেয়ে সম্পর্ক।

দ্বীপটা শীতের প্রকোপে জুড়িসুড়ি মেরে আছে। চারদিকে কুয়াশা। সমুদ্রের গর্জন। ছুঁইয়ে পড়া চাঁদের আলো। কাকজোৎস্নার মত চাঁদের আলো। চারদিকে মরাইয়ের গন্ধ। মাঠে মাঠে নাড়া, নাড়ায় হিম। হিম নাড়ায় এক বিষণ্ণতা। কুয়াশার স্তর সেখানে নুয়ে পড়ে। খসে পড়ে হিম। শীতের ভারি হাওয়া নেমে আসছে। অদ্ভুত এক নিঃশব্দতা।

গহর আলি দাওয়ায় বসে বিড়ি খাচ্ছে। গায়ে চাদর জড়ানো। মুখে বিড়ির আলো দপ দপ করে। আলেয়ার বয়স্ক স্বামী। শরীরে অবয়বে কেমন জেগে উঠেছে গহর আলি। খাবার ঘরের ভেতর থেকে হ্যারিকেনের আলো সরু হয়ে পড়েছে দাওয়ায়। গহর আলির গায়ে পড়েছে। একটু আগে মুড়ি খেয়েছে, চা খেয়েছে গহর আলি।

খোকাকে ঘুম পাড়াতে দোলায় বসে আলেয়া। মাসুরা এখানে কোথাও নেই। কোথায় গেল? সাজুদের উঠোনে রেডিও বাজে। ছোট খোকাকে কোলে নিয়ে দোলায় বসতেই ছোটখোকা ঘুমে কাদা। ঘরে এসে তাকে শুইয়ে দেয়। বাইরে বেরিয়ে আসে। জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। এদিক সেদিক। ছটফট করে আলেয়া। এই অস্থিরতা তার আরো বাড়তে থাকে। উঠোনে চলাফেরা করে। ছটফট। ছটফট। কোথাও কুকুর কাঁদে। শেয়াল ডাকে। সমুদ্রের গর্জন বয়ে আসছে। ঢেউ, শুধু ঢেউ আছড়ায়।

গহর আলি বসে আছে গভীর শরীর নিয়ে। বিড়ির আগুন ধক ধক করে। পেঁচা ওড়ে ভারি ডানায়। বাদুড় উড়ে যায়। পেয়ারা গাছে বাদুড় ঝটপট করে। বেড়ালটা গোয়ালের চালায় উঠে গিয়ে সন্তর্পণে চলাফেরা করে। ঝিঁঝির ডাক। রাতপোকার শব্দ। রাতপাখির ডাক। নরম হালকা জ্যোৎস্না শুয়ে আছে মাঠ জুড়ে। কিছু ধান শুয়ে আছে মাঠে। ইঁদুর তার ওপর চরে বেড়ায়। সড় সড় শব্দ করে।

উঠোন থেকে নামে আলেয়া।

উঠোনের বাড় থেকে শব্দ করে গহর — 'কোথা যাও নাকি?'

'ঘাটে যাই।' গহরের কথার উত্তর দেয় আলেয়া।

ঘাটে এসে কাঁদতে বসে আলেয়া। সমুদ্রের জলের মত, চোখের জল তার ঠোঁটে পড়ে, লবণাক্ত স্বাদ পায়। সমুদ্রের নোনতা স্বাদ শুধু নয়, সমুদ্রের মত বিশাল আকাঙ্ক্ষা বোধ করে আলেয়া।

ধীরে ধীরে কেঁপে উঠছে তার শরীর। ঠোঁট নড়ে। বুকে ভার লাগে। থেকে থেকে ধাকাচ্ছে বুক। নরম জ্যোৎস্না। চারদিক হিমেল হাওয়া। জোনাকি, কুয়াশা -- দূরে সমুদ্রের নিলয়। সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে।

নেনিনের মা

আনসারউদ্দিন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। পাড়ায় পাড়ায় ঘন ঘন বৈঠক, মিটিং মিছিল বক্তৃতা। মাটির দেওয়ালে বড় বড় হরফে প্রার্থীদের সমর্থনে পোস্টার। ভোটের আবেদন। মাটির দেওয়ালে জেল্লা ফেরে এ সময় রঙ-বেরঙের লেখার কারুকার্যে। কোথাও কাস্তে-হাতুড়ি, কোথাও কাটা হাত, কোথাও বা পদ্মফুল, তীর ধনুক। কে একজন দাঁড়িয়েছে কাঁঠাল নিয়ে। পোস্টারও পড়েছে অল্পবিস্তর। দেখে মনে হয় সদ্য গাছ থেকে পেড়ে এনে কেউ ঘরের দেওয়ালে লটকে দিয়েছে। সামান্য কাঁঠালও যে মাটির দেওয়ালে এত সুন্দর করে আঁকা যায় ভোট না হলে কেউ বুঝি বিশ্বাস করত না। অচেনার ছেলেটা ঐ ছবি দেখেই ক'দিন ধরে কাঠাল খাওয়ার বায়না জুড়েছে। ঠাস্ ঠাস্ চড় মেরে ফলটার স্বাদ পাল্টে দিতে চেয়েছিল অচেনা। অচেনা এবার প্রার্থী গ্রাম পঞ্চায়েতে। জিতলে পঞ্চায়েতের মেম্বার হবে। হারলে? কিছুতেই হেরে যাবার কথা চিন্তা করতে পারে না সে। দাড়াতেই চায়নি ভোটে। স্বামীহারা বিধবা সে। বয়সের তাতে পরপুরুষেরা চোখ টাটায়। অচেনার শরম লাগে। তার নাম মানুষের মুখে, ঠোঁটে। পুরুষদের আড্ডায়। মেয়েদের পুকুরঘাটে উকুন বাছাবাছির মজলিসেও। অচেনাকে চিনতে বাকি নেই কেউ। শুধু কি তাই। অচেনার নাম এখন গরমেন্টের খাতায়। কাঁপা কাঁপা মেয়েলি কাঁচা হাতের বুপোটে নিজের নামটা সই করতে পেরেছিল মনোনয়ন পত্রে। তারপর থেকেই অচেনার ঘুম নেই। চোখের পাতায় পাতায় প্রতিদিন জিইয়ে রাখে রাত আর অন্ধকার। মুখে হাই ছেড়ে রাতের নৈঃশব্দের কাঁপন লাগায় অচেনা। কাঁপন বুকেও। কেন সে দাঁড়াতে গেল ভোটে। সেদিন যদি সন্ধেবেলা পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে না পড়ত জলিল। যদি না বলত, ভাবীজান গো, বড় বিপদে পড়ে এলাম। বিপদ। শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে উঠেছিল অচেনার। ছড়িয়ে পড়েছিল জলিল সহ শুকুরালি হেবুল বিলাতের বোঁটকা ঘামের গন্ধ। খুপরী ঘরের কোণে আরও সরে বসে ছিল ও। হাঁটু থেকে কাপড়টা নামিয়ে দিয়েছিল পায়ের পাতায়। জলিল বলেছিল — ভাবী একটা কথা তুমাকে রাখতেই হবে। বলো রাখবে? সরে এসে গলা লতিয়ে দিয়ে কান খাড়া রেখে মোক্ষম উত্তরটা শোনার অপেক্ষায় শুধিয়েছিল আবার।

ভয়ে কাঠ আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল অচেনা। চার চারটি জোয়ান যুবকের খেজুর চাটায়ের উপর বসিয়ে রাখা প্রসারিত তালু চার জোড়া জ্বলন্ত চোখের জিজ্ঞাসু। আতঙ্কে লম্পোর সলতেটো বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমন্ত শিশুটাকে কাঁদিয়ে কোলে বসিয়ে সাপটে ধরে জিজ্ঞাসা করে, কি?

—আমাদের কথাটা রাখতে হবে ভাবী। বলো, ফেরাবে না?

এমন করাল কণ্ঠিতে কেমন সন্দেহ হয়েছিল ওর। কে জানে কি কথা। তবু বলেছিল, রাখবার মতো হলেই রাখবো। ঘাড় তুলতেই অচেনা দেখেছিল, ওদের চোখের তারায় তারায় কম্পমান আগুনের শিখা।

অচেনার কথায় চার চারজন যুবক নড়ে বসে। সামনে থেকে জলিল গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বললে — ভোটে দাঁড়াতে হবে তুমাকে?

আমাকে?

হ্যাঁ ভাবী, তুমাকে। জাবের ভাই আমাদের ভালো কমরেড ছিলো।

আমি পারব না। আমি মেয়েমানুষ।

মেয়েমানুষ বলেই বলছি। গরমেন্টের আইন শতকরা তিরিশ ভাগ আসনে মেয়েরা প্রার্থী হবে।

শুকুরালি বললে — কুন্নো ভয় নেই। তুমার জন্য আমরা জান লড়ে দেব। গভমেন্ট মেয়েদের ইজ্জত দিয়েছে। স্বাধীনতা দিয়েছে। ঘোমটা দিয়ে ঘরে বসে থাকার দিন নাই।

শুকুরালির শেষ কথাটার ইঙ্গিতে আপত্তি জানিয়ে থামিয়ে দিল জলিল, জানো ভাবী, মেম্বার হলে তুমার কাজটা তো আমরাই করব। শুধু বাড়ি বসে সই করে দেবে।

কোলের উপর বসে থাকা বাচ্চাটা কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে গিয়েছে যখন। অচেনা ভেবেছে আকাশ পাতাল। মাথার উপর মানুষ নেই। জীবন যে তার ভেসে আছে নিরালম্ব শূন্যতায়। এক পা ঘরের বাইরে বাড়াতে হাজারো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, মানুষের কটু কথা, অবিশ্বাস, সন্দেহ। অচেনা ঘেমে ওঠে। জলিল তাড়া লাগায় — জবাব খোলো ভাবী। আবুতালিবের মেয়ে মনচেহারা শেষ পর্যন্ত ফেসাদে ফেললে। প্রার্থী হবার কথা ছিল তারই। কিছুক্ষণ আগেই আবুতালিব আমার বাড়ি এসে বলল — বাপু, কিছু মনে করো না এলেমনগরে মেয়ের আমার বিয়ের কথা চলেছে। বোঝোই তো কাচা কাপড় আর যাচা কন্যে। এখন যদি শোনে, মেয়ে ভোটে নড়ছে সব কিছু কেঁচিয়ে যাবে। এরপর তুমিও যদি অমত করো ভাবী মধ্যে থেকে কাশিমের বউ ছকিনা বিনি ভোটে বেরিয়ে যাবে। জলিল অসহায় ভাবে নিজের হাত কচলাতে থাকে। অচেনা পুরুষ মানুষ হলে হয়তো এতক্ষণ হাত দুটো জড়িয়ে ধরত।

জলিলের কথা শেষ হতেই বিলাত বললে — কাশিমের বউ ছকিনা মেম্বার হলে আর কুনোদিন ইলিপ পাবে?

হরকিসিমের অনুরোধ আর প্রশ্নের ফাঁসে গলা শুকিয়ে আসছিল অচেনার। এত দিনে রিলিফ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে জলিল। বিধবা পেনশনের টাকা সেও তো পেয়েছিল পঞ্চায়েত থেকে। লোকটা মরে যাবার পর থেকেই এরাই জ্যান্ত রেখেছে তাকে। এদেরকে কেমন করে বিমুখ করে সে? ছকিনার স্বামী ছকিনাকে ভোটে দাঁড়াতে অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু তাকে? ঘুমন্ত সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে মৃত স্বামীর আদলটা মনে করার চেষ্টা করে অচেনা। সুন্দর স্বাস্থ্য ছিল তার। প্রসারিত বুকের ছাতিতে ছিল এক পরম নির্ভরতা। লাল পতাকার লাঠিতে কাঁধ বাঁধিয়ে ভোটের মিছিল করত। লোকে বলত, জাবের সি পি এম। দলের লোকেরা বলত কমরেড। কোলকাতায় জ্যোতিবাবুর মিছিলে যেত কখনো কখনো। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরত ঘাম জবজবে গায়ে। আজও ভোরে দূরে ট্রেনের সিটি বাজলে অচেনার শরীরে কাঁপন জাগে। অচেনা উঠে বসে। আলো জ্বালে। একজন মানুষ কমরেড হয়ে বাড়ি ফিরবে। মিছিল গেয়ে বসে যাওয়া গলাটা সারাতে সে রাতেই নুন-জল গরম করা। ভাঙা ভাঙা গলায় রেলগাড়িতে বিনে পয়সায় চড়ার অভিজ্ঞতা। মাথার পাক খুলে পড়া কোলকাতার আকাশ-ঘেঁষা অট্টালিকার বিবরণ। মিটিং-এর ফাঁক তালে দেখে আসা যাদুঘর চিড়িয়াখানা রাজভবন পাতাল রেল নাখোদা মসজিদের গল্পের বিনুনী। মনে আছে অচেনার একদিন বলেছিল, তুমারে একদিন লিয়ে যাব কোলকেতাতে। টিক্সি গাড়ি চড়ে দেখবে কি বাহার। কি বাহার।

স্বামীকে এই মুহূর্তে খুব বেশি করে মনে পড়ে অচেনার। ভোট মিছিল কোলকাতার সমাবেশ কিছু একটা হলেই মনটা ভরে ওঠে ব্যথায় বেদনায়। পরের ক্ষেতে জন খেটে যে মানুষ সংসার চালায় সে মানুষটা কি করে কমরেড হয়ে যায়। একদিন বলেওছিল — কমরেড হওয়া যার তার কম্মো লয়, জোতিবাবুই ল্যায্য কমরেড। লোকটা ফিরিস্তা।

এহেন পার্টিভক্ত মানুষটা মরে গেল একলা একলা পেটের ব্যামোতে। সে আজ আড়াই বছর পেরিয়ে। বাবার বাড়ি চলেই যেত অচেনা যদিনা হাতে কাজললতা তুলে দিয়ে যেত। ছ'মাসের ছেলেটা যে তখন বাপ বলতে শেখেনি। আদর করে নাক কাঁপা নাম রেখেছিল, নেনিন। লাল ঝান্ডা কচি হাতে ধরিয়ে বলেছিল — বল বাবা ইনকিলাব —

সেদিন নেনিন লাল ঝান্ডাতে পেচ্ছাপ করেছিল বলে জাবের ক্ষেপে উঠেছিল — হেই নেনিনের মা, দেখি যা নেনিনের কাণ্ড। ব্যাটা বড় হলে মির্জাফর হবে। পতাকার হাল দেখে জোর করে কেড়ে নিতেই নেনিন কেঁদে উঠেছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অচেনা প্রশ্ন করেছিল — হ্যাঁগো নেনিন কাঁদচে ক্যানে? গলা ফাটিয়ে জাবের বলেছিল — কাঁদচে ঝান্ডায় আর একবার পেচ্ছাপ করবে বলে।

ঘরে লম্পোর আলোয় ধুয়ে যাচ্ছিল অচেনার মুখ। নির্বিকল্প বসে জলিল শুকুরালি বিলাত। মাঝে মধ্যে মাটিতে পায়ের পাতা ঠুকে ঝিনঝিনানি কাটিয়ে নেয়। সেই শব্দে নেনিন চমকে ওঠে মায়ের কোলেই। অচেনা বুঝতে পারে তার সম্মতির লগনের ডাক বয়ে যায়। আঁধারের আধারে বেড়ে যাচ্ছে রাত। ঘরের মধ্যে এতগুলো পরপুরুষ পালা করে নিঃশ্বাস নেয়। কে কোন্ কথা এই রাতে রটিয়ে দেবে কে জানে। অস্বস্তিতে আরো ঘেমে উঠেছিল অচেনা। অথচ মুখ থেকে নারাজ হবার কথাটা কিছুতেই মুখের বশে আসছে না। ঘরে জলিলের দেওয়া পঞ্চায়েতের গমের পিঠে এখনো জিয়োনো আছে মালসাতে। অচেনা ঘাড় তোলে। ঘাড় তোলে জলিলসহ অন্যেরা — কথা দাও ভাবী কালই তুমার নামে প্রচারে নেমে যাই। জাবের ভাই থাকলে, তুমার সামনে এমন হত্যে মেরে বসে থাকতে হত না। জাবের ভাইয়ের মত কমরেড হয় না।

নিজের স্বামী সম্পর্কে এমন মূল্যায়ন যখন তখন কি করে না করা যায়। একটা অদৃশ্য বঁড়শির টান অনুভব করে অচেনা। গোটা জীবনের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে যায় সন্ধেতে। লোকটার সঙ্গে যখন প্রথম বিয়ে হয়েছিল তখনই বুঝেছিল খুব বিছানা-ভক্ত মানুষ। বেলা ডুবতে তর সয় না। মালপোকা, গোবরে পোকা উচুঙ্গার কিরি কিরি গজলের তানে সারা অঙ্গ জুড়ে ছন্দের নাচানাচি। এখন! থেমে যাওয়া সুরের ঝংকারে আশ্চর্য নৈঃশব্দ। মুখের ফুঁয়ে লম্পোর আলো নিভিয়ে যে রাতকে সে বিছানায় ডেকে আদর করেছিল। সেই মুখে হাজারো ফুঁ দিয়ে রাতটাকে তাড়াতে পারে না অচেনা। সলতেটা জ্বালিয়ে দেয় আরো। নেনিনের সারা মুখে চিত্রিত হয় জাবেরের মুখ। অচেনা বলেছিল, তেনার সোম্মানে যেদি দাঁড করাতি চাও তাহলি আর আপত্তি নাই।

অচেনার মুখ থেকে ভোটে দাঁড়ানোর সম্মতি আদায় হতেই জলিলসহ প্রত্যেকের দীর্ঘশ্বাসে লম্পোর আলোটা গেল নিভে। অচেনার আঁচল ফুঁড়ে সেই দীর্ঘশ্বাসে পুড়ে যায় বুক। নেনিনকে জড়িয়ে ধরে আরো। নেনিন কেঁদে ওঠে।

ভোটে দাঁড়াতেই নামটা যে এমন ভারী হয়ে উঠবে ভাবতেই পারেনি অচেনা। সাক্ষরতা কেন্দ্রের সদ্যসাক্ষর সে। দেওয়ালে নজর খুঁড়ে খুঁড়ে কোন মতে পড়তে পারে। 'কমরেড অচেনা বেওয়াকে কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিন।' কাস্তের মধ্যিখানে হাতুড়ি। দোমটটা নেমে এসেছে অনেকটা নীচে। নিজের নামের নীচে সিঁথি ভোর ফাঁক রেখে গ্রাম পঞ্চায়েতের আরেক প্রার্থী জলিল। প্রার্থী সুবাদে বেড়েছে নামের জৌলুস — কমরেড জলিল উদ্দীন।

একই প্রতীক। এভাবেই সাফ ছুতরো নামে অচেনা জলিলের নির্বাচনী দেওয়াল লিখন। অচেনার গা'টা ঘুলিয়ে উঠেছিল, এ আবার ক্যামন কতা। — মেয়ে মানুষের আবার কমরেড হওয়া! ছিঃ ছিঃ! কি নজ্জা? জলিলকে বলতেই ও বললে — ভাবী, এতে মনখারাপের কিসে? নামের আগে কমরেড থাকলে ভোটের সময় বুকে বল বাড়ে। তুমি না নেনিনের মা। কথাটা বলে জলিল অচেনার গা ঘেঁষে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই অচেনা সরে দাঁড়ায়। একটা বোটকা গন্ধ ঝাপটা মারে নাকে। আঁচলে মুখ ঢাকা দেয় অচেনা। দেওয়ালের গায়ে নিজের নামের কাছাকাছি জলিলের নামটাও সহ্য হচ্ছিল না। ওর নামের হ্রস্বস্বর দীর্ঘস্বরের চিহ্নগুলো ছুঁয়ে অচেনার নাম। নাম নাকি তার শরীর! কাপড়ে বুক ঢাকে। অঙ্গে অঙ্গে চোখ রেখে দেখে নেয় নিজেকে। এই বয়স এই শরীর, বৈধব্যের ফাটা বসন্তে উগরে আসে বিষাদের ভাব। মনে হয় প্রতি মুহূর্তে তার যেন ধর্ষণ হচ্ছে। নির্বাচনী দেওয়াল লিখন থেকে তার নামটা পেষণ করে দুটো পুরুষালি হাত কুঁড়েঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। অচেনার বেজে ওঠে গা। অন্ধকারের নেনিনকে জড়িয়ে ধরে বুকে।

নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক কর্মীদের তৎপরতা বাড়ছে ততই বেশি। ভোটার লিস্ট মুখে করে ভোটারদের গোত্র অনুযায়ী সম্ভাব্য ভোটের পরিসংখ্যান মেপে ঘাটতি এলাকা চিহ্নিত করা হচ্ছে। অবশ্য গোপনে। পুব পাড়ার হানিফ যদি ডি.আর. ডি.এ লোন না পায় সে ক্ষেত্রে তার ক্ষোভ থাকতেই পারে। পশ্চিম পাড়ার নিছারণ বুড়ি যদি পর পর দু হপ্তা রিলিফ না পায় সেক্ষেত্রে মেম্বারদের মাথা ভিজবে এ সময়। পঞ্চায়েতের প্রার্থী জলিল বোঝে দু-রকম ক্ষোভের গুণগত পরিমাণগত তফাৎটা। নিছারণ বেওয়া মানুষ, এক ভোটের দফাদার। অপরদিকে হানিফের গোষ্ঠী ভোট যদি বেশি থাকে তবে ওর বাড়িতে ঘনঘন চলবে ওঠা বসা। জলিলের ভাষায় এটা হচ্ছে জনসংযোগ। গত পঞ্চায়েতে এই মুষ্টি-যোগের বলেই পঞ্চায়েতের মেম্বার হয়েছে জলিল। এবার পরিস্থিতি অন্যরকম। দাস পাড়ার জগা জগবন্ধু নাম নিয়ে বি. জে. পি র প্রার্থী। একটা কমরেডের এহেন অধঃপতনে চিন্তিত জলিল। যার মুখ থেকে ইন্‌কিলাবের ফোয়ারা ছুটত সে এখন জয় ছিরাম ছাড়া কথা বলে না। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস বহুদিন পরে কাপড় ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আতাহার তাই চটকদারী হাঁটন হাঁটে। দু'দুবার পঞ্চায়েতে হেরে গিয়েও তো আক্ষেপে বলেইছিল, সবাই বলে আছি আছি; ভোটের বাক্সে সবই কাচি।

কংগ্রেসের বাবরি মসজিদের রক্ষার ব্যর্থতা এখন জলিলের মারণ অস্ত্র। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বৈদেশিক ঋণ তেমন কোন কাজে লাগছে না। অচেনাকে বলেছে, এসময় একটু সাফ-ছুতরো থাকতে। পঞ্চায়েতের প্রার্থী বলে কথা! ব্যালট নিয়ে পাঁচ বাড়ি ঘুরতে হবে।

আমাকে? প্রথমে ভড়কে গিয়েছিল অচেনা।

প্রার্থী হয়ে পাড়ায় না বেরুলে হয়? জাবের ভাই কতদিন বাড়ি বাড়ি ভোট চেয়ে বেড়িয়েছে সে তো তুমি জানো। এটাতো সেই জাবের ভাইয়ের পার্টি সর্বহারা পার্টি। চাইতে আর লজ্জা কিসের?

পাড়ায় বেরুনোর নাম শুনে শরমে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছিল প্রায়। জাবেরের কথা ভেবে জলিলের সঙ্গে অচেনা বার হয়। সঙ্গে কুকুর মাছির মত আরো কিছু লোকজন। কমরেড এমন অহঙ্কারী নামের দল কিনা সর্বহারা? কিছুতেই মেলাতে পারে না অচেনা। সে নিজেও একজন কমরেড। ভোট প্রার্থী। এতদিন পঞ্চায়েতের রিলিফে পেট-পোষ গিয়েছে এবার মেম্বার হলে সে নিজেই বিলি করবে গাঁয়ের আর পাঁচটা দুঃস্থ বেওয়াদের রিলিফ। অচেনার হাতে ব্যালট। নকল ভোটপত্র। পাড়ার মানুষ নতুন করে চিনছে অচেনাকে। মৃদু

গুঞ্জন। মায়ের বুকে দুগ্ধপানরত শিশুও একবার ঘাড় ঘোরায়। দ্যাখে অচেনাকে। হানিফের ছেলেটা কি ভেবে বলে উঠেছিল, এমা হিজ্‌রে নাচবো।

প্রথম দিন দলীয় ব্যালট দেখাতে গিয়েই মন ভাঙল অচেনার। গাঁয়ের মেয়ে-বৌদের মধ্যে আঁচলে দাঁত চেপে তির্যক হাসি হেসেছে কেউ কেউ। —মন্দ চরানির মাগির ধোয়ান দেখ। জোয়ান হাতি পুরুষ মানুষটার জন্য একটু শোগ নেই গো — পুব পাড়ার আয়ুব মিয়া বললেন — দিনে দিনে মেয়েমানুষ যে মাথায় তুললে জ্যোতি বোস। হ্যাঁ গো অচেনা, ঈদের চাঁদে ফেৎরা দিই বকরীদের চাঁদের কুরবানীর গোস্ত দিই বলে কি ভোটটাও দিতে হবে তুমায়?

অচেনা ঘোমটা টানে। পাশে থেকে জলিল বললে — ইটা নারী স্বাধীনতা।

সব বুঝি বাপু সব বুঝি, এসব নাফরমানের আজত্ব। রোজ কেয়ামতের আর দেরি নেই।

কথাটা ঠিক বললে না চাচা।

ভুল বললাম কিসে? মেয়েমানুষের সই নিয়ে পঞ্চায়েতে ছুটতে হবে? দেখবে বেগানা মেয়েমানুষ নিয়ে অঞ্চল অফিসটা বালাখানা তৈরি হবে। ইসলাম কুরবানী হবে তুমাদের হাতে।

ধর্মের কথা বলছ? বাবরি মসজিদটা বি জে পি-কে দিয়ে কারা ভাঙালো শুনি? মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল জলিল।

আয়ুব মিয়া একটু হোঁচট খেলেন। বারকতেক দাড়ি চুলকিয়ে বললেন — যারাই ভাঙুক তাতে অচেনার কি? মেয়েমানুষ কি শাড়ি পরে মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়বে? আর তুমরা তো ধম্মো মানো না, আল্লা রসুলে বিশ্বাস করনা, বাবরি মসজিদের জন্য এত দরদ কিসের? কুরান শরিফকে তুমাদের এক নেতাই বলেছে ওটা ছাত্রবন্ধু।

অচেনার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করছিল। ভোটে দাঁড়িয়ে এত মানুষের এত কথা তর্কাতর্কি এ সবই অসহ্য। পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছিল। হয়তো বা সে চেয়েইছিল এই মাটির ভিতর মুখ লুকাতে। ইচ্ছে করছিল একদৌড়ে এখান থেকে পালিয়ে যায়। বলে দেয় জলিলকে সাফ কথা — আঁড় বেধবা হয়ে মেম্বারগিরি সাজে না আমার। বলতে পারেনি। লোকটা কমরেড ছিল। তাছাড়া জলিলও বলেছিল — বিগড়ে যাবার কিছু নেই ভাবী, জেতার পরে দেখবে কত লোক তুমারে লাল সেলাম জানাতে আসে।

কংগ্রেসের প্রার্থী ছকিনার হয়ে ভোট প্রচারে নেমেছে স্বামী কাশিম। অচেনা ঘরে বসে দেখতে পায়। হাতে ব্যালট নিয়ে টহল মারছে পাড়ায়। চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার স্বামী নেই। কেউ নেই। যারা আছে তারা কমরেড। সেই কমরেডরা ভরসা। তাদের সঙ্গেই ঘুরতে হয়েছে পাড়ায় বে-পাড়ায়। কিছু মানুষের কূট বাক্য। তবু তো অনেকে আশা দিয়েছে! নিছারণ বুড়ি দু হপ্তার রিলিফের শোক ভুলে কথা দিয়েছে তাকে, আমার ভোটটা তোর জন্যি তুলা থাকল অচেনা। তুইও বেধবা আমিও বেধবা। বেধবার আর জাত কিসের? ঠিক ঠিক বুঝে নিবি চটের ঘরে। তারপর গলার সুর পাল্টে বলেছে — মিম্বার হয়ে জি. আর ইলিপে ফাঁকি দিসনে অচেনা। বেওয়া মানুষের পঞ্চাই-ই তো স্বামী সতীন।

বেশকিছু নেওয়া ভোট অচেনার পক্ষে। আরো অনেক ভোট আছে সেগুলো না অচেনার না ছকিনার। শুকুরালি বললে — ভাবী, পাড়ায় প্রচারের সময় নেনিনকে সঙ্গে নিয়ো, ওর মুখ দেখে দু'চারটে উড়ো-ভোট পেলেও পেতে পারো।

উড়ো ভোট ধরার জন্য সব দলই ফিঙে পাখির মত চক্কর মারছে। নতুন কৌশল নিয়ে জলিল হানা দিচ্ছে রাত বিরেতে। যে ইব্রাহিম মোল্লা এতদিন হাতে ভোট দিয়েছে সেই লোকটা কাবু হল জায়নামাজের পাটিতে। নামাজের সালাম ফিরিয়ে বসতেই দেখলো জলিলের হাতে

ব্যালট। চাচা কি বলচ? এ এক কঠিন প্রশ্ন। থম মেরে ভাবতে ভাবতে গালের ঘামে দাড়ি ভিজিয়ে জবান দিয়েছিল — ইনশাল্লাহ! অর্থাৎ আল্লা যদি রাজী হয় তো নিশ্চয় পাবে।

এখন প্রতিদিন অচেনার বাড়িতে মিটিং বসছে। জড়ো হয়েছে আরো কিছু তরুণ কর্মী। এদের একবার কমরেড বললে তিনবার মাথা ঝাঁকিয়ে নড়ে বসে। মিছিল গেয়ে গলা ভেঙেছে অনেকের। এরাই তো তার নাম ধরে চেঁচিয়ে ভোট চেয়েছিল। বাতাসে কথার বাড়ি খেয়ে নিজের নামটা ফিরে এসেছিল নিজের কাছে, কমরেড অ-চে-নাকে ভোট দিন।

অচেনার মনে হয়েছিল তার পরনের শাড়িটা খুলে যেন কেউ উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। ক্রমশ নগ্ন হয়ে যাচ্ছে সে। তারপর একটু একটু করে নিজেই ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে সেই জড়তা। পঞ্চায়েতের ভোটে জিতে যাবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার। অচেনা সাহস পায়। এতগুলো মানুষ কমরেড হয়ে তার জন্য লড়াই করছে। অচেনা জল ঢালে গ্লাসের পর গ্লাসে। কাঁচের গ্লাসে স্পষ্ট পাঁচ আঙুলের ছবি। হাতের চুড়িতে ঝুন ঝুন বোল ফোটা শব্দে পিপাসা বাড়ে। ভাবী, এদিকে এ্যাক গিলাস।

অচেনা জলের গ্লাস বাড়িয়ে ধরতেই মধ্যিখানে বিলাতের হাতে গ্লাস আটকায়। আর এক কমরেড জলিল হাত বাড়িয়েই থাকে। বুকের ভিতর তার জ্যৈষ্ঠের খরা বইছে।

অবশেষে সেই কাঙ্ক্ষিত দিনটা এসে গেল নিজে থেকে। এক একজন কমরেড কামানের গোলার মত ছুটছে। দীর্ঘ লাইন পড়ছে স্কুলঘরের সামনে। ভোটদাতাদের হাতে হাতে বুথ শ্লিপ। গোপনে ভোট পড়ছে, হাতে বা কাস্তেতে। কখনো বা পদ্মফুলে, হাত ফস্কে কাঁঠালে। অচেনাও দাঁড়িয়ে এক পাশে। কোলে দামাল নেনিন। শেষ ভোট ভিক্ষার নিঃশব্দ আবেদনে করুণ মুখ। মাথাটা ঝিম ঝিম করছে ঠা-ঠা রোদের আঁচে। অচেনার ঘাম ঝরে পিঠে গালে বুকের চাতালে। সেই ঘামে সিক্ত হয়ে ওঠে বসন। রোদের তাতে নেনিনের কাবাব হয়ে যাবার জোগাড়। মাথার উপর শাড়ির আঁচলে আচ্ছাদিত শরম। অচেনা রোজা রেখেছে। নফর রোজা। এক নাগাড়ে তিনদিন নফর রোজা রাখার জন্য ঘানি গাছের মত শরীরটা ঝলসে গেছে অনেকটা। সারারাত নফর নামাজ পড়ায় চোখের কোণে রাত্রি জাগরণের সুস্পষ্ট ছাপ। এই নামাজ আর রোজা দিল একিনে পালন করতে পারলে হয়তো আল্লা রাজী হবে। পঞ্চায়েতের মেম্বার হবে সে। নামাজের মোনাজাতে দুটো কমনীয় হাত শূন্যে ধরে একসময় অচেনা ডুকরে কেঁদে উঠেছে। জায়নামাজের পাটিতে।

ভোট শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। অচেনা ফিরে এসেছে ঘরে। স্কুল বাড়ির চারপাশে রাজনৈতিক দল আর উৎসুক জনতার ভীড়। গণনা চলছে — অচেনা বেওয়া এক ছকিনা বিবি এক। কিছুক্ষণ আগে জলিল এক চক্কর ঘুরে গিয়েছে। অচেনা তখন সদ্য নফর নামাজ শেষ করে উঠে দাঁড়িয়েছে। বাইরে নড়ে ওঠা অন্ধকার আর পায়ের শব্দে সচকিত অচেনা। ভয়ে সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। কাস্তে হাতুড়ির রঙিন পোস্টার তখনো ঝলসে উঠছে। অচেনা হাত রাখে কাস্তের বাঁটে। ইজ্জত রক্ষার সে এক অনন্য নারী মূর্তি।

ভাবী। জলিলের ডাকে দেওয়ালের কাস্তে থেকে হাত পিছলোয় অচেনার। কেঁপে ওঠে ও। আড়ষ্ট গলায় অচেনা প্রশ্ন করে, কি খবর?

তুমি পঁচিশ ভোটে এগিয়ে আছ এখনও। কাল সকালবেলা আবীর মেখে তোমায় নিয়ে বিজয় মিছিল করব। অন্ধকারে খোদাই করা জলিলের দাঁত দেখে আঁতকে ওঠে অচেনা।

শুনতে পায় বাষ্পিত কণ্ঠস্বর — নেনিন ঘুমুয়েছে? মায়ের হাতে ঝাঁকানি খেয়ে ঘুমন্ত নেনিন আচমকা জোরসে কেঁদে ওঠে।

শুধু জলিল নয়। রাতের ভোট গণনার খবর পালা করে দিয়ে গেছে শুকুরালি বিলাত। বিলাতের শেষ সংবাদ অনুযায়ী পাঁচ ভোটে এগিয়ে অচেনা। তারপর আর কোন খবর আসেনি। উৎকণ্ঠায় অচেনার ঘুম নেই। চারপাশে জমাট অন্ধকার ঝামরে আছে। অচেনার এলোচুল বেয়ে ঘরের মধ্যে সেই অন্ধকার আরো গাঢ়। দুর্জ্ঞেয়। রহস্যময়।

হঠাৎ জোর শব্দ হল। অচেনার শরীরটা নেচে ওঠে। নেনিন ককিয়ে ওঠে। ঘাড় ফেরায়। এক ঝলক তাজা আগুনের দাপাদাপি তার উঠোনে। চোখ ধাঁধরে যায়। বুঝতে পারে ভোটে হেরে গেছে সে।

বন্দেমাতরম্ আর ঘন ঘন বাজির শব্দ। গাছের শেষ পাতা ছুঁয়ে উড়ে যাওয়া পাখির ডানায় যেন হাততালি দিয়ে জেগে ওঠে রাত। ছকিনা বিবির কাছে মাত্র এক ভোটে হেরে যাবার যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ে সারা শিরায় শিরায়। কলজে টাটায় অচেনার। জাবেরের কথা মনে পড়ে। আজ যদি তার স্বামী থাকত তবে ছকিনার কাছে এভাবে হেরে যেত না সে। অচেনা কেঁদে ওঠে। ভোরের ফিকে আলোয় দেওয়ালের রঙিন পোস্টারে পুড়ে যায় তাবৎ শরীর! তার মান-সম্মানের আর কী বা রইল। কী বাকি রইল ইজ্জতের! একটা পাশব শক্তির কাছে যে যেন ধর্ষিত, বিপর্যস্ত। অচেনা শুনতে পায়, ভোরে সিটি মেরে ছুটে যাওয়া ট্রেনের শব্দ বুকের ভিতর কাস্তের দাগ কেটে যায়। আবার যেন সে নতুন করে বিধবা হল।

বুকের উপর একহাতে ধরে থাকা নেনিন অন্য হাতে ন্যাতা অচেনার। সে মুছতে থাকে নির্বাচনী পোস্টার। আর নয়। পঞ্চায়েতের মিম্বার হওয়া সাজে না তার। সে বিধবা-বেওয়া। সে কমরেড নয়। আজ থেকে শুধু নেনিনের মা।

না-শহিদের গল্প

অমৃতেন্দু মণ্ডল

ডানার আড়ষ্টভাবটা কাটিয়ে পাখপাখালি তখন সবে উড়াল দিতে শুরু করেছে। তাদের ডানায় চড়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। অথবা বলা যায় পিঁপড়ের পায়ে আটকে খবরটা চাউর হল। অথবা বলা যায় দুটোই ঠিক।

জগা, দুটো চা। তিন প্লেট ঘুগনি পাঠিয়ে দে জগা। একটা ওমলেট বানিয়ে দাও হে জগা...। তো সেই "জগন্নাথ" খরিদ্দারের কাছে যে স্রেফ জগা — পাখপাখালি উড়াল দেওয়ার কালে এসে তার দোকান খুলতে গিয়ে দেখতে পায় কে একজন শুয়ে আছে তার দোকানের সামনে। স্টেশনের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো তার দোকানের সামনে লোকটা শুয়ে ঘুমচ্ছে।

'কে বাপ ইখানে শুয়ে আচো? দোকান খোলবো যে। আর তো ইখানে ঘুমুনো যাবে না। উঠি পড়ো, উঠি পড়ো।' ঝাঁপ খুলতে খুলতে ঘুমন্ত মানুষটাকে শুনিয়ে কথাগুলো বলছিল জগা। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সে নির্বিকার। নট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু। ঝাঁপ খুলে একশো পাওয়ারের বাতিটা জ্বালিয়ে দিতেই, তার ছিটকে আসা আলোয় স্পষ্ট দেখতে পায় লোকটা শুয়ে আছে। লোক নয় তো — সেই ছেলেটা। নাম হাতড়ে পাওয়া মোটেই শক্ত নয়। এত চেনা। মানব।

ছেলেটা মাঝে মধ্যে কারও কারও জন্যে চা ফা নিয়ে যায় 'জগাদা অমুকদা পাঁচটা চা বলেছেন। রেল অবরোধ কর্মসূচি চলছে তো, যাওয়ার সময় দাম দিয়ে যাবেন।'

অমুকদাদাটি যে কে, জগা কেন স্টেশনের সবাই চেনে তাঁকে। সুতরাং জগা মানবের হাতেই চা পাঠিয়ে দিতে দ্বিধা করে না। আবার অন্য এক পার্টির পথসভা হল হয়তো, স্টেশনের বাইরে, তাদের হয়েও ফাইফরমাস খাটা ছেলেটার কাজের মধ্যে পড়ে।

এই রকম কোনও কাজে এসে একদিন এই জগার দোকান থেকেই তার এই 'মানব' নামটা জুটে গিয়েছিল। তখন সবে মাত্র সে এই স্টেশনে পা রেখেছে। শেকড়বাকড় গজায়নি তখনও। কাউন্টারে বসা টিকিট ক্লার্ক অবনীবাবু তাকে বললেন, 'এই যো ও, আমাকে এক কাপ চা এনে দাও তো জগার দোকান থেকে। ওইই যে দেখা যাচ্ছে যে দোকানটা, বলবে অবনীবাবুর। চিনিছাড়া। গিয়ে বললেই হবে।'

বাবুর তর্জনী অনুসরণ করে যথাস্থানে গিয়ে ফরমাস পেশ করা। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে কাউন্টারের দিকে পা বাড়াতেই এক ফ্যাচাং। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ এক ভদ্রলোক হুট করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী ভাই?'

— আমার নাম? দাঁড়ান আসর্তিচি। চা'ডা টিকিট বাবুরে দে আসি।

ব্যস্তভাবে চা নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ বাদে কাপ আর পয়সা নিয়ে ফিরেও আসে। আসতেই সেই ভদ্রলোক কী ভেবে বললেন, 'দেখো ভাই, তোমার নাম যাই থাক আমি

তোমার নাম দিলাম 'মানব' বুঝলে?' হেসে ঘাড় নেড়ে নিজের নতুন নামটা নিয়ে তা প্রায় জপ করতে করতে চলে যায় সে। সেই থেকে তার ওই নামটাই বহাল হয়ে গিয়েছিল।

স্টেশনের ভেতরে-বাইরে যে দলেরই বক্তৃতা হোক বা যে কোনও কর্মসূচি থাক না কেন মানব সেখানেই আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের বক্তৃতা শোনে। ভেতরে তার বিশেষ কোনও রকম প্রতিক্রিয়া হয় কিনা বোঝা যায় না। পোষা পাখিকে বুলি শেখানোর সময় সে যেমন ঘাড় বাঁকিয়ে শিক্ষকের দিকে অখণ্ড মনোযোগে তাকিয়ে থাকে. মানবও ঠিক সেই আদলে ঘাড়টা ত্রিশ ডিগ্রি বাঁকিয়ে বক্তৃতা শোনে। শুনেই যায়। সে শ্যামবাবুর দলের বক্তৃতা শোনে। মধুবাবুর দলের বক্তৃতা শোনে। আবার সনৎবাবুর দলের বক্তব্য শুনতেও তার সমান আগ্রহ। অবশ্য মানবের এই আগ্রহের ব্যাপারটা বড গোলমেলে। বাইরে থেকে কিছু তো বোঝার উপায় নেই। যে দলের মধ্যে যখন. তখন তাদের হয়ে ফাইফরমাশ খাটে। অবশ্য কাজকর্ম করতে তার নিজে থেকে যে খুব একটা গরজ তাও নয়। যন্ত্রের মতো যে স্যুইচ টিপে চালু করল তার হয়ে কাজে লেগে গেল, সে তখন তারই। এমন কি একই সময়ে দু-তিনজন যদি কাজ করতে বলে মানব সেখানেও তার সাধ্যমত হাত লাগাবে।

শ্যামবাবু মাইক্রোফোন হাতে নেওয়ার আগে জেলুসিল ট্যাবলেটটা জলসহযোগে গিলে ফেলতে চান। তাঁর জন্যে গ্লাস ভরে জল নিয়ে আসতে গিয়ে আর একজনের সঙ্গে দেখা। সে হয়তো বলল, 'চলতো পোস্টারগুলো সেঁটে দিবি।' মানব কোনও রকম আপত্তি না তুলে তাকে বলল, 'দাঁড়ান এক্ষুনি আসছি।' নির্দিষ্ট হাতে জল পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে পোস্টারের পাশে। এক হাতে পোস্টারের বান্ডিল অন্য হাতে মই আর কানে সেই ছেলেটার বক্‌বকানি নিয়ে চলল, 'এদের এইসব বুক্‌নি বুঝলি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা। ওতে শাল্লা আমি ইয়ে করি। লেকচার শুনতে হয় শুনিস নীরেন মুখার্জির। আমাদের পার্টির বাঘা লিডার। ১৫ জুন আসছেন কাছারি ময়দানে। বিরাট জনসভা। শুনিস লেকচাব কাকে বলে। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে।'

লোম খাড়া হয়ে উঠবে না নেতিয়ে পডবে সে ভাবনার মধ্যে গিয়ে লাভ নেই বুঝে যায় মানব। তার চিন্তা খালি পেটে মই বেয়ে খাড়া দেওয়ালে ওঠা নিয়ে।

কিন্তু এই চিন্তারও হয়তো ছোট্ট করে একটা সমাধান হয়ে যায়। পার্টি কর্মী হিসেবে পোস্টার সাঁটা আর তার প্রয়োজনে আঠা ইত্যাদি বানিয়ে নেওয়ার খরচখরচা বাবদ পাওযা টাকার বেঁচে যাওয়া অংশের কিয়দংশ মানবের জন্যে খরচা না করা নিতান্ত অমানবিক হবে, বিশেষ করে তার উপর ন্যস্ত কাজ যখন সেইই কবে দিচ্ছে। এই বোধেই হয়তো পোস্টার সাঁটতে যাওয়ার মুখে জগার দোকান থেকে এক কোয়ার্টার পাউরুটি আর এক কাপ চা মানবের জন্যে বরাদ্দ হয়ে গেল। মানবের এইটুকুই যা লাভ।

কেউ কিছু না দিলে. কারও কাছে কিছু চেয়ে খাওয়া মানবের প্রকৃতি নয়। যে যা দেয় খায়। যে যা কাজ বলে করে সাধ্য মতো। জগতে এমন কেউ কেউ থাকে যারা নিজে থেকে কিছু করে না। তবে যেকোনও কাজ করতে প্রস্তুত। চাই করিয়ে নেওয়ার মতো একজন। তাদের নিজস্ব প্রয়োজনও এতো নগণ্য যে বিধাতাও অবাক হয়ে যান। শুধুমাত্র জীবনধারণের মতো সামান্যতম কিছু পেলেই তারা খুশি যা প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে পড়ে।

এহেন না হক মানুষ মানব যে ঘুমোচ্ছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই জগার। আগলপাগল কিংবা ভিখিরি হলে 'আই ওঠ্, উঠি পড়' এরকম ডাকা যেতে পারত। কীভাবে কেমন সম্বোধন করা সমীচীন হবে এই নিয়ে একটা ঝঞ্ঝাটে পড়ে যায় জগা। ডাকবে — ''মানববাবু উঠি পড়ুন, দোকান খোলবো?'' না তেমন সম্মানধারী ব্যক্তি ছেলেটি নয়। তবে

কী বলে ডাকবে? ডেকে না তুললেও নয়। দোকানটা খুলতে হবে। ঝাঁপের নীচের অংশটা পাতিয়ে দিলে ছেলেটা তো তার নীচে শুয়ে আছে বলে মনে হবে। যেমন কুকুর বেড়াল শুয়ে থাকে। সেটাও বড় দৃষ্টিকটু হবে। ছেলেটার আবার ভাবভালোবাসা আছে পার্টির লোকদের সঙ্গে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আর পার্টি ছুঁলে কত যে ঘা তার ইয়ত্তা নেই। চটালে.আর রক্ষে আছে? চাঁদার রেট ধাঁ করে বেড়ে যাবে না? সেই সঙ্গে দাবড়ানি ধমকানি। যদি বলে, "আমাদের পার্টির ছেলেটা তোর দোকানের সামনে না হয় একটু শুয়েই ছিল, তাই বলে কুকুর বেড়ালের মতো ব্যবহার করলি জগা? জানিস আমরা তোর দোকান এখান থেকে ফুটিয়ে দিতে পারি?"

স্টেশন লাগোয়া, বাজারে ঢোকার মুখে এই ত্রিশঙ্কু জায়গাটায় খুব সমঝে চলে করে খেতে হয় তাদের। দু-তিন পার্টির লোককেই তুষ্ট রেখে চলতে হয়। চাঁদাপত্র দিতে হয় পার্টিফান্ডে। ছেলেটা যদি চটে গিয়ে তার কাছের পার্টির লোকের কাছে লাগিয়ে দেয় — তাহলে? ততক্ষণে পাশের সেলুন দোকানের পরের চা-দোকানের দুলাল এসে দোকান খুলতে লেগেছে। 'হেই দুলাল দেখর্দিনি কী ঝামেলায় পড়লাম। সেই ছেলেডা শুয়ে আচে আমার দোকানের সামনি। দোকান খুলতি পারচিনে।'

— 'আরে তুলে দে না লাথি মেরে।'

দুলালের ভঙ্গি সমাধান মনে ধরে না জগার। 'আরে না না। তুই বুঝতি পারচিসনে। তাহলি তো হয়েই গেলো।'

এই সমস্যার সমাধান করে নিতে হবে নিজেকেই। জগা এবারে শুয়ে থাকা মানুষটার পাশে এসে একটা পুরনো কায়দায় ডাকে, যাতে অসন্তুষ্টির কিছু থাকতেই পারে না। তার নিজেব ছেলের বয়সিও তো বটে। ডাকে, 'ও খোকা, খোকাবাবু উঠি পড়ো। দোকান খোলব যে বাপ।'

তোয়াক্কাই করছে না খোকাবাবু। 'কী ঘুম ঘুমোয় রে বাবা!' সাড়া না পেয়ে বেশ খানিকটা বিরক্তই হয় এবারে জগা। দোকান বন্ধের দিন (যদিও তেমন বন্ধের দিন বলে কিছু নেই। নিতান্ত বেগতিকে পড়ে দোকান বন্ধ থাকলে) বাড়িতে থাকলে তার নিজের গেঁতো ছেলেটাকে সে যেভাবে ঘুম থেকে ডেকে তোলে সেই আদলেও ডেকে দেখল। না কোনও সাড়া নেই। এবারে গায়ে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া না দিলে তো হয় না। ঝুঁকে পড়ে গায়ে হাত দিতে গিয়ে দেখে ছোট ছোট লাল পিঁপড়ের একটা সারি সেই খোকাবাবুর কান থেকে শুরু করে এঁকে বেঁকে কোথাও চলে গিয়েছে। দেখে প্রথমেই গা শিরশির করে ওঠে জগার। যেন ঐ পিঁপড়েগুলোই তার সারা গায়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে শুরু করেছে। বুকের কাছে কুটুস করে কামড়ে সন্দেহের হুল ফুটিয়ে দিল। খুব সন্তর্পণে ভয়ে ভয়ে খোকাবাবুর গায়ে হাত রাখে। 'হে মা কালী, এ যে ঠাণ্ডা বরফ!'

জগা ত্রস্ত হাতে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় তাপ খোঁজে। বুকে, কপালে, হাতে, যেন কোথাও সামান্য একটু হলেও তাপ লুকনো অছে।

নাহ্ কোথাও জীবনের চিহ্ন নেই। খোকাবাবুর মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা ধরে খোলার চেষ্টা করে। না খোলা যাচ্ছে না। আস্তে আস্তে হাতটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দেয়। এবারে যেন অন্য ধারার এক রকমের ভয় মানবের প্রাণহীন শরীর থেকে উঠে আসে জগার নাভির কাছে। কানের পাশে সাঁই সাঁই। গলার মধ্যেটা দলাদলা ঠেকে। সেই ভয় ভয় ভাবটা সামাল দিতেই জগা নিচু স্বরে ডাক পাড়ে, 'হাই দুলাল ইদিকে আয় দিনি একবার। ছেলেটা যে মরে গেচে র‍্যা।'

—সে কি র‍্যা....বলিস কী। থানা পুলিশ হবে যে।

দুলাল শায়িত মানবের পাশে এসে দাঁড়ায়। না ছুঁয়ে দু'হাটুতে হাত রেখে নিচু হয়ে দেখে। সামান্য ভেঙে যাওয়া পিঁপড়ের সারি আবার যথারীতি কিলবিলিয়ে যাতায়াত করছে। প্রথমেই সেইটাতে চোখ পড়তেই দুলাল বলে উঠল, 'তাই তো মরে গেচে যে। পিঁপড়ে লেগেচে দেকচি। মরে ভূত হয়ে গেচে র‍্যা। এখন কী হবে? থানা পুলিশ তো হবেই। পার্টি-ফাটির ঝামালিও হতি পারে।'—'হলি আর কী করা যাবে।' স্বগতোক্তির মতো বিড়বিড় করে জগা।

জগা দোকান খুলতে খুলতেও আর খুলল না। আধ খোলা করে রাখল। রাতে বাড়ি যাওয়ার আগে উনুনের ছাই ফেলে, নিকিয়ে, কয়লা চড়িয়ে রেডি করে রেখে যায়। ভোর ভোর এসে তাতে আগুন দিয়ে আঁচ লাগায়। তড়িঘড়ি চা চাপিয়ে দিতে পারে, যাতে দিনের প্রথম ট্রেনের ওঠা-নামা যাত্রীদের হাতে ধোঁয়াওড়া চায়ের কাপ তুলে দিতে পারে। এতে দুটো পয়সাও আসে তার। আজ উনুনে আগুন দিল না। কাপ-ডিস সাজাল না। আজ তার কিছুতে আর মন নেই। কী রকম ভার ভার শিরশিরে ভাব নিয়ে ভূতগ্রস্তের মতো আধ খোলা দোকানটায় বসে থাকে জগা। ভালো করে আলো ফোটার অপেক্ষায় থাকে।

পাতলা আঁধারে মোড়া সেই ভোর যখন আলোর আলখাল্লা চাপিয়ে সকাল হয়ে এল তখন সবাই দেখল জগার দোকানের সামনে বেশ একটা জটলা। জটলা ঘিরে মৃদু গুঞ্জন।

— হাবভাব দেখে তো মনে হয় স্যুইসাউডাল কেস। বাড়িতে মা-বাবা, ভাই-বোনকে খেতে দিতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে।

— মানছি স্যুইসাইডাল কেস, তবে আপনি মশায় যা ভাবছেন তা নয়। কারণটা নারীঘটিত। বয়সটা ওয়াচ করেছেন?

— আই অ্যাম সিওর, বিলাভেডকে না পেয়ে স্যুইসাইড করেছে পয়জন খেয়ে। ভিসেরা টেস্ট করে দেখুন গাদাগাদা পয়জন বেরোবে।

— আহারে ছেলেডা না খাতি পেয়ে মইরে গেল গো! হায় ভগবান মনিষ্যিজন্ম দে পাঠালে ভবে, তার তরে খাইদ্য দে পাঠালে নে!

— বোধ হতিচে ফিটির ব্যামো ছেলো। রাত-বিরেতে ফিট হইয়ে পড়েচে। দেকার নোক হইনি, মইরে গেচে।

— আরে বাবা যা দিনকাল তাতে ও মরে বেঁচেছে। বেঁচে থাকাটাই বড়ো কষ্টের।

সেই জটলা — তার ভেতরে-বাইরে বহুক্ষণ যাবৎ কোনও রকমফের হচ্ছিল না। রকমফের হল স্টেশনেব অন্ধ ভিখিরিটা এসে পড়ায়। বিস্তর গুঁতো খেতে খেতে ভিক্ষে করে বেড়ায়। 'আমারে এট্টু ভেতরি যাতি দ্যাও বাবা। আমি এট্টু দেকি কেডা মল।'

— তুমি দেখতে পাও যে দেখবে?

— দ্যাও বাবা এট্টু দেকতি দ্যাও।

— দেখি একটু সরে ভাই। জনৈক মজা পিপাসু ছোকরা ভিড় ঠেলে ভেতরে নিয়ে যায় তাকে। লাঠিখানা পাশে রেখে অন্ধটি শবের পাশে বসে। চোখে মুখে উদ্বেগ। আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। কাঁপা কাঁপা আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে দেখে বোজা চোখের পাতা ভুরু। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। দিতে থাকে। অন্ধের হাতের কম্পমান আঙুলগুলো আঙুল নয়, যেন জমাটবাঁধা স্নেহ-মায়া-মমতা-সমবেদনার নরম শাখা-প্রশাখা। শব্দহীন। শুধু তিরতির করে কাঁপছে অন্ধের ঠোঁট দুটো। বিড় বিড় করছে। শব্দহীন কথার তীব্রতা বড়ো মর্মস্পর্শী হয়। নষ্ট ডিমের ঘোলাটে অ্যালবোমিনের মতো চোখ দুটো দিয়ে টসটস করে কয়েক ফোঁটা

জল গড়িয়ে পড়ল মৃতের বুকে মুখে। তারপর মুখ নামিয়ে এক সময় মৃতের কপালে একবার চুমু খেল ধীরে। তারপর সে চলে গেল লাঠি ঠুকে ঠুকে।

এরপরের দৃশ্যগুলো বেশ বেগবান। এক সঙ্গে পাঁচ-সাতটি টগবগে ছেলে এসে হাঁকডাক শুরু করল। 'কোন হারামির বাচ্চা খুন করল আমাদের কমরেডকে? শালারা বড্ড বাড় বেড়েছে।'

বিস্তর হম্বিতম্বির মধ্যে কথাগুলো যে ছেলেটি বলল সে শ্যামসুন্দরবাবুর দলের ছেলে। অ্যাকটিভ ওয়ার্কার। পরনে লালজামা। বাবরি কাটা চুল। সে আবার বললে, 'ডেড বডি নিয়ে প্রসেশন বার করতে হবে। শ্যামদাকে খবর দে। সবাইকে ডেকে আন। এক্ষুনি একে নিয়ে প্রসেশন করে গোটা এলাকা ঘুরতে হবে।' হঠাৎ সে কণ্ঠস্বর উঁচিয়ে বলে উঠল, 'শহিদ স্মরণে জীবনে মরণে রক্ত ঋণ শোধ করো, শোধ করো...।' তার সঙ্গে কোরাসে কণ্ঠ মেলাল তার অনুগামী পাঁচসাতটি ছেলে।

প্রায় বৃত্তাকার ভিড়ের ব্যাসার্ধ বরাবর উলটো দিকে দাঁড়িয়ে আর একটি যুবক। পরনে তার নীল জামা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মধু সরকারের দলের লোকাল কমিটির একজন তরুণ তুর্কি বলা যায়। প্রায় বিজ্ঞাপনি স্টাইলে দাঁড়ানো। তো সেই নীলজামা এবারে মুখ খুলল। 'খুব যে রোয়াবি দেখানো হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এ ডেডবডি আমাদের। মানব আমাদের পার্টি ওয়ার্কার। পরশুদিন ও আমাদের সঙ্গে মিছিলে গিয়েছিল ব্রিগেড-প্যারেড-গ্রাউন্ডে। আমাদের শহিদ। প্রসেশন করতে হয়, একে নিয়ে আমরা করব।'

তার সঙ্গে পোঁ ধরা তিন-চারটি ছেলে সেই কথার প্রতিধ্বনি তুলল। আবেগমথিত স্বরে নীলজামা বলে উঠল, 'শহিদ তোমায় ভুলছি না, ভুলব না।' অন্যেরা তাতে দোহার দেয়, 'ভুলছি না, ভুলব না।'

সেই ভিড় বৃত্তের কোনও একটা জ্যা বরাবর দাঁড়ানো গেরুয়া পাঞ্জাবি ও গলায় কণ্ঠি পরা মাঝবয়সি একটি লোক অনেকক্ষণ ধরে উসখুস উসখুস করছিল। তো সেই গেরুয়া পাঞ্জাবি এবারে মুখ খুলল, 'শুনুন বাবা সকলেরা একটা ভুল হচ্ছে আপনাদের। আপনারা মিছিমিছি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ঝঞ্ঝাট করছেন। মানব আমাদেরই লোক ছিল। ও আমাদের হয়ে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার মেরেছে। চাঁদা তুলেছে। ওই যে, দেখছেন নতুন শিব মন্দিরটা, সে তো সেই চাঁদার টাকায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। তাতে কি বোঝায় না ছেলেটা আমাদেরই দলের একজন বীরসেবক ছিল? একে নিয়ে গিয়ে আমরা বৈদিক মতে সৎকার করব। ওর আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পাবে।'

শবের দখলদারি নিয়ে যখন বিস্তর জলঘোলা হচ্ছে তখন সত্যিই একটা নিরেট সমস্যা দেখা দিল। চোখে বেশি পাওয়ারের চশমা আঁটা বিজ্ঞদর্শন এক বয়স্ক ভদ্রলোক মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে স্টলায় এসে আটকে পড়েছেন— নিরপেক্ষ ভঙ্গিতে তিনি বললেন, 'ডেডবডিটা ছাড়পত্র পাওয়ার আগেই আপনারা বডির ডিমান্ড নিয়ে অযথা খেয়োখেয়ি করছেন। ইটস এ কেস অফ অ্যাব-নরম্যাল ডেথ। সুতরাং পোস্টমর্টেম তো হবেই। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে না পেলে তো একে আপনারা কেউ ছুঁতেও পারবেন না।' বিবদমান লালজামা-নীলজামা ও গেরুয়া পাঞ্জাবি এতক্ষণে এই একটা জায়গায় একমত হল। 'তা ঠিক, তা ঠিক।'

মর্নিং ডিউটির স্টেশন মাস্টার ইতিমধ্যে খবরটা শুনেছেন। রেল পুলিশের ব্যারাকেও যে খবরটা এতক্ষণে পৌঁছয়নি তা নয়। তবে ব্যাপারটা গায়ে মাখতে হয় বলে গা করছিলেন না। শেষে কয়েকজন পাবলিক রেল পুলিশের ব্যারাকে খবরটা খোদ গিয়ে জানালে আইন মোতাবেক একজন আর-পি-এফ অফিসারকে অকুস্থলে আসতেই হল। তিনি দেখে শুনে ভোজপুরি গোঁফ

মোচড়াতে মোচড়াতে বললেন, 'ইয়ে তো রেলওয়ে ইলাকাকে অন্দর নেহি হ্যায়। হমলোগ কুছ নেহি কর সকতে, সমঝে?' আর-পি এফ অফিসার সপার্ষদ ফিরে গেলেন।

পরে। আরও কিছুক্ষণ পরে একটা পুলিশ জিপ এসে থামল। রাশগম্ভীর পদক্ষেপে ভিড়ের দিকে এগিয়ে গেলেন লোকাল থানার সেকেন্ড অফিসার। সঙ্গে দু'জন সেপাই ও লোকাল কমিটির সম্পাদক শ্যামসুন্দর ঘোষাল। পুলিশ আসতে ভিড় একটু পাতলা হল। রুল উঁচিয়ে আরও পাতলা করে দিল সেপাইদ্বয়। 'ভিড় ভাঙুন, ভিড় ভাঙুন।' দেখার কী আছে? যে যার কাজে যান। এখানে দাঁড়াবেন না।" অফিসার এসে মৃতদেহ যেখানে পড়ে রয়েছে সেই জায়গাটা নিরীক্ষণ করলেন। স্টেশনের রেলিঙ-এ ঠেস দেওয়া জগার দোকান। তাতে বিমর্ষ প্রেতাত্মার মতো স্বয়ং জগা বসে। অফিসার দেখে নিতে চাইলেন জায়গাটা সত্যি সত্যি তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে কিনা। 'আচ্ছা শ্যামবাবু কেসটা কি আমাদের জুরিসডিকশনের মধ্যে পড়ে? ভাল করে দেখুন তো। শেষে আবার ফেঁসে না যাই।'

—'হ্যাঁ স্যার, এটা আমাদের এলাকার মধ্যেই পড়ে। দেখছেন না আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির পাকা রাস্তা এই অবধি এসেছে। তবে এটা ঠিক, জায়গাটা রেলেরই। জনসাধারণের সুবিধার্থে আমরা রাস্তাটা এই পর্যন্ত টেনে দিইচি। রেল রেলিঙের বাইরের কোনও কেস রেল পুলিশ নেয় না। এটা আপনাকেই টেক-আপ করতে হবে।

শ্যামসুন্দরবাবুর কণ্ঠস্বরে এমন এক ধরনের সাংগঠনিক জোর ধ্বনিত হল যে — তাইতেই ডায়েরি বার করে নোট নিতে শুরু করলেন পুলিশ অফিসার। ঘুরে দাঁড়িয়ে মানবের মৃতদেহ দেখে দেখে কী সব লিখতে লাগলেন। তারপর প্রথমে জগাকে, পরে পাশের আরও কয়েকজন দোকানদারকে কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদকে ঝামেলা এড়িয়ে চলা অতি শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষ জেরা ভাবে। তো সেই জেরার ভয়ে ভিড় একেবারে পাতলা। ঝুটঝামেলার মধ্যে কে যায়? সেপাইকে দিয়ে ডাকিয়ে আনা অনাদি স্টুডিওর ফটোগ্রাফার গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে হাজির। অফিসারের নির্দেশমতো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ক্লোজ-আপে শট নিল তিন চারটে। শক্ত কাঠি পুঁতে মৃতদেহের চারপাশের জায়গাটা ঘিরে দেওয়া দরকার, তদন্তের স্বার্থে অফিসার একজন সেপাইকে নির্দেশ দিলেন, 'রাম সিং লছমন কি তরা এক গণ্ডি খিচ্ দো'। আর বলতে হয় না। পোক্ত হাতে রাম সিং খড়ির গণ্ডি এঁকে দেয় মানবের মৃতদেহের চারপাশে। হাত-পা ছড়িয়ে এমন আকৃতি নিয়ে মৃতদেহটি পড়েছিল যে — তার মাথার দিকটা যেন হয়ে গেল উত্তর ভারত। পায়ের দিকটা দক্ষিণ ভারত। ডান হাত বাম হাত পূর্ব-পশ্চিম। সব মিলিয়ে মৃতদেহে, চারপাশের খড়ির ঘেরটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো দেখাচ্ছে প্রায়।

এরপর মৃতদেহটি চাটাইয়ে মুড়ে বেঁধেছেঁদে একটা রিক্সাভ্যানে চাপানোর ব্যবস্থা হয়। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ ভ্যানওয়ালা পেশির বারো আনা শক্তি চেন ও চাকায় প্রয়োগ করে মৃতদেহটি সোজা নিয়ে গিয়ে তোলে জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে। পুলিশ-প্রশাসনের কথামতো জরুরি ভিত্তিতে পোস্ট মর্টেম করানোর ব্যবস্থা হয়। এক রাজনৈতিক খুন সন্দেহে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পোস্টমর্টেমটি করা হয়।

পুলিশ অফিসারের হাতে রিপোর্টটিও এসে যায় যথা সময়ে। রিপোর্ট শিটটি দেখে মাথা চুলকোলেন অফিসার। তাঁর ধারণার সঙ্গে কিছুই মিলছে না রিপোর্টে। উসখুস করেন।

ময়না তদন্ত হয়ে যাওয়ার পর মৃতদেহ ছোঁয়ার কোনও অসুবিধা নেই। সাধারণ ক্ষেত্রে সৎকারের ব্যবস্থা করাই বিধেয়। কিন্তু এতো যে সে মড়া নয়। এটাকে দিয়ে আরও একটা উদ্দেশ্য সাধন না করে কিছুতেই ছাড়া নেই।

মরা বিকেল অথবা বলা যায় হব হব সন্ধ্যা নাগাদ মর্গ থেকে ডেড-বডি স্টেশনের পাশে গ্রিলঘেরা ডিম্বাকৃতি জায়গাটা যেখানে একটি শহিদ বেদিও আছে, সেখানে ফেরত এল। এবং তা কাদের ব্যবস্থাপনায় সে বিতর্কের মধ্যে নাই বা গেলেন। একটা কারণ এই হতে পারে যে — এখান থেকে মানবের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা রওনা হয়ে এলাকার ছোট-বড়ো প্রধান কতকগুলি রাস্তা পরিক্রমা করে যেতে সুবিধা হয়।

জগার দোকানের সামনের দশগজ দূরে সেই গ্রিলঘেরা শহিদ বেদি, সেখানে অতএব ভিড় হওয়াই স্বাভাবিক। অফিসফেরত যাত্রীদের কেউ কেউ উৎসুকভাবে দাঁড়িয়েও পড়েছেন সেখানে। ফলে ভিড়টা বেশ জমজমাট। ব্যাপারখানা তো যে সে নয় — যাকে বলে ভি-আই-পি মড়া। সকালবেলার সেই লালজামা ও নীলজামা হাজির। ভিড়ের মধ্যে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গী সংখ্যাও প্রচুর। ডেডবডির ডিমান্ড নিয়ে মারদাঙ্গা হওয়ার আশঙ্কায় আগে থাকতে পুলিশ পোস্টিং করা হয়েছে সেখানে। তারা ভিড় সামলাচ্ছে।

সামনে পুরসভার নির্বাচন।

বিরোধী পক্ষের উপর খুনের দায়ভার চাপিয়ে নিজেদের ভাবমূর্তি মেরামতি ও চকচকে করার ব্যাপারে শহিদের শব নিয়ে শোভাযাত্রা করাটা প্রায় নির্বিকল্প। সুতরাং মানবের ডেডবডিটা চাইই চাই।

পুলিশ অফিসার জিপ হাঁকিয়ে সেখানে এলেন। কয়েকজন তাঁর দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'রিপোর্টে কী পাওয়া গেল স্যার? শরীরে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল?'

— না।

ভিসেরায় কোনও বিষ পাওয়া গেছে?

— না, এক ফোঁটা নয়।

— তেমন কোনও ব্যামো ছিল যাতে.......?

— না।

— তবে মরলটা কী ভাবে?

— ভিসেরা টেস্টে জানা গেছে ছেলেটার পাকস্থলিতে এক কণাও খাবার ছিল না। পাচক রসে জীর্ণ হয়ে হয়ে পাকস্থলির দেওয়াল মারাত্মক রকম চুপসে ছিল একেবারে।

— তাহলে বলুন, না-খেতে পেয়ে মারা গেছে!

— হ্যাঁ ঠিক তাই।

— ইস!

বাড়তি কৌতূহলি চ্যাংড়া গোছে একটি যুবক জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলেটা হিন্দু না মুসলমান, হিঃ হিঃ?'

প্রশ্নটা অবান্তর। তথাপি পুলিশি চোখে প্রশ্নকর্তাকে জরিপ না করেই এবং বিরক্ত না হয়েই পুলিশ অফিসার বললেন, 'আর ও হ্যাঁ, কথাটা বলতে ভুলে গেছি — পোস্ট মর্টেমের সময় ছেলেটির পুরুষাঙ্গে ছুন্নতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।'

পুলিশ অফিসার চলে গেলেন।

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট ছাড়াও আরও কতকগুলো তথ্য জানা গেল মানব সম্পর্কে। মাথাগোঁজার মতো কোনও আস্তানা ছিল না তার। একটা পুরনো জামা আর ছেঁড়া একটা প্যান্ট ছাড়া আর কোনও পরিধেয় ছিল না। অক্ষরজ্ঞান ছিল না। এবং নিজের আহারটুকু উপার্জন করে নিতে পারে এমন কোনও কর্মসংস্থান তার ছিল না। সব মিলিয়ে প্রাপ্ত তথ্যগুলো জোড়া দিলে এই দাঁড়াচ্ছে যে ছেলেটির খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান বলে কিছুই ছিল না। শিক্ষা

ছিল না। এবং পুরোপুরি বেকার ছিল। এই অবস্থায় না খেতে পেয়ে মারা গিয়ে ভারতবর্ষের মানচিত্রের আকৃতি নিয়ে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল মানবকে।

জীবদ্দশায় ওইসব মৌলিক চাহিদা ছিল ছেলেটার। সেগুলো পূরণ করার দায়ভার ছিল যাদের উপর, তারা তা পূরণ করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত না খেতে পেয়ে মানব মারা গেল। এ হেন ডেড-বডির দাবি করে কী করে? জনমত বড়ো বিষম বস্তু। হিতে বিপরীত হতে কতক্ষণ? সামনে পুরসভার নির্বাচন। এ সময়ে এরকম উটকো ঝুঁকি নেয় কেউ? অতএব সেই নীলজামা পিঠটান দিল। একই কারণে সাঙ্গোপাঙ্গ সহযোগে লালজামা সরে পড়ল। আর সেই গেরুয়া পাঞ্জাবি — সে এল বেশ একটু দেরিতে। এসে কথাবার্তার গাদ থেকে ময়না তদন্তের ফলাফলটুকু তুলে নিল। নিয়ে যে বেগে এসেছিল, সেই বেগে ফিরে যেতে চাইছিল। ঠিক তখন বেশি পাওয়ারের চশমা পরা বিজ্ঞ চেহারার সেই বয়স্ক ভদ্রলোক যিনি প্রাতঃভ্রমণে এসে দৈবাৎ হাজির হয়েছিলেন ভিড়ে, তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই যে মশায় শুনছেন? পোস্টমর্টেম তো হয়ে গেছে। এখন ডেড বডি নিতে তো কোনও অসুবিধে নেই।'

-- না মানে.... একটু অসুবিধে আছে।

— কী অসুবিধে? আপনিও তো ওবেলায় ডেড বডি নিতে চাইছিলেন। বললেন বৈদিক মতে সৎকার করবেন, যাতে মানবের আত্মা স্বর্গে গিয়ে শান্তি পায়। তা আর তো কোনও অসুবিধে রইল না, নিয়ে যান। ওর আত্মার যাতে শান্তি হয় সেইভাবে বৈদিক মতে সৎকার করুন।

—করতাম। করতামই তো। কিন্তু মুশকিল হল ছেলেটা যে মুসলমান, হিন্দু হলে করতাম।

— সে কী মশায়, আপনি না ও বেলায় মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করছিলেন? তা আত্মার আবার হিন্দু মুসলমান কী? তার আবার কোনও জাত হয় নাকি? ছেলেটা না হয় মুসলমানের ঘরে জন্মেছিল, ও তো সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান অন্য যে কোনও ঘরেও জন্মাতে পারত। তাহলে?

— তাহলে যা হয় হত। কিন্তু আদতে তো মুসলমান।

— না আদতে ও মানব। মানুষ। সবাই ওকে ওই নামেই জানত। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বরে একটা জোর মিশে থাকে যা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে বেশ মানানসই।

মানবের শব নিয়ে দাবি তুলেছিল যারা, তারা যে যার চলে যাওয়ায় আর কী-ই বা মজা থাকতে পারে? সুতরাং স্টেশনের বাইরে গ্রিলঘেরা ডিম্বাকৃতি জায়গাটায় সিমেন্ট বাঁধানো শহিদ বেদির পাশে যেখানে মানবের মৃতদেহ শায়িত ছিল, তেমনই থাকল। তাকে ঘিরে আর কোনও ঔৎসুক্য নেই বললেই চলে। শুধু বাজার ফেরত কিংবা ট্রেন থেকে নেমে আসা যাত্রীর কারও কারও চোখ আলটপকা সেদিকে চলে গেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে পরে প্যাচ করে এক খাবলা থুথু ফেলে যে যার চলে যাচ্ছে।

এইভাবেই রাত গড়িয়ে গেল অনেকটাই। স্টেশনের রেলপোর্টার মঙ্গল এসে বলল, 'আচ্ছা জগাদা মড়াডার কী হবে বলো দেকিনি, ওইখেনেই পড়ে থাকপে? পার্টির লোকেরা তো খুব করল। ছিঃ ঘেন্না ঘেন্না!' এরপর মঙ্গলের কথাগুলো ভিজে ভিজে শোনায়। 'মানবদাদা আমাদের কত ভালোবাসত। আমাদের সমুস্যে নে মাথা ঘামাত। সে না খাতি পেয়ে মরে গেল, আর আমরা তার জন্যি কিছু করতি পারব না?'

—'কিছু এট্টা না করলি হবে কেন? মঙ্গল। কিছু না পারি খোকাবাবুর সংকারের এট্টা ব্যবস্থা করতিই হবে। ভাই মঙ্গল তুই আরএকজনেরে ডেইকে নে আয়। আমি এদিক থেকে দুলালরে ডেইকে নিচ্চি।'

ঠিক পাশের সেলুন দোকানের যোগেন বারিককে ঝাঁপ বন্ধ করতে দেখে তাকেও ডাকে জগা, 'যোগেন, ভাই চল খোকাবাবুর মড়াডার এট্টা সৎকার করে আসি।' যোগেন সিঁটিয়ে গিয়ে বলে, 'আমার কাচে মাদুলি আচে। আমি বাপু মড়াফড়া ছুঁতি পারব না।' অগত্যা দু'জন রেলকুলি ও দুলাল ও জগাকেই উদ্যোগ নিতে হয়। মঙ্গল আর খাদেম গিয়ে এক শিশি আতর আর ধূপ কিনে নিয়ে এল। বাঁশ কিনে ভারা বানানোও হল চটপট।

চারজন মিলে যখন মানবের শব কাঁধে তুলল তখন তারা লক্ষ করল গোটা আকাশ যেন ফেটে গেছে। চৌচির মেঘে ঢেকে আছে আকাশ। না-বৃষ্টি না-হাওযা। বিশ্রী গুমরানো ভাব। কাঁধে শব নিয়ে সমান তালে হাঁটতে হাঁটতে শববাহকদের মধ্যে কথা হয় :

— পার্টির দাদারা থাক্‌তি মানবদাদা শেষ পরযন্ত না খাতি পেয়ে মরে গেল!

— মানবদাদারে দেকার কেউ হলনি।

— অথচ দেকো ভাত কাপড় রুজিরোজগারের লোভ দেকিয়ে বাবুবা পার্টিতে নে আসে।

— আচ্চা বল দিনি পার্টি মানে কী?

— পার্টি মানে? পার্টি মানে হল গে মিটিঙ। মিছিল। আরও লম্বা মিছিল।

— ধ্যাৎ পার্টি মানে চাঁদা। ভোট। আর খ্যাম্‌তা দখলে রাকা।

— পার্টি মানে হরতাল। পার্টি মানে খুন খারাবি।

— ভাত কাপড়, রুজিরোজগারের সুবিধে তো হয় না। আমাদের দিন তো বদলায় না।

শেষের কথাগুলো বলে ফুটো বেলুনের মতন একটা দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়ে দেয খাদেম।

মাথার উপর চৌচির মেঘেঢাকা সেই আকাশ আর কাঁধে শব নিয়ে শববাহকেরা বাবোযাবি কববখানায এসে পৌঁছল। শবাধার নামিযে বাখলো।

জগা আব মঙ্গল হ্যারিকেন হাতে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এখন তাদেব প্রথম কাজ হল সাত পো পবিমাণ একটা ফাকা জাযগা খুঁজে বার করা, যেখানে মানবেব দেহটিকে মাটিব নীচে শুইযে রাখা যায়। কিন্তু ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা অত কবরের ভিড়ে তেমন সুবিধাজনক একটা জাযগা পাওয়া তত সহজ নয়। ওরা খোঁজে। খুঁজতে থাকে।

পৃথিবী

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

জীবনভর কম দুঃখ পেল না সীতাবতী। তার বাপ মরেছিল রাজনৈতিক দাঙ্গায় — উলুখাগড়ার প্রাণ তাই আসতেও যতক্ষণ যেতেও ততক্ষণ। এক কাটের ফ্রক পরে সে তখন বাতাসি মাস্টারের পাঠশালে পড়তে যেত। কানে খুব খোয়া হত, কথা ভালো শুনতে পেত না সে। পুকুর কাটাই হলে পাড়ে পড়ে থাকা গ্রীষ্মের পাক ফাটা মাটিতে খুঁটে খুঁটে খুঁজে নিত শুকনো পানিফল, শালুকের গেঁড়। আগুনে পুড়িয়ে তাই খেতে ভালোবাসত। এই তার শৈশবের ভালোবাসা। বাপের মৃত্যুতে চোখের জল ফেলতে পারেনি সীতাবতী, গভীর জ্বরে ঘুমিয়ে ছিল তখন। খুব জ্বর হত তার। কচিকালের দুঃখ আর ভালোবাসার ইতিহাস বলতে এটুকুই তার মনে পড়ে।

তারপর প্রখর রোদের জ্বালায় ফেটে গেল সেই কচি প্রাণ। শক্তসামর্থ তেজালো চেহারার পাকা ছাতিম গাছটায় ফুল এল। অন্যরকম এক গন্ধ পেল সীতাবতী। কেমন একটা মাতন লাগল শরীরে। পুকুরঘাটে নাইতে গিয়ে শিমুলি পাতায় জল টলমল দেখল। আহা কি ভালো লাগল তার। ঘাট থেকে উঠে আসার সময় নিজে নিজেই বুকে গামছা পেতে দিতে শিখে গেল।

এখন সীতাবতীর গায়ে খড়ি ফুটছে। মাথার চুল গ্রীষ্মের ঝলসানো ঘাসের মতো ধূসর। মাখতে পরতে মানা, তার মাছ খেতে নেই — নিরামিষ। অশৌচের দিন মনে আর শরীরে শুদ্ধ থাকার বিধান। মা মরেছে যক্ষ্মায়। একমাসের মাথায় ভাই কলা চটকে বামুন ডেকে শ্রাদ্ধ করবে। আকাশের রোদ খেয়ে ধান শুকোচ্ছে উঠোনে, কুটলেই আতপচাল। রাতের বেলা সীতাবতীর শরীর ফাটে, পোড়ে, জ্বালা ধরে। একা একা শুতে পারে না সে। নিশি জাগরণে রাত কেটে যায়। মাঝরাতে কামারের হাপরের আগুন খেয়ে মদ্যিগগনে যখন চাঁদ জ্বলছে তখন সীতাবতী তাকিয়ে আছে ডোবার পাড়ে তাদের কলাগাছটার দিকে। ডোবার ধারে ভেজা এঁটেল মাটি হলুদ, জ্যোৎস্নায় মেয়েমানুষের ডৌল উরুর মাসের মত চিকচিকায়। জল পায় আরশীর চরিত্র। তাকালে মুখ দেখা যায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে গাছটার বাড়ন্ত কলার ফানা ছায়া ফেলেছে জলে। আঙুলের গিঁট গুনে সীতাবতী হিসাব করে, আরো দশদিন পরে ঘাট ..... ক্ষৌরকর্ম। এগারো দিনের দিন শ্রাদ্ধ।

মধ্দুয়ারে পাতা খেজুর পাতার তালাইয়ে শুয়ে ছিল সীতাবতী। কি মনে এল কে জানে। সে উঠে এসে দাঁড়াল ডোবার ধারে। দেখল কলার কাঁদি থেকে আকাশের দিকে জেগে উঠেছে একটা কচি পাতা। তীব্র কোনো তলোয়ারের মতো দৃঢ়, ধারালো। গাছটার গোড়ার দিকে তাকাতেই বুকটা ধ্বক করে ওঠে সীতাবতীর — জায়গাটা কালো হয়ে আছে, আর মাটি থেকে কয়েকটা পিঁপড়ে বেছে বেছে কি যেন খাচ্ছে। নিচে ডোবার জল, ওপরে ঝুঝকা আঁধারে ছাওয়া আকাশ — মদ্যিখানের ফাঁকা ছিদ্রহীন পৃথিবীতে সীতাবতী তার মায়ের মুখ দেখতে পেল। আর ভয়ে ভড়কে গিয়ে কঁকিয়ে উঠল, ...আঁ......

তারপর আবার থিতু। চতুর্দিক স্থির। ঈশ্বরের মহিমা দেখা যায় সসাগরা চরাচরে। সীতাবতী তাকিয়ে দেখল ঘরের চালের মটকায় কেমন পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে একটি গোল পেট-ঢপকা লাউ। আবার ফিরে এসে সে শুয়ে পড়ল তার নিদেন বিছানায়।

১৩ বছর বয়সে সীতাবতীর বিয়ে হয়েছিল জংলাদেশে। ভঞ্জভূম পরগণার কাশীডাঙায়। তমালের কূলে। রাঢ় মাটির যেমন ধরন ....মাটিতে বালির ভাগ বেশি। শসা, ফুটি, তরমুজ ভালো ফলে। ধানে মন্দা যায়। দু বছরের মাথায় লোকটা অন্য মেয়েমানুষ নিল, ছেড়ে দিল সীতাবতীকে। মেয়েটা ড্যাং ড্যাং করে ফিরে এলো বাপের বাড়ি, কিন্তু দুঃখ পেল না।

নিজের মানুষের সঙ্গে শুয়ে শুয়ে সীতাবতীর এক বদ অভ্যার্স হয়ে গেছিল। একা একা আর শুতে পারত না সে। তাই বাপের ঘরে এসে শুল মা কিরণীর সঙ্গে। কখনো জড়িয়ে ধরে, ঘুমোতে ঘুমোতে গায়ে মাথায় পা তুলে দেয়। গুড়েবাগান পুকুরের পাড়ে মড়া পোড়ানোর বোল শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে যেত মায়ের শরীরে। গায়ে গতরে সব পেয়েছে সীতাবতী, কিন্তু মায়ের কাছে মেয়ে মেয়েটি হয়েই থেকে যায় চিরকাল।

আবার বিয়ে হল তার সতীশের সঙ্গে। দেখে পছন্দ হয়েছিল মেয়েকে। দোজবরে ঘরে গেল সীতাবতী। লোকটার প্রথম পক্ষের বউ বাঁশতলায় বজ্রাঘাতে পুড়ে মরেছে। সীতাবতী পিতলের গাগরায় ভরে কাঁখে করে জল তুলে আনল ঘরে। উঠোনের মাঝখানে তুলসী গাছ লাগাল, জ্যৈষ্ঠ মাসে নতুন ভাঁড় ফুটো করে টাঙিয়ে দিল তুলসীর মাথায়, জল ঝরল — বসুধারা। ভোরে গেরস্থের চৌদিকে গোবরের ন্যাতা আর সন্ধ্যায় শাঁখে ফুঁ দিয়ে ঠাকুর জাগাল সীতাবতী। ক' মাস ঘর করল মেয়েটি —। কিন্তু কপালে নাইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি। এ লোকটাও ছেড়ে দিল সীতাবতীকে,... মেয়ের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। বাঁশগাছের ডগায় ভর দিয়ে গভীর রাতে প্রেত নামে উঠোনে ....সংসারে পাঁচ পুয়ো পাপ পড়ল হে.....

লাজ নাই, লজ্জা নাই, সোয়ামির ঘরের মাথা খেয়ে আঁটকুড়ো মেয়েছেলেটা বাপের ঘরে ফিরে এলো। এবারও কোনো দুঃখ হল না তার। শীতের রোদে বসে মৌতাতে তারিয়ে তারিয়ে এক সানকি পান্তাভাত খেল শুধু লাট্টু পেঁয়াজ দিয়ে, সর্ষের তেল কাঁচা লংকা দিয়ে। আর লোকের কথায় হি হি করে বেহায়ার মতো হাসল, রাত্রে ঘুমোতে গেল মা কিরণীর কাছে। যেমন খায় তেমনি ঘুমোয়।

কাশতে কাশতে একদিন কিরণীর গলা চিরে রক্ত পড়ল। মায়ের পিঠটা ডলে দিতে দিতে মাথার তেলায় ফুঁ দিল সীতাবতী। আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল — বৈকুণ্ঠ নাপিত চুপ। বৈকুণ্ঠ নাপিত চুপ। রক্তপড়া বন্ধ হল বটে। কিন্তু পরের দিন আবার পড়ল রক্ত। মুখ খুলে সীতাবতী গাল দিল ভগবানকে। কেশপুর হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কিরণীকে দেখাল ভাই সুধন। মায়ের রোগের কথা শুনে দুঃখ হল তার। খেতে পায়নি কিরণী ঠিকমতো, প্রথমে পিত্তি চুঁইল সেই আগুনের শিষ উঠল ফুসফুসে। যক্ষা রোগের ধাক্কা, মহাধাক্কা। রোজই রক্ত নামে কাশির সঙ্গে। সীতাবতী বলে, হায় মা। একি হলো গঅ তোর....।

কুমোর ঘর থেকে ঘরে এলো নতুন মাটির সরা। আমন ধানের খড় পুড়িয়ে তৈরি হল পাঁশ, ছাই। সেই ছাই সরায় ধরে রাখা। মাকে দেখভাল করে মেয়েটা, কাশির সঙ্গে পড়ে রক্ত। সেই রক্ত ছাইভরা সরায় করে ধরে ডোবা পাড়ের চারা কলাগাছের গোড়ায় পুঁতে দিয়ে আসে, গাছ রক্ত খায় আর দিনে দিনে বাড়ে। মাজা পুষ্ট হয়। তেজে গোড়ার দিকটায় ফাট ধরে। পাতায় চিকন লাগে। বসন্তকালের নরম হাওয়ায় অঙ্গ দুলিয়ে নাচে কলাগাছ।

সেই কলাগাছ থেকে কলার কাঁদিটা বঁটির এক কোপে কেমন অবলীলায় নামিয়ে ফেলল সুধন। দুদিন শিরিষ পাতার ভেতর কার্বাইড ফেলে মাটির হাঁড়িতে রেখে দিলেই পেকে যাবে। শ্রাদ্ধের রান্না হবে। কাঠ কাটা হচ্ছিল দুপুরে। ভরা গরমকাল, গা ধুতে গিয়ে

গোপালকোলে পুকুরের হেলেঞ্চে লতায় পোকা দেখল সীতাবতী। লম্বা মুড়ির মতো....ইঃ। কি ঘেন্না।

রাত্রে চোখে ঘুম নেই সীতাবতীর। জ্যোৎস্নার ভেতর দিয়ে অন্ধকার মেয়েমানুষের ছেঁড়া চুলের মতো উড়ে উড়ে যায়। তাল গাছের বাঁকে বসে মদন গান ধরেছে। লোকটা দু চক্ষের বিষ ... যেমন ষণ্ডাপাষণ্ড দেখতে। রাতের বেলা তারও চোখে ঘুম থাকে না। পুকুরের পাড়ে কিংবা আস্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে গান ধরে। সে চায় সীতাবতীকে। দেবে নতুন জীবন। জীবনের মায়ায় আর কতবার সীতাবতী ঘর করবে। ঘর করলেই ঘরের বাঁশে ঘুণ লাগে। চোখের ভেতর সাপের ফণা আছে লোকটার, পারলে দংশায়। চতুর্দ্দিক চুপ। রাত যেমন নিরুপদ্রব হয়। লোকটা গাইছে....

এমন মানব জমিন রইলো পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা....
মনরে কৃষি কাজ জান না.......

এক এক সময় সীতাবতীর ইচ্ছে হয় ওই লোকটার সঙ্গেই চলে যায়। একা থাকা, সে এক হতচেতন পরমায়ু। কতকাল যে জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে সীতাবতীর, হাসা হয়ে ওঠেনি, সে খেয়াল কে রাখে। গানের দিকে কান, সীতাবতী পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ঘর থেকে উঠে বাইরে আসে সে। কলা গাছটার দিকে তাকিয়ে মুখচোখ যেন ভরে যায়। আদুল হাওয়াটি শরীরে ধরে ডোবার জলের দিকে গাছটা নামিয়েছে তার পাতা। কেমন সতৃষ্ণ, ঠিক একটা মেয়েমানুষের মতো। ঘোমটা আড়াল দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে।

দুগ্‌গা পূজার কথা মনে পড়ে যায় সীতাবতীর। ষষ্ঠীর রাতে কলাবরণের কলাবৌয়ের মতো এই গাছ। সমস্ত জ্যোৎস্না আজ ওকে দুহাত দিয়ে বরণ করছে। রক্তখাকি, প্রাণবিনাশী। মায়ের শরীর নিংড়ে নিজে পেয়েছে অলীক যৌবন। ভাবতে ভাবতে বিছানায় এসে শোয়। এবং একসময় ঘুমিয়ে যায়। আর দেখা হয়ে যায় মা কিরণের সঙ্গে। মা লাল পাড়ের কোরা শাড়ি পরেছে। এয়োতি মেয়েদের যেমন, সিঁদুরে মাথাটা লাল। ঠোঁটের ওপর সেই কাটা দাগ....

মা বলল, ঘুম নাই চোখে?

উহুঁ .....

কীসের এত ভাবনা ....হাতমুখ ঘাটে ভালো করে ধুয়ে এসে শুদ্ধ মনে ঠাকুরের নাম কর। ঘুম আসবে।

ভিতরটা যে জ্বলছে গও মা....

কীসের জ্বলন?

তোর মুখে যে রক্ত নামে মা, ... তার কি বৃত্তান্ত....

খকখক করে কাশল কিরণ। যেন দৈব কোন যোগ। কথার সঙ্গে রক্তের লীলা। হিক্কায় কথা ফুরায় না, ধাক্কা খায়। চাপ চাপ রক্ত, কালো একটা বদ অন্ধকারের গুঁড়ো যেন সেই রক্তে। মাটির সরায় করে ধরল সীতাবতী। মুখ তুলল কিরণ, যেন নেশার পান তার ঠোঁটে রক্তের আলপনা দিয়েছে। কেঁদে উঠল সীতাবতী .... মাগো — মা। মা বলল, এ মাসেই আমি মরব। ভালো থাকিস লো। যা কলা গাছের গোড়ায় পুঁতে দিয়ে আয় ......

কলা গাছের তলায় গিয়ে এই জ্যোৎস্না রাতের স্বপ্নের ভেতর দিয়ে সীতাবতী যেন মহাজীবনের বীজ পুঁতে দিয়ে এল এক আধিদৈবিক অন্ধকারে। এবার ধারণ করুক পৃথিবী. গাছ, চরাচর।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সীতাবতী বুঝতে পারল কাল গভীর রাতে সে মাকে স্বপ্নে দেখেছিল। আর কাকেই বা দেখবে, আর কেবা আছে তার যাকে স্বপ্নে দেখা যায়। চতুর্দ্দিকে জটিল কুটিল পৃথিবী, তার ভেতর দিয়ে বোধহয় লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক ফন্দি করে পালিয়ে এসেছে সকালের টাটকা রোদ। খুব হলুদ, বাঁ হাতটা আড়াল থেকে রোদের দিকে বাড়িয়ে দিতেই তার গায়েহলুদের দিনটির কথা মনে পড়ে যায়।

বিকালে আবার সেই পাষণ্ড মদনের সঙ্গে দেখা। তার ছাতিতে চুল, পিঠে চুল। দূর থেকে দেখলেই বোঝা যায় হাতপায়ের গিঁটগুলি খুব শক্ত। লোকটা বলল, যাবি. .. যাবি নাকি রে....

কুথা যাবো —

নাবাল —

খাবো কি.....

জীব দিয়েছে যে খাবার দিবে সে....। খাটব খাব....

রুক্ষ লোকটার চুলের রঙ আরো রুক্ষ, হিরাকষে ধোয়া। যেন ধূপের ধোঁয়া চুলের গহীনে কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। খর চাউনিতে কেমন একটা ইচ্ছে। সীতাবতী বুঝতে পারে, সব বুঝতে পারে। ভেতরটা তার চুপ। তবু বাইরেটায় অবিকল্প হাসির মত আহ্লাদ ঝরতে থাকে। নিজেকে দামি মনে হয়। কিন্তু কোনো উত্তর করে না। লোকটা আপন খেয়ালে এসেছিল। চলেও গেল খেয়ালে গাইতে গাইতে। সেই গান শ্যামাসঙ্গীত। চরিত্র দুলিয়ে সীতাবতী হাসতে গেল। অমনি হোঁচট খেল মাটির মধ্যে ডুবে থাকা একটা পাথরের থুর্থনিতে । পায়ের একটা আঙুল ফেটে গেল। যেমন গোড়ালি ফাটে শীতকালে। ঠাণ্ডায়। হিমে কনকনায়। কিন্তু তেমন যন্ত্রণা পেল না সে....মগজ এখন রক্তের বদলে ওই পুরুষ মানুষটাকে দেখছিল। মানুষটাকে ধরে রাখতে পারলে অমন অনেক রক্ত আসবে যাবে। নিচ থেকে যন্ত্রণাটা যখন উপরে উঠে এল তখন সে বরং একটু তৃপ্তিই পেল কারণ যৌবনের মধ্য গগনে এসে এই পৃথিবীর সব মেয়েমানুষই যন্ত্রণার ভেতর থেকে এক অলৌকিক নোনতা স্বাদ পায়। আর তা হল জীবনের স্বাদ।

সীতাবতীর ভাই সুধন মায়ের শ্রাদ্ধ করল কলা চটকে। আতপচাল, কলা, বাতাসা, তিল চটকে পিণ্ড। সব দেখল সীতাবতী। লোক খেল। বামুন বিদায়। সারাদিন কীর্তনীয়ার দল বসে বসে তারক ব্রহ্ম গাইল।....

চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল সীতাবতীর। পাঁচজনের সঙ্গে সুর করে মড়াকান্নাও গাইল সে। সন্ধে উতরে গেলে খই ছড়াতে ছড়াতে শোলার ফুলঘর মায়ের শ্মশানে দিয়ে এলো। মালাকারের পাওনা মিটিয়ে যখন ভাইয়ের দিকে তাকাল সে তখন কান্নায় আরেকবার গলা রুদ্ধ হয়ে এলো তার! ভাইয়ের চুলহীন নেড়া মাথাটা যে চালে পড়ে থাকা সেই পেট টপকা লাউটার মতোই একা। পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের এই যোগাযোগ, সাদৃশ্য, সম্পর্কের গূঢ় তত্ত্ব কিছুই বুঝতে না পেরে শুধু ভাইটার দিকে তাকিয়ে তার এক অবচিন মায়া তৈরি হল। যার সঙ্গে গভীর রাতে সে পালিয়ে যাবে ঠিক করেছিল এখন ইচ্ছে তাকে গাল দিয়ে উদ্ধার করতে — খাল ভরা, ড্যাকরা, সাত —

রাত্রে বিছানায় শুতে গিয়ে আবার সেই নিদ্রাহীন চোখ জ্বলতে লাগল তার। শরীরে হট্ট লাগে। নিজের শরীর থেকে এক গন্ধ উঠে এসে ঢুকে যায় নিজেরই নাকে। নতুন শাড়ির কোরা গন্ধ, অচেনা এক আঁশটে গন্ধের সঙ্গে মিলেমিশে সে এক বিষাক্ত ভাব। শরীর জ্বালা করে, বাইরে উঠে গিয়ে চাঁদের আলোয় সে দেখল পৃথিবী ফাঁকা, একা, অবয়বহীন।

অবয়বহীন পৃথিবীকে তার মেয়েছেলের মতো মনে হয়। অবলা কলাগাছটি দাঁড়িয়ে আছে ডোবার পাড়ে। সেই কলাবউ, দুর্গা ষষ্ঠীর রাত থেকে পালিয়ে এসে এখন শুধু উঁকি মারে। আড়ে আড়ে ডাকে সীতাবতীকে....আয় সখী, কি তোর দুঃখ, পরান খুলে আমাকে একবার দেখা তো দেখি....

ভাই বলছিল কাল দুপুরে কলাগাছটিকে কাটা হবে। কাঁদিহীন গাছ নাকি কুনজরে বাড়ে। ওর ছাতি থেকে থোড়টা খুলে নিয়ে রান্না হবে। সীতাবতী দেখল গাছে পাতায় বেশ বাড়ন্ত চেহারা তার। জ্যোৎস্নায় দূর থেকে দেখা যায় গাছের গোড়ায় গর্তের মতো কালো অন্ধকার জায়গাটি পড়ে আছে রক্তহীন হয়ে। আর ডোবার জল কুঁদুলে বাতাসের তাড়নায় সেই হলুদ এঁটেল মাটিকে ধরে ছলকায়। উঠে পড়ে বাড়ে, ছোট হয়। শরীরে শরীরে লাগিয়ে হুড়কায়।

হঠাৎ সীতাবতী নিজের শরীরে কি একটা বেগ অনুভব করে। ভেতরে শুয়ে থাকা, ঘুমিয়ে থাকা নদী যেমন গর্জায়। কোথায় কোন মাঠের ধারে অনিদ্রায় লোকটা ঘুরে বেড়ায় কে জানে। তার গান শুধু হাহাকারের মতো ভেসে আসে হাওয়ায় হাওয়ায় ...

এমন মানবজমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা....
মনরে কৃষি কাজ জানো না....

ঘরে উঠে যায় সীতাবতী। ছ্যাঁড়া ন্যাকড়ায় করে নিজের শরীরের অশুদ্ধ রক্তটি ধরে এনে পুঁতে দেয় সেই কলাগাছটির গোড়ায়। যেন পৃথিবী আবার রজস্বলা হয়ে উঠল। কলাগাছ মেয়েমানুষের মতো জেগেছে মাটির হৃৎপিণ্ড ভেদ করে, বহু যন্ত্রণায়। মানুষের মন সে এক অদ্ভুত কারিগর....। হাত দিয়ে সেই রক্ত মাখা ন্যাকড়াটি গাছের গোড়ায় পুঁতে দিতে গিয়ে প্রথমে সীতাবতীর চোখে পড়ল অন্ধকার-মাখা মাটি। নাকে এসে লাগল আঁশটে গন্ধ। ঝুরো মাটি সরিয়ে মাকে যেন আদর করল সীতাবতী। তখনই হাতে খচ করে লাগল কী, কী একটা খোঁচা কলাগাছের গোড়ায়, এটা আবার কী ?

তবসর্তার মাটি সরাতেই পৃথিবী ভেদ করে অবিকল মানুষের মত জেগে উঠল নতুন গাছের একটি ফোঁড়। শিশুটির দিকে তাকিয়ে আনন্দে সীতাবতীর বাক্‌শক্তি রহিত হয়ে গেল, যেমনটা মেয়েমানুষের হয়।

কাঠের গৌরাঙ্গ

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

ভোরের দিকে ধর্মতলাও বেশ পবিত্র হয়ে ওঠে। চারপাশে নরম আলো, কার্জন পার্কের ফুটপাথে দঙ্গল বেঁধে শালিক চড়ুই লুটোপুটি করছে, বাতাসে এক ফোঁটাও রাজনীতির গন্ধ নেই।

এই সব দেখতে দেখতে মনের ভার অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে কণাদের। তখন পাশ থেকে কে যেন বলে ওঠে, বাবু কোথায় যাবেন?

ঘুরে তাকায় কণাদ, প্রশ্নকর্তা এক কিশোর। চা-দোকানের বয়টয় গোছের। গায়ের রং তেলচিটে কালো। পরনে কলকাতার আকাশের মতো রং জ্বলা নীল পাজামা পাঞ্জাবি। কাঁধে পাতি রেক্সিনের ব্যাগ।

কণাদের কাঁধেও ব্যাগ, বেশ দামি। দু'জনেই ধর্মতলার বাসগুমটির সামনে দাঁড়িয়ে। ছেলেটার প্রশ্ন ওই মুহূর্তে কণাদের কাছে অত্যন্ত অস্বস্তিজনক। গত আধঘণ্টা ধরে বাসস্ট্যান্ডে পায়চারি করে যাচ্ছে কণাদ, এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি কোথায় যাবে! আধা বিরক্তি আধা কৌতূহলে কণাদ বলে, আমি কোথায় যাব, তাতে তোর কী দরকার?

— না মানে, আমি রামনগর যাব, টাকাপয়সা নেই....

ছক শুরু হয়ে গেল, বুঝতে অসুবিধা হয় না কণাদের। সকাল হতে না হতেই কলকাতা তার খেলা দেখাতে লেগেছে। এ ধরনের ছুটকোছাটকা চুরি ছিনতাই যে কোনও বেনিয়া শহরের সাইড এফেক্ট। এ সব নিয়ে গা করলে চলে না। কিন্তু কেউ যদি কণাদকেই মুরগি ঠাওরায়, রাগ হয় বইকী। বিশেষ করে এই ছেলেটা যেখানে নিতান্ত কিশোর। ছেলেটার দিকে চোখ রেখে কণাদ মনে মনে বলে, নয় তুই এই লাইনে নতুন, অথবা আমি একটু একটু করে ভোঁতা টাইপের হয়ে যাচ্ছি।

দুটো সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা ঠিক বোঝার জন্য কণাদ ছেলেটাকে একটু খেলাতে যায়, টাকা নেই তো বাসস্ট্যান্ডে চলে এসেছিস কেন?

অতি বিনয়ে ছেলেটা বলে, দেশে পুজো, আমাকে যেতেই হবে। মালিক টাকা দিল না।

— কোথায় কাজ করিস তুই?

— নাকতলায়, সাইকেলের দোকানে।

কী টপাটপ উত্তর দিচ্ছে! হয়তো একই স্ক্রিপ্ট আওড়ে যাচ্ছে পছন্দ মতো মুরগি পেলে। ওর কথা ক'টার মধ্যে পুজো ব্যাপারটা খটকা রেখে গেল। কণাদ জানতে চায়, এখন আবার কী পুজো?

— মচ্ছব। চোত বোশেখ দুটো মাস 'হরিমন্তি' ধান ওঠে, দেশ গাঁর মানুষের মনমেজাজ ভালো থাকে। তখনই ঘরে ঘরে আমাদের গৌরাঙ্গ ঘুরে বেড়ায়।

কিছুই বুঝতে পারে না কণাদ। মচ্ছব! গৌরাঙ্গ ঘুরে বেড়ায়! ডায়লগ এলোমেলো করে ফেলছে বোধহয়।

— চা খাবি? জানতে চায় কণাদ। সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করে ছেলেটা। একটু দূরে ফুটপাথের উপরে চা-দোকান। কণাদের পিছু পিছু এগিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা। কণাদ ভাবে, এই দৃশ্যটা যদি উর্মি দেখতে পেত, বলত, যাক, তুমি শেষমেশ একজন সঙ্গী পেয়ে গেছ তাহলে।

ভোরবেলা বেশ রাগ রাগ মুখ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে কণাদ। চৌকাঠ ডিঙানোর আগে উর্মি আরও একবার আর্ত গলায় বলেছিল, দুটো দিন দ্যাখো না, ছুটি পেয়ে যেতে পারি মনে হয়।

গ্রাহ্য করেনি কণাদ। উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। উর্মি যে কী মনে করে! ওর অপিসের ছুটি অনুযায়ী কি আমাকে অফিস ছুটি দেবে? এতটাই আন-ইমপর্ট্যান্ট আমার কর্মক্ষেত্র।

কোথায় যাবে ঠিক করা নেই, তবু ভোর ভোর ব্যাগ কাঁধে ধর্মতলায় চলে এসেছে কণাদ।

চা-দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। দোকানিকে দুটো চা দিতে বলে, কণাদ ছেলেটাকে বলে, কেক খাবি?

না করে না ছেলেটা। ও তো ধরেই নিয়েছে, বাসের ভাড়াটা পাচ্ছেই। ব্রেকফাস্টটা ফাউ। কিন্তু এত সহজে তো তোমায় ছাড়ছি না বাপ, মনে মনে এই কথা বলে, দোকানিকে একটা কেক দিতে বলে কণাদ।

রোদ তখনও ততটা চড়েনি। চৈত্রের এলোপাতারি হাওয়া ঘুরছে ধর্মতলা জুড়ে। কেমন একটা বেড়াতে যাওয়া টাইপের আবহাওয়া। রাস্তার ও পারে কার্জন পার্ক থেকে একটা দোয়েল উঁচু স্কেলে শিস দিচ্ছে, হয়তো এ অঞ্চলের হকারদের থেকে শিখেছে।

— রামনগর মানে তো দিঘার লাইনে? ছেলেটাকে শুধোয় কণাদ।

ঠোঁট থেকে চায়ের গ্লাস নামিয়ে ছেলেটা বলে, হ্যাঁ, আগের স্টপেজ। আমি যাব নছিমপুর, রামনগর থেকে আরও পাঁচ ছ মাইল ভেতরে।

— ওখানেই তোর দেশ?

— না না, ওখানে একজনের বাড়িতে আজ মচ্ছব। আমার দেশ দিঘা ছাড়িয়ে, সমুদ্রের গায়ে।

— রামনগর অবধি ভাড়া কত?

— পঁয়তাল্লিশ টাকা। তারপর তো হেঁটেই চলে যাব নছিমপুর। হিপ পকেট থেকে পার্স বার করতে যায় কণাদ, একদৃষ্টে চেয়ে আছে ছেলেটা। পার্স থেকে শুধু চা কেকের দামটা বার করে কণাদ। ছেলেটার চোখে হতাশা।

বাসগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কণাদ। ছেলেটা দাঁড়িয়েই আছে ফুটপাথে। দু'চার পা গিয়ে কণাদ পিছন ফেরে, কী হল, আয়। আমি যাব তোর সঙ্গে।

অবাক চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটা। হয়তো ভেবেছিল টাকাটা ম্যানেজ করে কেটে যাবে। পার্টি যে তার সঙ্গে বাসে উঠতে চাইবে, কল্পনাও করেনি।

— দাঁড়িয়ে রইলি কেন, আয়। তাড়া দেয় কণাদ।

— আপনি কি দিঘায় যাবেন?

— না। তোর নছিমপুর যাব।

— সত্যি?

— সত্যি। কেন, থাকার জায়গা দিতে পারবি না?

হঠাৎ বেশ উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে ছেলেটা। বলে, থাকার তো ঢের জায়গা। আপনি পারবেন থাকতে? ওখানে লাইট যায়নি কিন্তু।

— পারব। তুই আগে দেখ, কোন বাসে যাবি।

স্টার্ট-চালু একটা এক্সপ্রেসের সামনে দৌড়ে যায় ছেলেটা। কন্ডাক্টরকে ঘিরে সেখানে যাত্রীর ভিড়।

— সামনের দিক করে দুটো সিট দাও তো, কথাটা কন্ডাক্টরকে বলে, ছেলেটা কণাদকে বলে, বাবু, নব্বই টাকা দিন।

মনুমেন্ট পিছিয়ে যাচ্ছে, রাজভবন, ইডেন গার্ডেন, আকাশবাণী—একটু একটু করে পিছিয়ে যাচ্ছে কলকাতা। ঝোঁকের মাথায় বাসটায় চড়ে বসলেও কণাদের মনে হচ্ছে, খুব একটা ভুল করেনি বোধহয়। তবু তো একটা গন্তব্য ঠিক হল। বাসগুমটিতে পায়চারি করতে করতে বড়ো অসহায় লাগছিল, কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না কোথায় যাবে। একা বেড়াতে যাওয়া যে এত কঠিন, ধারণা ছিল না কণাদের। বাড়ি ফিরে যাওয়ারও উপায় নেই, উর্মি হ্যাটা দেবে। কাল রাত্তিরেই বলেছিল, তোমার কি বউ মরে গেছে, যে একা বেড়াতে যাবে! একগাদা টুরিস্টের মাঝখানে একা একা ঘুরে বেড়াবে, খারাপ লাগবে না?

কণাদ বলেছিল, লাগবে না। তোমার ছুটির সঙ্গে আমার ছুটি কোনও দিনই কোয়েন্সাইড করবে না। বিয়ের পর চার বছর ধরে এভাবে অনেক ছুটি নষ্ট হয়েছে আমাদের। সারা দিন যখন আমরা দুটো আলাদা অফিসে পরিশ্রম করি, তেমনি ছুটিগুলো না হয় আলাদাই কাটাব।

কথাগুলো শোনার পর গুম মেরে গিয়েছিল উর্মি। নিশ্চয়ই কষ্ট পেয়েছিল। তবু তো কণাদ উগড়ে দেয়নি সেই গোপন দুঃখটা, অনেক ছুটির মতো উর্মির চাকরির জন্য একটা বাচ্চাও নষ্ট করেছে ওরা। চাকরিতে তখন প্রবেশনারি পিরিয়ড চলছিল উর্মির। হয়তো সেই অভিমানে অথবা ভয়ে আর কোনও শিশুই আসছে না ওদের দাম্পত্যে।

কলকাতার দিকে কালো ধোঁয়া ছেড়ে বাসটা উঠে এসেছে হাওড়া ব্রিজে। এ রকম রাশ রাশ ডিজেলের ধোঁয়ায় সারা দিনমান আবছা হয়ে থাকে কলকাতা। ঘুম থেকে উঠেই চোখ জ্বালা জ্বালা করে তার।

ছেলেটা নির্বিকার ভাবে জানলার বাইরে গঙ্গা দেখছে। কণাদ ভেবেছিল, এভাবে ওর সঙ্গে বাসে উঠে গেলে হয়তো বেশ প্যাঁচে পড়ে যাবে। কিন্তু না, ছেলেটার চোখমুখে কোনও উৎকণ্ঠা নেই। এতটাই প্রফেশনাল হয়ে গেছে এই বয়সে! নাকি সত্যিই ওর গ্রামটা আছে। পুজো, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সব সত্যি।

— তোর নাম কী রে?

মনে মনে বোধহয় নিজের দেশগাঁয়ে চলে গিয়েছিল ছেলেটা। কণাদের প্রশ্নে সম্বিত ফেরে। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, দিবাকর, দিবাকর বেরা।

— প্রতি বছরই বুঝি এই দুটো মাস দেশের বাড়িতে যাস?

— যেতেই হয়। উপায় নেই। এই করে কত ক'টা চাকরি গেল আমার।

নড়েচড়ে বসে কণাদ জানতে চায়, যেতেই হয় কেন?

— কী করব, আমিই তো মচ্ছবের পূজ্যক।

— পূজ্যক? মানে তুই পুরোহিত।

ঘাড়টা দু'বার উপর নীচ করে, মাথা নামিয়ে নিয়েছে ছেলেটা। একটু যেন লজ্জা পেয়েছে।

— সে কী রে, তুই এইটুকু ছেলে, পুজোর মন্ত্রতন্ত্র সব জানিস?

— আমাদের পুজো তো আপনাদের মতো অত শক্ত নয়।

— কেন?

— আমরা বোষ্টম। যে গৌরাঙ্গের আজ পুজো, সে আমাদের বংশের ঠাকুর। বংশে আমি ছাড়া আর কোনও ছেলে নেই।

বেড়াতে যাওয়াটা এতক্ষণে অভিযান মনে হচ্ছে কণাদের। হাওড়া জেলার আধাশহর ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বাস। এ রকমই একটা মফস্‌সলে কণাদের আসল বাড়ি। তারকেশ্বরের লাইনে সিঙ্গুরে। সেখানে বাবা মা আর ভাই থাকে। চাকরির সুবিধের জন্য কণাদ, উর্মি টালিগঞ্জের ভাড়া বড়িতে। সিঙ্গুরে প্রায় যাওয়াই হয় না। আজ একবার ভেবেছিল আটপুরের বাস ধরে সিঙ্গুরে চলে যাবে। কিন্তু বাবা মা তো তাদের বউমাকেও দেখতে চাইত।

এই বাসজার্নিটাও খুব মিস করল উর্মি। অফিস ওকে যেতেই হবে, ক'দিন ধরে ম্যানেজমেন্টের কী সব মিটিং চলছে। দিল্লি থেকে সাহেবরা এসেছে। ম্যানেজমেন্ট স্টাফ উর্মি রোজই এ সি রুমের থমথমে ঠাণ্ডা মুখে মেখে ঘরে ফিরছে। ঠিক এই মুহূর্তে কী করছে উর্মি? নিশ্চয় খুব মনমরা হয়ে অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছে....মনটাকে আবার নিজের ঘর থেকে বাসে নিয়ে আসে কণাদ। পাশে বসে থাকা পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করে, তোদের বংশের ঠাকুর মানে?

— সে অনেক কথা।

- বলই না। এখন তো অনেকটা রাস্তা।

দিবাকর বেরা শুরু করে — আমাদের গৌরাঙ্গকে না, আমার বাবার ঠাকুমা স্বপ্নে পেয়েছিল। খুব জাগ্রত। লোকে যা মানত করে, ঠিক পেয়ে যায়। তারপর সেই লোক নিজের বাড়িতে ঠাকুর নিয়ে গিয়ে মচ্ছব দেয়।

এ বার যেন 'মচ্ছব' কথাটার মানে বুঝতে পারছে কণাদ, এত সম্ভ্রমে শহরের লোক তো উচ্চারণ করে না কথাটা। আসলে মহোৎসবের কথা বলছে দিবাকর। ওর গল্পকথা বেশ পেয়ে বসেছে কণাদকে। কৌতূহলে জানতে চায়, কী স্বপ্ন দেখেছিল তোর বাবার ঠাকুমা?

হাসতে-হাসতে দিবাকর বলে, কী জানি সত্যি কি না। তবে ছোট বয়েস থেকে শুনছি, বাবার সেই ঠাকুরমার নাকি নাতিনাতনি হচ্ছিল না। পাড়ার লোকে খোঁটা দেয়, জ্ঞাতিরা ছিঃ ছিঃ করে। বুড়ির মনে খুব দুঃখ। সারাদিন মহাপ্রভুকে ডাকে, আমার বংশরক্ষা করো প্রভু। তো একরাতে স্বপ্নে গৌরাঙ্গ দেখা দিলেন। বললেন, ভোর হলেই সমুদ্রের ধারে চলে যাস। একটা কাঠ ভেসে আসবে। কোনও ছোট ছেলেকে দিয়ে ওটা তুলে নিয়ে আসবি। তারপর ওই কাঠ কেটে আমার মূর্তি বানাতে দিবি। তোদের বাড়ির উঠোনে অশ্বথ গাছটার নীচে প্রতিষ্ঠা করবি।

ঘুম ভেঙে গেল বুড়ির। ভোর হতে না হতেই ছুটল পাড়ার সব বাড়িতে, ওগো শোনো, কী স্বপ্ন দেখেছি আমি ......

বুড়ির মুখে সব শুনে সারা গাঁ চলল সমুদ্রের দিকে। চরে গিয়ে দ্যাখে, জলে চার হাত মতো নুনপোড়া একটা কাঠ ভাসছে।

কাঠ তুলতে হুড়মুড় করে জলে নেমে পড়ল সবাই। লোকগুলো যত এগোয়, ততই পিছিয়ে যায় কাঠ। কিছুতেই ধরা যায় না। এই করে দুপুর গড়িয়ে যেতে, সবাই ফিরতে থাকে গ্রামে। সারা পথ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুড়িও ফিরে আসে। মহাপ্রভুকে বলে, এ কী করলে ঠাকুর, ধরা দিয়েও অধরা রয়ে গেলে! কী এমন দোষ করলাম আমি?

আবার সেই রাতে দেখা দিলেন মহাপ্রভু। বললেন, তোকে যে বলেছিলাম, কোনও বাচ্চাছেলেকে পাঠাবি, তা না করে যত সব পাপী তাপী পাঠালি....

পরের দিন কাকভোরে উঠে, বুড়ি নিজের জায়ের নাতিকে চুপিচুপি ঘুম ভাঙাল। তারপর নিয়ে চলল চরের দিকে। সাগরের ও পারটা সবে তখন ফিকে হতে শুরু করেছে, সূয্যিঠাকুরের ঘুম ভাঙেনি তখনও। সেই কাঠের খণ্ড কিন্তু আবার এসে হাজির। জায়ের নাতি হাঁটু ডুবিয়েই তুলে আনল কাঠটা।

সেই কাঠ কেটে বানানো হল গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। দেশের বাড়ির উঠোনে অশ্বথতলার নীচে আটচালা করে প্রতিষ্ঠা হল ঠাকুর। এখন সেখানে পাকা মন্দির। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে করে ঠাকুর এখন বড়ো লোক। কত লোক জমি দান করেছে, সোনা দিয়েছে, ট্রাস্টি হয়ে গেছে। পর হয়ে গেছে বংশের ঠাকুর শুধু মচ্ছবের সময় আমাদের ডাক পড়ে। তবে মচ্ছবটা হয় দারুণ! হাজার দু'হাজার লোক খায় দু'দিন ধরে। অষ্ট প্রহর নামগান হয়। সে হেভি ব্যাপার! গেলেই সব দেখতে পাবেন।

থামল দিবাকর। ওর বর্ণনা এত জীবন্ত, কণাদ পৌঁছে গেছে সেই সাগর পারে, আবছা ভোরে। যেখানে ঢেউয়ের দোলায় দুলছে শিশুপ্রতিম কাঠের খণ্ড।

বম্বে রোড ধরে দৌড়চ্ছে বাস। কয়েক ঘণ্টা পরেই রামনগর। বাসস্ট্যান্ডে হয়তো একদল গ্রাম্যমানুষ অপেক্ষা করছে তাদের ছোট্ট উপাসকের জন্য। সেই উপাসক এখন ঘুমে ঢুলে পড়ছে কণাদের কাঁধে। কাঁধটা সুবিধে মতো পেতে দেয় কণাদ।

বাসের জানলা দিয়ে হই হই করে ঢুকে আসছে হাওয়া। তার গভীরে সমুদ্রের গন্ধ পায় কণাদ। অনেক দিন পর এ রকম একটা অবাধ ছুটির মধ্যে ঘুম পায়।

গ্রামের রাস্তা ধরে চলেছে একটা দল। সবার সামনে কিশোর পুরোহিত দিবাকর বেরা। তার কোলে ফুট চারেকের কাঠের গৌরাঙ্গ। চন্দনেশ্বর থেকে ঠাকুর এনে, বাস স্টপে অপেক্ষা করছিল গ্রামের মানুষ। কণাদরা এসে পৌঁছতেই ওরা দিবাকরকে রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে ধুতি পরাল। গলায় তুলসীর কণ্ঠি পরিয়ে ঠাকুর তুলে দিল হাতে। দলটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে নছিমপুরের দিকে। সবার শেষে কাঁধে কিটব্যাগ নিয়ে কণাদ। পুরোহিতকে নির্বিঘ্নে নিয়ে আসার জন্য কণাদকেও যথেষ্ট খাতির করছে নছিমপুরের মানুষ।

রাস্তার দু'পাশে সদ্য হেমন্তের ফসল তোলা গর্বিত কৃষিভূমি দেখছে, দু'হাত তোলা গৌরাঙ্গকে। পানের বরজে লুকিয়ে থাকা যুবতী রোদ উঁকি দিচ্ছে। বিশাল বিশাল বৃক্ষের সুঠাম শরীরে জেগে ওঠা কচিপাতারা যেন হাসছে।

পুজোআচ্চায় তেমন কোনও গাঢ় বিশ্বাস নেই কণাদের। তবু চারপাশের এই সমৃদ্ধিভরা প্রকৃতি, যার মাঝখান দিয়ে তেলরংয়ের চকচকে গৌরাঙ্গ চলেছে উদবাহু হয়ে! কেন জানি কিছু একটা চাইতে ইচ্ছে হয়, কণাদ মনে মনে বলে, ঠাকুর, আমার বাবা মা ভাইকে ভালো রেখো। উর্মির কোঁচকানো কপাল সাঁওতালদের দাওয়ার মতো নিকিয়ে দিও। ওর শরীর আবার কৃষি উপযোগী করে তোলো। আমাকে নির্মল কিছু বীজ দাও।

দলটার সঙ্গে সঙ্গে আরও গভীর গ্রামে ঢুকে যাচ্ছে কণাদ। এবড়ো খেবড়ো রাস্তার পাশের পুকুরে ফুটে উঠেছে সারিবদ্ধ মানুষের ছবি। হাওয়ায় ভাসছে ঢাক কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ....

এই সময় কে যেন ধাক্কা দেয় কণাদকে।

— বাবু! ও বাবু আপনার রামনগর এসে গেছে।

চটকা ভেঙে কণাদ দ্যাখে, সে বাসেই বসে অছে। কিন্তু একী! পাশের সিট যে ফাঁকা!

— আমার পাশের ছেলেটা কোথায় গেল। কন্ডাক্টরের কাছে জানতে চায় কণাদ। কন্ডাক্টর বলে, ছোঁড়াটা তো বালিসাহি নেমে গেল।

বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। অবধারিত ভাবে চোখ যায় বাসের বাঙ্কে, ব্যাগটা নেই! সে জায়গায় দিবাকর বেরার সস্তা ঝোলাটা পড়ে আছে। খালি হাতেই বাস থেকে নেমে আসে কণাদ।

ব্যাগটায় তেমন কিছু ছিল না। তবু ঠকে যাওয়ার অপমান চাপ মারছে বুকে। একা শুনশান রাস্তায় দাঁড়িয়ে গ্রামরেখার দিকে চেয়ে আছে কণাদ। তাহলে কি নছিমপুর বলে কোনও গ্রাম নেই?

হঠাৎই মরুবিহ্বলতার মতো কণাদ দেখতে পায়, দূরে গ্রামের রাস্তা ধরে একদল মানুষ হেঁটে আসছে। ওরা হয়তো খোঁজ নিতে আসছে পুরোহিতের!

কণাদ প্রার্থনা করে, মানুষগুলো এখানে পৌঁছনোর আগেই যেন একটা কলকাতা ফেরার বাস চলে আসে।

পরের দিন। কাল রাতে বাড়ি ফিরে উর্মির কাছে ব্যাগ হারানোর আসল গল্পটা চেপে গিয়েছিল কণাদ। বলেছিল, সিম্পলি স্ন্যাচিং। উর্মি মুডে ছিল, তিন দিনের ছুটি জোগাড় করেছে, তাই ব্যাপারটায় গুরুত্ব দেয়নি।

আজ ভোর ভোর ওরা চলে এসেছে হাওড়া স্টেশনে। সিঙ্গুরে বাবা-মার কাছে যাবে। লেডিস কাউন্টার ফাঁকা থাকে বলে, উর্মি টিকিট কাটতে গেছে। অল্পবৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে কণাদ। আচমকাই চোখে পড়ে, সেই রং-জ্বলা নীল পাজামা পাঞ্জাবি, দিবাকর বেরা! শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যায় কণাদের। রাগ নয়, তীব্র অভিমানে কণাদ এগিয়ে যায় ছেলেটার দিকে। সে-ও দেখে ফেলেছে, দৌড়চ্ছে। কণাদ পিছু নিয়েছে। স্টেশন চত্বরে থিকথিক করছে মানুষ। এঁকে বেঁকে পালাচ্ছে ছেলেটা। কিছুতেই ওর কাছে পৌঁছতে পারছে না কণাদ। স্টেশনের বাইরে চলে যাচ্ছে দিবাকর বেরা। নামটা নিশ্চয়ই মিথ্যে। কণাদও স্টেশনের বাইরে চলে এসেছে, এখানে আরও ভিড়। স্রোতের মতো মানুষ ঢুকছে বেরোচ্ছে। স্রোত ভেঙে এগোতে যেতেই, উর্মি এসে হাত টেনে ধরে, কাকে তাড়া করছ?

— ওই যে, ওই ছেলেটা। আঙুল তোলে কণাদ। কিছুতেই বুঝতে পারে না উর্মি। হাত নামিয়ে চলমান ভিড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে কণাদ। জনসমুদ্রের কালো ঢেউয়ের ওপর পোড়া কাঠের মতো ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

মধ্যরাত্রির জীবনী

রবিশংকর বল

দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলেন নীহারিকা। বিতান দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে বিহারি রিকশাওলার মাথায় হোলড-অল, ব্যাগ ইত্যাদি। তিন বছর পরে বিতান আবার এল। অথচ এই ক'বছরের ব্যবধানে তাকে বড়ো বয়স্ক মনে হচ্ছে, যেন বিতান তিন হাজার বছর পেরিয়ে এসেছে। রিকশাওলা জিনিসগুলো দরজার মুখেই নাবিয়ে দিয়ে চলে যায়। বিতান আচমকা হেসে ফেলে।

একেবারে চলে এলাম, মা —

চাকরিটা ছেড়ে দিলি?

বাজপড়া বাড়ির মতো কীরকম ফুটিফাঠা চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকল বিতান। কাল সারারাত ট্রেনে ঘুম হয়নি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে গা এলিয়েই ঘুম পেয়েছিল তার, বড়ো নির্ভরতার ঘুম। আঃ, প্রিয় শহরটায় চিরকালের মতই তবে চলে এল সে আবার। সাদার্ন অ্যাভেনিউর ঘাসঢাকা বুলেভারে হাত-পা ছাড়িয়ে শুয়ে থেকে, শীতকালে তো বেশি রাতে হিম জড়িয়ে যেত প্রতি রোমকূপে, প্রায় আকাশটাকে বুকে ধারণ করার অনুভবে শুয়ে থেকে, শহরের প্রতিটি চিৎকার আর কোলাহল, বাসের চাকার ঘষটানি, ট্যাকসির হর্ন, সব — সবই তো কেমন কল্লোলমুখর সিন্ধুশব্দের মতো মনে হত তার।

তুই যে কুটুমের মতো দোরগোড়াতেই দাঁড়িয়ে রইলি —

কেমন? ইষ্টিকুটুম পাখির মতো? জিনিসপত্রগুলি ঘরের ভিতরে ঢোকাতে ঢোকাতে নীহারিকাকে দেখছিল বিতান। তোমরা দেশ-গাঁয়ে ইষ্টিকুটুম পাখি দেখেছ না মা? আদ্ধেক শরীরটা বিছানাতেই মেলে দেয় সে। পা দুখানি শূন্যে ঝোলে বিতানের।

ধরো না কেন, আমি আবার তোমার সেই ইষ্টিকুটুম পাখি হলান —

এ আবার কেমনধারা কথা?

সেরকমই তো। নইলে তুমি ভেবেছিলে, আমি এমনভাবে চলে আসব? কথা বলতে বলতেই বিতানের চোখ বুজে আসে। আসলে নীহারিকার মুখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। এমন অতিথির মতো কেন মনে হল আজ মার মুখোমুখি? ভ্রূণ, অমরা, রক্তের নানাগল্পের ছায়ায় তার চোখ বুজে গেছে — যেন বিপরীত এক রক্তস্রোতে ভেসে-ভেসে এল সে — নীহারিকার কাছে, যে বিতান যেন যীশু, কুমারী মায়ের দিকে তাকিয়ে নীরব প্রলাপে মুখর — তাহলে রক্তেও কোনো নির্ভরতা নেই। বিতান চোখ মেলে দেখল, নীহারিকা তার দিকে অভিনিবেশে তাকিয়ে আছেন।

কোনো গণ্ডগোল হয়েছিল? নীহারিকা বিছানার ধারে বিতানের পাশে এসে বসলেন। জামার বোতাম খোলা, হা হা বুকে পাঁজরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়, এতটাই রোগা হয়ে গেছে বিতান। রুগ্ন অবশ্য সে ছোটোবেলা থেকেই। সে জন্মাবার বছরখানেক পর থেকেই দু-দুবার

বাঁচবার কোনো আশা ছিল না, টাইফয়েডের ওপর টাইফয়েড, তখন নীহারিকা সারা রাত জেগে বসে থাকতেন ছেলের পাশে। মালিকের সঙ্গে কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল?

না তো —। মা একটু চা খাওয়াবে? বিতান কনুইয়ের ওপর ভর রেখে, হাতের তালুতে মাথা রাখল। মাকে আমি অনেকদিন এভাবে কাছ থেকে দেখিনি, সে ভাবল। ছেলেবেলায় কখনো মাকে কাছে না পেলে সে মায়ের কাপড়ে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে থাকত। তখন হয়তো স্কুলে গ্রীষ্মাবকাশ চলছে। শহরের অভ্যন্তরে গ্রীষ্মের দুপুরে সে মাতাল হয়ে যেত মায়ের কাপড়ের গন্ধে। দেশ-গাঁ সে দেখেনি, না ঘাস না জল, কিন্তু এমন গন্ধের তটরেখা ছুঁয়েছিল। বস্তুতপক্ষে এই গন্ধই ছিল তার কাছে মায়ের স্বাদ, আজও, যেহেতু বড়ো হয়ে মার সঙ্গে তার জড়িয়ে ছড়িয়ে কথা হয়নি কোনোদিন, আজ অব্দি, আর এই গন্ধেও সে ডুবে যেতে পারেনি বহু বছর। শুধু একটা বিশেষ গন্ধের স্মৃতি, যা তার মা, তার নীহারিকা মা।

বিতান দেখল, নীহারিকা রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। এই তিন বছরে অনেক কিছুই নিশ্চয় বদলে গেছে, যেমন এই ঘরটি, আগের চেয়ে অনেক বেশি সাজানো গোছানো, বাড়তি জিনিসও হয়েছে, যেমন সোফা, টিভি ইত্যাদি। তার বাড়ির লোক, পরিচিতজনেরা জানত, এই চাকরিটায় বিতান ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না বা ঠিক চাকরিও নয়, আসলে দূরত্ব, এই শহর থেকে অনেক দূরে উত্তর ভারতের নিষ্প্রাণ শহরটিতে — বিতানের প্রথম দিককার চিঠিগুলোতে এরকমটাই থাকত। তবু তিন বছর পরে, যে সময়সীমায় অস্তিত্বের নানা ক্ষত সাফসুরত হয়ে যায় বা হওয়াই সম্ভব, ঠিক তখনই, বিতান হুট করে চাকরিটা ছেড়ে চলে আসবে, এমনটা তো অস্বাভাবিক মনে হতেই পারে। বিতানও তা জানে। চাকরিটা কেন সে ছেড়ে দিল, সেই কারণটাও তো তার কাছে স্বচ্ছ নয়, অর্থাৎ কারুর কাছে গুছিয়ে বলবার মতো যুক্তিপরম্পরাও তার ভাঁড়ারে নেই। তবু চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে তার নিজেকে বেশ বিজেতার মতো মনে হয়েছিল, যেন টিলায় উঠে সূর্যোদয় দেখার মতো, যেহেতু আটাশ বছরের জীবনে এই প্রথম সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। এর আগে দুবার বিভিন্ন কারণে তাকে কোম্পানি থেকে শো-কজ করা হয়েছিল। দুটি চিঠিরই বয়ানের একটি অভিন্নতা তার মনে আছে, য়্যু হ্যাভ ডেভ্‌লপ্‌ড আ মোড অব ইর্‌রেসপনসিবিলিটি....।

তুই কিছু খাবি না? আগে খেয়ে নে কিছু। রান্নাঘর থেকে নীহারিকার কথা ভেসে এল। সেই সঙ্গে স্টোভ ধরানোর শব্দ, জলের শব্দ, সেলফ থেকে কাপ নাবানো আর নীহারিকার পায়ের শব্দ, হালকা, ভূতের মতো। বিতান উঠে বসতে বসতেই দেখল, নীহারিকা ভিতর দিকের দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।

নীহারিকা চেয়ে থাকলেন বিতানের দিকে। তিন হাজার বছরের কত আঁকিবুকি মুখে নিয়ে বসে আছে তার ছেলে। বিতানের দিকে তাকালেই তাঁর মনে পড়ে নিজের বাবার কথা। সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছর পরেই — ভারত-পাকিস্তান হয়ে যাওয়া — দূরে কাছে যখন কেবল গ্রামপতনের শব্দ — মূল্যবোধ আর নৈতিকতা যখন বুকটাকে দুফালি করে ভেঙেচুরে যাচ্ছে — তার বাবা তখন সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের মতো মানসসরোবরের স্বপ্নে ডানা ঝাপটাচ্ছেন। রোগা, ছ-ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ তার বাবা শহরের রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতেন। কথা বলতেন খুব কম। ধীরে। একদিন বলেছিলেন, রাজনীতি কখনো মানুষের হৃদয়ের জিনিস নয় —

তবু রাজনীতি ছাড়া মানুষ আর কী নিয়ে লড়বে? কেউ প্রশ্ন করেছিল তখন। বাবা এর কোনো উত্তর দিতে পারেননি। সময়ের নানা বিভ্রান্তি এভাবেই তাকে আলাদা করে দিচ্ছিল সকলের থেকে, হয়তো নিজের হৃদয়ের থেকেও। মৃত্যুর কয়েক বছর আগে থেকে তিনি

লিখছিলেন আত্মজীবনী, যা অসমাপ্ত, এখন নীহারিকার ট্রাঙ্কে, ন্যাপথলিনের গন্ধের ভিতরে। তার বাবা বলতেন, ও জীবনী আমার নয় — আমার নয় —

তাহলে কার?

মধ্যরাত্রির। বাবা কি শেষকালে পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন? নীহারিকা জানেন না। বিতানও কি তবে মধ্যরাত্রির সন্তান?

এই বাড়িটায় আর থাকতে ইচ্ছে করে না। বিতান শুনল, নীহারিকার গলার ভিতরে প্রাচীন বালি ঝরছে।

কেন?

কতদিন কোথাও যাইনি।

বেড়াতে যাবে?

না। মানুষ তো নতুন-নতুন বাড়ি বদলায় —

ভালো বাড়ির লোভ হয় বুঝি।

হৃদয়পুরের দিকে একটা জমির সন্ধান পেয়েছি —

বিতান চুপ করে থাকল। মার জিজ্ঞাসার ধরন কি এইরকম? এত স্বপ্নাভাসের মধ্য দিয়ে? চাকরিটা সে এমন আকস্মিকভাবে ছেড়ে দিল — কেন — মা তবু সহজে জিজ্ঞেস করতে পারে না তাকে। সহজ জিজ্ঞাসার রক্তপাতে তারা কেউ — এই মা আর ছেলে, বিতান আর নীহারিকা দীর্ণ হয়নি কখনো, তবু স্বপ্নে তো আমরা এখনও কথা বলি, বিতান ভাবল।

আকাশ দেখছিল বিতান। তার ছেলেবেলার সেই আকাশ আর নেই। ভাড়াবাড়ির একতলার ছাদে দাঁড়িয়ে রাতের আকাশ দেখতে-দেখতে ভাবছিল বিতান, আকাশ, সমুদ্র সবকিছুই বদলায়। মাতৃত্বের সংজ্ঞা বদলায়। গন্ধের শরীর একসময় শুধু গন্ধের স্মৃতি হয়ে যায়। নীহারিকার কথা ভেবে বিতানের গলার কাছে সূক্ষ্ম ব্যথার কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে। কী অসহায় তুমি নীহারিকা, যেন কুন্তীর মতো তুমি আজ আমার সামনে এসে দাঁড়ালে .... ভ্রূণের সন্তানের পরিচয় এভাবেই বদলে যায় তবে!

ট্রেন জারনি করে এলি, আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় —

আকাশের আলোয় নীহারিকাকে দেখতে পেল বিতান।

তখন তুমি বাড়ির কথা বলছিলে —

হ্যাঁ, হৃদয়পুরের দিকে একটা জমির খোঁজ পাওয়া গেছে।

কত টাকা?

চার হাজার কাঠা।

তুমি কি বাড়িতে পুকুর বানাবে — বাগান করবে — সুপুরি, নিম, দোপাটি গাছ করবে? তাতে তো অনেক জায়গা দরকার?

কত? একটা পৃথিবী? এই মহাবিশ্ব —

আবার বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করলি? তোর বাবাও তো করেন।

বিতান চুপ করে গেল। পৌরুষের মুখোশটাকে তার মধ্যেও কি মা আবিষ্কার করতে চায়? যেন সন্তান নয়, অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে কথা বলছেন নীহারিকা।

কী হল? শুতে যাবি না?

তুমি একটা মাদুর নিয়ে এসো — এখনি শোব না —

কেন, ঘুম আসছে না?

না —

অন্ধকারে চোখ বুজে শুয়ে থাকলে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বি — ক্লান্ত আছিস তো —

ক্লান্ত হয়ে কী জাগতে নেই?

তোর কথাবার্তার রকমসকম বুঝি না বাবা।

কেন বোঝ না?

তোর বাবা বলেন, আমরা পুরোনো যুগের মানুষ।

তোমার বাবা তোমার কথা বুঝতেন না?

তা বুঝবেন না কেন —

তাহলে তুমি বোঝ না কেন? তুমি কত পুরোনো যুগের? তোমার বাবার চেয়েও? তোমার ঠাকুমার চেয়েও?

আমি তো লেখাপড়া শিখি নি।

বিতান কার্নিসের উপর ভর রেখে নীচের দিকে তাকাল। নীচের গলি সুনসান। লাইটপোস্টের হলুদ আলো ছড়িয়ে আছে। যেন নক্ষত্রদের মড়াটে ঘিলু, নাড়িভুঁড়ি। মা আর সন্তান, জ্ঞানের এই আদিতম বীজ, এর বাইরেও আর কোন্ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে পরস্পরকে বুঝে নেবার জন্য? নীহারিকার আর কোন্ জ্ঞান চাই? এই প্রশ্ন তো সে নীহারিকাকে করতে পারবে না। কেননা সেই জ্ঞানের শরীরে দাঁতাল শুয়োরের চিৎকারের জন্ম দিয়েছিল সে নিজেই, তার চেতনা। আড়াই কোটি বছর আগে যে নক্ষত্রটি মারা গিয়েছে -- যার আলো ১৯৮৬-র ১৭ই নভেম্বর দাঁড়িয়ে সে দেখতে পাচ্ছে — সেই নক্ষত্রের জীবনকালের সঙ্গে সে নিজেকে সংযুক্ত করবে কীভাবে? সে তো নীহারিকার সন্তান — তাই কি এত সহস্র আলোকবর্ষের ব্যবধান? নিজের জন্মফলের খাতাটি ওলটাতে-ওলটাতে সে একদিন দেখেছিল — 'এই জাতকের জন্মনক্ষত্র কালপুরুষের মুখে পড়ায় জাতক অত্যন্ত ভোজনপ্রিয় হইবে।' — তাই কি তার চেতনা এমন আগ্রাসী হয়ে সম্পর্কের অন্তঃসারগুলি বকরাক্ষসের মতো গিলতে চায়?

আচ্ছা মা —। বিতান নীহারিকার দিকে ফিরে দাঁড়াল। নতুন বাড়িতে তুমি একটা অ্যাকোরিয়াম রাখবে না?

নীহারিকা বিহ্বলের মতো বিতানের দিকে চেয়ে থাকেন।

কী সব যেন নাম — ব্ল্যাক ফিশ, অ্যানজেল, আর ওই লাল-লাল মাছগুলো — বিতান হঠাৎ খিকখিক করে হেসে ফেলে — তোমার মনে আছে মা, তখনও এ-বাড়িতে ইলেকট্রিক আসে নি, হারিকেনের আলো ছিল, সেবার রথের মেলা থেকে অনেক মাছ কিনে আমি বয়ামে এনে রেখেছিলাম — সেই যে বয়ামটায় তুমি আখের গুড় রাখতে — এইসব মাছেরা তো আলো ছাড়া বাঁচে না — এইসব রঙিন মাছেরা — আর ঘুরে ফিরে বেড়ানোর জন্য অনেকটা জায়গা ওদের লাগে, সবুজ শ্যাওলা চাই — সে সব তো কিছুই ছিল না — কী যেন ঝাঁঝিগাছ, হ্যাঁ, তাও ছিল না — ভোরবেলা উঠে দেখলাম, জোড়া অ্যানজেল মরে গেছে — সারাদিন আমার কী কান্না — তুমি খাওয়াতে পর্যন্ত পারনি — তারপর কয়েকদিনের মধ্যে সব মাছগুলোই মরে গেল—

বাবা, এতসব তোর মনে আছে? বগবগানিও জানিস —

তুমি জান না, জাতকের জন্মনক্ষত্র কালপুরুষের মুখে পড়ায় জাতক অত্যন্ত বাকপটু হইবে?

আচ্ছা, যদি অ্যাকোরিয়াম করি — নীহারিকা হাসলেন — করাই তো যায়, তাহলে কি তুই সেখানে রঙিন মাছ হয়ে সাঁতার কাটবি?

বিতান মরা মাছের মতো চোখে নীহারিকার দিকে তাকিয়ে থাকল। এই নীহারিকাকে সে কোনোদিন দেখেনি — যেন বিশাল এক নারীমাছের মতো, যে নীহারিকা তার পঞ্চাশ বছরের জীবনের স্রোত ভেঙে তার দিকে এগিয়ে আসছে — তার রঙিন সন্তান মাছের দিকে। বিতান হাওয়ায় শ্যাওলার গন্ধ পেল। ঝাঁঝিরও।

কিন্তু জল বার করার সময় অমন জাল দিয়ে ধরতে যেও না আমায় তুমি।

তুই কিন্তু আজেবাজে বকছিস তখন থেকে। ঘুমোতে চল — নীহারিকা বিতানের হাত ধরে টানলেন।

আচ্ছা মা, সত্যিই যদি হৃদয়পুরের জমিটা কেনা হয়ে যায় — তোমার মনের মতন একটা বাড়িও সেখানে হতে পারে — তবু এই বাড়িটা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

তা তো হবেই —

তাহলে?

তা বলে কি মানুষ নতুন বাড়িতে যায় না?

যায়। কিন্তু কষ্ট নিয়ে তবু কেন যায়?

নিজের ঘর তো চায় মানুষ —

আপন বাসা?

নীহারিকা হেসে ফেললেন।

কিন্তু ধর সেখানে যদি তোমার কোনো ছেলে মরে যায় —

বিতান! নীহারিকার গলা সাদা পৃষ্ঠার মতো কেঁপে ওঠে। তোরা আমার বাড়ির স্বপ্ন এভাবে ভেঙে দিবি! তাঁর গলা ছুঁয়ে ঝর্নাটি উঠে আসে চোখে। নীহারিকা কাপড়ে মুখ ঢাকেন। শোনা যায় শিকনি টানার শব্দ। নীহারিকার ফ্যাসফ্যাসে গলা। নতুন বাড়িটা শুধু আমার চাওয়া নয় —

তাহলে কী মা? বিতান নীহারিকার পিঠে তার থাবা মেলে দেয়।

অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন না নীহারিকা। তারপর একটা শব্দ তার মুখ থেকে ছড়িয়ে যায়, আ — কা — ং — খা —

আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি মা — এমনি মুখ ফস্কে —

তুই তো এভাবেই বলিস চিরদিন —

বিতান চুপ করে যায়।

ঘুমোতে যাবি না?

কটা বাজল?

বারোটা বেজে গেছে নির্ঘাত —

তাহলে আরো একটু থাকি।

মাদুর আর বালিশটা নিয়ে আসি। এখানেই কিছুক্ষণ শুয়ে থাক।

তোমার বাড়ির সব জানলাগুলোয় রঙিন কাঁচ লাগিও, মা —

বাড়ির কথা থাক।

চাল বেটে তুমি যেমন আলপনা দিতে — সিঁড়িতে তেমন ফুল-লতা-পাতা এঁকে দিও —

বাড়ির কথা থাক। তুই শুবি চল।

একটা লাউমাচাও করতে পার —

বাড়ির কথা থাক। অনেক রাত হল।

বা লঙ্কার গাছ। লাল-লাল ফুলের মতো লঙ্কা —

সবটাই বুঝি আমাকে সাজাতে হবে? নীহারিকা শ্লেষে হাসলেন। আর তোরা? বাড়িটা কি তোদের নয়?

বিতান ছাদের উপরেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে।

তুই যে নোংরাতেই বসে পড়লি — কতদিন ঝাঁট পড়েনি —

নীহারিকার দিকে চেয়ে থাকে সে। — ছাদের এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে ছেঁড়া কাগজ, শুকনো পাতা, পালক — যেন কোনো মহাযুদ্ধের শেষ অঙ্কের ভিতরে বসে আছে সে। শান্তিপর্বের ভিতরে? যেখানে বিষাদ এসে জয়ের মুখোমুখি ভাঁড় হয়ে নাচে, বিতান ভাবছিল, যেখানে স্বাধীনতা পরিণত হয় দহনে। তবু এই শান্তিপর্বের শ্মশানে তার পাশে তো নীহারিকাও আছেন — হয়তো দশ হাজার বছর আগে নীহারিকার নক্ষত্রমণ্ডলী ভেঙে গেছে — তার আলো বিতানের পাশে এখনও জেগে আছে।

নীহারিকাও বসে পড়েন বিতানের পাশে।

তুই তো কোনোদিন কিছু বলিস না —

বিতান চুপ করে থাকে।

আগেও যখন এখানে থাকতিস, একা একাই থাকতিস। কখনো জিজ্ঞেস করলেও কিছু বলিস নি তুই —

কী? বিতান হাসে।

নিজের কথা। বল তুই, সেধে কোনোদিন আমার কাছে একহাতা ভাত বেশি চেয়েছিস তুই?

তাতে কী?

মানুষ তো কাউকে কিছু বলে —

কাকে?

আমাকে তো বলতে পারিস তুই।

ও কিছু না। ও তুমি বুঝবে না।

কেন, তুই কত আগামী যুগের? তোর ছেলের মেয়ের চেয়েও? তোর নাতির চেয়েও?

হাওয়ার ভিতরে বিতানের হাসি কেঁপে-কেঁপে ওঠে।

তুমি দেখছি কথার শিরোমণি হয়ে উঠেছ মা —

আমি তো তোর পেটে জন্মাই নি।

বিতান আবার হো-হো করে হেসে ওঠে। পেটে ধরেছ বলেই বুঝি —

কী?

রক্ত দিয়ে সব কিছু বোঝা যায় না, মা।

তাহলে কী দিয়ে! বল তুই — আমি সেভাবেই বুঝব।

আমি জানি না। আচ্ছা মা, চাকরিটা আমি কেন ছেড়ে দিয়ে এলাম তা তুমি একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন?

তুই তো উত্তর দিতিস না —

তবু জিজ্ঞেস করতে তো পারতে।

কী লাভ?

আচ্ছা, যদি তোমায় উত্তর দিতাম — তাহলেও কি আমাদের বোঝাবুঝি সম্পূর্ণ হত?

তুই যেন অনেক দূরে সরে গেছিস —

তুমি তোমার মা-বাবার থেকে এতখানি দূরে সরে গিয়েছিলে কোনোদিন?

নীহারিকা চুপ করে থাকেন।

আচ্ছা, এই পুরোনো বাড়িটা ছেড়ে যেতে তোমার কষ্ট হবে না?

হ্যাঁ—

তুমি চলে গেলে তো এ বাড়িটা আর ঠিক এভাবে বাঁচবে না —

নীহারিকা বিতানের দিকে চেয়ে থাকেন।

জান মা, এই তিন বছরে, ওখানে আমি বার দশেক বাড়ি বদলেছি। সত্যি বলছি, প্রত্যেকটা বাড়িতেই কেমন ভূতের ভয় পেয়ে বসত আমায়।

ভূতের ভয়? চিঠিতে তো লিখিসনি কোনোদিন —

দারুণ ভয় হত। রাত্তিরে শুলেই মনে হত, কারা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। পুরোনো সব বাড়িরা ভুতের মতো তাড়া করে ফেরে।

কী আবোল তাবোল বকছিস! এত রাত্তিরে তোর মাথায় ভূত চেপেছে। চল, শুবি চল।

বিতান আবার হেসে ওঠে।

তুমি ভয় পেয়ে গেছ, মা?

তোর শরীরে কোনো কষ্ট হচ্ছে?

না তো —

কোনো কষ্ট নেই?

না —

তাহলে এমন বানিয়ে-বানিয়ে কথা বলছিস কেন তুই?

বিতান দেখল নীহারিকার মুখ কিরকম কুয়াশার মতো আবছা হয়ে যাচ্ছে। সেই কুয়াশার মধ্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অনেক জেটপ্লেন, উড়ুক্কু মাছ আর অরকিডের শেকড়।

মা, ওই বাড়িগুলোতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ছিলাম খুব--

কেন?

ভূত ছিল —

কাদের ভুত?

গত একশ বছরে যেসব সময় মরে গেছে--

তোর শরীর খারাপ লাগছে?

না, শোনো না — তোমাদের মা বাবা তো তোমাদের জানত —

হ্যাঁ —

তোমরাও তাদের জানতে —

হ্যাঁ —

তার আগের পুরুষেও জানত —

হ্যাঁ —

তারও আগের পুরুষ —

হ্যাঁ —

তাহলে এতদিনের জ্ঞান --- জ্ঞানের ভূত—

তোর শরীর খারাপ লাগছে?

আমি এত মৃত জ্ঞান নিয়ে কী করব বলতে পার, মা? কথাটি বিতানের গলার ভিতরেই ডুবে যায়। নীহারিকার কানে পৌঁছয় না। বিতান জানে, কোনোদিন পৌঁছবে না।

হৃদয়পুরের জমিটা যদি সত্যিই কেনা যায় —

ওসব কথা থাক। তুই এবার ঘুমিয়ে পড়বি চল।

নতুন বাড়িটা সেই স্টেশন থেকে কতদূরে হবে?

ক্ষত-অক্ষত

অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

হাড়-জ্বালানো একটা শব্দ, পাখির। কী পাখি? কে জানে। হতে পারে কোকিল, কিংবা কাক। একটানা চেঁচিয়েই চলেছে। সেই জন্যই ধনার মাথা গরম।

দু বোতল মহুয়া সাত সকালে পেটে ভরে তবেই না ধনা এসেছে ডিউটিতে। তাতেও মাথা ঠাণ্ডা নয়। বরং শিরা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম। বিরক্তি। তার ওপর এই পাখিটা!

ঢিল ছোঁড়ে ধনা। ঘন পাতায় ঢাকা ছাতিম গাছটির সবচেয়ে অন্ধকার গভীর ডালে। ইটের টুকরো গিয়ে লাগে ও পাশের লাল পাকার সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের দেওয়ালে। ঠক্ ঠক্। ট্যাঙ্কির পাইপ ফেটে গিয়ে যেখান দিয়ে অনবরত জল ঝরেই চলেছে — ঝর ঝর টপ্ টপ্—

ঘুসুরের বাচ্চা, শালা রামপরবেশ এই সকালে গা ধুতে —ঝরা জলের নিচে — মরবে শালা এই খেপেই —টি. বি. রুগি – এতো অত্যাচার .... রামপরবেশকে টেনে তুলতে সেদিকে দৌড়ায় ধনা। পিছন থেকে দিদিমণি যেন ডাকলো — ধনু — ও ধনু —

কাঁচা মাংসের ঝুড়ি এলো কিচেনে। শাল্‌লা দু লম্বরি। একবার দেখলে হয়। না, তার আগে এ্যাক্ উই ঘুসুরের বাচ্চাকে — মরবে ব্যাটা এই লটেই।

ধনা দৌড়ায়। গজ প্লাস্টার রক্ত মল -- যতো সব নোংরা যেখানে সেখানে পড়ে ডাঁই। তারই মাঝে রামপরবেশ — মাথায় জল গায়ে জল। মূর্তিমান মৃত্যু। শুকনো চামড়ায় ঢাকা কখান হাড় মাত্র, বধির অথর্ব, প্রায় মূক, জ্যান্ত কঙ্কাল!

একজন আয়া আসে। ও ধনু দিদিমণি — ফাইলটা —

কারো কথায় কান দেবার ফুরসৎ নেই ধনার। টেনে আনে, দুহাত ধরে হ্যাঁচ্‌কা টান মারে ধনা। —যাতা যাতা— রামপরবেশ যেন কী সব বলে।

টেনে আনতে না পেরে, কোলপাঁজা করে তাকে তুলে নিয়ে ধনা বিড়বিড় করে, শাল্‌লা দেড় কেজি ওজন্যার জ্যান্ত লাশ -- অ্যাতেই অ্যাত্তো বাহাদুরি। ছাতিম তলায় কলেরা ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের সামনে সিমেন্ট-বাঁধানো চত্বরে ধনা রামপরবেশকে ধপ্ করে নামিয়ে রাখে। তারপর তার নিম্নাঙ্গের ভেজা কাপড়ের টুকরোটিকে খুলে ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ উলঙ্গ বৃদ্ধ রামপরবেশের গায়ে সকালে রোদ পড়ে ঠিকরোয়।

নিজের জামার নিচের দুটো বোতাম খুলে ফেলে, জামা দিয়েই রামপরবেশের গা মুছিয়ে দেয় ধনা। রামপরবেশ বসে বসে হাঁপায়।

ততক্ষণে এধার ওধার থেকে দুচারটা রোগী উঁকি দিতে শুরু করেছে। একটা গজের কাপড় হাতে নিয়ে অফিস কাম ডিপথেরিয়া ওয়ার্ড থেকে ধনা বেরিয়ে আসে। হেই-হেই করে মারতে তেড়ে যায় কৌতূহলীদের।

ধনাকে চেনে সকলে। যা ইচ্ছা তাই করতে পারে সে। ডাক্তারবাবুরা, নার্স, আয়া, জমাদার মায় ডি. এম. ও সাহেব পর্যন্ত ধনাকে সমঝে চলে। স্নেহের সুরে কথা না বললে,

প্রেস্টিজের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সব জায়গায় শাস্তি চলে না। আর ধনা দোষিকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়ে না।

সবাই মুখ সরিয়ে নিলে গব গব করে গজটা রামপরবেশের নিম্নাঙ্গ জড়ায়। বাপের মতো আদর করে। রামপরবেশের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখে সব জল শুকিয়েছে কিনা। — লাগা? লাগা? অর্থাৎ ধনা জিজ্ঞেস করে টানা হেঁচড়ায় রামপরবেশের লেগেছে কিনা। রামপরবেশ বোঝেনা ধনার ভাষা, ধনা বোঝেনা রামপরবেশের ভাষা। — এই ভাবেই ইঙ্গিতে সংকেতে দুজন দুজনের কথা বোঝে। এ ওকে ভয় পায়, ও একে ভয় পায়, দুজনেই শত্রুর মতো আচরণ করে। ধনার ভয়, এতো মেহনতেও যদি মরে যায় রামপরবেশ! দুতিন বছরের পুরানো রুগি, পোঁদে দগদগে ঘা, বারো বারো শালা বুড়হার সব রক্ত শেষ, নাকে সির্কনি। কটা মজবুত হাড় মাত্র সম্বল। তাই নিয়ে আর কদিন? বছর দুতিন ডিঙিয়ে গেছে।

তবে আগের চেয়ে এখন সুস্থ রামপরবেশ। আর যাই হোক শাল্‌লা পোঁদ ঘস্‌টে ঘস্‌টে ইস্টিশান চত্বরে হাবা খেতে যায় মৌজে — এ্যাতো ধকলেও জান কাহিল হয় না।

সারা সদর হাসপাতাল চত্বর ধনার দখলে। কোনো দাদা বা মস্তানের ট্যাঁ ফো করবার জো নেই তার কাছে। এ সব ধনা বোঝে কিনা কেউ বোঝে না। নিজের খেয়ালে নিজের জীবন হাতে নিয়ে ধনা আকণ্ঠ মদ-চোলাই তাড়ি গিলে চলে। ফাই-ফর্মায়েশ খাটে। ধনা না কি জাতে ডোম। তো ডোমের কাজটি তার পছন্দ নয়। গাড়ি ভর্তি পচা লাশ যাবে মহাতাবপুরের শ্মশানে—ধনা থাকবে সঙ্গে। হাতটি লাগাতে বলো, সে কথা বলবার উপায় নেই! ধনা গাইবে গান, বাজারের হিট সব হিন্দিগানের প্রথম কলি .রাম তেরি গঙ্গা ময়লি হো গেয়ি..........

রামপরবেশের হাত ধরে ধনা। ধনা হাঁটে পা-পা। রামপরবেশ এক হাতে গুঁত্তা মেরে বসে বসে এগিয়ে যায়।

রোগীকে বেডে বসিয়ে এবার ধনা কিছুটা নিশ্চিন্ত। ততোক্ষণে পাখিটাও উড়ে গেছে। রামপরবেশের বরাদ্দ চারপিশ পাঁউরুটি আর আধ-মগ দুধ। সেটি খাওয়ানোর তদ্বির করতে গিয়েই নতুন ঝামেলা বাধালো ধনা।

হৈ-হুল্লোড়। নার্স-আয়া-ওয়ার্ড-ইনচার্জ-জমাদার-ওয়ার্ডবয় — সবার ছোটাছুটি। দুধ নয় তো, দুধ-মেশানো জল। ওয়ার্ডবয়কে ধরে থাপ্পড় কষালো ধনা। চারপিশ পাঁউরুটির দুপিশ হাওয়া।

ধনা নির্বিকার। আবার গাছতলায় এসে বসে সে। গা চুলকায়। কানের ভিতর পায়রার পালক ঢুকিয়ে খরর খরর শব্দে আরাম পায়। কুত্তার পাছায় ঢিল মেরে কেঁই-কেঁই শব্দ শুনে মজা পায়।

ওদিকে তর্জমা চলে। ফোঁস ফোঁস শব্দ করে কিচেনের ওয়ার্ডম্যান সুপারের কোয়ার্টারের দিকে এগিয়ে যায়, ধনার সামনে দিয়েই। ধনা সে সব দেখে। আর যাত্রার ঢং-এ মস্ত একটা হাসি দিয়ে চত্বরকে কাঁপিয়ে তোলে। তারপর একটা পা ওপরে তুলে, এক পায়ের ওপর ভর রেখে শরীর ঘুরিয়ে ওয়ার্ড-বয়টির উদ্দেশে চেঁচিয়ে ওঠে — পাগলা খেপ্ — এ — ছে — এ........

ধনার এই কিত্তি দেখে ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের চৈতালি দিদিমণি হি-হি হাসে।

ধনা তখন সেদিকে এগিয়ে যায়। দিদিগো গলা কেমন? তখন দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে খ্যাক্ খ্যাক্ হাসে।

চৈতালি বলে, তা ভালো, কিন্তু তুমি ওকে মারলে কেন?

— কাকে?

— ঐ যে বলাই।

— ও —

যেন কিছুই হয়নি, কিছুই ঘটেনি, এমনই নিরুত্তাপ ধনা। উত্তরটিও সেই অভিব্যক্তির প্রকাশ।

চৈতালি ছাড়ে না সহজে, কী গো বল........

— শাল্‌লা হারামির বাচ্চা সব — রামপরবেশের দুধে জল ঢাল্যো দেয় — রুটি হাফিস করে দেয় —

পকেট থেকে জর্দা পান বের করে ধনা মুখে ভরে। তারপব মোড়কের শালপাতাটি নোংরা ফেলার চৌবাচ্চায় ফেলে আসে। চৈতালি ধনার পেছনে লাগে — ও ধনু, তুমি এই সক্কালবেলাতেই মদ খেয়েছ?

নির্বিকার ধনা এড়িয়ে গিয়ে বলে, দিদি তুমি ডাক্তার হবে? তমার বাবা ত ডাক্তার —

এসব তথ্য রোগীদের থেকে আগেই জানা হয়ে যায় ধনার। চৈতালিব বাবা বীরভূমেব দুববাজপুরে থাকে। মেডিক্যাল অফিসার। এখানে মহিলা কলেজের ছাত্রী চৈতালি। সে বলে, হ্যাঁ ডাক্তার হব।

— ভালো খুব ভাল্‌লো—

— ও ধনু —

— কী

-- এই বিস্কুটগুলো তুমি নাও।

চৈতালি তার বরাদ্দ হাসপাতালের দেওয়া আট-খানা বিস্কুট ধনার দিকে এগিয়ে ধবে।

এখানে বলাইরা ঝাড়তে পাবেনি। ধনা জানে চৈতালি দিদিমণি হাসপাতালের দেওয়া খাবাব খায় না। সেই বিস্কুটগুলি হাতে নিয়ে টি.বি.ওয়ার্ডে যায়। বসে থেকে রামপরবেশকে খাওয়ায।

জানালার বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলাই টিটকিরি কাটে, শালা যেন বাপকে খাবায়

— হুঁঃ —

এদিকে অফিসে আর এক দফা চেঁচামেচি। রোগী এন্ট্রি ফাইল উধাও। ধনা শোনে সব। আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ঘাড় নিচু করে দাঁড়ায়। ওয়ার্ড ইনচার্জ বলে, ও ধনু, বাবা ফাইলটা—

হা হা হাসে ধনা। পাগলি খেপ্ — এ— ছে.......

— তা হোক, আগে ফাইলটা দে।

আলমারির মাথার ওপর থেকে ফাইলটি এনে টেবিলে আছড়ে ফেলে দেয় ধনা। আবার ছোটে টি. বি. ওয়ার্ডে।

মাঝ বরাবর শহরকে চিরে ফাঁক করে খাড়া দক্ষিণে কাঁসাই-এব দিকে চলে গেছে জল নিকাশির ড্রেন। তারই আশেপাশে দ্বারিবাঁধ নিমতলার চককে ঘিরে গড়ে উঠেছে এক ঝুপড়ি পল্লি। কারো গোছানো ঘর, ছিটেবেড়ায় ঘেরা। মাথার ওপর খড়ের চাল। দু' একজন এমনও আছে — যারা মাথায় চাপিয়েছে টালি — টিন।

এখানে সব ডোম আর মেথরেরা থাকে। সকাল হবার অগেই 'ডিব্বাগাড়ি' ঠেলে ঠেলে ছেলে-মেয়েরা চলে খাটা-পায়খানা সাফ করতে। মল ভরে ভরে চলে যাবে শহরের একেবারে

বাইরে জুগনিপোতায়। তারপর নদীর জলে সাফাসুফো হয়ে ফিরে আসবে। কেউ বা দেবে রাস্তা ঝাড়ু। নর্দমা সাফাই স্যানেটারি পায়খানার ট্যাঙ্কি সাফাই, জঞ্জালের লরিচালক, কুলি কামিন সব এদের থেকেই। এরা সব মিউনিসিপালিটির কর্মী। আর এদেরই কেউ কেউ জোগাড় করেছে সরকারি সদর হাসপাতালে একখানা মস্ত চাকরি। এদেরই ঘরের বৌ-ঝিরা কেউ কেউ আয়ার কাজ জুটিয়েছে। কেউ আছে লাশ মুদ্দা সাফাই-এ। কেউ জমাদার। আর কেউ কেউ ওয়ার্ড বয়।

ধনা ডোম সই-এর খাতায় ওয়ার্ড-বয়। কিন্তু নানারকম কাজ কম্মো করে সে। চোলাই ভাটিতে গিয়ে হামলা করে, উঠা উঠা এসব লিয়ে যা হেই সে পাস্‌সে—হাসপাত্তাল চত্বরে উসব চলবেনি। প্রয়োজনে দু'দশটা ঘুসি ফুসিও চালিয়ে দেয়। তাকে সমঝে চলে এরা। কিচেনে মাংস কম এলে, কিংবা পাঁঠার বদলে পাঁঠি মাংস সাপ্লাই এলে, দিন দুপুরেই ওষুধ পাচার হলে, লেবার রুম থেকে সদ্যজাত শিশুকে কুত্তায় টেনে নিয়ে গেলে, রোগিনীর ইজ্জতহানি হলে — হাঁ, সেখানেও ধনা হাজির গিয়ে। সবসময় সব সমাধান করতে পারে না। কারণ গভীর। কিন্তু হৈ হট্টগোল হামলা সুপারের তড়পানি, কন্ট্রাক্টরের লাল চোখ — এসব লেগেই থাকে। বেপরোয়া ধনা ছুটে যায় অন্য কাজে বা টি. বি. ওয়ার্ডে। অ্যাক্‌সিডেন্টে ঠ্যাং কেটে যাওয়া, পোড়া, বিষ খাওয়া, সাপে কাটা, কলেরার সিরিয়াস রোগী সব দূর-দূরান্ত থেকে এসে জোটে। রিক্সা এ্যাম্বুলেন্স থেকে তাদের টেনে নামিয়ে, এমারজেন্সিতে দেখিয়ে, আউট ডোরের খাতায় নাম এন্ট্রি করে, ওয়ার্ডে বেডের ক্রাইসিস মিটিয়ে সব ব্যবস্থা করা — এ সবে ধনা মস্ত সহায়। যারা জানেনা ভিন্ন কথা, কিন্তু যারা জানে, তারা মাল খেতে দু'একটা আধুলি কয়েন মায় দু'পাঁচ টাকার মস্ত একটা নোট ধনার হাতে ধরিয়ে দাও, ধনা তোমায় দেবতা মেনে সেবা করবে। বদলে তুমি বড়ো ঘরের পো পোতা বৌ ঝি মালিক — হাসপাতালের দুধ মেশানো জল বা সস্তার বিস্কুট বা শুকনো বাসি ডাব বা বাসি পাঁউরুটি ট্রের ওপর সাজানো নোংরা ঝোল ভাত মাছ মাংস ডিম — যেগুলো তুমি খাওনা ঘেন্নায় বা অন্যকারণে, সেগুলো ধনাকে দাও। ধনা সে সব কাজে লাগাবে। ছুটে যাবে টি.বি.ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও। মেডিক্যাল ওয়ার্ডে, যেখানে লাশের মতোই মেঝের ওপর গাদাগাদি সব রোগী — তাদের সেবায়। বদলে মদের গন্ধ ভর্তি ধনার শরীরটি তোমার নাককে সহ্য করতে হবে। আর বাইরের বটতলার চক থেকে তোমার প্রিয় খাদ্য কমপ্লান হরলিক্স বিস্কুট এবং অবশ্যই ওষুধটিও ধনাকে আনতে দাও ধনা এনে দেবে। এই নিয়েই ধনার অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ। বাজারে চালু হিন্দি সিনেমার হিরো-স্টাইল।

সেদিন সকালে ডিউটিতে আসবার সময়, হঠাৎ নিমতলার চকে তাকে দেখেই মগজটা কেমন চিড়বিড়িয়ে উঠল ধনার। — শালী হারামির বাচ্চা খান্‌কি মাগী —

চেঁচাতে চেঁচাতে তার দিকে তেড়ে যেতেই, পিছন থেকে এক রিক্সাআলা ধনার ঘাড়ের ওপরের চুল ধরে কষিয়ে দিল থ্যাপড়া নাকের ওপর দু'চারটা।

ধনা আর বাড়াবাড়ি করেনি। বরং তড়পাতে তড়পাতে পরে গান গাইতে গাইতে হাসপাতালের দিকে এগিয়ে এসেছে। এসেই ছুটেছে টি বি ওয়ার্ডে। — অনেক জমানো ব্যথা বেদনা কী করে গান হল জানি না ....

এই মেয়েটি ধনার বউ। ধনার ঘর ছেড়ে, ধনার সঙ্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মহাতাবপুরের রিক্সাআলাটির সাথে থাকে। মিউনিসিপালিটির রাস্তায় ঝাড়ু দেয়।

এমনিতে সব ঠিক ঠাক। ধনা তার জীবনের এই ইতিহাসটুকু জানাতে কারোর কাছে চোখের জল ফেলেনি, নাকের সিকনি ঝরায়নি। একজনের খোরাকি কমে যাওয়ায় মাল

খাওয়া বেড়ে গেছে মাত্র। কোনো কৌতূহলী জিজ্ঞাসু হলে ধনা এড়িয়ে গেছে। কোনো নার্সদিদিমণি বা বেপাড়ার যুবতী আয়া এ নিয়ে ঠাট্টা ফাজলামি মারাতে এলে ধনাও একটা ঠ্যাং-এর ওপব শরীরের ভর রেখে অন্য ঠ্যাং ওপরে তুলে শরীরকে গোল পাক খাইয়ে হো-হো হেসেছে — তুই তুমি আপনি আমার বউ হবেন গো ... .

— এই ধনা শোন শোন

পগার পার। ধনা আর সে চত্বরে নেই। টি বি ওয়ার্ডে বা অন্য কোথাও। বরং পুরোনো ইয়ার দোস্ত দু'একজন এই সব ব্যথা বেদনার কথা নিয়ে সহানুভূতি জানাতে এলে, দু'এক হাত হয়েও গেছে তাদের সঙ্গে ধনার।

ধনা আসে ওয়ার্ডে।

নার্স দিদিমণি জিজ্ঞেস করে, কী ধনু, তোর এত দেরি আজ!

ধনা সে সবের উত্তর না দিয়ে যাত্রাব ঢং-এ রাজাব হাসি দিয়ে সোজা টিবি ওয়ার্ডে।

সেখানে আর এক কাণ্ড! ধনা গিযে দেখে, রামপরবেশ বে-পাত্তা। তার গন্ধও নেই ধারে কাছে।

— এ খেপিদিদি, বিহারিবাচ্চা কাই গইল বা?

— কী? কী কউ? হাঁফাতে হাঁফাতে এক অসুস্থা সাঁওতাল বৃদ্ধা ধনার প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করে।

ধনা বলে, রামপরবেশ?

নাই।

এক দৌড়ে ধনা ওয়ার্ড ইন্‌চার্জের কাছে। দিদিমণি টি বি ওয়ার্ডে রামপরবেশ নাই।

— নেই কি রে!

-- হুঁ, দেখলম নাই।

— দেখ দেখ বাবা ধনু, আবার ঝামেলা বাধিয়েছে।

– কী দেখব ফের? শালা পঁদ ঘসটাতে ঘসটাতে সেই ইস্টিসান চত্বর।

— যা দেখ।

— যাই, কেউ খুঁজতে আইলে বলবে, ধনা নাই, সে কাজে গেছে।

ধনার গম্ভীর ভঙ্গি দেখে নার্স মুখে রুমাল চাপা দেয়। হাসলেই দিদিমণির দেড় ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে পড়ে।

বাইরে বারান্দায় চৈতালি দিদিমণি। ও ধনু কোথায় যাও?

— দিদিমণি ভালো আছ ত?

— তুমি?

— শুবে যাও।

— শোনো না এদিকে —

— না গ তমার বর ধরতে ইস্টিসানে যাই।

— শোনো শোনো — বরটা কেমন? ও ধনু —

— পাগ্‌লি খেপ্ — এ— ছে — এ। এক দৌড়ে ধনা ছাতিম তলা ডিঙিয়ে ওপাশের লাল পাকা পেরিয়ে গেছে।

ইস্টিশান চত্বরে রেল লাইনের পাশে লাল মাটির ওপর যে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায় বসে থাকে রামপরবেশ, ধনা দেখে, আজ সেখানে নেই। বদলে টাটকা তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে এক যুবতী। মাটির কলসির মুখে খেজুর পাতা আর শাদা ফেনা। তালের রসের তাড়ি! চার

গেলাস টপাটপ মেরে দিয়ে ধনা রামপরবেশকে খুঁজতে থাকে। শাল্‌লা বিহারি কা বাচ্চা কাই গইল বা? .... চেঁচায় ধনা।

অবশেষে প্লাটফর্ম চত্বরে শুয়ে থাকতে দেখে। শাল্‌লা পাখ্‌খার হাবা আর ইস্টিসানের বাতাসে ঘুম্‌মে গেছে।

রামপরবেশের উদোম তপড়ানো পাছায় লাল কালোয় মেশামেশি ঘা — বেডসোর। দীর্ঘ দু-তিন বছর বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই অবস্থা। সেখান থেকে নেংটি খসে যাওয়ায় মাছি ভন্ ভন্ করছে। নেংটি টেনে ঢাকা দিয়ে দেয় ধনা। তারপর গুঁতো মেরে জাগিয়ে তোলে রামপরবেশকে। জিজ্ঞেস করে, লাগা? লাগা?

ভয়ে উদ্বেগে শঙ্কায় জড়সড় জবু থবু অসাড় রামপবরেশ বিড় বিড় করে, যাতা যাতা — যেন, অন্যায় করে ধরা পড়ে গেছে, এমনই আড়ষ্ট। কাতরতা চোখে মুখে।

এতোখানি পথ পাছা আর দু'হাতের ওপর ভর দিয়েই রামপরবেশ পালিয়ে আসে। ফলে ঘা ক্রমশ বেড়ে যায়। ধনার নিয়মিত মলম লেপাতেও সে ঘা তাই বাড়ে বই কমে না।

রামপরবেশ তার যাবতীয় অসুস্থতা নিয়ে কেনই বা বার বার ইস্টিশানে পালিয়ে আসে, তা জানেনা ধনা। কেনই বা অন্য কোথাও না গিয়ে এই খানেই পালিয়ে আসে তাও জানেনা ধনা। এ নিয়ে হাজার প্রশ্ন তৈরি হতে পারে; সেই সূত্রে বেওয়ারিশ রামপরবেশের একখানা জীবনের মস্ত ইতিহাস আগ্নেয়গিরির মতো হঠাৎই ভুঁই ফুড়ে লাভার স্রোত উগরিয়ে দিতে পারে। সে সবের ধাব ধারে না ধনা। আকণ্ঠ মদের ওপর নিমতলার চকের উত্তেজনা, টি বি ওয়ার্ডে রামপরবেশহীন খালি বেড, চৈতালি দিদিমণির মিষ্টি হাসি, হাসপাতাল টু ইস্টিশান হিন্দিগানের কলি, টকমিষ্টি ঝাঁঝালো তাড়ির আমেজ, বামপরবেশের অসুস্থতা পালিয়ে আসা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা — সব মিলিয়ে এক ঘোরের মধ্যে টলতে টলতে বামপরবেশকে দু'হাতের মধ্যে তুলে নেয় ধনা। তারপর রিক্সা স্ট্যান্ড আসে। চল রে হাস্‌পাতাল —

রিক্সার পা-দানিতে রামপরবেশকে বসিয়ে দিয়ে নিজে সিটে বসে। তারপর নিজের পাগুলো তুলে দেয় রামপরবেশের কাঁধে। ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধের চুলহীন মাথাটি ধরে রাখে যত্নে দু'হাতে। এতোসব, যাতে আর রিক্সা থেকে লাফিয়ে না পালিয়ে যেতে পাবে রামপবরেশ।

রিক্সা থেকে লাফিয়ে পালাবার কোনো সাধ বা সাধ্য যে নেই জড় রামপরবেশের সে বোধ ধনার নেই।

এইভাবে দুটি প্রাণীকে বয়ে নিয়ে একখানা রিক্সা শহরেব যাবতীয় বড়ো বড়ো বাড়ির পাশ দিয়ে সরকারি পিচ বাস্তা মাড়িয়ে এগিয়ে যায় হাসপাতালের দিকে।

এই দৃশ্য অনেকেরই হাসির খোরাক। অনেক কৌতূহলী ট্যারা চোখে তাকিয়ে দেখে।

ধনা নির্বিকার।

রামপরবেশকে কোলে করে নিয়ে যায় বেডে। ও দিকে রামপরবেশকে দেখতে পেয়েই আর এক কাণ্ড!

অনেক ভোরে, যখন সবে কাক পক্ষীরা জাগতে শুরু করেছে, তখন না কী এক অসুস্থ ল্যাট্রিনের ভিতর। নিদ্রাহীন রামপরবেশ সামলাতে না পেরে দরজার মুখেই সেরে ফেলেছে। প্রত্যক্ষদ্রষ্টারা তা জমাদারের কানে তুলে অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়েছে। ফিনাইল এবং পাটের ঝাড়ু হাতে জমাদার এসব কাণ্ডকারবারে রেগে খুন। রামপরবেশকে মারবে বলে শাসিয়ে গেছে সে। তাই হৈ-হল্লা।

অসুস্থ মানুষের ভিড়ে, অসুস্থ গুমোট পরিবেশে এই সব দু'একটা দুর্ঘটনা বেশ আলোড়ন আনে হাসপাতাল চত্বরে। তাই প্রত্যেকেরই মুখে মুখে ঘোরে ফেরে এই সব অনাসৃষ্টির কথা।

ধনা সব শোনে। মন দিয়ে শোনে। ধনা রাগতে জানে। কাঁদতে জানে না।

প্রথমটায় হাসে। গোটা চত্বরকে কাঁপিয়ে চেঁচায়—পাগ্‌লা খেপ্—এ— ছে—এ

পরমুহূর্তেই গম্ভীর।

ঠিক সেই সময় ছাতিমতলা পেরিয়ে ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের সামনে জমাদাবটি হাজির।

এক মুহূর্তেই হৈ-হট্টগোল চেঁচামেচি লোক জড়ো অনেক কাণ্ড। ধনা জমাদারকে আধমরা করে ছেড়েছে। তার অপরাধ, কেবল ক্রোধের মাথায় রামপরবেশকে মারবে বলে ফেলেছে।

অসহায় জমাদার যখন ধনার চাকরি খাওয়ার কথা ঘোষণা করে তড়পিয়েই চলেছে, তখন অন্যমনস্ক ধনা বলে, শালা মারবি কুথায় অর আঁ— শরীলে মারবার জায়গা আছে? পরক্ষণেই হেসে উঠেছে -- পাগ্‌লা খেপ্ — এ -- ছে-- এ —

লোকেরা যখন তদন্ত আর সমালোচনায় ব্যস্ত, ধনা তখন চৈতালি দিদিমণির কাছে বিস্কুট সংগ্রহে ব্যস্ত। এবং এক হাট লোকের ওপর দিয়েই বুক ফুলিয়ে পেছন দুলিয়ে দৈত্যের হা-হা হাসি দিয়ে সোজা আবার টি বি ওয়ার্ডে।

ধনার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ধনারই। জন্মাবার পর থেকেই। সম্পদের সম্ভারে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য এতোই নিটোল যে বাইরের কোনো ক্রিয়াকর্ম তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে না। শূন্য থাকলে তো ভরাবে, ভরাই যদি থাকে তবে আর ভরাবে কোথায়! ধনার গুণ-অগুণ সবগুলিই তাই অপরিবর্তনীয়। যারা দেখেছে, তারা সেটা জানে। একটা কাণ্ড-কারবারে সে আমূল সংশোধিত হয়ে যাবে এমন ধারণা করাটাই ভুল।

এতো বড়ো গণ্ডগোল বাঁধানোর পরও নির্লজ্জ ধনা ও দিকের ওয়ার্ডে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক নিচুতলার মহিলা স্টাফের ওপর চড় তুলেছে!

টি. বি. ওয়ার্ডের ওপাশে মর্গ ও লাশ স্টোর। বিকট গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে মাঝে মধ্যে! মহিলার অপরাধ, জানালার ঠিক ওপারেই কিছু নোংবা গজপ্রাস্টার ধনা তাকে পবিষ্কার করতে বলেছিল। সে করেনি।

ধনা বলবার কে?

কিন্তু, আইন কানুনের প্রশ্ন শিক্ষিত ভদ্র আমলাদেব জন্য। ধনা সে সবের ধার ধারে না। তোমাকে করতে বলেছি, তুমি করনি, আমার কাছে তুমি দোষি। ধনার ভাবখানা এই বকম।

মহিলাটি সে সব তো কবেইনি, উপরন্তু জানালাগুলিও বন্ধ করেনি। টি বি ওয়ার্ডে, যেখানে উন্মুক্ত নির্মল হাওয়া জরুরি, সেখানে পচা মড়া ও যাবতীয় নোংরার দুর্গন্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়বে — এ ধনার মগজ মেনে নেয়নি।

পুরুষ পুরুষের গায়ে হাত তুলেছে, কিংবা মহিলা পুরুষের গায়ে হাত তুলেছে, তাতে ঝামেলা মিটমাট হওয়া যতো সহজ, পুরুষ মহিলার গায়ে হাত তুলেছে, এটি মেনে নেওয়া ততো সহজ নয়। ধনা দোষি এবং তার শাস্তি পাওয়া উচিত।

কিন্তু সবমিলিয়ে যা দাঁড়াল, তাকেই বলে মিটমাট। এবারও জয়ী ধনা। পরক্ষণেই মহিলাটির কাছে গিয়ে বলল, মোর দোষ হয়ে গেছে। পান খাবি? হা লে —। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পানের খিলি বের করে, খপাৎ করে মেয়েমানুষের হাত ধরে, সেই নরম হাতের ভিতর পান গুঁজে দিয়েছে।

· বদলে মহিলাটি মুখটাকে ভিন্নরকম কায়দার মধ্যে ধরে রেখে ধনাকে ঠেলা দিয়েছে — যা মড়া যা — ভাগ —

নিজের পাছায় চাপড় মারতে মারতে আনন্দে আর উত্তেজনায় লাফিয়ে জটলার ভিতর হাজির ধনা। তার সেই বিশেষ ভঙ্গিতে শরীরকে বোঁ পাক খাইয়ে চেঁচিয়ে ছাতিমগাছের পাখিগুলিকে উড়িয়ে দিয়েছে। পাগ্‌লি খেপ্ এ — ছে — এ —

ধনার মনটা খুশিতে ফুরফুরিয়ে পাতলা বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উড়ে বেড়াতে চাইছে। সকালে উঠেই দেখে, দুনিয়াটি কেমন বদলে গেছে। রিক্সা স্ট্যান্ডে এখনো সে আসেনি। রাস্তার ওপর ঝাড়ু হাতে এখনো সে আসেনি। সবে বাসস্টপগুলিতে দু একটা মাত্র চায়ের দোকান খুলেছে। কোথাও বা কয়লার কাঁচা ধোঁয়া চত্বরকে মাতিয়ে রেখেছে। দু'একটি লোক দূর পাল্লার বাস ধরতে রিক্সা চড়ে স্টপের দিকে এগিয়ে আসছে। মিউনিসিপালিটির আলোগুলি নেভেনি এখনো। ভোরের ধোঁয়াশা ছড়িয়ে চারদিকে।

শাল্লা রাতে আঁধার, মান্‌ষে মায়ের গভ্‌ভে ঢুকে আর দিনের ব্যালা বাত্তি জ্বলে— অবাক হয়ে বিড়বিড় করে ধনা।

দিনের বেলা বাতি জ্বলা উচিত নয়, সুতরাং ইঁটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে একটা বাল্‌ব লক্ষ্য করে ছোঁড়ে। বিফল হয়ে আনমনা ধনা গান ধরে পরপর — হোমারিযা হোমাবিয়া — রাম্মা হো হো হো — ম্যায় নেহি মাখন খায়ো —। ভাটির দিকে এগিয়ে যায় — গান চলে — রঙ দে চুনারিয়া — আ-আ অ্যায়সে লাগি লগন মীরা হো গেযী মগন ...

আজ দু'টি বোতল পেটে ভরে ধনা ডিউটিতে চলে।

কাল রাতে রামপরবেশকে বেশ সুস্থ দেখেই এসেছে। রাতে আসাব সময হাত দুটি জড়িয়ে ধরে রেখেছিল, আসতে দেয়নি। ধনা বুঝিয়েছে, লাগা? লাগা?

বদলে, আঙুল উঁচিয়ে কেবলই ইস্টিশান দেখিয়েছে। ধনা বলেছে না, না, লাগবে, কষ্ট হবে, কাশি বাড়বে, তুই ঘুমা। ইঙ্গিতে নিজের চোখ বন্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছে ধনা। তারপর অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছে।

হেসেছে রামপরবেশ। ইস্টিশানের কথা ভুলে কেবল ধনার দিকে তাকিয়েই হেসেছে।

হাসছে হাসছে হাসছে .... কেবলই হেসে চলেছে ...... সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটিব তলায় বসে, পাশে ধনা.. ... দুনিযাব দুটি শত্তুর মুখোমুখি হয়ে এক পবিত্র সম্পর্কেব স্বাদ পেয়ে চলেছে। স্বপ্ন ভেঙে যেতেই উঠে পড়েছে ধনা ঘুম থেকে। ভোরের স্বপ্ন সত্যি হয? কী মজা!

হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে ধনা শোনে, সেই পাখিটা ডেকে চলেছে। ঢিল মেবে তাকে ওড়ানোর চেষ্টা করে না। বরং বিড় বিড় করে, ডাক শাল্‌লা ডাক চেঁচিযেই যা - - থমকে দাঁড়িয়ে গাছেব দিকে তাকায় — এই পাখিটাকে কোকিল কয়? পাতার পর পাতা ডিঙিয়ে গভীর অন্ধকারে চোখ চারায়।

তারপর ডিপথেরিযা ওয়ার্ডে, ওয়ার্ড ইনচার্জের কাছে যাওয়ার আগে একবার চৈতালি দিদিমণিকে দেখে যায়।

ও দিদি, আছো কেমন?

চৈতালী নিরুত্তর। মুখটা ঘুরিয়ে নেয় অন্য দিকে। গম্ভীর। কেবল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে।

ধনা ঘাবড়ে গিয়ে, পরক্ষণেই ঘোরটা কাটিয়ে নিয়ে একখানা হাসি দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, পাগলি খেপ্‌-এ-ছে-এ—

চৈতালি মুখ ফেরায়। অন্যরকম। যেন কিছু ভাবছে।

ধনা অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে। ও দিদিমণি, তুমি ডাক্তার হবে?

ওদিকে ইনচার্জ ডাকে, ধনা শোন — ফাইলটা?

ধনা উঠে দাঁড়িয়ে পর্দা ঠেলে ওদিকে যায়। আলমারি থেকে ফাইল বের করে টেবিলের ওপর ফেলে দিয়েই সটাং টি. বি. ওয়ার্ডে।

শালা রামপরবেশ ঝামেলা পাকিয়েছে আজ ফের। বেড ফাঁকা, সেই ইস্টিশান চত্বর.......

ধনা আবার অফিসে আসে। ও দিদি রামপরবেশ নাই — সেই ইস্টিশান, আমি যাই, কেউ খুঁজতে এলে বলবে, ধনু কাজে গেছে — ধনা পেছন ফিরে হাঁটা দেয়।

— ও ধনু, ধনুরে, ধনা, এদিকে আয়, শোন।

ধনা প্রথমে এড়িয়ে গেলেও এত ডাকে থমকে দাঁড়ায়। ফিরে আসে।

দিদিমণি চোখ রাঙায় — এ এ-ই —

— কী হইছে জলদি বল।

- কেন? এত তাড়াহুড়োর কী?

-- আমি যাব যে — না গেলে এসবেনি -

-- কোথায়?

-- ইস্টিশানে —

— না।

— কেন গ-অ দিদি রামপরবেশ যে ---

হাসে দিদিমণি। যেন জানালার কাঁচ ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ে মেঝেয়। রামপরবেশের লাশ মুদ্দা ঘরে —

অবহেলায়, যেন বাতাসে কথাটি ভাসিয়ে দেয় নার্স দিদিমণি। এমনই নিরুত্তাপ। কেবল দেড় ইঞ্চি মাড়ি বেরিয়ে থাকে।

- উঁ? অ্যাঁ — কী। ব্যস্ত ধনা এখন চেয়ারে বসে। মাথায় হাত। চোখগুলি মেঝেতে আটকানো।

— এই ধনা।

ধনা নিরুত্তর।

— ওরে হলটা কী? ফাইল দে -

ধনা চোখ তোলে, লাল। — কী?

— ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডের ডিসচার্জ ফাইলটা —

ধনা দাঁড়ায়।

হাঁটতে থাকে।

দিদিমণি বিরক্ত হয়। মুখ খারাপ করে — শালার হয়েছে কী? ফাইল না দিয়েই —

গেটের সামনে গিয়ে বাঁয়ে চোখ ফেরায় ধনা। চৈতালি দিদিমণি দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হয়।

নিশ্চুপ ধনা হাঁটতে থাকে।

মাতাল খামখেয়ালি ধনাকে চৈতালির চিনতে কষ্ট হয়। সে ঘরে ঢোকে। ধনা আবার ফিরে আসে। ওয়ার্ড ইনচার্জের কাছে যায়। — ও দিদি আমি আসছি।

— কেন? কোথায়?

— এই একটু উ দিকে। ধনার পা টলে না। অন্য পাঁচটা ওয়ার্ডবয়ের মতোই ধনা ঘোরে ফেরে।

অনুমতি চায়। লাল নয়, বরং বিনয়ী সে টলটলে চোখে হাজার যোজনা আকুতি ভেসে থাকে।

— ফাইলটা দে —

ধনা প্রতিবাদ করে না। ফাইল খুঁজে বের করে টেবিলে আস্তে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর বেওয়ারিশ রামপরবেশের লাশটার ডেথ সার্টিফিকেট ইত্যাদি কাগজপত্র শেষ পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে মর্গে যায়। সেখানের যাবতীয় ঝামেলা মিটিয়ে নিয়ে স্টোরে। এতোসব কাণ্ডকারবারকে ঘিরে আজ আর ধনাকে জড়িয়ে কোনো অঘটন ঘটে না।

ডিউটিতে ছুটি নিয়ে, দু'তিনজনকে যোগাড় করে রামপরবেশের মৃতদেহটি বাইরে আনে।

চৈতালির কাছে গিয়ে বলে, ও দিদি কুড়িটা টাকা দিবে? ধার? চৈতালি বুঝতে পেরে দেয়। এতো সহজে টাকা পেয়ে গিয়ে ধনা কৃতজ্ঞতায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। চৈতালি বলে, হবে তো এতে?

— হুঁ মোর কাছে কিছু আছে —

আকাশে ভেসে থাকে ধনার চোখ। একটার পর একটা কাজ সারে।

সবাই এ সব দেখে। কৌতূহলীরা উঁকি মারে আর অবাক হয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে। ধনার শত্তুরেরা টিটকিরি কাটে — শালার থোবড়াটা দ্যাখ্ — শক্ পেয়ে মিইয়ে গেছে —

ধনা চেঁচিয়ে ওঠে না, চুপ্ বে —

ধনা চেঁচিয়ে ওঠে না, পাগ্লা খেপ্ — এ— ছে — এ —। অপরাধীকে জব্দ করে, তার বিশেষ কায়দায় শারীরিক কসরৎ করে ধনা এখন আনন্দ প্রকাশ করে না।

সেদিন হাসপাতালে ধনা ডোমকে জড়িয়ে কতকগুলি দুর্ঘটনা এবং অথবা অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল। এদিক ওদিকের সারা হাসপাতাল দুনিয়ার সমঝদারেরা মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

একটি বেওয়ারিশ লাশের জন্য ঝামেলায় ঝঞ্ঝাটে নিজেকে জড়িয়ে নিজের গাঁটের পয়সা খরচ করে খাট কিনে ধূপে ফুলে নতুন কাপড়ে সাজিয়ে সংকার করবার জন্য কে কবে ফের মাথা ঘামায়?

ধনা ডোম কাঁদছে। ছাতিমতলায় বসে, কোকিলের ডাক ছাপিয়ে হাউ হাউ করে কেবল কেঁদেই চলেছে ধনা ডোম বেওয়ারিশ রামপরবেশের দুর্গন্ধময় লাশটাকে জড়িয়ে ধরে।

খাটিয়ার পায়ের দিকটায়, যেখানে ছ'ফুট মৃত রামপরবেশের খাড়া পা দু'খানি খাট ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছে — সেখানে এক দোস্ত পা-টিকে মুচড়ে ভিতরে ঠেলার চেষ্টা করেই চলেছে।

মুখ তোলে ধনা। তাকায়। আকাশে তখন রোদের তাপ বাড়ছে।

ধনা বিড় বিড় করে রামপরবেশের শুকনো চোখদুটোর ওপর নিজের ভেজা স্থির চোখগুলি মেলে ধরে — লাগা? লাগা?

আগুনের বৃত্তান্ত

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

অনেকদিন পর মাকে স্বপ্নে দেখল রণজয়, বেশ অনেকদিন পর, অনেকক্ষণ ধরে। যে কোনও দুপুরের ঘুমের মধ্যে এক ধরনের আধোজাগর সচেতনতা থাকে। যে ঘুমে স্বপ্নটাকে মনে হয় বাস্তব, আবার বাস্তবটাকেও যেন স্বপ্নই মনে হয়। সেই সচেতনতায় রণজয় টের পেল তার মায়ের অস্তিত্ব। ঠিক সেইরকম মুখ, নাক, চোখ, শাড়ি পরার কায়দা, হাঁটা, চলা, অকারণে চিৎকার করা, রেগে ওঠা, হঠাৎ-হঠাৎ হাপরের মত ওঠানামা করতে থাকা মায়ের বুক। বুকে-এঁটে-থাকা ব্লাউজ। শনাক্তকরণের বেদনাময় নীল যার রং।

রণজয়, মাকে দেখার আনন্দ, আর কখনও মা হিসেবে সান্নিধ্যে না পাবার দুঃখ নিয়ে নিজেকে দারুণ একাকিত্বে খুঁজে পেল। দুপুরের আলস্যবিলাসী ঘুম তাকে একাকিত্বে পৌঁছে দিয়েছে বহুবার, বহুবিকেলে। তবু আজ, তাকে পৃথিবীতে এনেছে যে নারী, তার রক্তসম্পর্কের মার সঙ্গে সম্পর্কের যে সংহতি, তা থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে রণজয় কষ্ট পেল।

রণজয়ের মা মারা গিয়েছিল পাঁচ বছর আগে। কোনও রকম দীর্ঘ বা স্বল্পমেয়াদি রোগভোগ ছাড়াই কেন যে তার মাকে তখন মরতে হল তার যথার্থ কারণ তখন কেউই খুঁজে পায় নি। বা পেলেও প্রকাশ করে নি। মৃত্যুর পদ্ধতিটাও ছিল অস্বাভাবিক, আগুনে পুড়ে মৃত্যুর মতো। কিন্তু সেই অস্বাভাবিক অপ্রত্যাশিত মৃত্যু কাউকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় ঠেলে দেয় নি। যেন খুব প্রস্তুতি নিয়ে, আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর সমস্ত মহলের মানসিকতা ধীরে ধীরে গড়ে নিয়ে, তারপর রণজয়ের মা মৃত্যুটাকে গ্রহণ করেছিল। এবং আর পাঁচটা সহজ, স্বাভাবিক মৃত্যুর মতো করে এই মৃত্যুটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। ফলে মনে হতে পারে, যে ধরনের মৃত্যুকে মানুষ চট করে মেনে নিতে পারে না এবং যে ধরনের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়াও হয় ভিন্নরকম, রণজয়ের মার মৃত্যু সবদিক থেকে তেমন হওয়া সত্ত্বেও আত্মীয়স্বজনদের প্রতিক্রিয়ার কোনও রদবদল ছিল না। আগুনে পোড়া এক মৃত্যুকে তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন সহজে। মৃত্যুর ধরন অস্বাভাবিক হওয়া সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়ায় কোনও নতুনত্ব না দেখে রণজয় একটু আশ্চর্য হয়। আলাদাভবে প্রতিটি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সে আবিষ্কার করে এক চরিত্রগত সংহতি। রণজয় এইসব প্রতিক্রিয়ার মধ্যে মৃত্যুর অস্বাভাবিকতার প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব, অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর ধরনের প্রতি একটা অগ্রাহ্যকারী মানসিকতাও লক্ষ্য করে। নিজেকে রণজয় এই উপেক্ষা ও অগ্রাহ্যের সঙ্গে অভ্যস্ত করে তুলতে পারে নি। তার মা, ছাদের মতো বর্ষাকালীন এবং আগুনের মতো শীতকালীন নিরাপত্তার সাক্ষাৎ-রচয়িতা, আগুনের সঙ্গেই মৃত্যুপূর্ব ঘনিষ্ঠতাব কারণে তাদের বড় বেশি অ-নিরাপত্তায় পৌঁছে দিয়ে গেল, অথচ কোনও অগ্নিময় বাদানুবাদ হল না। আঁচলভেজানো কান্নাকাটি তো নয়ই। সরলীকৃত পক্ষবিভাজনে, মামারাও মেনে নিল সব। ফলে চোখের সামনে এরকম এক উপলব্ধির অতীত ও অনুভবে বর্তমান ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিকতায় রণজয় শঙ্কিত হয়। তবে কি তার মামার এবং বাবার বাড়ির প্রত্যেকের না হোক, অধিকাংশের

মানসিক প্রস্তুতি ছিল এই ঘটনার জন্য, যা তার পক্ষে জানা সম্ভব হয় নি, বা তাকে জানতে দেওয়া হয় নি শুধু এই কারণে যে, সে তার মামার অথবা বাবার বাড়ির কোনোটার প্রতি বাড়তি টান কেন অনুভব করে তা এখনও অপ্রমাণিত? যেহেতু ঘটনাটা মেনে নেবার জন্য প্রস্তুতি এবং সেই প্রস্তুতিকালীন ব্যাখ্যা দু'তরফে আলাদ-আলাদারকম হয়েছে তাই তার পক্ষাবলম্বন নিশ্চিত না হওয়ার জন্যই কোনো পক্ষের প্রস্তুতি ও ব্যাখ্যা তার কাছে আসে নি এমনও হতে পারে। ঘটনাচক্রে অথবা চক্রবহির্ভূত কোনও অবস্থানে, মৃত্যুর পর থেকেই দু'তরফের সান্ত্বনা পৃথক পৃথক দৃষ্টিকোণ থেকে, পৃথক ভঙ্গিমায় তার স্পর্শে ও শ্রুতিতে আসে। রণজয় বুঝেছিল, তাকে বোঝাতে চাওয়াও হয়েছিল যে, তার মায়ের মৃত্যুটা শুধু তার মায়েরই মৃত্যু নয়। কারুর বোন বা দিদি, কারুর মাসি, পিসি, কারুর বৌদি বা ননদের মৃত্যু। এবং কারুর স্ত্রীরও মৃত্যু। সুতরাং ক্ষতি যদি কারুর হয়ে থাকে তবে সেটা তার একক নয়, অন্য অনেকের সঙ্গে তার। সেক্ষেত্রে দুঃখ বা শোকও তাব একক নয়, সম্মিলিতভাবে একদল আত্মীয়স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে তার। তাঁরা, সবাই মিলে এবং পৃথকভাবে প্রত্যেকে যদি এই ক্ষতিকে অপূরণীয় বলে মন্তব্য করেও পূরণযোগ্যতা দিতে পারে, শোক দুঃখ কাটাতে পারে, তবে তারও সেকাজ পেরে ওঠা উচিত। এইসব বিবেচনায় মায়েব মৃত্যু-আশঙ্কা তার এবং অন্য সবাব মনে জাগার পর থেকে সে স্বাভাবিক থাকতে চেয়েছিল, কিছুটা পরিস্থিতির চাপে। যদিও সেই পরিস্থিতিতে ওইরকম স্বাভাবিকতাই অস্বাভাবিক হিসেবে ধবা হয়, যেমন রণজয় ধরেছিল অন্যদের ক্ষেত্রে। তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কে, কিভাবে নিয়েছিল সে জানে না, জানা সম্ভবও নয়। তার স্পষ্ট মনে আছে তখন, সেই বিপন্নতায়, একা অথবা পরিজনবেষ্টিত থাকার দুই আলাদা সময় ও পরিবেশে তার চিন্তাবিন্যাস একইরকম ছিল। একা থাকার সময়ে তার একটুও কান্না পায় নি, পরিজনবেষ্টনেও সে মৃত্যুটাকে অগ্রাহ্যকারী হিসেবে বসে থাকতে চায় নি যদিও রণজয় বুঝতে পারছিল এই গোটা এলাকার লোকজন তারই প্রতি সহানুভূতি নিয়ে হাজির, সমস্ত সান্ত্বনার লক্ষ্য সেই। তার শোক তাকে বহন করতে হবে, তার কাছে উচ্চারিত সান্ত্বনাবাক্য তাকে গ্রহণ করতে হবে, অথচ এই মৃত্যুতে যে ক্ষতি তার ব্যক্তি এবং পরিবারগতও, তার পূরণযোগ্যতা নিয়ে কোনও সংশয়, আশঙ্কা প্রকাশ করা চলবে না। এমনকি দৃষ্টিতেও নয়। কিন্তু সবাই সেই শোক সামলে উঠতে পারছে, পরিস্থিতি এমন কখনও ছিল না। যথেষ্ট প্রস্তুতি এবং তজ্জনিত আত্মবিশ্বাস নিয়েও কোনও কোনও ছাত্রছাত্রী যেমন পরীক্ষায় হেরে যায়, তেমনই শোক সামলাতে পারবে ভাবা সত্ত্বেও শোকার্ত হবার, ভেঙে পড়ার সম্ভাবনায় কিছু মানুষ চারপাশে থাকে। সব মৃত্যুর মতো তার মায়ের মৃত্যুতেও ছিল। আত্মীয়স্বজন ও পাড়াপ্রতিবেশী দু'তরফেই। হাজার হলেও ওটা তো একটা মৃত্যুই। একটা মরণ, না এসে পৌঁছনো অবধি তো শোক গড়েই উঠতে পারে না। রণজয়ের এক আধটা কথা, শব্দে প্রকাশিত অনুভূতি, বসে থাকার ভঙ্গি, চাহনি অথবা নিশ্বাসের দীর্ঘতর বিন্যাসের যে কোনও একটাকে কেন্দ্র করে সেই শোক গড়ে উঠতে পারত, তাদের সমস্ত সংযম ও প্রস্তুতি অস্বীকার করে। কিন্তু রণজয়, একেবারে শুরুর সময় থেকে প্রতিক্রিয়ার পারিবারিক ধরনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে চেয়েছিল বলে সেই শোককে সংহত ও প্রকাশিত হতে দেয় নি। মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সে তো আর তাদের পরিবারের, মানে এক্ষেত্রে তার মামার এবং বাবার বিপরীতে থাকতে পারে না। ঘটনাটা যত সামাজিকভাবেই ঘটুক না কেন, প্রথমে নিশ্চয়ই পারিবারিক। ঘটনার ফলে তার যা কিছু, যত ব্যক্তিগতই হোক না কেন, একটা সময়ে পরিবারটাই বিবেচনায় আসে। রণজয় তাই তার তখনকার দৈনন্দিনের স্বাভাবিকতায়, ফুটবল ও ক্রিকেটের কথায় থাকতে

চেয়েছিল। এমন চাওয়া ও তার প্রকাশ অনেকের কাছে মৃত্যুর অস্বাভাবিক ধরনকে, এমনকি মৃত্যু নামক ঘটনাটাকেও, অস্বীকার করার কায়দা মনে হতে পারে। রণজয় তার মায়ের কথাও মাঝে মাঝে বলে। কিন্তু সেটা কখনও শোক, শোকের কারণ বা স্মৃতিচারণ হিসেবে মনে হতে দেয় নি, সে নিজেও মনে করে নি। মৃত্যুর পথ ধরে তার মা এখন অতীত। রণজয়, তাদের পরিবারের কোনও একজন বা অনেকজন, এমনকি তার মা নিজে মনেপ্রাণে না চেয়েও। সেই অতীতের মধ্যে কেবল অতীত থাকে না, থাকে ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশা অথবা আশঙ্কা। তার মায়ের, রক্তমাংসের মানুষটার, মানুষ হিসেবে অতীত হয়ে যাওয়ার উদ্যোগের মধ্যে তাই কোনও না কোনও ভবিষ্যৎচিন্তা ছিল। মায়ের চিন্তার ক্ষুদ্র গণ্ডির কথা যদি ধরা যায়, তাহলে সেটা পারিবারিক ভবিষ্যৎ না হয়ে পারে না। নিজের ভবিষ্যৎ বলে মা তো কিছুই রাখল না শেষপর্যন্ত। পারিবারিক বিচারে যদি কেউ, কোনওভাবে ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচিত, গৃহীত হয় তাহলে সেটা রণজয়ই। ভবিষ্যৎ তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠছে, উঠুক এমন চাওয়া হচ্ছে, তাকেই ভবিষ্যৎ এর স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে -এই প্রাপ্ত অনুভূতিতে সে আর অতীত নিয়ে, মানে তার মা কেমন ছিল, কীভাবে ছিল, কেমন করে খেত, হাসত, কথা বলত, জামাকাপড় কাচত, দুঃখ পেত, বই পড়ত, গল্প করত ইত্যাদি কোনও কিছু নিয়ে থাকতে চায়নি। তার মা যে অতীত এটা ভাবতে গেলে অতীতকেই ভাবতে হয়। সামনে ভবিষ্যৎ ভেবে রণজয় অতীতকে এবং অন্যভাবে বর্তমানকে অস্বীকার করতে চেয়েছিল। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী ভেতরের ভাঙচুরকে আটকানোর চেষ্টা করেছিল। উত্তরাধিকারী হিসেবে তার কাছে তাদের পরিবারের প্রত্যাশাও যেন সেটাই ছিল।

সে রাত্রে রণজয় তার মায়ের ছবি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকে। তার মায়ের একমাত্র ছবি, শুধুই তার মায়ের। মায়ের আর দ্বিতীয় কোনও ছবির কথা তার জানা ছিল না, দেখেও নি কোনওকালে। সেই একমাত্র ছবি, যাতে তার মা একা। উদভ্রান্তের দৃষ্টিতে, শীর্ণ শরীরে কিন্তু বিন্যস্ত পোশাকে একা তার মা। সাথে আর কেউ নেই। তার বাবা ও মা, এই দুজনে মিলে যে সে, রণজয়, কিম্বা তাদের দুজন যে রণজয়ের বাবা-মা, এই সামাজিক পরিচয় নিশ্চিত করার জন্য অন্য কোনও ছবি নেই। তার মা বিষয়ে যা কিছু ভাবনা তার জন্য ছবির কাছে গেলে ছবিতে মা ছাড়া আর কাউকে পাওয়া যাবে না। বিশ বছরের জীবনসঙ্গীর অথবা সাংসারিক জীবনবিস্তারের কোনও চিহ্নমাত্র সেখানে নেই। ছবিতে অন্তত সেটাই প্রমাণিত। অথচ বাবাকে বাদ দিয়ে মার সংসার হয় না। তাহলে সে রণজয় হত না, তার মা-ও তারই মা হত না, এবং হয়ত তার মায়ের মৃত্যুও হত না। এখন বর্তমান থেকে এক-পা এক-পা করে পেছিয়ে সেই গোটা অতীতটাকে ধরে তাদের পারিবারিক সম্পর্কবিন্যাসের কথা আপাদমস্তক ভাবতে গেলে, ভেবে দুঃখ বা আনন্দ তৈরি করতে চাইলে অন্তত দৃষ্টিপাতে, রণজয়কে বাদ দিয়েও যদি ধরা যায়, বাবা ও মাকে একসঙ্গে একছবিতে পাবার উপায় নেই। শুধু আজ কেন, আর কোনও দিনই নেই। বাবা ও মা, এই দুজনের মিলন, মিলনের ফলে সে রণজয়—এরকম একটা বিশ বছর বয়সী বাস্তব কীভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যেতে চায় ওই ছবির দিকে তাকালে, ভেবে রণজয় দুঃখ পেয়েছিল। তার বাবা ও মায়ের সম্পর্ক নিয়ে এক অদ্ভুত অস্বীকৃতি তার মনের মধ্যে ওই ছবির প্রতি একাগ্র দৃষ্টিপাতে কেন্দ্রীভূত হতে চায়। রণজয় বোঝে এমন কেন্দ্রীভবন বড় অসামাজিক, অপৈতৃক ব্যাপার হয়ে যেতে পারে শেষ অবধি। তাই সে ছবি সরিয়ে রাখে। ছবি সরিয়ে, দুই হাঁটুর মাঝখানে মাথা গুঁজে, অপেক্ষা ও বিশ্রামের যৌথ ভঙ্গিতে, মনের মধ্যে এক অদ্ভুত আনাগোনা অনুভব করেছিল। সেই স্মৃতিউদ্ধারে সে বারবার ফিরে যায় তাদের জীবনের নানা ঘটনায়,

মুহূর্তে। চোখের সামনে তাদের ঘরের আতঙ্ক ছড়ানো মেঝে, আধপোড়া দরজা, ইতস্তত উড়ে-পুড়ে-যাওয়া চুল, ঘরের চারদিকে আগুনের আঙুলের যেমন-খুশি হাত বাড়ানোর ব্যর্থচেষ্টার অল্পবিস্তর চিহ্ন। ঘরের সাজানো-গোছানো আসবাব, আলনা, আলমারি, ক্যালেন্ডার, লক্ষ্মীর আসন, জামাকাপড়—সব সব। কেবল সেই না থাকা মানুষটাই চোখের সামনের সবকিছুর টিউবলাইট ভাসানো উজ্জ্বলতাকে ধূসর করে অন্যসময়, অন্যদিন, অন্যক্ষণে নিয়ে যায় রণজয়কে, সেই মৃত্যুঘন রাত্রে। রণজয় বোঝে তার মায়ের জীবন্ত উপস্থিতিটা এখন অতীত কিন্তু প্রাণহীন শরীরটা হাসপাতালে মর্গের বরফঢাকা টেবিলে এখনও বর্তমান। ফারাক করা যায় না, অতীত ও বর্তমানের মিলিত উপস্থিতির এই রহস্যময় মুহূর্তেই তার মাকে, মায়ের শরীরী উপস্থিতি না থাকা সত্ত্বেও সবচয়ে জীবন্তভাবে পাওয়া সম্ভব। এখনও, রণজয়ের মনে হল, তার মায়ের আর কোনওদিন বাড়ি ফিরে না আসার সত্যটা, কিছুটা কল্পনাই যেন, বা আশঙ্কাও। বরং তার মায়ের এই সংসারের প্রতি সার্বিক টান, সারাদিনের খাটনি, তার প্রতি বকাঝকা, কখনও কান মলে দেওয়া, বাবার প্রতি অভিমান, অভিমানী প্রেম, প্রত্যাখ্যান মিলিয়ে সংসারী চেহারাটা বেশি সত্য। ওই বাথরুম, যেখানে জীবিত কোনও মানুষের পক্ষে যতটা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে (এটা একটা অনুমান, কারণ কতটা সম্ভব, তা জানা নেই এবং সেই সম্ভাব্যতারও রকমফের আছে) আগুনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার অবাধ, নিশ্চিন্ত সুযোগ তার মা স্বেচ্ছায় তৈরি করে নিয়েছিল, সেখানে স্নান করার সময়কালীন তার মায়ের গানের আওয়াজ সে চাইলে এখনও শুনতে পারে, একটু কল্পিত নৈঃশব্দ্যে, পারলে আর কিছু না হোক অন্তত শব্দের নাগালে মাকে পাওয়া হয়। সেক্ষেত্রে, তার মাকে প্রায় বাস্তবে পাবার এমন সুযোগ হয়ত তার জীবনে এই শেষবারের মতো উপস্থিত। এরপরে, কাল সকাল, দুপুর বা রাত বা তারও পর থেকে যা সে নেহাত স্মৃতিচারণ, কেবল স্মৃতিজীবী অস্তিত্ব। রণজয় তখন, বাস্তবকে ছুঁতে গিয়ে আসলে এক স্মৃতির আড়ালে নিয়ে যায় নিজেকে।

রণজয়ের মনে পড়েছিল, যখন সে খুব ছোট এবং ছোট বলে অনেককিছুই তার কাছে উন্মোচিত নয়, তখনই তার বাবা ও মায়ের সম্পর্কের অসংহতিটুকু, সেই বয়সের যাবতীয় বোধহীনতার মধ্যেও চোখে পড়ার মতো অসঙ্গতি বলেই, তার কাছে পরিষ্কার হয়। মা ও বাবার দৈনন্দিন যা সে দেখত, তাঁরা মা-বাবা বলে এবং তাদের দুজনের রক্তের মিলিত স্রোত রণজয়ের শিরায়-উপশিরায় সেদিন এবং আজও বহমান বলে তাতে, তাঁদেরকে ঠিক মা-বাবা মনে হত না। কিম্বা মা-বাবা সম্বর্কে রণজয় অন্য সবার ক্ষেত্রে যা দেখত, সেই অভিজ্ঞতা নিজের ক্ষেত্রে বদলে যেত। বদলে অন্য একটা ধারণা গড়ে উঠত, যা তার নিজস্ব। কোনও ধারণাই একদিনে জমে না, ধীরে ধীরে জমে। আবার জমে থাকা কোনও ধারণাও একদিনে বদলায় না, পর্যায়ক্রমে বদলায়। জমা-বদলের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একদিন রাত্রে রণজয় তার বাবা-মাকে একসঙ্গে সাজগোজ করে সিনেমায় বেরোতে দেখল। তাকে পাশের ফ্ল্যাটে কাকুর কাছে, সিনেমা দেখে না আসা পর্যন্ত থাকতে বলা হয়েছিল। সেই ছোটবেলায় রণজয়ের উচিত ছিল বায়না করা, কমপক্ষে ভ্যাঁ করে কেঁদে ওঠা। এসবের কিছুই রণজয় করেনি। রণজয় এখন ভালোভাবে বুঝল, তার সে বাবা-মার একসাথে সেজেগুজে হাসিমুখে বেরোনোটাতেই আশ্চর্য হয়েছিল। ধীরগতির প্রক্রিয়া সত্ত্বেও একটা নির্মীয়মান ধারণা মাঝপথে হঠাৎ কিছুটা ভেঙে পড়ায়, তার সেই আশ্চর্য হয়ে যাওয়াটা বেমানান হয় না, ওই শৈশবেও। রণজয় তারপরদিন সকালে অন্য দিনের চেয়ে একটু আগেই ঘুম থেকে উঠে, মার প্রতিদিনকার প্রত্যাশার সাময়িক পূরণে পড়তে বসে যায়। বাবা-মার কথা সে এবার থেকে সবসময় ঠিক ঠিক শুনবে এমন একটা ছোটখাটো প্রতিজ্ঞাও

করে ফেলে। মায়ের মৃত্যুর রাত্রে, তার মায়ের অতীত ও বর্তমানের সন্ধিক্ষণে, মায়ের স্মৃতি হাতড়ে বাবা-মার মিলিত সিনেমাযাত্রার সেই সন্ধ্যার কথা মনে পড়ায় রণজয় বুঝল তার বাবা ও মায়ের একসঙ্গে কোনও ছবি না থাকাটা কতখানি স্বাভাবিক। তার সেদিনের বিস্ময়ের অবসান বুঝি, এই সন্ধ্যায়। সেদিনের রহস্যের উন্মোচন বুঝি আজকের প্রত্যক্ষ অনুভবে, যখন কেউই এই মৃত্যুতে তেমন বিস্মিত, চমকিত নয়। সেই প্রত্যাশা ভেঙে যাওয়ার বিস্ময় কারোর মধ্যে না দেখতে পাওয়ার সঙ্গে রণজয় তার একসন্ধ্যার স্মৃতি-উদ্ধৃত ঘটনাবলিকে মিলিয়ে দিতে পারল। তাতে আজকের মৃত্যুপরবর্তী প্রতিক্রিয়ার নতুনত্ব তার কাছে বোধগম্য হয় সহজে। সে বোঝে, কেন সেদিন তাকে অবাক হতে হয়েছিল এবং কেন আজ সবাই স্বাভাবিক থেকে যেতে পারছে। এতে তার মায়ের সঙ্গে দূরত্বের এক আশঙ্কা রণজয়কে বেশ অভিমানী করে তুলতে চায়, মার এমন মৃত্যুর আভাস তাহলে সবার কাছেই ছিল, যে কারণে এখন সবাই ঘটনাটা সহজভাবে নিতে পারছে, শুধু তার কাছেই ছিল না, যার জন্য রণজয়ের কাছে এই সহজতা অস্বাভাবিক ঠেকছে, কিম্বা তার কাছেও ছিল। কিন্তু আভাস হিসেবে নয়, ঘটনা হিসেবে। কিন্তু মৃত্যু তো এত ভাবনা ও অনুভূতির পরম্পরা তৈরি করতে করতে কারুর কাছে পৌঁছয় না, মৃতার সন্তানের কাছে তো নয়ই, তবু, যেন সেই প্রস্তুতির পরম্পরাটুকু আত্মীয়স্বজনদের প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। যেখানে রণজয়-ই একমাত্র দলছুট এবং হতভম্ব। কিন্তু এসব সে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। তাকে সবচেয়ে অবাক করে তার মামা। বছরে একবার মাত্র মামা আসত তাদের বাড়িতে, ভাইফোঁটার দিন। সেদিন সকাল থেকে রণজয়দের বাড়িতে অভ্যর্থনার মেজাজ এসে যেত। আগের দিন রাত থেকে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে চমকে ওঠার অপেক্ষায় থাকত রণজয়দের বাড়িটা। কখনও এমন হত, মামা আগের দিন আসতই না, তখন ভাইফোঁটার দিন সকালে কলকাতা থেকে প্রথম ট্রেন এই শহরে পৌঁছবার টাইম-টেবল নির্দিষ্ট সময় পেরোলেই রণজয়রা অপেক্ষায় অস্থির হয়ে উঠত। মা বারবার দরজা খুলে বাইরে যেত, রণজয়কে আরও একটু এগিয়ে দেখে আসতে বলত, আর নিজে নানা রকমের রান্নায় উদ্বেগের সাথে ব্যস্ত থাকত। আর এই পারিবারিক অভ্যর্থনার মধ্যে বাবা যেন থাকতেই চাইত না, রণজয়ের মনে পড়ল। সারা বছরের সেই একটিমাত্র আসা আর যাওয়া একটা বাৎসরিক উৎসাহে আর আনন্দে রণজয়দের আচ্ছন্ন রাখত। দুপুর নাগাদ কলকাতায় মামার ব্যাঙ্কে যখন টেলিফোনে খবর পাঠানো হয় রণজয়ের মায়ের দুর্ঘটনার খবর দিয়ে, তখন থেকে রণজয়ের কেবলই অপেক্ষা ছিল, মামা যেভাবে বছরে একবার আসে তাদের বাড়িতে, সেই আসাটার জায়গায় এই উৎকণ্ঠার আসাটা না জানি কেমন হবে। তার মামা এসে নিশ্চয়ই সবকিছু রণজয়ের কাছে জানতে চাইবে, সেইসব যা রণজয় ছাড়া অন্য কারুর পক্ষে সাধারণভাবে জানা সম্ভব নয় বলে মামার ধারণা থাকবে, তাছাড়া রণজয়ই তো তার মায়ের একমাত্র জাগতিক প্রতিনিধি। তখন কী বলবে রণজয়? মাকে সে আবিষ্কার করে দুপুরে, হাসপাতালে, কলেজ থেকে ফিরে বাড়ির সামনে থমথমে ভিড়, দরজায় তালা দেওয়া দেখে। সে সকালের কোনও বৃত্তান্ত জানেই না, কীভাবেই বা আগুন লাগল, তখন কে কোথায় ছিল, কে সেই আগুনের সন্ধান দিল প্রথম, কে লোকজন ডাকল, ভেতর থেকে আটকানো দরজা ভাঙল, কে বা কারা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিল আর রণজয়ের বাবাকে খবর দিল। 'তোর মা কীভাবে পুড়ল সেটাই তুই জানলি না অপদার্থ'—এরকম একটা ধিক্কৃত উচ্চারণ, যা মামার স্বভাবের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, রণজয় শুনতে পাবে বলে আশঙ্কা করেছিল। কিন্তু তার মামা কলকাতা থেকে ট্রেনে এসে স্টেশনে নামার পর প্রথমেই তাঁর দিদির খবর জানতে চায় বলে রণজয় সেই সময় স্টেশনে উপস্থিত কয়েকজনের কথাবার্তা থেকে শোনে। জানতে

চাওয়ামাত্র সবাই ইঙ্গিতে আর একজন বোধ হয় আমতা-আমতা উচ্চারণে জানিয়েছিল যে, রণজয়ের মা আর বেঁচে নেই। তারপর স্টেশন থেকে বাড়িতে এসে মামা রণজয়কে পাশের ফ্ল্যাট থেকে ডেকে পাঠায়। হাসপাতালে যেতে চায় নি মামা। রণজয় এসে দেখেছিল তার মামা চুপচাপ বসে আছে। এতকাল তো মামা এলে মা নিজেই যা বলার বলত, যা করার করত, এখন সেই বাড়িতেই অনুপস্থিত মায়ের পক্ষ থেকে রণজয় মামাকে কী বলবে তাই ভাবছিল, যা বলবে তার ভাষা খুঁজছিল। মামা নিজেই সেসব থেকে রেহাই দেয় রণজয়কে, হাত ধরে টেনে পাশে বসায়, 'বোস এখানে রণজয়'। মুখে, মামার কোনও কথা ছিল না। কোনও জিজ্ঞাসা বা কৌতূহলও নয়। শুধু যেন একটা আক্ষেপ, 'কিছু করা গেল না।' শুধু যেন একটা অতিগোপন ধিক্কার, 'আমি জানতাম।' একটামাত্র আনন্দমুখর বাৎসরিক অনুষ্ঠানের স্মৃতিভরপুর এই বাড়িতে মৃত্যুর মত অপ্রত্যাশিত ও এই মৃত্যুর মত বীভৎস পরিস্থিতির সঙ্গে মামা এত দ্রুত মানিয়ে নেয় কী করে? কলকাতা থেকে এই শহরে তার বরাবরের আসার পথের মানসিকতার সম্পূর্ণ বিপরীতটা বয়ে বয়ে মাত্র তিনঘণ্টা আসতেই সেই মর্মান্তিক বিপরীতের সহনক্ষম হয়ে উঠতে পারে, তার মামা? আসলে ঘটনাটার মধ্যে কোনও চমক বোধ হয় মামার কাছে ছিল না। মামা বরং প্রস্তুত ছিল। বছরে একবার এই পরিবারের জীবনযাত্রার সঙ্গে সামান্য পরিচয় আর রণজয়রা কলকাতায় গেলে যেটুকু কথাবার্তা, তার মধ্যেই এমন উপাদান স্পষ্টতর ছিল যাতে, কোনও এক কর্মব্যস্ত দুপুরে টেলিফোনে অফিসছাড়া হয়ে এখানে হঠাৎ আসতে হলেও ট্রেন থেকে নেমে পাওয়া দিদির মৃত্যুসংবাদে একইরকম থাকতে পারা যায়। একটা জীবন্ত মানুষের মৃত্যু সংবাদের জন্য প্রস্তুতি যতই নিখুঁত করে মনের মধ্যে গাঁথা হোক না কেন, না মরা পর্যন্ত তো আর ওই মানুষটার মৃত্যু-পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের ঠেলে দেওয়া যায় না। সবার যেন এই মৃত্যু সম্পর্কে এমন অনিবার্য ধারণা ছিল যাতে মৃত্যুটা ঘটে গিয়েও এখন মৃত্যুর তাৎপর্য তৈরি করতে পারছে না কোথাও। বেদনাটাও যেন এতদিন ক্লান্তিকর বয়ে বয়ে এখন নামিয়ে রাখার মতো দায়মুক্তি। তিনঘণ্টায় বা একদিনে নয়, বহু বছরের নিরবচ্ছিন্ন যেমন প্রস্তুতির কারণে দিদির মৃত্যুসংবাদে আশ্চর্য হয়ে ওঠাকে ঠেকানো যায়, বিপন্নতাকে অস্বীকার করা যায়, অস্বাভাবিক মৃত্যুর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াকে উপেক্ষা করা যায়, অতিক্রম করতে চাওয়া যায় ঠিক, ঠিক সেইরকম প্রস্তুতি তার মামার ছিল।

তাহলে তার মায়েরও প্রস্তুতি ছিল, মনে মনে, শরীরের প্রতিটি কোষে, শ্বেত ও লোহিত কণিকায়, ভাবনার স্তরবিন্যাসে, এক আত্মহত্যার প্রস্তুতি? তবে কি বাবারও প্রস্তুতি ছিল, আশঙ্কা-যন্ত্রণাহীন, অনস্থির? তবে তো আর সকলেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। শুধু রণজয়, বাবা-মায়ের যন্ত্রণাময় অস্তিত্বের চাক্ষুষে থাকা সত্ত্বেও এসব কোনও কিছুর নাগাল পায় নি। সবাই প্রস্তুতি নিয়ে একরকম। সে প্রস্তুতির মধ্যে না থেকে, যেন চারপাশের প্রস্তুতিতে, তাঁদের- রকম। তাঁদের প্রস্তুতি ছিল এরকম একটা পরিস্থিতির সামনাসামনি হবার। তার জন্য তাঁদের অনেক গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়, নইলে আজকে সকলের চোখে পড়ার মতো বিসদৃশ স্বাভাবিকতা তাঁরা অর্জন করে কোথা থেকে? অনেক ঘটনা তাঁরা হয় নিজেরা গোপন করেছিল, না হয়, গোপনে সেইসব ঘটনা মেনে নিয়েছিল। মেনে নেবার সেই নিরুচ্চার অভ্যাস ছিল বলে তারা আজ ঘটনার কাম্য প্রতিক্রিয়ার আওতার বাইরে, অনেক সহজ থাকতে পারছে। সইয়ে নেবার এমন কঠিন এক কার্যক্রম বছরের পর বছর ধরে তার মামার, বাবার বাড়ির অন্য সবাইকে চালু রাখতে হয়েছে, আর সব সামাজিক ও পারিবারিক রীতিবিধির ভেতরে। এমনটার দরকার পড়ল কেন, কোন অপরাধবোধে? এসব প্রয়োজন তৈরি হতে পারে কোনও প্ররোচনা থেকে। কিম্বা, প্ররোচনাময় প্রয়োজন থেকে। সেটা যে আসলে কী তা রণজয় আঁচ করতে পারে শুধু। চারপাশের আক্রমণ

আর তা থেকে মায়ের আত্মরক্ষা প্রত্যক্ষ করার সূত্রেই সেই অনুমান। যা সে হারিয়ে ফেলল। মা আত্মরক্ষা করতে করতে, করতে করতে পিঠঠেকানো দেওয়াল, যদি তাকে দেওয়াল বলা যায় আদৌ, দেওয়াল হিসেবে গড়ে ওঠার ঠিক আগে আত্মঘাতী হল, কিম্বা মা নিজেই দেওয়াল হিসেবে সমস্ত আক্রমণের প্রতিরোধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে নিজের ছায়ার ওপরে ভেঙে পড়ল। নিজের মার ওপর রণজয়ের দারুণ রাগ হল। এই রাগ কোনওদিন, কোনওভাবে এমনকি আজকে এখন তার এই রাগের কারণ তৈরির সমস্ত প্রত্যক্ষ তৎপরতা শেষ হবার ঠিক ঘণ্টাদশেকের মধ্যে, মায়ের শরীরী অস্তিত্বের অবলুপ্তির কুড়ি-বাইশ ঘণ্টা আগে, মায়ের বাস্তবকে ছুঁতে চাইবার মতো অতীত-বর্তমানের সন্ধিতে তার মায়ের কাছে জানাতে পারবে না, ভবিষ্যতেও নয়। কিন্তু এটাই তার মায়ের আক্রমণ ভেবে রণজয় এই পরিবেশেও একটু তৃপ্তি পায়। একমাত্র আক্রমণেই নিহিত থাকে যে তৃপ্তি, জন্ম দেয় যে ক্রোধ। সে ভেবে উঠতে পারে নি যে, সে তার মায়ের সনাতন আত্মরক্ষার পদ্ধতিটাই বেছে নেবে না কি আক্রমণের সর্বশেষ ইঙ্গিতটাকে গ্রহণ করবে। রণজয় তার মায়ের পদ্ধতিটা একবার ইঙ্গিত হিসেবে ভাবতে চেষ্টা করে, যেহেতু যে-কোনও আক্রমণ বা আত্মরক্ষার প্রত্যক্ষ কারণ তার বাবা, বলে সবাই জানে, ভাবে, অপৈতৃক আচরণের ভয় পেল। রণজয় তার ভাবনার নানাদিকগুলোকে কিছুতেই এক জায়গায় জড়ো করতে না পেরে মাথাটাকে আর একটু গুঁজে দেয়, যেন আশ্রয় প্রার্থনায়।

ওই রাত্তিরটা কোনওরকমে কাটিয়ে দেবার পর ভোর হতেই রণজয়দের বাড়িতে নানারকম লোকজনের ভিড় আসতে শুরু করেছিল। সেদিনই পোড়ানো হবে। মার দেহ তখন মর্গে, মা যে বাঁচবে না, হাসপাতালের বেডে দেখামাত্র সে সম্পর্কে নিশ্চিত হলেও মৃত্যুসংবাদ তখনও রণজয়ের কানে পৌঁছয় নি, কেবল রণজয়েরই কানে। আগের রাত মামার সঙ্গে, বাবার সঙ্গে কাটিয়ে ফেললে, আজ সকালে যদি মৃত্যুসংবাদটা দেওয়া হয় তবে তা যেন রণজয়ের গা সাওয়া হয়ে যেতে পারে, এমনভাবে খবরটা চেপে যাওয়া হয়েছিল। খবর হিসেবে তার মা সম্পর্কে শেষপর্যন্ত তাকে কিছু বলা হয় নি, পরিস্থিতির চাহিদা একটা ছিল, তার কাছে, রণজয়কে তার সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে নিতে দেখে, যেন আস্তে আস্তে রণজয় ওটুকুও সইয়ে নিতে পারবে পরিস্থিতি হিসেবে এলে, এমন প্রত্যাশায় তার কাছে ওই মৃত্যুসংবাদটুকু ছাড়া আর কিছু গোপন রাখা হয় নি। কিন্তু অন্য সবাই যেভাবে এতদিন ধরে সইয়ে নিয়েছে আর কখনও কখনও মানুষটার বেঁচে থাকাতেই অবাক হয়েছে, রণজয়ের তেমন কোনও প্রস্তুতি বা আশঙ্কা ছিল না। কাল সারারাত ধরে যতই তাকে শক্ত হবার কথা বলা হোক, শক্ত হবার বদলে ভেতরে, ভাঙচুরে সে যে আরও নুইয়ে পড়বে না, তা কে বলতে পারে, যেহেতু মৃত্যুটা আজ সকালে এলেও তার কাছে মৃত্যু হিসেবেই আসবে। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু। একরাত্রে মোকাবিলা করার মতো রোগজর্জর মৃত্যু তার মায়ের হয় নি, যখন, যে কোনওদিন মারা যেতে পারে এমন আশঙ্কা জাগিয়ে দীর্ঘদিন রোগভোগের পর একটা মানুষ শেষ অবধি একদিন মরেই যায়, মৃত্যু তখন বুঝি একটু কমজোরি হয়ে আত্মীয়স্বজনের কাছে আসে। এই মৃত্যু বা তার সমতুল কোনও ঘটনা আত্মীয়স্বজনের কাছে অভাবনীয় না হলেও রণজয়ের কাছে আকস্মিক। একরাতে সবাই নিজেদের যেভাবে মৃত্যুসহা করে তুলতে পারে, নতুন করে, রণজয়ের ক্ষেত্রে বুঝি তার বিপরীতটা ঘটে যায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে রণজয় জানতে পারে তার মা আর বেঁচে নেই, সৎকারের জন্য পাড়ার ছেলেরা গামছা কাঁধে বেরিয়ে পড়েছে। বাবা আর মামার মত সহজভাবে কথাবার্তা বলা তখন রণজয়ের কাছে অসম্ভব, সে শুধু ভঙ্গিটুকু অনুসরণ করতে পারে মাত্র, শক্ত হবার অন্য উপায় না দেখে। অনেকের সঙ্গে তাকে কথা বলতে হচ্ছিল। যেমন তার বাবাকেও, মামাকেও। বেলা বাড়লে হাসপাতালে পৌঁছে রণজয় চত্বর-উপচানো ভিড়ের প্রান্তে পুলিশের সঙ্গে তার বাবা ও

বাবার ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে কথা বলতে দেখে। তার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। এই গোটা ভিড়ের সবটুকু রণজয়ের পছন্দ হচ্ছিল, এমন নয়। কাউকে কাউকে বেশ অসহ্য লাগছিল। হাসপাতালে নিত্যকার আনাগোনার বাইরে সেদিনের বিশিষ্ট যে ভিড়, তার মধ্যে পরিচিত যাঁরা, তাঁদের হাসপাতালে আসার কারণ হিসেবে রণজয় তার মায়ের মৃত্যুকে বিবেচনা করে। এ শহরে রণজয়দের বিশ বছরের বেশি দিন ধরে সামাজিক বসবাসের সূত্রে তাঁরা সবাই যেমন আনন্দের, তেমনি রণজয়দের এই পারিবারিক বিপন্নতার অংশীদার হবার সঙ্গত অধিকারী। সামাজিকতার দীর্ঘ, সযত্ন চর্চায় অংশগ্রহণ, উপস্থিতি কর্তব্যবোধের আওতায় এসে যায়। ভূমিকার এই অনির্ণেয়তা নিয়ে রণজয়রাও কতজনের আপদে-আনন্দে ছুটে গেছে। এখন হাসপাতালে যাঁরা এসেছেন নিজেদের দৈনন্দিনকে ব্যাহত করে, ঘটনার চমকে হতবাক সামাজিকতার বাইরে সেখানে আর কিছু থাকে না। অথচ এ এক এমন সময় যখন সরল জিজ্ঞাসাকেও মনে হয় শয়তানের কৌতূহল। সহানুভূতির প্রকাশকেও মনে হয় বাণিজ্যপ্রয়াস। এক গৃহস্থ বধূর মর্মান্তিক মৃত্যুতে রচিত স্বাভাবিক ম্লানতাকে মনে হয় প্রাক-অভিনয় প্রস্তুতি। এত প্রতিরোধে বিপন্নতা তবু এসেই যায়। রণজয় বোঝে, হাসপাতালে কিম্বা গতকাল সকাল থেকে তাদের বাড়ি, হাসপাতাল, স্টেশন মিলিয়ে পরিচিত-প্রতিবেশীদের সমস্ত দৌড়োদৌড়ির কারণ, তার মায়ের মৃত্যু। এখন পুলিশের সঙ্গে তার বাবার কথোপকথনের কারণও তাই প্রতিক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা দিয়ে মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা ঢাকতে চাওয়ার প্রয়োজনও সেকানে বহুমৃত্যুদর্শী বৃদ্ধ না হয়েও রণজয় এটা বোঝে যে, মৃত্যুর কারণ মানে আগুন নয়। হাসপাতাল মর্গ বা ময়নাতদন্তের টেবিল নয়। আধপোড়া দরজা, রক্তময় মেঝে নয়। পুলিশ তো নয়ই সাধারণ মৃত্যুতে। সেক্ষেত্রে, এত কাণ্ড করে ঠেকানো তো যাচ্ছে না এই মৃত্যুর অস্বাভাবিকতা অগ্নিময় ব্যতিক্রম।

তখন হাসপাতালের মর্গের দিকটায় ছেলেছোকবারা ভিড় করছিল। কোমরে গামছা বেঁধে শার্টের বোতাম বুকের অর্ধেক পর্যন্ত খুলে দিয়ে কারুর কারুর পরনেব লুঙ্গি একটু বেশিই গুটিয়ে, ট্রাকের গায়ে মাথায় ছড়ানো সেই ভিড়, একটা সংহতিতে অপেক্ষমান। রণজয়ের মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার। মা যদিও এখন মর্গের বারান্দায়। গতকাল দুপুর থেকে তাদের বাড়ির বাথরুমে এবং তারও বহু বহু আগে তাদের পরিবারের অভ্যন্তরে যে অগ্নিবিষয়ক তৎপরতার শুরু, কাল সারারাতের বরফ সংলগ্নতায় বুঝি সেসবের নিশ্চিত নির্বাপন ও প্রশমন হয়ে গেছে। উত্তাপকে যে দীর্ঘ, কালিক বিস্তৃতিতে সে তাদের দৈনন্দিনের সবটুকু দিয়ে অনুভব করেছে তাতে প্রশমনের এত সময়স্বল্পতায় প্রক্রিয়াটার কার্যকারিতা নিয়েই সন্দেহ জাগে। রণজয় তার মাকে শেষ ঠিক কখন দেখেছে মনে করতে চেষ্টা করল। জীবিত মাকে সে আর পাবে না। এখন যা কিছু সবই মৃতদেহকে ঘিরে। তার মনে পড়ল সকালে কলেজ যাবার আগে, গতকাল, সে তার মাকে শেষবারের মতো শীতল সাংসারিক ব্যস্ততায় দেখেছে। উনুনের পাশে বসে, তাদের ছোট্ট রান্নাঘরটায় তার মা মাছ কাটছিল বঁটিতে। আগুন থেকে হাতখানেকের মধ্যে। হয়ত তার মা তখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল। আগুনকে সাক্ষী রেখে নেওয়া সিদ্ধান্ত। বিশবছর আগে আর একবার আগুনকেই সাক্ষী রেখে নেওয়া এক শপথকে ভাঙবার জন্য, ভাঙার অপরাধবোধ থেকে রেহাই পেতে, কিম্বা ভাঙার অনুমতি নিতেই বুঝি আবার, আগুনকে সাক্ষী করা। মিলনের যে মন্ত্র বিশবছর আগে উচ্চারণ করেছিল, চেষ্টা করে করেও সেই মিলনে ব্যর্থ হয়ে, মিলনের চেষ্টা থেকেই নিষ্কৃতিতে, চরম বিচ্ছেদকে মেনে নেবার জন্যই বুঝি, আবার আগুনের কাছে যাওয়া। আগুনছোঁয়া প্রতিদিনে বুঝি সেই উচ্চারিত মন্ত্র থেকে বিচ্যুত না হবার প্রাণশক্তি, মা সংগ্রহ

করত। প্রতিদিনের সংগৃহীত সেই প্রাণশক্তি বুঝি অকুলান হয়ে গেল। আরও বৃহত্তর একটা আয়োজনের আগুনকে ঠেকিয়ে রাখার কাজে। যে আগুন অপরিহার্য বাঁচিয়ে রাখে, সে আবার মরণেও কাজে লেগে যায়। কিন্তু মরণোত্তর আগুন আর মরবার আগুনের তফাৎ তাতে মোছে না। তারও পরে শেষবার, হ্যাঁ শেষবারই দেখেছে হাসপাতালের বেডে। সারাগায়ে লাল ওষুধ লাগানো, গলে যাওয়া চোখ, আবরণহীন শরীরে চামড়াও বুঝি নেই ই, মাথায় কেরোসিন-ভেজা চুল। গোটানো চুলে চাপ দিলেই টপটপ করে কেরোসিনের ফোঁটা চাদর ভেজায় তখনও। দুটো হাত বুকের ওপর না ঠেকানো অবস্থায় সোজা করা, পা দুটো একটার সঙ্গে আরেকটা কোনওভাবে না ছুঁয়ে সোজা, ঊর্ধ্বমুখী। কোনও মতেই ওই দেহ মায়ের বলে রণজয় সনাক্ত করতে চায় নি। কিন্তু না করে সে যাবে কোথায়, বুকে নীল ব্রাউজ, ব্লাউজের একটুও না পোড়া, ছেঁড়া, বেরঙা সেলাইয়ের অদ্ভুত অবিকৃতি যেন এক অসহ্য বেদনায় রণজয়কে বাধ্য করেছিল ওই দেহকেই মা হিসেবে চিনতে। একটু পরে অস্ফুট উচ্চারণ কানে আসে। শরীরের সর্বস্ব পুড়ে গিয়েও যেটুকু থাকলে মানুষ বেঁচে থাকে, বুকে, পেটে আর মাথায় সেই মৃত্যুমুখী বাঁচাতেও কণ্ঠস্বর কিন্তু চিনে নেওয়ার মত এক থেকে যায়। মায়ের গলার আওয়াজের সহস্ররকম ভাঙাগড়ার সঙ্গে পরিচিত রণজয় ওই প্রায়-গোঙানিকে ভরসা করে উৎসে রওনা দিতেই বোঝে, এ তার মায়েরই গলা। অন্য সুরে বাঁধা তার মায়ের গলার স্বর। তবে তো ওটা তার মা-ই। রণজয় আর সেখানে থাকে নি। এতক্ষণ সে এই বিশ্বাসে থাকতে চেয়েছিল যে, ওটা আমার মা নয়। কারণ, দিনযাপনের কৃৎকৌশল হিসেবে তার মা যখন আত্মরক্ষা করত, তা নিজের জোরেই। যদি এটাকে আক্রমণ ধরে নিই তাহলে যখন আক্রমণ করল, সে তার নিজেরই ক্ষমতার এক্তিয়ার থেকে। স্ব-নির্ভরতার সেই আত্মবিশ্বাসী মাতৃত্ব ওই দেহে কই? ও দেহের বাঁচা-মরার কোনওটাই তো আর এখন ওঁর নিজস্ব উদ্যোগের আওতায় নয়। অন্যের হাতে। যে জল দেবে, কিছুটা তাঁর, যে জল না দিয়ে ওষুধ বা অন্য কিছু দেবে, জল মোটেই দেবেই না, তারও হাতে। যদি রণজয় জল দেয়, তাহলে রণজয়ের হাতে। মা ওই অস্ফুট কণ্ঠস্বরে জল চাইছেও বারংবার। ততক্ষণে তার শোনা হয়ে গেছে তার মা আগুনে পুড়বার সময় কোন ভঙ্গিমায় ছিল। সেই ভঙ্গিমায়, দুই হাঁটু বুকের কাছে এনে, বুকের সঙ্গেই চেপে ধরে বসে থাকার সেই কায়দায় তার মায়ের এতকালের বেঁচে থাকার পদ্ধতিটার অনুসরণ ছিল। মৃত্যুকালীন অনুসরণ। যেন সব লড়াই-এর, আত্মরক্ষা ও আক্রমণেরও, শেষ ভরসা ওই বুক। যেন তখন, আগুনে পুড়তে পুড়তেও মৃত্যুগামী যে সময়, সময়ের অনিবার্য সংগ্রাম, তারও ধাত্রী ওই বুক। বুঝি বুক বাঁচলেই লড়াই বাঁচে। বুক না বাঁচলেই লড়াই শেষ, মৃত্যু তার পূর্ণগ্রাস সম্পন্ন করে। নিজের এতকালের আত্মরক্ষার বিপরীতে আক্রমণে পৌঁছতে চাওয়া, সে বুঝি ভবিষ্যতের জন্য, ভবিষ্যৎ হিসেবে রণজয়ের জন্য। বেঁচে থাকার কায়দা নিয়ে মৃত্যুর কাছে যাওয়া। বেঁচে থাকার আগুন দিয়ে মরণকে ডেকে আনা। যেন বেঁচে থাকার জন্যই মরণের কাছে যাওয়া। এমনভাবে যাওয়া যাতে, সেই ডেকে আনা মৃত্যু তাঁকেই ছুঁতে পারে, নিতে পারে শুধু। আর সবাইকে নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত বাঁচিয়ে রাখার জন্য। সর্বভুক আগুনকে বরণ করে নিয়ে এসেও তাকে সেইটুকু অধিকার দেওয়া, যাতে আগুন শুধু তাকেই নেয়, আর কিছুমাত্র না ছোঁয়, না ধরে। জীবনের আগুনের নিয়ন্ত্রণ মরণের আগুনেও প্রসারিত। মরণের আগুন বিষয়ে জীবৎকালীন সর্তকতা। জীবনকে এত ভালোবেসে কি মরা যায়, মৃত্যুকে হাত ধরে ডেকে আনা যায়? মায়ের সেই মরণভঙ্গিমা, রণজয় মনে রাখতে চেয়েছিল। সে ভঙ্গিমায় কেবল মা-ই পোড়ে, যেন মায়ের ঘর পোড়ে না, ঘরের আর সব অক্ষত থেকে যায়, থেকেই যায়।

সেই ভঙ্গিমার বদল হয়েছে। ট্রাকে সাদা কাপড়ে ঢাকা শরীর টানটান। কোথাও কোনও উচ্চতা নেই, কোথাও কোনও খাদও চোখে পড়ে না। সারাটা শরীর ঢাকা। রণজয় তার মায়ের মুখ আর দেখতে পাবে না। যে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পেতে এই জ্বালাময় মৃত্যু, মায়ের মুখ থেকে সুপ্রাচীন সেই যন্ত্রণার ছাপ মুছে গেছে কিনা জানার উপায় নেই। বিশবছর ধরে, প্রতিদিন একটু একটু করে যে যন্ত্রণা তার মায়ের মুখে প্রায় ভাস্কর্যের ধৈর্যে খোদাই হয়ে গিয়েছিল তা গতকাল সারা দিন-রাতের মধ্যে মুছে যাবার মতো অপরিণত হাতের কাজ কিনা তাও রণজয়ের জানার উপায় ছিল না। এমনকি, শেষ হাতিয়ার হিসেবে নির্বাচিত হওযার সুযোগে জ্বালা, দীর্ঘায়ু যন্ত্রণাকে অতিক্রম করে যেতে পারল কিনা মায়ের মুখ দেখে সেটাও জানা যাবে না। কারণ মায়ের মুখটাই আর দেখা যাবে না। জ্বালা ও যন্ত্রণা মিলেমিশে একাকার হয়ে অন্য কোনও অনুভবের ছাপ তার মায়ের মুখে ফেলে গেল কিনা তাও অজ্ঞাত থেকে যাবে চিরকাল। কিংবা কাপড় সরিয়ে যদি দেখা যেত তার মায়ের মুখে অস্বাভাবিক মৃত্যুর, এমনকি মৃত্যুরও কোনও ছোঁয়াই নেই তাহলে রণজয়ের কাছে সেটাও একটা আবিষ্কার হত। আর কোনওদিন যা হবার সুযোগ রইল না। এই অসময়ে চারপাশের সমস্ত শব্দকে অস্বীকার করে রণজয়ের ইচ্ছে করল তার মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে। রণজয় তা পেল না। বরং চারপাশে বেশ কিছু গুঞ্জন ছিটিয়ে, সংলগ্ন আকাশে বাতাসে অমঙ্গলের আশঙ্কা ছড়িয়ে, সেই প্রথাগত মঙ্গলমন্ত্র উচ্চারণে যে যাত্রার শুরু, তা শেষ হয়ে গিয়েছিল। দূরে সাজানো আছে কাঠ। তারই নির্দিষ্ট উচ্চতায়, অনির্দিষ্ট কাল ধরে যেমন, তেমনি রণজয়ের মায়ের শরীরও রাখা হবে। আবার আগুন দেওয়া হবে। রণজয়কেই দিতে হবে। তার মায়ের একমাত্র জাগতিক প্রতিনিধি হিসেবে। সেই আগুনে মৃত্যুর সমস্ত পর্যায় অতিক্রান্ত হবে। মৃত্যুর সাক্ষাৎ তৎপরতার শুরু যা দিয়েই হোক না কেন, শরীরী অবলুপ্তির শেষতম পর্যায়ে আগুনের অনিবার্যতায় রণজয় বুঝল, আগুনের কাছে প্রাথমিক সমর্পণ করে তার মা কত নিশ্চিন্তে, কত সরাসরি, কত সারল্যে ও অসামান্য জটিলতায় মৃত্যুর কাছে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু মৃত্যু, যতই তা সর্বত্রগামী হোক, এখনও এত পর্যায়, এত স্তর, এতদিনের বিচিত্র প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা না ডিঙিয়ে যে আসতে পারে না, সেটা তার মা জেনে বুঝে নিতে পারে নি।

চিতা জ্বলছে। রণজয়ের ছুঁইয়ে দেওয়া আগুনের বিস্তৃতিতে। এই দহন, মৃত্যুপরবর্তী। এই আগুন, মৃত্যুর শেষ অপরিহার্যতা। রণজয় আগুন থেকে মাকে আলাদা করতে পারছে না কিছুতেই। আগুন ও তার মা একাকার, নাকি আকারহীনতা, ধারণ করছে। এই শ্মশানভূমিতে মার শরীরকে ওই আগুনের ভিতর থেকে চিনে ওঠা কঠিন, অসম্ভব। স্মৃতি ও অনুমানেও। রণজয় শুধু এটুকু বুঝেছিল, ওই আগুনে তার মা আছে। ওই আগুন তার মায়ের মধ্যে আছে।

অরণ্যলতার শেকড়বাকড়

বিজিত ঘোষ

ক' দিন ধরে রাতে ঘুম হচ্ছে না দীপুর। বিছানায় খালি এ পাশ আব ও-পাশ। রাতে শুয়ে ঘুম না এলে বিচ্ছিরি লাগে।

বাত বাড়ে। পাশে বউয়ের নাক ডাকানি। আবো রাত বাড়ে। চারদিক নিঝুম। গোটা পৃথিবীটার কি এখন ঘুমের সময়?

রাতেরবেলা অনেকক্ষণ শুয়েও ঘুম না এলে বার বার বাথরুম পায়। প্রতিবার উঠে দীপু ঘড়ির কাঁটার সরে যাওয়া দেখে। সবাই ঘুমোয়। কেবল দীপুর চোখেই ঘুম নেই। বিছানায় শুয়ে জেগে থেকে এই ভাবনাটা কেমন একটা মানসিক কষ্ট দেয়।

পড়াশোনার জন্য কয়েকটা বছর দেশ গাঁয়েব বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে হয়েছে দীপুকে। তাই কি তাব প্রতি অবণ্যলতা একটু বেশি রকমের দুর্বল? 'আহা, বেচারা। কলকাতায় বাসা ভাড়া করে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খায়। কত কষ্টই না হয় বাছার!' যেন বঙ্গদেশে এই দুর্লভ কষ্ট ভোগ করছে একমাত্র তাঁর ছেলেই!

ছুটিছাটাতে বাড়ি আসতো দীপু। তার আগে থেকেই ছেলের জন্য এটা-ওটা গুছিয়ে রাখতেন দীপুর মা। ছোটপুত্তুর বলে কথা।

কলকাতায় চলে আসার সময় দীপুর হাতে জোর করে কতগুলো পুঁটুলি ধরিয়ে দিতেন অরণ্যলতা।

ময়লা-সাদা পলিপ্যাকে একটু মোটা আতপ। 'তুই তো ফ্যানেভাত খেতে খুব ভালোবাসিস।' ছেঁড়া-ফাঁটা আর একটা পলিপ্যাকে জড়ানো, ম্যানেজ করা দু'টো নতুন আলু। 'বঁটির পিছন দিকে একটু ঘসে নিয়ে ধুয়ে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিস্।'

অল্প ঘি। কাগজের ঠোঙায় গোটা দুই টমেটো। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা। সামান্য মুগ ডাল। 'ন্যাকড়ায় বেঁধে গরম ভাতের মধ্যে ফেলে একটু সিদ্ধ করে নিস্। তেল, লঙ্কা দিয়ে মেখে শুধু এটা দিয়েই একথালা ভাত খেয়ে নিতে পারবি।' দীপু অবাক হয়ে ভাবে—। 'বাবা, আলু-টমেটোগুলো পচাস্ নে যেন। সিদ্ধ করে, গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচালঙ্কা আর সরষের তেল মেখে খেয়ে দেখিস।' এতো সবের পরেও বাড়ির গাছের দু'-একটা নারকোল দীপুকে নিয়ে আসতেই হ'ত।

ছেলে-বউদের সঙ্গে একরকম ঝগড়া করেই অরণ্যলতা দীপুর জন্য গুছিয়ে রাখতেন ডাব। নারকোল। ছেলের কলকাতায় ফিরে আসার সময় এটা নিয়েই হত ঝামেলা। অতোগুলো পুঁটুলির সঙ্গে ভারী ভারী নারকোল নিয়ে আসা কি সহজ কথা? দীপু কিছুতেই তা আনতে চাইতো না। অরণ্যলতা তখন তাঁর শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করতেন। চোখের জল। কথায় কথায় সমুদ্রের জল বেড়েই চলতো। ক্রমাগত। সেই ঢেউ ঠেলে কি আসা যায়?

দীপুদের বাড়িতে নারকোল গাছ বলতে ঐ একটাই। গাছটায় একসময় ডাব হ'ত প্রচুর। বেশ বড় বড়। জলও খুব মিষ্টি। একটা খেলেই প্রাণ ভরে যায়। এটা অবশ্য অরণ্যলতার কথা।

গাছটা বুড়ো হয়ে যাওয়ায় ফলন এখন অনেক কম। হয়তো এবারে মরেই যাবে। কিন্তু দীপুর মায়ের সামনে এ-কথা বললে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয়ে যাবে সমুদ্রের উথালপাথাল।

ছেলের ফিরে যাওয়ার দিন বেশ ভোর-ভোর উঠে পড়তেন অরণ্যলতা। উঠেই তাঁর প্রথম কাজ ছিল কিছু শুকনো নারকোল পাতা নিয়ে বারান্দার কোনটাতে গিয়ে বসা। এক হাতে সেই পাতা জ্বেলে অন্য হাতে তিনি একটা এনামেলের বাটি ধরে জল গরম করতেন। সেই বাটির মধ্যেই হর্লিকস্ গুলে খেতে দিতেন ছেলেকে। 'বাইরে বাইরে থাকিস্। খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই। শরীরটা তো একেবারে কাঠি হয়ে গেছে। এই দুব্‌লা শরীর নিয়ে মোটা মোটা সব বই পড়া! তাড়াতাড়ি এটুকু ঢক্‌ঢক্ করে খেয়ে নে তো দেখি।'

মানুষটার ভেতর থেকে ঝরে পড়া মমতায় ভিজে যেত দীপু। ভেসেও। দু'চোখ ভরে সে দেখতো তার মাকে। গোলা হরলিক্সের মধ্যে উড়ে পড়া নারকোলপাতার পোড়া টুকরো দেখেও মাকে তা নিয়ে কিছু বলতে সঙ্কোচ হত দীপুর। ছানিপড়া চোখের ঝাপসা দৃষ্টিতে ওটুকু নজরে আসতো না অরণ্যলতার। হাতের কাছে সাঁড়াশী, কাগজ, ন্যাকড়ার অভাবে তাড়াহুড়ো করে খালি হাতেই আগুনের উপর এনামেলের বাটি ধরে ছেলের জন্য জল গরম করতেন তিনি। গভীর স্নেহ আগুনের তাপকেও কিভাবে সহনীয় করে তোলে, অবাক বিস্ময়ে তা দেখতে দেখতে দীপু খেয়ে নিত অমৃতের তলানিটুকুও।

তাড়াতাড়ি দু'টো নারকোল ব্যাগে ঢুকিয়ে মাকে প্রণাম করে, মাকে ছেড়ে, মাকে ফেলে দীপুকে চলে আসতো হত কলকাতায়। দীপুর তখন মনে হত, তার বুকের পাঁজরাগুলো কেউ যেন পাটকাঠির মতো মট্‌মট্ করে ভেঙে ফেলছে।

পুজোর ছুটিতে দীপু বাড়িতে এসে মায়ের কাছে থাকতো। অরণ্যলতার মন তখন পেখমতোলা ময়ূরী। প্রতিদিন ছেলেকে কাছে বসিয়ে ভাত খাওয়াতেন তিনি।

ভাত তেমন গরম নয়। ধারে কাছে একটা মাছিকেও দেখা যাচ্ছে না। তবু অরণ্যলতা সর্বক্ষণ হাত-পাখা নেড়ে কল্পিত মাছি তাড়াতেন। ভাত জুড়িয়ে দিতেন ছেলের!

ভাতেই শেষ নয়। ভাত খাওয়ার পর অন্য পর্ব। 'তক্তপোষের তলা থেকে একটা ডাব বার করে একটু কেটে খা বাবা। এতো পড়াশোনা করিস্, ওতে শরীর খুব গরম হয়ে যায়। ডাবের জলে শরীর ঠাণ্ডা হয়। যা বাবা, একটা কেটে খা।'

ডাব হয়তো নেই বাড়িতে। আছে নারকোল। তাতেও দমবার পাত্রী নন অরণ্যলতা। 'ঝুনো? তাতে কি! আমাদের এ নারকোল ঝুনোতেও শুক্‌নো-শুক্‌নো ছিব্‌ড়ে মতো হয় না। মিষ্টিও বেশ। তুই আধখানা কেটে দে। আমি এখুনি কুরে দিচ্ছি। খেয়ে দ্যাখ—।' নিজেই খাচ্ছেন যেন, মুখে এমন পরিতৃপ্তির ভাব।

অরণ্যলতার রকমসকম দেখে কোনো কোনোদিন বৌমাদের কেউ-না-কেউ বলেই ফেলতো তাদের মনের কথা। 'ছোটছেলেকে জোর করে ঝুনোও খাওয়াচ্ছেন? সামনে যে পুজো। বিজয়ার সময় কি কম লোকজন আসে! সকলের হাতে একটা করে নাড়ু দিতে গেলেও তো —। এখন থেকে নারকোলগুলো এভাবে —।'

বরাবরই লোককে দিতে-থুতে, খাওয়াতে-দাওয়াতে খুবই ভালোবাসতেন অরণ্যলতা। কিন্তু তাঁর মন্দ কপাল। আজ আর কোনো সামর্থ্যই নেই বিধবা মানুষটার। কেবল স্বামীর

হাতে পোঁতা নারকোল গাছটাকেই এখন তিনি একমাত্র নিজস্ব সম্পদ বলে মনে করেন। প্রিয়জনদের ডাব, নারকোল, নাড়ু খাইয়ে কী এক অদ্ভুত তৃপ্তি যে তিনি পান!

শীতের দুপুরে উঠোনের রোদ্দুরে বসে বঁটি দিয়ে নারকোল পাতা চেঁছে কাঠি বার করতেন অরণ্যলতা। চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। একদিন হাত কেটে সে কী রক্ত! মুঠো মুঠো চিনি চেপে ধরেও রক্ত বন্ধ হয় না কিছুতেই। হীরের টুকরো যেন ভেজা চুনির দলা হয়ে ফিরে আসতে থাকে। শেষে গাঁদার পাতা ডলে হাতে চেপে ধরতেই রক্ত বন্ধ হয়।

একে-ওকে ডেকে সামান্য কিছু দিয়ে ঝাঁটা তৈরি করে রাখতেন অরণ্যলতা। স্বামীর গাছের পাতা। নিজের পরিশ্রমে তৈরি। তাই ঝাঁটাগুলোর প্রতিও বড়ো টান ছিল তাঁর। জীবনভোর তেমন কিছুই পাননি মানুষটা। ছোটোখাটো সামান্য জিনিসেও তাই এমন গভীর মমতা।

দীপুর সঙ্গে সুজাতার সম্পর্কের সব কিছুই জানা অরণ্যলতার। ছেলে এম. এ পাশ করে একটা স্কুলে চাকরি পেতেই তাকে সংসারে বাঁধতে উঠে পড়ে লেগে যান তিনি। মা আর সুজাতাকে একসঙ্গে নিয়ে আসার জন্য স্কুলের কাছাকাছিই ঘর ভাড়া নেয় দীপু।

ছোটো ছেলের কাছে আসার খুশিতে কয়েকটা রাত ভালো করে ঘুমই হল না অরণ্যলতার। অনেক রাত পর্যন্ত কেবল খুটুর-খুটুর। একের পর এক শুধুই পুঁটুলী বাঁধা হচ্ছে। চাল। ডাল। আলু। কাপড়ের পাড়। সূচ। সুতো। দড়ি। অসংখ্য খালি কৌটো। বিশ্বের যাবতীয় অকিঞ্চিৎকর বস্তুও যেন ছেলের নতুন সংসারে অপরিহার্য। সেই সঙ্গে কয়েকটা নারকোল তো নিলেনই।

পোঁটলার সংখ্যা দেখে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় দীপুর। 'কি হবে এতোসব হাবিজাবি জিনিস?' — বেশ ঝাঁঝিয়েই বলে দীপু। পরক্ষণেই মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে বন্যার ভয়ে সে সুর নরম করে। 'সব একবারেই নিয়ে যেতে হবে? আবার পরে এসেও তো কিছু—।' অরণ্যলতা অন্য লাইন ধরেন। ছেলের এসব কথায় আজ আর কান দেবেন না তিনি। তাই পোঁটলা-পুঁটলি বাদ দেওয়া গেল সামান্য। নিতে হল বেশিটাই।

এরপরও অনেকগুলো নারকোল একজায়গায় জড়ো করা দেখে দীপু আর মাথা গরম না করে পারে না। 'এতোগুলো নারকোলের কী ওয়েট তুমি জানো! আমি একটা নারকোলও নিয়ে যেতে পারবো না।' চললো কিছুক্ষণ। অনেক চেঁচামেচি, ঝড়-জলের পর রফা হ'ল। 'এই দুটো নারকোল অন্তত নে বাবা। এ দু'টোর গজ বেরিয়ে গেছে। ওখানে গিয়ে পুঁতে দিলে দেখতে দেখতে বড় হয়ে যাবে। আমিই এর ফল দেখে যেতে পারবো।'

বয়স বাড়লে মানুষ এমন অবুঝ হয়ে যায়! একে কি বলে? দ্বিতীয় শৈশব না ভীমরতি? অন্যের বাড়ি। আমরা ভাড়াটে। তাদের সঙ্গে আগে থেকে কোনোরকম চেনা জানা নেই। তাদের জমিতে খামোকা নারকোল গাছ পুঁততে দেবে কেন? বিষয়টাতে মায়ের বিশেষ দুর্বলতার কথা জানে বলেই দীপু বিরক্ত হয়েও চেপে যায়।

ছোটছেলের নতুন সংসারে এসে কাজে অনন্ত উৎসাহ অরণ্যলতার। মহা-আনন্দে সব গোছগাছ করে দিলেন তিনি। শাশুড়ির সেন্টিমেন্ট জানে বলেই সুজাতা কিছুতে আপত্তি করে না। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অরণ্যলতার শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। একসময়ে প্রচুর কাজ করেছেন। সে ক্ষমতা আর নেই। হাঁপানি আর বাত কাবু করে দিয়েছে তাঁকে।

হাঁপানি যে কী কষ্টের! সর্বদাই মনে হয়, এই বুঝি দমটা বেরিয়ে গেল। আর দর্‌দর্‌ করে ঘাম নামে। কষ্টে দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসে অরণ্যলতার। 'ঠাকুর, অতিবড় শত্তুরেরও যেন এ রোগ না হয়।'

অসুস্থ শরীরেও অরণ্যলতা সমানেই তাগাদা দিয়ে যাচ্ছেন ছেলেকে। অগত্যা দীপু একদিন মিহিসুরে বাড়িওলাকে প্রস্তাবটা দিল। তিনি বেশ অবাকই হলেন। অন্যের বাড়িতে নারকোল

গাছ বসানোর প্রস্তাব জীবনে তিনি নিশ্চয়ই সেই প্রথম শুনলেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দীপুর দিকে। পাগল-টাগল ভাবলেন? পাকা ধান্দাবাজও মনে করতে পারেন। কে জানে, কী কু-মতলবে ভাড়া নিয়েছে? বাড়িটাতে ফাঁকা জায়গা অনেকটাই। গাছ-গাছালিও কম নেই। তবু দীপুর প্রস্তাবটা বাড়িওলার ঠিক পছন্দ হয়নি। এগিয়ে এলো বাড়িওলী। 'পুঁতুক-না। আমাদের বুড়ো নারকোল গাছটাতে এখন তো আর মুচিই আসে না।' বাড়িওলীর ইঙ্গিত অর্থপূর্ণ। গিন্নিগণের সুপরামর্শ ছাড়া অনেক কর্তাকেই যে পস্তাতে হয়। বাড়িওলা আর অনুৎসাহী নন। শুভস্য শীঘ্রম। বোকার মতো শেষে নয়; আগে-ভাগেই পার্বতী শিবকে সমুদ্রমন্থনে পাঠাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

রবিবার গাছটা পোঁতা হল। অসুস্থ শরীর নিয়েও সব কিছুর তদারক করলেন অরণ্যলতা। তাঁরই নির্দেশে এক কিলো নুন কিনে আনা হল। গাছটার গোড়া থেকে বিগেদ খানেক ছেড়ে তার চারদিকে গোল করে মাটি কাটা হল। পুরো নুনটাই ঢেলে দেওয়া হল সেখানে। এতে গাছ বাঁচে। তাড়াতাড়ি বাড়ে।

হঠাৎ রে-রে করে উঠলেন বাড়িওলা। 'ওটাও পুঁতবেন না কি? দুটো পোঁতা যাবে না। নারকোল গাছের শেকড় বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। তার উপর ভয়ানক শক্ত। দুটো পুঁতলে আমার বাড়ি ঘর-দোর সব ফাটিয়ে দেবে।'

গজ বার করা আর একটা নারকোল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন অরণ্যলতা। গুটিগুটি ঘরের দিকে চলে এলেন তিনি।

দ্বিতীয় গাছটা পোঁতা না গেলেও দীপু সেটাকে বসিয়ে রেখেছিল কলতলার পাশের জল-কাদায়। গাছটা সেই নরম ভেজা মাটিতে নিত্য কলের জল পেয়ে দিব্যি বেঁচে রইলো।

কয়েকমাস যেতে না যেতেই ছুতো-নাতায় কারণে অ-কারণে দীপুদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে শুরু করলেন ওরা। হয়তো বাড়িওলা-ওলী চরিত্রের স্বভাবগুণ! ভাড়া বাড়ানোর ধান্দাও হতে পারে। আরো বেশি ভাড়া আর মোটা অ্যাডভান্সের কোনো অফার পেয়েছে হয়তো।

একটু খোঁজখবর করলে এটা ছেড়ে আর একটা বাড়ি পেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু অরণ্যলতার নারকোল গাছ নিয়েই ভাবনা হয় দীপুর। তাছাড়া তার নিজেরও বাড়ির গাছের বাচ্চা দু'টোর প্রতি কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে।

ভাড়াটা একটু কম হলে কি হবে, বাড়িটা কেমন যেন পোড়ো-পোড়ো। পিছন দিকে আবার একটা বিশাল বাঁশ ঝাড়। ভুতুড়ে বাড়িটাতে থাকে কেবল একটা বুড়ি। তার ছেলে বৌরা বাইরে চাকরি করে। ন'মাসে ছ'মাসে এক-আধদিনের জন্য আসে।

আগের বাড়িতে পোঁতা ও না-পোঁতা দু'টো গাছই তুলে এনে এ-বাড়িতে বসানো হল। এখানে নারকোল গাছ কেন, বট-অশ্বত্থ গাছ পুঁতলেও কেউ কিছু বলতে আসবে না। অরণ্যলতা মহা খুশি। দীপুও। দু'টো গাছই পোঁতা গেল। সুজাতার মুখ ভার। কী বিচ্ছিরি পোড়ো বাড়ি। বাঁশঝাড়।

এ-বাড়িতেও শুরু হল আর এক উৎপাত। শুরু ঠিক নয়। আগেই ছিল। কোনোরকম খোঁজ-খবর না নিয়ে আসায় দীপুরাই কিছু জানতে পারে নি।

বাড়িটাতে পাঁচিল বা বেড়া, এসবের কোনো বালাই নেই। হাটের মতো চারদিক খোলা। বাড়িটার ভেতর দিয়েই অলিখিত পথ তৈরি হয়ে আছে। রাজ্যের লোক যাওয়া-আসা

করছে। পিছন দিকের বাঁশঝাড়টা সমাজবিরোধীদের ঠেক্। সেখানে জুয়া, সাট্টা ছাড়াও এটা-ওটা চলে নিয়মিত।

আগের বাড়িটা থেকে দীপুদের চলে আসতে বাধ্য করেছিল বাড়িওলার বউ। বর্তমানে সে ভূমিকায় দীপুর বউ। মা-বউকে নিয়ে মহা দুঃশ্চিন্তায় পড়ে দীপু। সে বুঝতে পারে, এ-বাড়িতে ওদের নিয়ে থাকা নিরাপদ নয়। কোনোরকম খোঁজখবর না নিয়ে এভাবে দুম্ করে ঘর ভাড়া নিয়ে চলে আসার জন্য নিজের উপরেই সব থেকে বেশি বিরক্ত দীপু। সুজাতার ঘ্যানর-ঘ্যানরে আরো খচে যায় দীপু। 'কি করবো? ও শালারা আমাদের তুলে দেওয়ার জন্য দিনরাত এমন পিছনে লাগতে শুরু করলো, সেই সঙ্গে তুমিও। তখন কি ধীরে-সুস্থে সব খোঁজখবর নেবার মতো অবস্থা?' সুজাতা জানে, এমনিতেও তার বর কত খোঁজনেওয়ালা। কিন্তু এখন কিছু বলা যাবে না।

সব দেখেশুনে অরণ্যলতা ছেলেকে নতুন গান শোনোলেন। 'বাবা, দ্যাখ্ না, ধারধোর করে যদি একটু জমি কেনা যায়। আরো গ্রামের ভেতরে হয় হোক। তোর তো সাইকেল আছে। একটা কুঁড়ে করে উঠে যেতে পারলেও ঢের শান্তি। নিজের বাড়ি বলে কথা।' মায়ের সব কথা কানে গেলেও দীপুর মুখ অন্য দিকে। দীপুকে চুপ্ দেখে অরণ্যলতা এবার ছেলের মনের পথ ধরলেন। 'আমারও তো বয়স হচ্ছে। রোগে-রোগে শরীরের হাল কি হয়েছে, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস্ বাবা। আমি আজ আছি, কাল নেই। তোদের একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই দেখে যেতে পারলে বড়ো তৃপ্তিতে চোখ বুঁজতে পারতাম বে। তাছাড়া —।' ছেলে তাকায়। অরণ্যলতা বোঝেন, কাজ হয়েছে। 'তাছাড়া গাছ দু'টোকেও এভাবে বার বার তোলা-নাড়া করলে শেষমেষ আর বাঁচাতে পারবি না।'

মায়ের সাধ, বউয়ের বাস্তব অসুবিধা, সবই বুঝতে পারছে দীপু। কিন্তু তারও তো নতুন চাকরি। এখন স্কুল থেকে কোনো লোনও পাওয়া যাবে না। টিউশনও করে না দীপু। চাকরি পাওযার পর থেকে প্রথমাবধিই এটা তাব কাছে একান্তই নীতিবিরুদ্ধ কাণ্ড।

জমানো টাকাও কিছু নেই। শেষমেষ হেডমাস্টাব মশায়ের চেষ্টায় কিছু টাকা সংগ্রহ হ'ল।

দীপুর বউয়ের ইচ্ছে সুন্দর, ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট। কিন্তু যে টাকা জোগাড় হয়েছে তাতে এই মফঃস্বলেও ভেতরের দিকে বড়জোর কাঠা দুই জমি কেনা যেতে পারে। তৈরি ফ্ল্যাট কেনা অসম্ভব। জমি কিনে মাথা গোঁজার মতো একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারলে মাসে মাসে আর ভাড়াটা গুনতে হয় না। বার বার জিনিসপত্র নিয়ে বাসা বদল বড়ই ঝামেলার।

ফ্ল্যাটের কথায় দীপু মৌনীবাবা। অরণ্যলতা বধির। সুজাতা সব বুঝেও অপেক্ষা করছিল। গরম কড়াইতে বালি দিয়ে। শাশুড়ি উঠে যেতেই তপ্ত কড়াইতে ফটাফট্ খৈ ফুটতে থাকে। 'জানি, তোমরা মা-ছেলে ফ্ল্যাট সহ্য করতে পারো না। তোমাদের মাটি চাই। মাঠ চাই। খোলামেলা জায়গা চাই। সঙ্গে একটা পুকুর পেলে আরো ভালো হয়। সম্ভব হলে একটা নদী পেলে তো আর কথাই থাকে না, —।'

ভাব ভালো নয় বুঝে সরে পড়ে দীপু। তা না হলে আর একটু পরেই মায়ের মতো সমুদ্র. বন্যা না হলেও শাওয়ারে জল এসে যাবে অন্তত।

ছেলের হয়ে বৌমাকে বোঝাতে আসেন অরণ্যলতা। 'তুমি শহরের মেয়ে বউমা। খোকা, খোকার বাপ-ঠাকুর্দাদের জীবন কেটেছে গ্রামেই। তুমি মাঠ, নদী বলে যতই ঠাট্টা কর মা, বাংলাদেশে দীপুর বাবার শুধু একশো বিঘে ধেনো জমি ছিল। আর বাড়ি-পুকুর-বাগান-গোলা-গোয়াল নিয়ে আরো বিঘে দশেক।' সুজাতা মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকে। পুরনো দিনের কথা এলে অরণ্যলতা সহজে থামেন না।

'মানুষটা চলে গেলেন অসময়ে। ছেলেরাও একে একে সব বিক্রিবাটা করে এপারে চলে এলো। জলের দরে চলে গেল সব। এপারে এসে এক চিলতে জমি আর বাড়ি। তারই মধ্যে জেদাজিদি করে তোমার শ্বশুরকে দিয়ে নারকোল গাছটা পোঁতাই। সে কী আজকের কথা। উল্টোরথের দিন কিনে এনে সেদিনই পোঁতা। সে কী ঝম্‌ঝমে বিষ্টি। ওঁনার হাতে শাবল। আমার হাতে চারাটা........।' অরণ্যলতা একটু একটু করে ফিরে যাচ্ছেন তাঁর বৃষ্টি-ভেজা যৌবনে।

কয়েকজন উৎসাহী সহকর্মীর চেষ্টায় বেশ সস্তাতে পাওয়া গেল দু'কাঠা জমি। ছোটো গাছটাকে জমিতে এনে পোঁতা হল। অরণ্যলতার খুশি আর ধরে না। 'যাক্, এটাকে অন্তত আর কোথাও তুলে নিয়ে যেতে হবে না।' জমির চারদিকটা খোলা। গোরু ছাগলে যদি—। গাছটাকে ঘিরে উঁচু করে একটা মজবুত বেড়া দেওয়ার ব্যবস্থা করে এলো দীপু।

পুজোর ছুটিটাতে অরণ্যলতা ছেলে-বৌকে নিয়ে দেশের বাড়িতে কাটিয়ে এলেন। ফিরে এসে শোনেন, তাঁদের বাসার পিছন দিকের ফাঁকা জায়গাটাতে একজন খুন হয়েছে।

সুজাতা ভয়ে কাঠ। কিছুতেই সে আর এখানে থাকবে না। অসহায় দীপু স্কুলে গিয়ে প্রিয় কয়েকজন সহকর্মীকে সব বলে। সকলে মিলে খোঁজ করতে কয়েকদিনের মধ্যে একটা তৈরি বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। খুবই ছোটো। বাড়িটাও। জায়গাও। এক বন্ধু দীপুকে বললে, 'অতো ভাবাভাবির কিছু নেই গুরু। সস্তায় পাচ্ছো, নিয়ে নাও। তোমার ঐ জমি বিক্রির টাকাতেই এটা হয়ে যাবে। আবার নতুন করে কোথায় লোন পাবে?'

বাড়িটার চারদিকটা কেমন ঘিঞ্জিমতো। আশপাশের বাড়িগুলো সব গায়ে-গায়ে। একটা আর একটার ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে যেন। বাড়িটা ছোটো হলেও তার সামনের পুবদিকের কোণটাতে সামান্য ফাঁকা জায়গা আছে। মায়ের কথা মনে করে দীপু ভাবে, 'এইখানটাতে একটা গাছ পোঁতা যেতে পারে।' বাড়িটার চারদিকেই পাঁচিল দেওয়া। তবে তিন ইঞ্চির। প্রতিবেশীদেরও কাউকে খুনী বলে মনে হ'ল না।

অরণালতা খুশি। সুজাতাও। 'ছোটো হোক, যা হোক নিজের বাড়ি তো। পুব কোণে এক টুকরো জমিও আছে।' দীপু মায়ের লাইন ধরে ফেলে আগে-ভাগেই বলে রাখে, 'ঐটুকু জমিতে কিন্তু তুমি দু'টো গাছ পোঁতার কথা একবারও ভেবো না। খুনে বাড়ির বড়ো গাছটা কোনোরকমে তুলে এনে যদি এইখানটাতে পুঁততে পারি —।' অরণ্যলতা বলেন, 'না পারার কি আছে? এর থেকেও বড়ো গাছ তুলে এনে পুঁতেও বেঁচে গেছে, আমার নিজের চোখে দেখা। নারকোল গাছের জান্ বড়ো শক্ত। ঠিক বেঁচে যাবে দেখিস্।' পরের কথাগুলো স্বগতোক্তির মতো নিজের মনে মনেই বললেন অরণ্যলতা : 'কত গাছের আয়ু মানুষের থেকেও ঢের ঢের বেশি।'

ভালো দামেই বিক্রি হল জমিটা। কিনলো নবীনের বাবা সনাতন মণ্ডল। নবীন দীপুদের স্কুলের ১২ ক্লাশের ফার্স্ট বয়। ভালো ছেলে। স্কুলের সকলেরই প্রিয় ছাত্র। দীপু আসার সময় নবীনের হাত ধরে বলে এলো, 'গাছটা যদি পারিস বাঁচিয়ে রাখিস্ নবীন। আমার মায়ের হাতের গাছ।'

ভাড়া বাড়ি ছেড়ে নিজেদের কেনা বাড়িতে চলে এলেন অরণ্যলতা। বেশ কিছুটা বড়ো হয়ে ওঠা গাছটাকে যে কী কষ্ট করে তুলে আনা হল। এতো টানা-হেঁচড়ায় শেষমেষ গাছটা বাঁচলে হয়।

পুব কোণের ফাঁকা জায়গাটাতে বিশাল একটা গর্ত খোঁড়া হল। খুনে বাড়িতে খোলামেলা জায়গা পেয়ে গাছটা ভালোই হাত-পা ছাড়িয়েছে।

ছেলের বাড়িতে তাঁর হাতের গাছ পোঁতা হচ্ছে। অসুস্থ হলেও অরণ্যলতা কি সেখানে না এসে থাকতে পারেন?

কেবল মনের জোরে এসে বসা। হাঁপানিটা খুব বেড়েছে। শ্বাসকষ্টে শরীরটা দুমড়ে আসছে। বুকের ভেতরে দু'টো বেড়ালের লড়াই হচ্ছে যেন। অসম্ভব সহ্যশক্তি মানুষটার। সুজাতা বাতাস করে। দীপু বার বার শুতে যেতে বলে। — 'ও কিছু না রে বাবা। একটু জিরোলেই ঠিক হয়ে যাবে।' শ্বাস নেন অরণ্যলতা। এটুকু কথা বলতেও যেন দমটা — ।

পাঁচিলের গায়ে হেলান দেওয়া নধরকান্তি গাছটা। তার সামনে বিরাট একটা হাঁ-করা গর্ত। গর্ত থেকে তোলা আলগা মাটির ঢিবি। তার পাশে কোদাল আর অসুস্থ অরণ্যলতা। সব মিলে কেমন একটা অতিপ্রাকৃত কর্মকাণ্ডের মহড়া চলছে যেন।

'এ গাছের ফল আমি কি আর দেখে যেতে পারবো? তবু আমার হাতের গাছটা বেঁচে গেলে —।' কথায় পেয়েছে অরণ্যলতাকে। আশ্চর্য, এতো শ্বাসকষ্টের মধ্যেও কথা বলতে ইচ্ছে করে! 'বাড়ির পুব কোণে গাছ শুভ। তোর ঠাণ্ডার ধাত। শীতকালে সকালে উঠে গাছটার কাছে এসে দাঁড়াস্, রোদ পাবি।'

অসুস্থ অরণ্যলতার গলায় আজ অন্য আকুলতা। 'আমার হাতের এ গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখিস্ বাবা। দেশেব বাড়ির তোর বাবার হাতের গাছটা বুড়ো হয়ে গেছে। ওটা এবারে মরেই যাবে।'

অরণ্যলতার কথায় কেমন ভয় ভয় করে দীপুর। সব কিছু কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়।

গাছটাকে গর্তের মধ্যে বসানোর সময় পায়ে সরে সরে এগিয়ে এলেন অরণ্যলতা। কাঁপা হাতে গাছটাকে ছুঁয়ে প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেলেন যেন।

নবীনের বাবার কাছে কিছু টাকা পেত দীপু। সেদিন ওদের বাড়িতে সে টাকাটা আনতে যায়। তার হাতে পোঁতা মায়ের নারকোল গাছটা দেখে খুব কষ্ট হয় দীপুর। একেবারে মরার মতো চেহারা হয়েছে গাছটার। নীচের দিকের দুটো পাতা শুকিয়ে গেছে। উপরের দিকের একটাই পাতা কেবল একটু সবুজ আছে। তাও তার ডগাগুলো —।

একটা বর্ষা যেতে না যেতেই বাড়ির গাছটা একী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ! দীপু স্কুল থেকে ফিরে প্রতিদিন বিকেলে গাছটাকে চান করায়। পাতার উপরে জল ঢালে। পাতার পিছন দিকে জলের ঝাপটা দেয়। পাতার বুকে-পিঠে হাত বোলায়।

গাছটা বেশ তাড়াতাড়িই বড় হচ্ছে। কয়েকটা পাতা লম্বা হয়ে সোজা উঠে গেছে কত উঁচুতে। দুটো করে পাতার মাঝখান দিয়ে কয়েকটা কী যেন বেরিয়েছে! ঘন সবুজ গালিচায় মোড়া এক-একটা স্বাস্থ্যবান চওড়া তরবারি যেন। এগুলো ঠিক পাতার মতো নয়।

অরণ্যলতা অসুস্থ শরীর নিয়ে সেই যে বিছানায় শুয়েছিলেন, আর ওঠেননি। সব শুনে তিনিই ছেলেকে বললেন : 'মুচি এসেছে। এখন আর গাছাটাকে চানটান করাস নে।'

মুচির পেটটা গর্ভবতী নারীর মতো দিনে দিনে ফুলতে থাকে। একদিন পেটটা ফেটে মুচিটা হয়ে গেল একটা ছোট নৌকো। নৌকোর পেটের ভেতর দেখা গেল একটা কাঁদি। কাঁদির গায়ে অনেক শিস। শিসের গায়ে সোনালি-সবুজ-হলুদ রঙের উজ্জ্বল লাবণ্যে ভরা অনেকগুলো ডুমো ডুমো গুটি। আর সেই একই শিসের সারা গায়ে ছোট ছোট পাকা গমের মতো দেখতে হাল্কা হলুদাভ অসংখ্য ফল। প্রতিদিন শিস থেকে তা ঝরে পড়ে গাছের তলায়। গাছের নীচেটা তখন সোনা গলা রোদ।

সবকিছুরই কি বয়স বাড়লে লাবণ্য কমে? ডুমো ডুমো সুপুরির মতো ফলগুলো আরো বড়ো হল। প্রথমটায় গাঢ় সবুজ। ক্রমশ হাল্কা সবুজ। তারপর দিনে দিনে সেগুলো সব ছোটো ছোটো এক-একটা আস্ত ডাব।

কিন্তু এক এক করে সব যে ঝরে গেল। কেবলমাত্র দুটো ডাব একটু বড় হল। তাও তার থেকে আবার কে একটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল। হয়তো বড়োরা কেউ। পুজোয় দিতে? ছোটোরাও হতে পারে। শাঁস হল কিনা দেখার আগ্রহে।

একই শিসে গায়ে-গায়ে ছিল ডাব দুটো। একটা টেনে ছেঁড়ায় অন্যটার গোড়াও সামান্য ছিঁড়ে যায়। দীপু অনেক যত্নে সেটাকে দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে বেঁধে দিয়েছিল। তাতে ডাবটা না শুকিয়ে আরো একটু বড়ই হয়েছিল। সেটাই গাছের এখন সবে ধন নীলমণি।

এটির উপরেও যে-কারোর সুনজর পড়তেই পারে। সে-কথা ভেবেই কিছুদিন পরে দীপু ডাবটা গাছ থেকে কেটে আনে। সেদিন আবার অরণ্যলতার অম্বুবাচীর উপোস ছিল। শরীরটা এতো খারাপ, তার মধ্যে এসবও ঠিক করা চাই।

উপোস মিটলে ডাবটা কাটে দীপু। জলটা খেতে দেয় মাকে। 'এ তুই কি করলি? বাড়ির গাছের প্রথম ফল ঠাকুরের পুজোয় দিতে হয় যে বাবা।' মায়ের কথায় দীপু বলে, 'নিজের মায়ের থেকেও বড় ঠাকুর আছে না কি?'

মানুষটার দু'চোখে জলের ধারা। তবে তা আগের মতো উথালপাথাল নয়। শান্ত। নিস্তরঙ্গ। বিষাদ কাটাতে দীপু বলে, 'কী মিষ্টি জল, খেয়ে দ্যাখো। প্রাণটা একেবারে জুড়িয়ে যাবে।'

যথাসাধ্য প্রাণ খুলে হাসতে চেষ্টা করলেন অরণ্যলতা। 'দ্যাখো বৌমা, কী দুষ্টু ছেলে। আমি ওমন বলতাম বলে, ঠিক সেভাবে —।' সকলের সম্মিলিত হাসিতে মুহূর্তের মধ্যে ঘরটা হয়ে গেল পাখির পালক।

সন্ধের দিকে ভয়ংকর টান উঠলো অরণ্যলতার। হঠাৎ গলার স্বরটা কেমন ভেঙে গেল। খুব অস্পষ্ট আর ফ্যাসফেসে হয়ে এলো। হাত নেড়ে দীপুকে কাছে ডাকলেন। অতিকষ্টে ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে এলেন অরণ্যলতা। 'আমার সময় হয়ে এসেছে রে দীপু। কাল রাতে তোর বাবার স্বপ্ন দেখলাম। আমায় হাত নেড়ে ডাকলেন মানুষটা।' প্রচণ্ড হাঁফাচ্ছেন অরণ্যলতা। শেষের কথাগুলো অত্যন্ত অস্পষ্ট শোনা গেল। 'তোরা সবাই মিলে আমাকে নামিয়ে ঐ — ।'

হাউ-হাউ করে কেঁদে ফেলে দীপু। সুজাতাও। প্রতিবেশীরা সান্ত্বনা দেয় নিয়মমাফিক। 'মা কি কারো চিরকাল থাকে?'—গোছের কথাবার্তায়। দীপু ভাবে, একটা মানুষ এখনও কথা বলছে। বেঁচে আছে। তার মা। সেই মানুষটা তার চোখের সামনে থেকে চিরদিনের মতো—।

দীপু আর সামলাতে পারে না। বন্ধুরা ধরে। দু'জন বন্ধু আগেই চলে গেছে ডাক্তার ডাকতে। ডাক্তারবাবু এলেন আর গেলেন।

অরণ্যলতা ছেলের কান্না, কথা কিছুই আর শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর ঘোলাটে হয়ে আসা চোখ দুটো কি কিছু খুঁজছিল? সুজাতার দিকে হাতটা একটু তুলে ইশারা করলেন তিনি। অরণ্যলতা চাইছেন তাঁকে এবার ঘর থেকে বাইরে বার করে আনা হোক। পুব দিকে তার নারকোল গাছটার তলায় শুতে চাইছেন তিনি। সেইমতো তাঁকে বাইরে আনা হ'ল।

লোকজনের ভিড় বাড়ছে। দীপুদের দেশের বাড়িতেও খবর গেছে। রাত গভীর হয়। আরণ্যলতা চোখ বুঁজিয়ে ঘুমিয়ে আছেন নিশ্চিন্তে। তাঁর সাধের গাছের তলায়।

মাথার কাছে অনেক ফুল। খুচরো। তোড়া। পায়ের কাছে এক গোছা জ্বলন্ত ধূপ। ধূপের ধোঁয়া উপরে উঠছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে। গাছের পাতার হাওয়ায় সেই কুণ্ডলী ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে।

নির্বাক দীপুর শরীরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অরণ্যলতারও কি খুব শীত করছে? অভ্যেসবশে এ-কথা ভেবে ফেলে পরেই দীপুর মনে হয়, 'মা-তো আর ঠাণ্ডা-গরমের মধ্যে নেই।' অরণ্যলতার পায়ের কাছে কে একটা হলুদ মোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে। বাইরের বাল্বের আলোটা এই পায়ের দিক পর্যন্ত আসছে না। নারকোল গাছের নুয়ে-পড়া পাতাটার বাতাসে বার বার মোমটা নিভে যাচ্ছে। প্রতিবার সুজাতা সেটা জ্বালিয়ে দিচ্ছে। বিরক্ত গলায় কে একজন বললে, 'পাতাটাকে টেনে দড়ি দিয়ে গাছটার সঙ্গে বেঁধে দিলেই তো হয়।' তা শুনে অস্বাভাবিক জোরে চিৎকার করে ওঠে দীপু, 'না'।

সকলে অবাক হয়। মুখে কেউ কিছু বলে না। ভাবে, মায়ের শোকে বোধ হয় বেচারার মাথাটা —।

অনেক সাধ, শখ আর স্বপ্ন বুকে নিয়ে অরণ্যলতা এসেছিলেন ছোটোছেলের কাছে। সব ফেলে একটু অসময়েই চলে গেলেন তিনি। তাঁর আদরের নারকোল গাছ, স্টিলের কানাকাটা টিফিন কৌটোর মধ্যে জমানো অনেকগুলো আধুলি-সিকি আর গোল-হলুদ কুড়ি পয়সা; কাঁথার চারদিকে বসানোর জন্য পুরনো কাপড়ের কাজ-করা সুন্দর রঙিন পাড়, সূচ-সুতো, অসংখ্য প্লাস্টিকের ছোটো-বড়ো কৌটো, অতি যত্নে থরে থরে পাট-পাট করে গুছিয়ে রাখা ছোটো ছোটো পলিপ্যাক, দড়ি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, কাসুন্দির শিশি, বয়েম ভর্তি ছ্যাতা পড়া আমের আচার, ছেলে, বউ — সব কিছু ছেড়ে, ফেলে চলে গেলেন অরণ্যলতা।

যাওয়ার আগে ভাঙা গলায় ফিসফিস করে অরণ্যলতা ছোটোছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে গিয়েছেন। 'মৃত্যুর পর আর কি কিছু থাকে রে দীপু? কোথাও কিছু থাকে না? কিচ্ছু না? সব শেষ? ও-পারের সঙ্গে এ পারের কোনোরকম যোগ থাকে না?'

এ-পারের মানুষের সঙ্গে এই ছিল অরণ্যলতার শেষ কথা। মৃত্যুপথযাত্রী মাকে কিছুই বলতে পারে নি কান্নায়-ভেঙে-পড়া দীপু। কাতর ঘোলাটে চোখের আকুল জিজ্ঞাসার কোনো উত্তর না পেয়েই বড়ো হতাশ হয়ে চলে গেলেন অরণ্যলতা।

প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মায়ের গাছটাকে মুখস্থ করে দীপু। অফ-পিরিয়ডে স্কুলে বসে দীপুর মনে হয়, ক্লাশের বই প্রতিদিন পড়া ও পড়ানোয় কী ক্লান্তি! আবার বাড়িতে এসে সেই দীপুই ভাবে, গাছের কাছে বসে জন্ম-জন্মান্তর ধরে পাঠ নিলেও ক্লান্তি আসে না।

রাতে খাওয়ার পর শুতে যাওয়ার আগে দীপু রোজ গাছটার কাছে এসে বসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে তার মনে হয় গাছটা তাকে ডাকছে।

বিছানায় শুয়ে সহজে ঘুম আসে না রাতে। কত কথা যে মনে পড়ে দীপুর! অনেক বেশি বয়স পর্যন্ত দীপু মায়ের কাছেই শুয়েছে। নিয়মিত। ছেলের জন্য রাতের বেলা লোডশেডিং হলে অনবরত হাত-পাখা টানা দীপুর মায়ের বহুদিনের অভ্যেস। বুড়ো ছেলেও যাতে গরমে একটুও কষ্ট না পায়, সেজন্য অরণ্যলতা পাখার বাতাস করেই যেতেন।

আশ্চর্য দক্ষতায় পাখা টেনে যেতেন অরণ্যলতা। ঘুমের মধ্যেও। ঘুম আরো গভীর হয়ে এলে পাখাসমেত হাত আপনিই হেলে পড়তো মশারির গায়ে। নাইলনের খস্‌খস্‌ শব্দে জেগে গিয়ে আবার পাখা নাড়তে শুরু করতেন তিনি।

লোডশেডিং-এ গ্রীষ্মকালে একতলা ছোটোঘরের ভেতর যা ভ্যাপসা গরম! কখনো কখনো দরজা-জান্‌লা দিয়ে হঠাৎ এক ঝলক বাতাস হয়তো ঢুকে পড়তো। অরণ্যলতা

বলতেন ঃ 'প্রকৃতির হাওয়ার কোনো তুলনা আছে? হাজার ফ্যানের হাওয়াও এতো আরাম দিতে পারবে না।' শ্বাসকষ্টের রুগি তো। চোখ বুঁজে এক বুক বাতাস টেনে বলতেন, 'আঃ, কী শান্তি!'

কয়েকমাস আগে রাস্তার তার ছিঁড়ে যাওয়ায় দীপুদের পাড়াটায় সারারাত কারেন্ট আসে নি। সেই গরমে ছেলের কষ্ট দেখে অসহায় অরণ্যলতা করুণ দৃষ্টিতে কেবল চেয়ে ছিলেন। তখন তাঁর পাখা ধরারও ক্ষমতা ছিল না। ক্ষীণ গলায় ছেলেকে বলেছিলেন, 'ঘরের ভেতরে গরমে সেদ্ধ না হয়ে বাইরে গিয়ে গাছটার তলায় একটু বোস্ না। দেখবি প্রাণটা জুড়িয়ে যাবে। যা মিষ্টি হাওয়া।'

ডুকরে কেঁদে ওঠে দীপু। নিজের মনেই বলে, 'মা আর তাঁর সাধের গাছ, — কাউকেই বাঁচাতে পারলাম না আমি।' দীপু জেনে গেছে শেষ পর্যন্ত মায়ের হাতের ফলন্ত গাছটা কেটেই ফেলতে হবে। আজ। না হয় কাল।

সেদিন স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে টিফিন খেয়ে দীপু রোজকার মতো এসে বসে গাছটাব কাছে। ' তুমি স্কুল যাবাব পর আজ ওরা আবাব এসেছিল। আমাকে শুনিয়ে গেল একচোট।' বিরক্ত হয়ে ওঠে দীপু। 'আবার কেন? সেদিন তো ওদের যা মুখে এসেছে উগ্‌রে গেছে। গাছ কেটে ফেলার ব্যাপারটা তো ঠিকই হয়ে আছে। আবার কি?'

আরো একটি রাত আসে। একসময় সে রাতও গভীর হয়। তবু ঘুম আসে না দীপুর। রাত পোহালেই রবিবার যে। কালই গাছটা কেটে ফেলা হবে। মানে, কেটে ফেলতে হবে।

এই বাড়িটার ডানদিকে ছ ফুট মাত্র রাস্তা। আর তিন দিকেই একেবারে গায়ে গায়ে বাড়ি। তাদেরই গাছটা নিয়ে তীব্র আপত্তি। প্রথম প্রথম ঐ লোকগুলোর উপর খুব রাগ হয়েছিল দীপুর। ক্রমশ তার রাগ কমেছে। বেড়েছে কষ্ট।

'এক কাঠা তিন ছটাক জমিতে মশাই বাড়িই হয় না। সেখানে আবার নারকোল গাছ করার শখ হয় কোথ্থেকে বলুন তো?' বলতে বলতে প্রতিবেশী সাধন মণ্ডল বার বার তেড়ে আসছিল দীপুর দিকে। 'আমাদের পায়খানার চেম্বারের ভেতরে আপ্‌নার সখের নারকোল গাছের শেকড় ঢুকে চেম্বারটা যে ফাটিয়ে দিয়েছে। এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে শুনি?' হারু ঘোষের কথা শেষ না হতেই তার মুখের বিষ নিজের ঠোঁটে তুলে নিল হারুর বুড়ো বাপ। 'বিদ্যুৎবাবুদের বারান্দার মেঝেতেও চিড় ধরেছে। পুলিনবাবুদের পুবদিকের পাঁচিলটা তো একদম ফেটে শেষ। এমন আহাম্মক একটা লোক স্কুলে ছেলেপুলেদের যে কী শেখায়!'

গাছ-দুর্বলতা দীপুকে অন্ধ করে রেখেছিল। আসলে একটু একটু করে বেড়ে ওঠা ঐ জীবন্ত গাছটার মধ্যে যে দীপুর মা — । কত কষ্টে থাকা সময়ে গাছটার কাছে এসে বসতো দীপু। ঠিক যেন মায়ের কোল। ঠাণ্ডা। শীতল। নিশ্চিন্ত, নিরাপদ আশ্রয়। নিবিড় শান্তি।

কত ঘুম-না-আসা রাতের আঁধারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে বসে থেকেছে দীপু। গাছটার সঙ্গে চোখে চোখে কথা হ'ত তার। সব ব্যথা সব যন্ত্রণা নিমেষে যেন জুড়িয়ে যেত দীপুর। জুড়িয়ে দিত ঐ গাছটা। তার মা।

রাত অনেক হ'ল। শুধু দীপু নয়, ঘুমোয় নি সুজাতাও। —'চলো না, কাল দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি। রবিবার। তোমার তো স্কুল ছুটি।'

— 'মা নেই, এখন কি আর ওখানে গিয়ে ভালো লাগবে?'

'তাহলে অন্য কোথাও চলো। তোমার তো কত ছাত্রছাত্রী। কতবার করে তারা এসে তোমায় বলে যায়।'

সুজাতার উদ্দেশ্য টের পায় দীপু। 'চ — লো —।' দীপুর গলায় বিসর্জনের সুর। 'পাশের তিনটে বাড়িতে সব বলা আছে। কাটার লোক তো ওদেরই ঠিক করা। তাকেও টাকা দেওয়া আছে। ওরা, বিশেষ করে হারুর বাবাই দাঁড়িয়ে থেকে শুভ কাজটা সুসম্পন্ন করে দেবে বলেছে। এখন আর আমার কোনো পিছুটান নেই।'

সুজাতার চোখে বর্ষাকালের রোদ্দুর। 'নবীনদের বাড়ি যাবে? সেবার ওদের গৃহপ্রবেশের সময় আমাদের যাওয়ার জন্য কত করে বলে গেল।'

নবীন। দীপুর জমিটা কিনেছিল ওর বাবা। কে যেন বললে সেদিন, নবীন একটা স্কুলে চাকরিও পেয়েছে।

সস্ত্রীক মাস্টারমশাইকে দেখে নবীন খুব খুশি। অনেক গল্প হ'ল। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনও ব্যাপক। গুরুদক্ষিণা নাকি? দীপু ভাবে। চলে আসার সময় নবীন গলা নামিয়ে অপরাধী ছাত্রের মতো করে দীপুকে বললে, 'স্যার, আপনার অনুরোধটা রাখতে পারিনি। বাড়িতেও অনেকগুলো ব্যাচ পড়াই। পশ্চিমদিকের ঘরটা তাই ভেঙে একটু বড়ো করেই করতে হ'ল। গাছটা না কেটে কোনো উপায় ছিল না স্যার।'

রাত বেশি হয়নি। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা হয়েই চলেছে সমানে। গ্রাম বলেই এমন নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে গভীর রাত। ঝোড়ো হিমেল বাতাসে কেমন শীত-শীত করছে। হাল্কা ঝড়েই সরে গেছে মেঘ। চারদিকে ধবধব করছে চাঁদের আলো। তার মধ্যে বৃষ্টিও হচ্ছে। বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশের চাঁদ আরো উজ্জ্বল।

অরণ্যলতা ছোটোবেলায় দীপুকে চাঁদের কলা গুনতে শিখিয়েছিলেন। চাঁদের মধ্যে তিনি কি স্বামীকে খুঁজতেন? দীপু যেমন মাকে খোঁজে!

চাঁদের কলা গুনে অমাবস্যা, পূর্ণিমা কবে হবে, তা মায়ের মতো দীপুও বলে দিতে পারতো। এখনও কি পারে? কে জানে?

আজ কি পূর্ণিমা? নবীনদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে ভাবে দীপু। চাঁদের আলোর বন্যায় দীপুর চোখ চলে যায় দূরে। একটা লম্বা নারকোল গাছের মাথার দিকে। ঝোড়ো হাওয়ায় তার দুটো পাতা বার বার ঝুঁকে পড়ছে। চাঁদের আলো মেখে সবুজ পাতায় সাদার বাহার। পাতা দুটোর বার বার নুয়ে পড়ার ভঙ্গিটি ভারী সুন্দর। যেন দু'হাত জড়ো করে মাথা নিচু করছে। এ কি আবাহন, না বিসর্জন?

ফাঁকা রিক্সাটাকে দাঁড় করালো সুজাতাই।

ভিজে রাস্তা। সাবধানি রিক্সাওলার গতি বড়ো মন্থর। দু'জনেই চুপ। 'বাড়ি গিয়ে দেখবো সব হয়ে গেছে।' দীপুর কথার কি উত্তর দেবে সুজাতা? 'নবীনদের বাড়িতে আসতে চেয়েছিলাম —।' দীপুকে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেয় না সুজাতা। আলতো করে তার হাতটা ছুঁয়ে বলে, 'জানি'।

'দেশের বাড়ির বুড়ো গাছটাও হয়তো —।' সুজাতা ভাবে, বলুক দীপু। বলে একটু হালকা হোক্। তাতে বুকের ভার যদি কিছুটাও কমে।

'বাইরে থেকে কতদিন কতো আঘাত মেখে বাড়ি ফিরেছি আমি। এসে বসেছি গাছটার পাশে। মায়ের কাছে। আমার বুকের সব কষ্ট টেনে নিয়েছে গাছটা। আজ আর কোথাও কোনো শেকড়বাকড়ই রইলো না আমার।'

চাঁদের আলো বাড়ছে। 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে —।' টিভি নয়। রেডিও শুনছে কেউ। গ্রামে এখনও চলে। বৃষ্টি থেমে গেছে। তবু আরো আস্তে চলুক রিক্সা। পথ আরো দীর্ঘ হোক। কোথাও ফেরার কোনো তাড়া নেই দীপুর।

ক্যুরিয়র

অমিতেশ মাইতি

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অনি।

সন্ধে হয়ে আসছে। বিষণ্ণ ধূসর স্লেট রঙের একটা আলো পৃথিবীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে। নদীর ওপার থেকে ভেসে আসছে চটুল গান, মাইকে। এই হল একটা পরিস্থিতি। অন্য পরিস্থিতিটা হল দু-কামরার এই ফ্ল্যাট পাথরের মতো চেপে বসছে অনির বুকের ওপর। বারবার চোখের সামনে এসে পড়ছে বাবার মুখ। বাবা যখন মারা যান, আসলে খুন হন, তখন অনি নিতান্ত বালক। কিন্তু সেই রাত্রিটার কথা কোনওদিন ভুলতে পারবে না।

ডায়েরিটা হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে অনি।

দেওয়ালে একটা পোকা শুঁড় দিয়ে অনেকক্ষণ গর্ত করার চেষ্টা করছে। পোকাটা ঈষৎ সবুজ রঙের। গায়ে অল্প অল্প রোঁয়া। একটা দেওয়াল ফুটো করতে চাওয়ার পিছনে জীবনের কোন মোক্ষ আছে? পোকাটা কি ওখানে থাকবে? একসময় এই পরিবারের এই বাড়ির একজন হয়ে যাবে? আমাদের শোক সুখ দুঃখের অংশীদার হবে? এরকম অনেক অদ্ভুত প্রশ্ন পোকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে মনে হল তার। বুকের ভিতর কেমন হা-হা শূন্যতা। নিমেষে সব ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাওয়ার বিহ্বলতা। পায়ের তলায় পৃথিবীটাও কি একটু দুলছে? ছি ছি, এতদিন কেউ জানত না, এমন কি মা-ও নয়? নাকি মা কিছুই জানাতে চায়নি। পাছে সবাই ঘৃণা করে, বাবার বিপ্লবী ভাবমূর্তিটা গুঁড়িয়ে যায়। তা বলে একটা মিথ্যেকে এভাবে মেনে নিতে হবে? মা কতদিন বাবার কতো কথাই বলেছে। অনি সেসব গল্পকথার মতোই শুনে গেছে। আর বাবার মূর্তিটা অনির বুকের মধ্যে দিনদিন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আরও স্পষ্ট। নিজেকে দিবাকর ঘোষালের ছেলে বলে জানাতে গর্ব হয় অনির। কিন্তু এ কীসের গর্ব, এই গর্বের মানে কী, সারবত্তা কই? ডায়েরিটা অনিকে যন্ত্রণায় ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছে।

স্কুলে কতদিন এমন হয়েছে, বেচাল দেখলেই মাস্টারমশাইরা বলেছেন, কী বাপের কী ছেলে। বাবাকে সবাই যে-চোখে দেখতো তাতে একটা তীব্র ভাললাগা জড়িয়ে থাকত। অনি জানে, অন্তত জীবনের এতোগুলো বছর কাটিয়ে আজ অন্তত জেনে গেছে, কোনও কোনও মানুষের ইমেজ সেই মানুষটাকেও ছাপিয়ে যায়। বাবার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হয়তো বাপের ছেলে বলেই এখনও যেখানে কোনও অন্যায় দেখে অনি প্রতিবাদ করে। ঝামেলা হয়, মারামারি থেকে কখনও রক্তারক্তিতে গড়ায়। অনি যখন সেই চেহারা নিয়ে বাড়ি ফেরে জয়শ্রী মানে অনির মা-র বুক কেঁপে ওঠে। জয়শ্রী আর রক্ত দেখতে চান না। তিনি রক্ত দেখতে ভয় পান। বিশেষত অনির রক্ত, কারণ ঐ রক্ত তো আসলে দিবাকরেরই। মুহূর্তে সব ওলটপালট হয়ে যায় জয়শ্রীর। সময়-স্থান-কাল গুলিয়ে যায়। নিমেষে জয়শ্রী ফিরে যান আগস্ট মাসের সেই রাত্রিতে। আজ থেকে প্রায় ৩০ বছর আগের একটা রাত্রি। সেই রাত্রির

চোখ থেকে ঠিকরে বেরোয় আগুন। নিঃশ্বাস থেকে আগুনের হল্কা। জয়শ্রীর স্মৃতি মুছে যায় যেন। গলার ভেতরটা কাগজের মতো খসখসে।

মনে আছে, সকাল থেকে নানারকম লোক আসত বাড়িতে। পরে লোকজন কমে গিয়েছিল। একদিন সন্ধেবেলা অনি দেখেছিল খেলার মাঠ থেকে ফেরার পর — কয়েকজন পুলিস এসে বাইরে ছুড়ে ফেলছে বাড়ির জিনিসপত্র। বাবা তখন বাড়ি নেই। পুলিসের ইউনিফর্ম ও টুপি পরা একটা লোক, নিশ্চিত অফিসারই, হাতের লাঠিটা মায়ের দিকে উঁচিয়ে জিগেস করছে, সত্যি কথাটা বলে দিন। এতে বিপদ কমবে। আর মা বলছে, আমি যা জানি তা বলেছি। সত্যি-মিথ্যে জানি না। ততক্ষণে বাড়ির অধিকাংশ জিনিস লণ্ডভণ্ড। কিছু কিছু ছুড়ে ফেলা হয়েছে সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়েও। অনিকে দেখে অফিসার বলেছিল ঃ কে, ছেলে? মা 'হ্যাঁ' বলে অনিকে কোলের কাছে টেনে নিয়েছিল। অফিসার সেটা দেখে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল : বিপ্লবীর বাচ্চা!

ডায়েরিটা অনির সমগ্র সত্তা গ্রাস করে ফেলছে। ঐ ঘটনার মাস তিনেক পর বাবা খুন হয়ে যায়। রাত্রিবেলা বাড়িই ফিরছিল। সরকারি কেরানি দিবাকর ঘোষালকে কে বা কারা পিছন থেকে গুলি করে। তিনটে বুলেট ঢুকে যায়। একটা কাঁধে, দুটো পিছে। বাবা রাস্তায় ছিটকে পড়ে এই আচমকা আক্রমণে। প্রথমে মাটিতে পড়ে কাঁধের ব্যাগটা। তারপর শরীরটা। খবর পেয়ে মায়ের সঙ্গে দৌড়ে গিয়ে অনি দেখেছিল রক্তে মাখামাখি হয়ে শুয়ে আছে। এদিক-ওদিক জটলা। ভীত সন্ত্রস্ত সব মুখ। অনি দেখছিল মা সেই রক্তের মধ্যে শুয়ে পড়েছে যেন বাবার পাশে, বুকে গলায় হাতে মাথায় হাত দিয়ে দিয়ে যেন প্রাণের স্পন্দন খুঁজছে। আর গলা থেকে বেরিয়ে আসছে গোঙানির মতো কান্না। অনেক কান্না এতদিন শুনেছে অনি। কিন্তু সেদিন রাতে মায়ের কান্নার সেই বুক মোচড়ানো অভিজ্ঞতা আর হয়নি। অনিকে কারা যেন তখন সরিয়ে নিয়ে যায়।

ডায়েরিটা এখন কী করবে অনি? সরকারি চাকরি করলেও বাবার রাজনৈতিক জীবন ছিল একদম আলাদা। গোপনে সাবধানে ঘোরাফেরা, বাড়িতে লোকের আনাগোনা থেকে অনি বুঝত, একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। এই কাজের খবর সবার জন্য নয়। গোপনীয়তা রক্ষার চেষ্টাটা নজর এড়ায়নি অনির সেই বয়সেই। একদিন অনি বাবাকে জিগ্যেসও করেছিল, কী কাজ করো? বাবা বলেছিল, খুব কঠিন কাজ, পেরে উঠছি না রে! মা লোকজন এলে কয়েক কাপ চা করে বাড়িয়ে দিত। সবদিন নয়, কোনও কোনও দিন। অনি আজ বুঝতে পারে, বাবা ক্যুরিয়র ছিল পার্টির। এই ছোট্ট শহরটায় দু'একটা দোকান ছিল। বাবা সেখানে পার্টির খবর রেখে আসত বা কোনও নির্দেশ। খবর দেওয়া-নেওয়ার এই আস্তানাগুলোকে বলে পোস্টবক্স। সেখানে গিয়ে যারা খবর রেখে আসে, নিয়ে যায়, তারা ক্যুরিয়র। বাবা এই ক্যুরিয়রের কাজটা করত। পোস্টবক্সগুলো খুব নিরীহ চেহারার হয়। সাদামাটা। পুলিসের বা খোঁচড়ের ধারণাতেই আসত না যে, এখান থেকে খবর লেনদেন হয়। হয়তো কোনও সেলুন বা মুদিখানা। সেখানে খবর রাখা থাকত। যার সংগ্রহ করার কথা, সংগ্রহ করে নিত।

ডায়েরির পাতা উল্টে যায় অনি।

১৬ জুন: আমাকে ভুল বোঝা হচ্ছে। হোক। অমি যা বিশ্বাস করি তাই করব। বিশ্বাসের কথা মুখ ফুটে বলায় দ্বিধা করব না। এতে আমার শত্রু বাড়বে জানি। ওরা যেহেতু দলে ভারী আমাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে হয়তো মূলস্রোত থেকে। হয়তো অভিযোগের তির ছুঁড়বে। কিন্তু আমি নিরুপায়। সমাজ বদলের নামে, সাধারণ মানুষের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার নামে এই ব্যক্তিহত্যা, এই মানুষখুনের রাজনীতিতে আমার সমর্থন নেই।

১৮ জুন: সকালে শরীরটা ভালো ছিল না। তবু গেলাম অফিস। বারবার একটা পোকা ভেতরে-ভেতরে কুরে খাচ্ছে যেন আমাকে। কাউকে বলতে পারছি না। জয়শ্রীকেও বলিনি কিছু। কী হবে বলে?

১৯ জুন: মেদিনীপুরে আগামী সপ্তাহে একটা বড় অপারেশন আছে। যারা যাচ্ছে, তারা যে কারা জানি না তবে বুঝতে পারি হাত রাঙিয়ে ফিরে আসবে। বিমলদা কয়েকদিন প্রায় কথাই বলছেন না। বললেও ভাববাচ্যে বলছেন।

জুন মাসে আর লেখা নেই।

২ জুলাই: যতদিন যাচ্ছে একা হয়ে পড়ছি। এতদিন জানতাম প্রবীর আমার পাশে আছে। কাল বুঝলাম, নেই। যে মানুষটা কাছে থাকলে আমায় অন্তত ভুল বুঝতেন না, তিনি এখন উত্তরবঙ্গে। শমীকদা নিশ্চয়ই আমায় সমর্থন করতেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার কোনও রাস্তা নেই। রাস্তা থাকলেও, মন বলছে উচিত নয়। তাতে ওঁরই ক্ষতি হবে। উনিও বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শমীকদাকে কোনওভাবে বিপদে ফেলতে পারব না।

৩ জুলাই: অফিসে ফোন এলো, মধুময়ের। বলল, দিবাকর ঠিক করছিস না। পার্টি লাইনের পথ থেকে সরে যাস না। বেহালা, ঢাকুরিয়া, যাদবপুরের মিটিংয়ে তো এ নিয়ে কথা হয়েছে। সবাই যখন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য পথে ..... ফোনটা কেটে গেল। ভালোই হল। শুনতে ইচ্ছে করছিল না।

৪ জুলাই: রাত্রে অনির জ্বর এলো। জয়শ্রী বলল, স্কুলের স্পোর্টস পরশু। কী হবে? কপালে হাত দিয়ে দেখলাম, বেশ জ্বর। অঘোরে ঘুমোচ্ছে অনি কিন্তু শরীরে তাপ। মুখটায় কী মায়া আমার ছেলের!

৮ জুলাই: প্রশান্তদা ডেকে পাঠিয়েছিলেন। বললেন, একটা দায়িত্ব দিতে চাই। এরকম দায়িত্ব তুমি অনেক নিয়েছ কিন্তু এবার একটু অন্যরকম। গুরুত্বপূর্ণ। কোলাঘাট গিয়ে একটা মেসেজ ও একটা ব্যাগ পৌঁছে দিতে হবে। ওখানে দু'দিন থাকতে হতে পারে। মধুময়রা পৌঁছনোর পর তোমার ছুটি। তুমি ওখানে আমাদের এক কমরেডের বাড়ি উঠবে। কোনও কথা না বলে শুনলাম। তারপর কী ভেবে প্রশান্তদা বললেন, আচ্ছা ব্যাগটা ছেড়ে দাও। রিস্ক হয়ে যাবে। শুধু মেসেজটা কোলাঘাটের পোস্টবক্সে পৌঁছে দিও। ১৫ তারিখ রওনা হবে। ১৪ তারিখ রাতে তোমার কাছে মেসেজ পৌঁছে যাবে।

১২ জুলাই: কী করব ভেবে উঠতে পারছি না। মনের মধ্যে ঝড়। জয়শ্রী বোধহয় আঁচ করেছে কিছু। জিগ্যেস করল, কোনও ঝামেলা হয়েছে? কী বলব ওকে? শুধু 'না' বলে মাথা নাড়লাম। আমি তো জানি ওই মেসেজে কী থাকবে। তার মানে আবার মানুষ খুন, আবার রক্তপাত। আমি অ্যাকশানের কোথাও নেই কিন্তু তবু কিভাবে যেন থেকে যাচ্ছি। নিজেকে খুব অপরাধী লাগছে। আমি তো চাইনি এভাবে পরিবর্তন আসুক। অনেকেই চায় না। সবাইকে এক করা যাচ্ছে না। হয়তো একটু সময় লাগবে।

১৩ জুলাই: বাসে সারাক্ষণ একটা লোক আমাকে দেখে গেল। সন্দেহ করছে কি? পুলিসের লোক কি? ভাবতে-ভাবতেই আপিসের স্টপ এলো। আমি নেমে পড়লাম। বাসটা স্টপ ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ লোকটাও লাফ দিয়ে নেমে পড়ল দেখলাম। কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছি, ভালো নয় গন্ধটা।

১৫ জুলাই: কাল রাতে মেসেজ এসেছে। কিন্তু আমি গেলাম না কোলাঘাট। বাড়িতেই 'বসে থাকব। জানিয়েও দিয়েছি। বলেছি, শরীর খারাপ। যেতে পারব না।

১৮ জুলাই: শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মধুময়রা কোলাঘাট পৌঁছে পুলিশের চোখে পড়ে। আমার বদলে যে মেসেজ নিয়ে গিয়েছিল, সে খুঁজে পায়নি লোকাল কমরেডের

বাড়ি। ফলে মধুময়দের সঙ্গে একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ পড়ে যায়। ছোটো জায়গায় নতুন মুখ সহজে বোঝা যায়। অন্তত পুলিসের চোখ বুঝেছে। পুলিস নজর রাখছে বুঝতে পেরে চ্যালেঞ্জ করার আগেই গা-ঢাকা দেয়। ফলে মেদিনীপুরের অপারেশনটা হয়নি। শুনে একটু ভালোও লাগছিল।

২০ জুলাই: প্রশান্তদা বললেন, বিশ্বাসঘাতক। মধুময় বলল : বেইমানি করেছ। তুমি না-যাওয়ার জন্যই এই অপারেশনটা হল না। ওখানে আমাদের সংগঠনটা সবে জোরদার হচ্ছে। এই সময় অপারেশনটা হলে...... কিন্তু হল না তোমার জন্য। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছ। মধুময় বলল, এর শাস্তি তুই পাবি। আমরা জানি, তুই ইচ্ছে করে যাসনি। কত বড়ো ক্ষতি করে দিলি। বললাম, আমি ঐ লাইনটাই সাপোর্ট করি না। মধুময় বলল, তুই করার কে? পার্টি যা বলবে তাই করতে হবে। .....তুই তো দলের কাছে ক্রমশ বিপজ্জনক হয়ে উঠছিস। আমি দলের কাছে বিপজ্জনক? হবেও বা!

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অনি।

এর কয়েক সপ্তাহ পর বাবা খুন হয়ে যায়। বাবা নাকি মাকে একদিন বলেছিল, পার্টিতে আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছে সবাই। আমি একজন বিপ্লবী হতে চাই। বিপ্লবীরা কখনও বিশ্বাসঘাতক হয় না। জয়শ্রী তুমি তো এটা মানো? কিন্তু বাবার এই ডায়েরিটা মা কি দেখেনি? জানত নাকি এর অস্তিত্ব? সবাই জানে দিবাকর, মানে তার বাবা মারা গেছে দুষ্কৃতীদের গুলিতে। এলাকা দখলের লড়াইয়ের মাঝে পড়ে যায় মানুষটা। গুলি খেয়ে মরে। কেউ এই মৃত্যুকে বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু হিসেবে দেখেনি। কারণ কেউই দিবাকরের রাজনৈতিক ভূমিকার কথা জানত না। সবাই জেনেছে, দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছে সাধাসিধে মানুষটা। অথচ নিজের দলের লোকরাই 'বিপজ্জনক' লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছে। এখন অনি কী করবে? বাবাকে আরও বেশি ভালোবাসবে? বাবাকে বলবে, তুমি ঠিক করেছ। বিবেকের পাশেই দাঁড়ানো সঠিক কাজ হয়েছে তোমার!

ডায়েরিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অনি। কালো রেকসিনে মোড়া ডায়েরিটা আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যাচ্ছিল। অনির হাতের একখণ্ড পাথর। দেওয়ালে পোকাটা গর্ত করার চেষ্টা করছে এখনও। সেই দিক লক্ষ করে ডায়েরিটা ছুঁড়ে মারে অসহায় ক্রোধে।

কন্যা

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রেমের বিয়ে। তাছাড়া বলতে গেলে একই পাড়ায় বাড়ি। শুভ্রাদের গলির মুখ থেকে রিক্সায় উঠলে হরিনাথ চাটার্জি লেন দশ মিনিটের বেশি নয়। থার্ড ইয়ারে পড়ার সময় থেকে এ-বাড়িতে প্রায় সকলেই জানত নীলাদ্রির সঙ্গে ব্যাপারটা শুধু মাত্র আলাপ-পরিচয় বা বন্ধুত্ব নয়, সম্পর্কের গভীরে একটা বীজ আছে, সেটা ভবিষ্যতে ডালপালা মেলে একটা গাছ হয়ে উঠতে পারে। তাই বোধ হয় পাকাকথাটা খুব সাধারণ ভাবেই সারা হয়ে গেছে দুই বাড়ির মধ্যে।

নীলাদ্রির সঙ্গে এই সাত বছরের আলাপে শুভ্রা যা দেখেছে তাতে ওর ব্যক্তিত্ব নেই একথা বললে ভুল হবে, ভুল কেন রীতিমতো অন্যায়। ওর দিদিরা যখন প্রথম ব্যাপারটা জানতে পারে একটা প্রচ্ছন্ন আপত্তি তুলেছিল। তবে সরাসরি কিছু বলেনি। ছোড়দি লতিকা বেথুনে কেমিস্ট্রির অধ্যাপিকা ছিলেন কিছুদিন। এখন ব্যারাকপুরে এক বড়ো অ্যাসিড তৈরির কোম্পানিতে কোয়ালিটি কনট্রোলে আছেন। বিয়ে হয়েছে এইচসিসি-র এক উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গে। মধ্যমগ্রামে বাগান ছোট পুকুর নিয়ে ছড়ানোছিটানো দোতলা বাড়ি। জামাই-ষষ্ঠীতে এ-বাড়িতে এসে ঘটনাটা জানতে পেরে নীলাদ্রিকে বলেছিলেন, বিয়ের পর ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারবি তো, আমি বলছি আমাদের বাড়ির যা ব্যাকগ্রাউন্ড ....

কথাটা যখন নীলাদ্রির কাছ থেকে প্রথম জানতে পারে শুভ্রা বেশ ধাক্কা খেয়েছিল। কিন্তু রাগ ও ভাবনার মধ্যে থেকে পরিশ্রুত হয়ে বেরিয়ে আসার পর বুঝেছিল কাথাটা ভুল কিছু নয়। নীলাদ্রির বড়ো জামাইবাবু বম্বের এক নাম-করা ইংরেজি দৈনিকের চিফ্ নিউজ এডিটর। বড়দি অ্যানথ্রোপলজিতে গবেষণা শেষ করে হিউম্যান রিসর্স ডেভেলাপমেন্ট মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা কমিটিতে আছেন। নীলাদ্রি যাদবপুর থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ করে ওএনজিসিতে ট্রেনিঙ পিরিয়ডে আছে। এখন স্টাইপেণ্ড পায় বাইশশোর মত। নিয়োগের সময় সাড়ে চার দিয়ে শুরু করবে।

সেখানে শুভ্রা মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজ থেকে হিস্ট্রিতে বি.এ.। অর্থে এবং সামাজিক সম্মানে এ-বাড়ি কোনদিন ও-বাড়ির বাইরের বারান্দাতে উঠতে পারবে না। কিন্তু মানুষের মন, অনুভবের অণু যখন সম্পর্ক গড়তে যায় তখন তো ভাবনা-চিন্তায় কেমিস্ট্রির অধ্যাপনা বা অ্যানথ্রোপলজিতে গবেষণা এসব কিছুই স্থান করে নিতে পারে না। যারা হয়ত সম্পর্কের মধ্যে যুক্ত নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাকে পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে দেখে বলে বসে — আবেগ। কিন্তু যারা যুক্ত, তারা তো উপলব্ধি করে, হাওয়া-বাতাস-রোদ-বৃষ্টির মত ঘটনাগত সত্য হচ্ছে মানুষটির কথা বলা, তাকান, হেঁটে যাওয়া কোন বিষয় সম্পর্কে মত পোষণের বিশেষ ধারাই সবকিছুকে সরিয়ে রেখে তার সম্পর্কে সম্বন্ধ নির্মাণে আগ্রহী করে তোলে।

মার্চ মাসের এক ঘটনাবিহীন দুপুরে ন্যাশানাল লাইব্রেরির গা ধরে চলে যাওয়া নির্জন রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে নীলাদ্রির কাছ থেকে ওর ছোড়দির কথাগুলো যখন প্রথম

শুনেছিল শুভ্রা ধুলোর আবরণময় কাচের জানালার শার্সির মতো হয়ে উঠেছিল তার চোখ। পৃথিবী বড়ো ক্ষীণ। এতদিনের নির্মাণ স্বল্প অস্পষ্ট।

নীলাদ্রি দু হাতের ফোঁকরে সিগারেট এনে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়েছিল হাওয়ার তোড়ে উড়ে যাওয়া প্রজাপতির মতো, দীঘল বুক কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে বলেছিল, আমি কি বলেছি জানো, ধর প্রফেসার ইউ আর রাও বা রবিশঙ্করের বাড়ির কারুর সঙ্গে এই ধরনের একটা ব্যাপার তোর ঘটেছে, তারা কি বলবে......

শুভ্রা তখনও অস্পষ্টতা সরাতে পারেনি। নীলাদ্রি সেই থমকে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, কি হল জানো, কেষ্টনগরের পু'তুল ....., আমি পরিষ্কার বলে দিয়েছি, জীবনটা আমার, সেটায় যদি কিছু ভুল হয় তাহলে সেই ভুলটা যেন আমারই হয়...........

তারপর হাসতে হাসতে রাস্তার মধ্যেই নীলাদ্রি তার বলিষ্ঠ হাতটা শুভ্রার কাঁধের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল মানিপ্ল্যান্টের লতার মতো।

কিন্তু এতকিছুর পরেও নীলাদ্রির শরীরে আর পাঁচজন মানুষের মতো হিমোগ্লোবিন আছে। সে চুল আঁচড়ায়, ভাত খায়। রাগের কারণে রাগ করে। দুঃখে ব্যথা পায় প্রাকৃতিক পথ ধরে। বিয়ের কথাটা অফিসিয়ালি বলার জন্য নীলাদ্রির বাবা যেদিন তাদেব বাড়িতে আসবে শুভ্রা জানতে পেরেছিল, হৃদয়গত কাপট্য থেকে নীলাদ্রির বাহুতে চিমটি কেটে বলেছিল, পাওনাগণ্ডার লিস্টটা একটু ছোটো কবতে বোলো.....

আর হঠাৎ লক্ষ করেছিল তার সরল কৌতুক নীলাদ্রির মুখ থেকে সহজাত স্মার্টনেস তথা ঔজ্জ্বল্য নীরবে মুছে দিয়েছে, হঠাৎ করে কলকাতার আকাশে একটা নিম্নচাপেব বাতাবরণ নেমে এসেছিল।

নীলাদ্রি অপসারিত ঠোঁটে সবচেয়ে আড়ষ্ট হাসিতে বলেছিল, তুমি কি মনে করবে জানিনা, আসলে বাবার কোন কথার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে পারি না. . .

খুব স্বাভাবিক অভিব্যক্তিতে ভবা মুখেব গভীরে অদৃশ্য কম্পন উঠেছিল শুভ্রার। একি সেই একটু আগের নীলাদ্রি। যে ছোড়দিব আপত্তিকে উড়িয়ে দিয়েছিল মৃত বৃক্ষপত্রেব অবহেলায়! বাবার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেনা . . . পুরুষ হিসেবে পুরুষের স্বীকৃতি! সে তো পাওনাগণ্ডা কথাটা বলেছিল নিছক মজার অছিলায়. এসব হিসেবনিকেশ তো তাকে কোন দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারবেনা। সামান্য বাধা যদি থাকে তবে বাবা। মূল্যবোধের মানুষ। পণ দেওয়া-নেওয়া নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মতামত দিয়েছেন। সভা-সমাবেশ করেছেন। অনামি কাগজে কিছু লেখালেখিও। অর্থকরী জায়গা থেকে এসব কিছুই তাদের বাড়ির দিক থেকে কোন সমস্যা নয়। বাবা আজীবন রাজনীতি করায় চাকরিবাকরির সুযোগ পাননি। বরাবরই ব্যবসা। পাড়ায় একটা ঔষধের দোকান করেছিলেন। সেটাই দিনেদিনে ফেঁপেছে। এখন ওরই সঙ্গে চারপাঁচটা নামি কোম্পানিব ডিস্ট্রিবিউটারশিপ জুড়েছে। সুতরাং তার ভয়ের জায়গাটা কোথায়। কোথাও নয়, অথচ তার এক নির্দোষ ছলনা তার অতি পরিচিত নীলাদ্রিকে আরেকবার চিনিয়ে দিয়ে গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন রঙে।

নীলাদ্রির এই মুখের ছবি কি কখনও খুব অচেতনে শুভ্রা দেখেছিল। হয়ত না। হয়ত নীলাদ্রির অস্তিত্বের এই বিশেষ রূপ নয় ওর ছোড়দির কথাগুলোই ভিতরে ভিতরে একটা জেদকে ক্রমশ সংকল্পের মতো বড়ো করেছে ধীরে ধীরে। জিপিও থেকে পোস্টালঅর্ডার কিনে ফর্ম পুরণ করে একের পর এক চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে চলেছে গত এক দেড় বছর ধরে। শুভ্রার পরিচিত মানুষজনেরা আড়ালে বিস্ময় প্রকাশ করে তার এই কাজে শুভ্রা জানে। নীলাদ্রির মতো ছেলের সংসার করতে যাবে যে মেয়ে তার চাকরির প্রয়োজনটা কোথায়। আছে, আছে, এক বিশাল প্রয়োজন আছে, উত্তরটা শুভ্রাকে দিতে হয়নি

কাউকে। দিয়েছে শুধু নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে, নিজের বেঁচে থাকার কাছে তার এই উত্তর, এসব পরীক্ষায় সফল হওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তিন লক্ষ সাড়ে তিন লক্ষের মতো ছেলেমেয়ে এক একটি পরীক্ষায় বসে। সফল হলে তবে ইন্টারভিউয়ের যুদ্ধ। অন্তিম লড়াই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হয় সাতশো আটশো ছেলেমেয়ে। তবে যদি ব্যাপারটা ঘটিয়ে ফেলতে পারে, নীলাদ্রির বাড়ির ঐ উজ্জ্বল পরিবেশে সমুদ্রে ভাসমান একখণ্ড ভূখণ্ডের মতো এই পৃথিবীতে একটু নিজস্ব জায়গা খুঁজে পাবে শুভ্রা, একটা ক্ষীণ উত্তর হয়ত তার থাকবে নীলাদ্রির ছোড়দির প্রতি।

নীলাদ্রির বাবা এ-বাড়িতে বিয়ের পাকা কথা সেরে চলে যাবার পরে শুভ্রার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়েছিল। ব্যাপারটা এতো সহজে মিটে যাবে ভাবতে পারেনি।? এখন মাঝেমাঝেই মনে হচ্ছে এত সহজে না মিটলেই বোধ হয় ভালো ছিল। একটু উত্তেজনা, সামান্য উৎকণ্ঠা না থাকলে জীবনটা যেন এক পরিপূর্ণ পদের মতো যা লবণহীন। বাইরের বাগানে পাতাবাহারের ওপর রোদ এসে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে বাইরের ঐ রোদের দিকে তাকিয়ে শুভ্রার মনে হল এমন সোনারঙের রোদ কি জুন মাসের সকালে আগে কখনও দেখেছে? হয়ত এই কাল আগেও এসেছে। আসেনি তার অবলোকনের ঋতু। বাইরের প্যাসেজে ফোনটা বোধ হয় অনেকক্ষণ ধরে বাজছে। খেয়াল হল হঠাৎ করে। আর হতেই শুভ্রার মনে হল ওটাও এক ছন্দে বাজে। শাড়ি গুছিয়ে নেমে এসেছিল বিছানা থেকে। ত্রস্ত পা হঠাৎই থেমে গেল। যদি নীলাদ্রির বাড়ি থেকে কেউ ফোন করে থাকে। কাছাকাছি শ্বশুরবাড়ি হওয়ার এই এক ঝামেলা। একবারে সমস্ত কাজের কথা কখনও সারা হয় না। এর আগেও দুদিন ওদের বাড়ি থেকে ফোন এসেছে। শুভ্রার ব্লাউজের মাপ, হাতের চুড়ির মাপ জানতে চেয়ে। বিছানায় ফিরে আসতে সেজোমামার গলা পেল শুভ্রা। ফোন ধরেছে।

বাইরে রোদের রঙ আরও নিবিড় করে দেখছিল শুভ্রা। আর তখনই বাইরেব প্যাসেজে বাবার ভাঙাভাঙা স্বর যেন এক অলৌকিক যাদুতে মুছে দিয়ে গেল পৃথিবীর যাবতীয় সোনালি বর্ণ।

আমি আগেই কইসিলাম .... শালা এক নম্বরের সুড ....

শুভ্রা বিছানা থেকে নামতে গিয়ে আলুথালু শাড়ি জড়িয়ে ফেলেছিল পায়ে। সামলে নিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে আসতে দেখল বাবার হাত থেকে খবরের কাগজ পড়ে গেছে মাটিতে। সেজোমামা এদিকে পিছন করে স্ট্যাচু। বিয়ে উপলক্ষে বাড়িতে এখন ছোটোখাটো ভিড়। প্যাসেজের ওপাশে বড়োঘরের খোলা দরজা দিয়ে আরও কয়েকটি কৌতূহলী চোখ....' সেজো মাইমা, বড়ো মাইমার মেয়ে, মা, দাদা প্যাসেজে ঢুকে মেঝের ওপর থেকে কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সেজোমামার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কার ফোন?

শুভ্রার শ্বশুরবাড়ি থেকে —

শ্বশুরবাড়ি কইবা না! কও কসাই-র বাড়ি, ঐ খানডায়, ঐ সোফায় বইস্যা গেল শনিবার নিলুর বাপে কইয়া গেল পাওনাগণ্ডার কথা কইবান না, আপনা গো যা ইচ্ছা আমাগো তাই, তিনডা দিন যাইতে না যাইতে মত পালডাইয়া গেল গিয়া, কোলেজের প্রোফেসার! ওমন বিদ্যার মুখে মুইত্তা দি, তহনই কইসিলাম হালায় এক নম্বরের সুড, ছেলের দিকে রক্তচক্ষু ফিরিয়ে নীরদ বলেন, কি কইনাই শোভন?

শোভন মেঝের ওপর থেকে কাগজ তুলে নেয়, অত উত্তেজিত হওয়ার কি আছে, ব্যাপারটা কি শুনি.....

শোভনের ওপর থেকে কুঞ্চিত ভ্রূ সরিয়ে নিতে নিতে নীরদ বলেন, আমারে জিগায়োও না, তোমার মামারে জিগাও, ওই অপমানের কথা আমারে দিয়া উচ্চারণ করাইও না.....

শোভনের কৌতূহলে চোখ সরে আসে মেজোমামার নির্লিপ্ত চোখে, নীলাদ্রির বড়ো জামাইবাবু ফোন করেছিলেন, বললেন বিয়ের ফার্নিচার যা পাঠাবেন সব নতুন বাড়িতে, এ-বাড়ি তো বিয়ের পরপরই ওরা ছেড়ে দিচ্ছে, আবার সবকিছু ওঠানো নামানো —

নীরদ যেন এতোক্ষণ দম সংগ্রহ করছিলেন, বুজলা কি, ইনডাইরেক্ট ফ্রিকিক, নিজের মুখে পাওনাগণ্ডার কতা কইলাম না এ্যাহন বাড়ি পাল্টানর কতা পাইরা ফার্নিচারের বিষয় স্যাঙ্গুইন হওনের চেষ্টা.........

শুভ্রা দেখল মা বোধ হয় রান্নাঘরে কাজ করতে করতে উঠে এসেছে। সরমার হাতে অর্ধেক খোশা ছাড়ানো একটা পেঁপে। কপালের ওপর ঢল তুলে নেমে আসা এলোমেলো চুল ঠিক করে নিতে নিতে বললেন, তা এতে এত রাগ করার কি আছে! ওনারা যদি কিছু না চান নাই চাইলেন তা বলে তোমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে কেন! মেয়ে আমাদের পাঁচটা নয়, একটা মেয়ে -- তার বিয়েতে আর পাঁচজন যেমন দেয় খাট-বিছানা ড্রেসিংটেবিল পারলে একটা ফ্রিজ, আলমারি তো দেওয়া উচিত, ওরা যাই বলুক......

শুভ্রা তার ঘরের পর্দার আড়াল থেকে দেখছিল বাবার গলার শির উঠছে নামছে ঝড়বাদলে তছনছ হয়ে যাওয়া গাছের পাতার মতো। নীলাদ্রিদের এই চাওয়ায় আর কার কোথায় কীসে বিঁধেছে সে জানে না। বয়সি জীবনে সবকিছুর শেষে পড়ে থাকে শুধু বিশ্বাস। এই বৃদ্ধ বয়সে বাবা তো শুধু হাওয়া-বাতাস, জল, এই পৃথিবীর আলো নিয়ে নয় — বেঁচে আছে সবকিছুর ভিতরে সযত্নে লালন করা নিজস্ব কিছু বিশ্বাস নিয়ে। পণের বিরুদ্ধে কাগজে কত লেখালেখি করেছেন। আত্মীয়স্বজনদের বুঝিয়েছেন। শেষবেলায় নিজের ক্ষেত্রেই ঘটনাটি তাকে ঘটাতে হবে! মা বুঝবে না ঐ বুড়ো মানুষটার কোথায় গিয়ে লেগেছে আঘাতটা। এক অবরুদ্ধ যন্ত্রণার পাকেপাকে জড়িয়ে যাচ্ছিল শুভ্রা। শুনতে পেল দাদার গলা। মাটি থেকে তুলে নেওয়া এলোমেলো খবরের কাগজটা গুছিয়ে নিতে নিতে মার দিকে খুব শীতল চোখে বলল, দেওয়াটা কোন বড়ো ব্যাপার নয়, এ প্রেমের বিয়ে, এখানে অত হিসেবনিকেশ লৌকিকতার কথা আসে কোথা থেকে...........

শুভ্রার শরীরে অনুভবে নীলাদ্রি ...... নীলাদ্রির বাবা .... ওদের আস্ত পারিবারিক অস্তিত্বের প্রতি একটা অবসন্নতা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল। আর সেই ব্যথায় মিলল এক নতুন ব্যথার স্রোত। প্রেম শব্দটার এমন কুৎসিত ব্যবহার কি এর আগে কখনও সে শুনেছে! এই যে গত সাত-আট বছর ধরে এ-বাড়ির সকলের চোখের সামনে সে নীলাদ্রির ভিতর একটু একটু করে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, অথচ একটি বারের জন্যেও কেউ কিছু বললনা, সামনে না শুনলেও আড়াল থেকে মায়ের আশঙ্কার কথা কয়েকবার তার কানে এসেছে, সরমা কাঁদোকাঁদো স্বরে শোভনকে বলতেন, শোভু তোর তো অনেক বন্ধুবান্ধব, একটু খোঁজখবর করে দেখতে পারিসনা মেয়েটা যে ছেলেটার সঙ্গে মেশে সে কীরকম ..... পরে আপদবিপদ যদি কিছু একটা....। শুভ্রা লক্ষ করে দেখেছে দাদাকে এসব কথা কখনই বিচলিত করতে পারেনি। দাদা হ্যাঁ অথবা না কিছুই বলেনি। শুধু চুপ করে থেকেছে। তবে সে কি নীরবতা নয়? শুধুমাত্র অপেক্ষা, আজকের এই মুহূর্তটির অপেক্ষা। যখন দাদা এক নিপুণ অঙ্ক ছুড়ে দিতে পারবে.... এ তো প্রেমের বিয়ে এখানে এত হিসেবনিকেশ আসে কোথা থেকে!

শুভ্রার শরীরের অন্তর্গত স্রোতে একটা দিক্‌ভুল পতঙ্গ বারবার আঁচড় কাটতে থাকে, একটা প্রশ্নের উত্তর কিছুতেই খুঁজে পায়না সে যারা ফোনটা করেছে আর যারা ফোনটা ধরেছে তাদের মধ্যে কি সত্যি কোন পার্থক্য আছে!

নীলাদ্রি .... নীলাদ্রির বাবা ...... শোভন প্রত্যেকে আসছিল। আবার সরেও যাচ্ছিল। সরে গিয়ে বারবার বাবার মুখের ভাঙাচোরা রেখাগুলো যেন জীবনের মানচিত্র হয়ে থাকল শুভ্রার সমস্ত ভাবনায়। এ-ঘটনায় সবচেয়ে গভীরে আঘাত পেয়েছে যে মানুষটি তিনি বাবা। ঐ মানুষটার বিশ্বাসের ভিত্তিপ্রস্তর থেকে কয়েকটা ইট ওরা সরিয়ে দিয়েছে। এখন তো নীরবতারই সময়।

এ বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে কাছের মানুষ যে শুভ্রার কাছে তিনি নীরদ। খুব ছোটোবেলা থেকে নানান আদর-আবদারে তাকে বাবা সমর্থন করে এসেছে সেই কারণে নয়। সবকিছুর পিছনে এক ঋজু বৃক্ষের মতো বাবাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। নীলাদ্রির বাড়ির ব্যাকগ্রাউন্ড যখন তাদের সম্পর্কের মাঝে একটা শুকিয়ে যাওয়া নদীর চরের মতো প্রাণহীন এক প্রান্তর ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল, নীরদ সব শুনে বলেছিলেন, শুভ্রা একটা সম্পর্ক আসলে কি জানস্? সম্পর্ক হইল গিয়া একটা সেতু তার সবকটা খুঁটি সমান না হইলে বাঁধন থাকে না ....

জীবনের সমস্ত স্তব্ধতা নিয়ে সে বসে পড়েছিল বাবার সামনে। তার যা যোগ্যতা তাতে নীলাদ্রিদের বাড়ির তুল্য হতে গেলে জীবনটাকে যে আবার এক থেকে শুরু করতে হবে। ভাবনার সমস্ত পথ গিয়ে শেষ হয়েছিল নিঃসীম শূন্যতায়। নীরদ এক মমতাময় হাত শুভ্রার নরম চুলের ওপর রেখে বলেছিলেন, তুই বি.এ. পাশ করছস্, কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দে, পাশ কইরলে তর মুক কি কম বড়ো হইব।

যে হাজার ভাবনার পথ শূন্যতায় গিয়ে শেষ হয়েছিল সেখানে কোন এক অলীক-মানুষ এসে ভোরবেলার আলো ঢেলে দিয়ে গেল। অথচ জীবনের এমন এক কঠিন মুহূর্তে সেই মানুষটার জন্য তার কিছুই করার নেই। নীলাদ্রির বাবা যদি সমস্ত গল্পটা জানতেন বলতে পারতেন পাওনাগণ্ডার কথাটা। কাঠ আর ইস্পাত, রক্ত আর অনুভব, সম্পর্ক বনাম ফার্নিচারের এই অঙ্কটা করতে পারতেন মানুষটি? সোনালি রোদ আর পাতাবাহারের পত্রলোভার মধ্যে যে দিনটা শুরু হয়েছিল অঙ্ক আর দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব আর যন্ত্রণায় মুড়ে যেতে যেতে সেই দিনের বিকেলটা যখন চলে এল শুভ্রা বুঝতে পারল না। দু চোখের কিনারায় শুকিয়ে যাওয়া জলরেখার ভিতর হারিয়ে যেতে সে ভুলে গেল আজ তার শুধু অবলোকনের ঋতু ছিল।

দুই

ভালো করে দেখেশুনে নে.......... বিয়ের পরে আবার বলিস না দাদা দেখেশুনে সস্তার জিনিস গছিয়ে দিয়েছে......

আলোও যে একটা বিড়ম্বনার বস্তু শুভ্রার জানা ছিল না। সারি সারি ড্রেসিঙ টেবিল .... সোফা......... খাট........ আলমারির শরীরে রকমারি ল্যাম্পের আলো পড়ে চারপাশটাকে যেন ঝলসে দিচ্ছে। ফার্নিচারের দোকানের ভদ্রলোকটির সঙ্গে দাদা আর সেজোমামা এতক্ষণ কি যেন গুজগুজ করছিল। হঠাৎ করে কথা থামিয়ে দোকানের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা শুভ্রাকে কথাগুলো বলে। ঝলসানো আলো যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গের মত প্রবেশ করে শুভ্রার কানে। দাদার কথাগুলোয় নীরব কোন ঝাঁজ লুকিয়ে আছে! ঐ যে বলল দেখেশুনে নে, দাদা যেন তার আজন্ম পরিচিত মানুষটি আর নেই, দাদা যেন এই ফার্নিচারের দোকানের কর্মচারী........দায়িত্ব ঘাড় থেকে নামিয়ে রাখতে চায় .... তার বিয়ের যৌতুক-সামগ্রী সে যেন নিজেই ভালোমন্দ বুঝে নেয়.........

শুভ্রা কোন উত্তর দিল না। দাদার পছন্দ-করা ড্রেসিঙ টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। চারপাশের ড্রেসিঙ টেবিলগুলোর ওপর চোখ পড়ে। দাদার পছন্দটা কিরকম যেন শীর্ণ। এক

আয়নায় সরু লম্বাটে ড্রেসিঙ টেবিলটার পাশে তিন আয়নায় ডিম্বাকৃতি ড্রেসিঙ টেবিলটা বার বার ওর চোখ কেড়ে নিচ্ছে। কি বলবে শুভ্রা বুঝতে পারে না। অস্বস্তি হয় .... ঠিক সম্পূর্ণ অপরিচিতি মানুষকে যেমন নিজের পছন্দের কথা খোলা মাঠের মতো করে বলা যায় না কখনও........ ঠিক তেমন অস্বস্তি ভেসে ওঠে শুভ্রার কণ্ঠনালিতে।

দোকানের মালিক পাকা ব্যবসায়ী। শুভ্রার চোখের ভাষা পড়ে ফেলতে মুহূর্তও যেন খরচ হয় না, শোভনের দিকে চোখ রেখে বলে, দিদিভাইয়ের এ ড্রেসিঙ টেবিল পছন্দ হয়নি, তিনপাল্লারই নিয়ে যান......

সেজোমামা শুভ্রার পছন্দের ড্রেসিঙ টেবিলের কাঠের ওপর আঙুল দিয়ে টোকা মারে, কি দাম......

সাড়ে চাব, দোকানদার ভদ্রলোকের ঠোঁটে অমলিন হাসি।

শুভ্রা দেখে দাদার কপালের রেখা ধনুক হয়, সাড়ে আটশো বেশি .....

আড়াইশো লেস করতে পারি, তবে লাস্ট দামে ......

আবর্জনার প্রতি মানুষের যে অভিব্যক্তি, তাই যেন ভেসে ওঠে শোভনের চোখে। শুভ্রার অন্তঃস্থলে বিস্ময় ঘাম ঝরায়। যেখানে তার পছন্দের প্রতি দাদার এই আচরণ সেখানে তাকে পছন্দ করতে ডাকার মানে, শুভ্রার কিছু বলা হয় না, কারণ দাদা আর সেজোমামা ড্রেসিঙ টেবিলের সারি থেকে খাটের ভিড়ে চলে গেছে . .. দোকানের অন্যপ্রান্তে।

এবার সেজোমামা ডাকে শুভু, খাট দেখে যা, তোর বর কেমন খাটে ধরবে তুই না হলে তো আমবা বুঝতে পারব না ..

শুভ্রাব পায়ের পাতায় পাথর নেমে আসে যেন। তবু না এগিয়ে পারে না। তাব সামনেটা ফাঁকা শুভ্রা জানে। নীলাদ্রিকে বিয়ে করে সে কোথায় যাচ্ছে সে তো রক্তের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে অনুভব করে ফেলেছে। কিন্তু এখন যেখানে আছে, যাদের সঙ্গে আছে... সেই জায়গাটাকেও যে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না শুভ্রা। অসহনীয় এক দ্বন্দ্ব তাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপত্তাহীনতার দিকে।

শুভ্রা ওদেব পাশে এসে দেখল সাবেকি আমলের কারুকার্যবিহীন ঢালা খাট পছন্দ করেছে এবা। সে কি জানাবে..... হ্যাঁ, তার পছন্দ হয়েছে....... নাকি বলবে এই তোমাদের পছন্দ। শুভ্রার ভালোলাগে উচ্চতর ছোটো ইংলিশ প্যাটার্ন খাট। মাথার দিকে কারুকার্য থাকবে। কারুকার্যের প্রান্তে দুদিকেই থাকবে আলোর ব্যবস্থা। বিছানায় শুয়ে গল্পের বই পড়তে খুব ভালো লাগে তার। তারপর পড়তে পড়তে যেই ঘুম চলে আসবে আলো নেবানোর জন্যে খাট থেকে নামতে হবে না, বিছানার পাশে ঝোলান পুশ বটন টিপলেই নিবে যাবে খাটের সঙ্গে যুক্ত আলো।

দোকানদার এবারেও যেন পড়ে ফেলেন শুভ্রার দৃষ্টি, পানের ছোপে রক্তাক্ত দাঁত বেরিয়ে আসে, কপালের ওপর ভেঙে যাওয়া চুলের টেরি ঠিক করতে করতে বলেন, এসব পুরনো ডিজাইন আমাদের পছন্দ হবে, দিদিভাইয়ের কি পছন্দ হয়। দিদিভাইয়ের চাই ইংলিশ প্যাটার্ন আলো লাগানো বক্স ফিট করা খাট, কি —

শুভ্রা তার পৃথিবীর সমস্ত শব্দ হারিয়ে ফেলেছে, মুহূর্তক্ষণ আগে নিজের পছন্দের ড্রেসিঙ টেবিলের কথা বলায় কি ঘটে গেছে সে জানে, তাই এ-মুহূর্তে কোনকিছুই বলতে পারছিল না শুভ্রা।

শোভন বলল ইংলিশ প্যাটার্নের কি দাম—

সাড়ে নয়, নয়, আট হাজার, বিভিন্ন দামের আছে, আলো লাগালে এক্সট্রা, যদি বলেন সাউন্ড বক্স ফিট করে দিতে, হবে, সাড়ে চোদ্দ মতো পড়বে —

শোভন বলল, আলো, বক্স ছাড়াই তো প্রায় আড়াই হাজার টাকার ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে—

তা তো হবেই, কি দিদিভাই টাকাটা বড়ো, না পছন্দটা ......

অকৃত্রিম হাসি দেখতে পায় শুভ্রা। ভদ্রলোক কি জানেন না এইমুহূর্তে প্রশ্ন মানে একটা থাপ্পড়।

ওরা খাটের পাশ থেকে সরে এসে এখন গদির সামনে। দাদা ছোবড়ার গদি পছন্দ করে। সেজোমামা পাশ থেকে মনে করিয়ে দেয় আসল লোককে একবার জিজ্ঞেস করে নাও, শেষে ....

শুভ্রার দুই কানের ভিতর দুটো বিষাক্ত পোকা যেন কথাগুলোর সঙ্গে ঢুকে পড়ে, যারা এতসব জিনিস চাইল তাদের সামনে গিয়ে এরা কিছুই বলল না। আর তাকে দোকানে নিয়ে এসে ধারাবাহিকভাবে অপমান করে চলেছে! অনেক কষ্টে দেওয়ালের গায় ঠেস দিয়ে রাখা গদির সারির সামনে এসে দাঁড়ায় শুভ্রা।

শোভন আঙুল দেখিয়ে বলে কি পছন্দ —

হলুদ জমির ওপর পদ্মফুলের ডিজাইন। নতুন অবস্থাতেই দুচার জায়গায় ছোবড়া উঁচু হয়ে আছে। এরকম গদিতে দাদা নিজে শুতে পারতো। জিজ্ঞেস করা হয় না।

দোকানদার ভদ্রলোক বলেন, ছোবড়ার নেবেন না ফোমের .... ফোমের কিন্তু খুব টেঁকসই হবে।

সেজোমামা দাম জিজ্ঞেস করেন। এবারে স্বাভাবিক ভাবেই পার্থক্য হয়। দোকানদার ভদ্রলোক একটা দাঁড় করানো গদি পার্শ্ববর্তী খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। টিপেটিপে বলেন, জিনিসটা দেখুন এ-ক্লাস ফোম.......

শোভন হঠাৎ শুভ্রার দিকে ফিরে বলে, বসে দেখতো শুভু, বোস...... কি হল বোস....... একরকম হাত ধরে শোভন শুভ্রাকে ফোমের গদির ওপর বসিয়ে দেয়, কি রে পছন্দ......

শোভনের একরকম জোর করে শুভ্রাকে গদির ওপর বসিয়ে দেওয়া দেখে সেজোমামা ও দোকানদার ভদ্রলোক অবাক চোখে তাকায়।

শুভ্রা বলতে পারে না, দাদা-ফোম জিনিসটা যে লোহার থেকে কঠিন আমি জানতাম না......

.

বাইরের বারান্দার আলোটা হলুদ হয়ে গেছে ধুলো পড়ে পড়ে। নীরদ হাত দুটো পিছনে করে পায়চারি করছেন। ওরা ফিরতে প্রায় দরজা অবধি এগিয়ে এলেন, শুভ্রার দিকে দু চোখে কৌতুক এনে বলেন, অ্যাক্ খান্ গুড নিউজ আছে....

তিনজোড়া মেঘময় চোখ নীরদকে স্তব্ধ করে দেয়। শুভ্রা বাবার কথার কোন উত্তর না দিয়ে চলে গিয়েছিল শোবার ঘরে। বাইরের ডাইনিঙ স্পেসে ওদের কথোপকথনের বিবাদ ভেসে আসছে টুকরো টুকরো। পালিয়ে গিয়ে, কানে আঙুল দিয়েও বোধ হয় রেহাই নেই আজ।

দাদার গলা বুঝতে পারে শুভ্রা, তুমি যা এস্টিমেট করেছিলে তাতে শুধু ফার্নিচারেই বেশি লাগছে তিন হাজার....

বাবার বিস্মিত গলা শুনতে পায় শুভ্রা, কস্ কি......

তোমার মেয়ের পছন্দ যেরকম তাতে খরচ আরও বাড়বে. ...

তা ওকে পছন্দ করতে নিয়ে গিয়েছিলিস কেন! মায়ের স্বরে শুভ্রা শোনে চিরাচরিত স্নেহ।

এখন আর কোন কথা শুনতে পায়না শুভ্রা। পৃথিবী যেন অনন্তের জন্যে ব্রেক কষেছে। দরজায় টোকা মারার শব্দে পৃথিবীর সুদূরতম অন্ধকার থেকে সে যেন ফিরে আসে। আর

পাল্লা দুটো খুলে দিতেই দেখে বাবার সতেজ মুখ। সেই মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় না মুহূর্ত আগেও ডাইনিঙ স্পেসে চরম ব্যবসায়িক হিসেবনিকেশ করেছিলেন তিনি। ঘরে ঢুকে বিছানায় বসতে বসতে নরম করে নীরদ হাত রাখেন শুভ্রার মাথায়, তারপর যেন প্রস্তুতির মতো গলা ঝেড়ে নেন, বলেন, কি ঠিক করলাম জানস্.... একটা ছুঁচ পর্যন্ত দিমুনা...... কেন দিমু ক..... মাইয়া আমাগো কি বানের জলে ভাইস্যা আইসে..... আমাগো মাইযা কম কীসের..... শুভ্রা দেখে বাবার চোখে ছায়ার মতো ঘন হয় মায়া, রোদের মতো সন্তানের জন্যে চিকচিক করে ওঠে গর্ব.... নীরদ বলেন, বাড়ি ফিইর‍্যা গটগট কইর‍্যা তো চইলা আইলি, কইছিলাম না অ্যাক্ খান গুড নিউজ আছে জানস তুই কী কইর‍্যা ফালাইসস্!...... ব্যাঙ্কের থেইক্যা তোর নামে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আইসে .... ফেব্রুয়ারিতে যে ইন্টারভিউ দিসিলি, সেইডা....

নীরদের এত উৎসাহব্যঞ্জক শব্দপুঞ্জের পরেও মহাকালের মতো নীরবতা দাঁড়িয়ে থাকে বাবা ও মেয়ের মাঝখানে। নীরদ আপ্রাণ ভাঙার চেষ্টা করেন অসহ্য নীরবতার প্রাচীরটিকে, বলেন, আমাগো মাইয়া কি ফালতু যে পণের লইগ্যা চিন্তা করুম......

শুভ্রার পায়ের নিচে মেঝে যেন সরে যাচ্ছে। দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে দু দিকে। অতল অন্ধকার। কোনরকমে সে বলে, যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা না আসত তাহলে কি করতে......

এমন প্রশ্ন চলে আসতে পারে নীরদ বোধ হয় কল্পনাও করতে পারেন নি। আমতা আমতা স্বরে বলেন, সেক্ষেত্রে নয় ভাবা যাইত.......

কি ভাবা যেত বাবা! ভূমিকম্পের আর্তনাদ যেন বেরিয়ে আসে শুভ্রার স্বর থেকে।

তারপর সেই চিরাচরিত নীরবতা। নীরদ ঘর থেকে চলে গেলেন। শুভ্রা দেখল বাবা পালিয়ে গেল। তার সেই বাবা পণ দেওয়া নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মতামত দিয়েছেন। স্ট্রিট কর্নার....সভা-সমাবেশ করেছেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা না এলে তিনিও ভাবতেন যৌতুকের কথা। শুভ্রা কঁকিয়ে উঠল অন্তরতম স্থলে, স্বরযন্ত্রের গর্ভে শব্দগুলো পরস্পরের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ করছে অবিরত, অথচ কিছুতেই বেবিয়ে আসতে পারছেনা, শুভ্রা কিছুতেই বলতে পারছেনা, বাবা ফিরে এসো, এভাবে চলে গেলে তোমার সঙ্গে নীলাদ্রির বাবার যে আমি কোনো তফাত খুঁজে পাবো না, আমি কোথায় যাবো, যেখানে যাচ্ছি সেটা অন্ধকার জেনেও আমায় যেতে হবে, কিন্তু তুমি এভাবে চলে গিয়ে আমায় কেন বলে দিয়ে গেলে যেখানে আছি সেটাও অন্ধকার! .

শুভ্রা কিছুই বলতে পারেনা নিজেকে, শুধু অনুভব করে পায়ের নিচে মেঝে দুভাগে ভেঙে গিয়ে দুপাশে সরে যাচ্ছে অবিরত। এই প্রথম সে তার শারীরবৃত্তীয় রূপটি সম্পূর্ণ চিনতে পারে। শুভ্রা বুঝতে পারে এ-যাবতীয় ঘটনা আজকের নয়, জন্মকালীন প্রাচীন।

হিম-যুদ্ধ

অসিত কর্মকার

বুড়ো ধর্মরাজের মনটায় কু-ডাকে। পৃথিবীতে দিন তার ফুরিয়ে এসেছে। তাকে নিতে সেদিন রাত্রে যম এসেছিল। কিন্তু ঘুটঘুট্টি অন্ধকারে যমের কালো হাত ধর্মরাজের গলার কাছটা খুঁজে পায়নি। ভুল করে হাত ধরে টানাটানি করেছিল। কী ভীষণ তার শক্তি! ধর্মরাজ 'ও বাপ আর ক'টা দিন আমায় বাঁচতি দেরে' — বলেই শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েছিল। বুকের ভিতর তখন তার ঢেঁকির পাড়! শিঁটা দেওয়া শরীর ঠাণ্ডা মেরে যেন শীতের পাথর। জব বন্ধ হয়ে দাঁতে দাঁত লেগে যাওয়ার জোগাড়। বউ দুখী তখন বাহ্যি সারতে বাইরে গেছে। দরমার বেড়াটা আলগা ভেজানো। ওই সুযোগেই যম তার ঘরে ঢুকেছিল। ছোটোমেয়ে বাতাসি পিছনের দাওয়ার ঘরে তখন অকাতর ঘুমে। বাচ্চা বিয়োতে বাপের বাড়ি এসেছে। মেয়েকে যে ডাকবে সে মনের জোরটুকুও আর ছিল না। 'তমে কি মরে তাকে মেয়ির গভ্‌ভে জন্ম নিতি হবে!' এমনই বদ্ধ ধারণায় পেয়ে বসে ধর্মরাজকে।

ধর্মরাজের দুই ছেলে, তিন মেয়ে। মেয়েদের ভালো বিয়ে দিতে পারেনি। অভাবের সংসারে বাল-বাচ্চা বেশি বিয়োয়। বছর না ঘুরতেই গর্তে যাওয়া ফিট্‌কিরির মতো চোখ; রক্তশূন্য ফ্যাকাসে মুখ, প্যাকাটি গতরে ঢোলপেট নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। পাথরের বিষণ্ণ মুখে তখন পরম-আশ্রয় সুখ হাসি। 'ও বাপ এলাম, মা তুমি ভালো আছ?' সঙ্গে একটা কোলে একটা হাতে ধরা থাকে। পোশাকহীন টিঙ্‌টিঙে শরীর তাদের। বোনেদের উঠোনে দেখে ভাইয়েরা মুখ ঘুরিয়ে নেয়। এক উঠোনে আলাদা সংসার তাদের। দুখী চোখের জল আঁচলে মুছে নাতি-নাতনিকে কোলে তুলে নেয়। মেয়েকে হাত ধরে ঘরে তোলে।

পিছনের দাওয়ায় আঁতুড় পড়ে। আঁতুড় তোলার পরেও মেয়ে আর বাচ্চাকে একটু শক্তপোক্ত না করে শ্বশুর ঘরে পাঠাতে মন চায় না দুখীর। ধর্মরাজ বলে, 'মায়া আর বাড়িও না, জামাইকে খপর পাঠাই, এসি নিয়ি যাক্‌।'

এক মেয়ের আঁতুড় তুলতে না তুলতে আরেক মেয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। ধর্মরাজ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মনে মনে ভগবানের কাছে নালিশ জানায়, 'আমার ক্ষেতি সোনার ধান না দিলি এ পোড়ার সম্‌সার আমি টানব ক্যামনি।'

দিন ঠিক গড়িয়ে যায়। আঁতুড় ওঠে। মেয়েরা বিদায় নিলে ক'টা দিন বুকটা বড় টনটনায়। ফসলহীন ফাঁকা মাঠের মতো হু হু করে। দুখী শব্দ করে কাঁদে না। চলতে ফিরতে আঁচলে চোখ মোছে।

বউ এসে পাশে শুয়েছিল। ভয়ের কথাটা তাকে বলতে পারেনি ধর্মরাজ। শুধু জড়িয়ে ধরে ভয়টাকে ভাগাভাগি করে নেওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল। তাও পারেনি। 'বুড়ো বয়সের ভীমরতি' বলে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিত সে।

বাকি রাতটুকু দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি ধর্মরাজ। ভোরের দিকে একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। বেলা হতে এল ঘুম। দুখী তখন স্নানে, মেয়ে এসে ডাক দিয়েছিল, 'ও

বাপ ওঠো, কদ্‌গুনো বেলা হ'ল।' এ মেয়েটা বড়ো বাপ-ন্যাওটা। ধর্মরাজও বড্ড দুর্বল ছোট মেয়ের কাছে। সারাটা রাত কাটিয়ে এই প্রথম সে মনটাকে হাল্কা করবার একটা অবলম্বন পেয়েছিল। রাতের ভয়টা নতুন করে তার বুকের মধ্যে গুড়গুড়িয়ে উঠেছিল। কাঁচা ঘুম ভাঙা চোখের উপর ভয়ের দৃশ্যটা ভাসছিল। বাতাসির একটা হাত খপ্ করে ধরে কেঁদে উঠেছিল ধর্মরাজ।

'মা-রে, আমি আর বাঁচবুনিরে মা। তোর মাকে বলিসনি, কাল রেইতে যম এয়েছিল আমারে নিতি।'

'কি অলুক্ষুনে কতা বলছ বাপ্। ও মাগো আমার বুকটা কেমন টিপ্‌টিপ্ কত্তিছে।' হাঁটু ভেঙে বাপটার পাশে বসে পড়েছিল বাতাসি।

'হ্যাঁরে মা। আমি না মরলি তুই ছেলির জন্ম দিবি কি করি। আমি যে তোর কোলে ছেলি হয়ি জন্মাব রে মা।'

'চুক্ কর বাপ্ চুক্ কর। কি দেখতি কি দেখিছ। বয়স হলি এমনটা হয়।'

'না রে মা। আমি তকন জাগা, তর মা গেছে বাহ্যি সারতে। কালো মিশ্‌মিশে একটা দানো ঘরে ঢুকে আমার বাঁ হাতটা ধরে টানাটানি করলে।'

'বাঁ হাতটা ধরে! তুমি ঠিক জানো?'

'এ ক্যামন ধারার কতা বলতিচিস্ তুই মা। আমার হাত ধরি টানলে আর আমি ঠিক জানবনি?'

'শুধু টানলে, আর কিছু করলে না?'

'সে সুযোগ দিলিতো রে মা। জোর করি হাতটা টেনি নে বললাম, 'ও বাপ. আমারে আর কটা দিন বাঁচতি দে বাপ।'

'কই দেকি তোমার বাঁ হাতটা।'

ধর্মরাজকে হাতটা এগিয়ে দিতে হয়নি। বাতাসি নিজেই বাপটার মেদশূন্য লোলচর্ম বাঁ হাতটা নিজের হাতে টেনে নিয়েছিল। তারপর খানিক সময় ধরে ভালো করে পবখ করে একসময় খিলখিলিয়ে হেসে উঠে বলেছিল. 'তোমায় নিতি ভগমানের পাঠানো যম আসেনি গো বাপ। এয়েছিল মানুষ-যম!'

'কী হেয়ালী করে কতা কচ্চিস্ বলদিকিনি?'

'হ্যাঁ গো মানুষ-যম। এরা সহসা কারোর প্রাণ নেয় না বাপ্। মানুষটারে বাঁচায়ে রেকি তার সমস্ত কেড়ি নেয়। চিনতি পারনি ভালই হয়িছে। চিনলি হয়তো তোমারি মেরি-ই ফেলতো। এবার থিকি তোমারি এট্টু সাবধানি রাকতি হবে।'

মেয়ের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি ধর্মরাজ। এই দিনমানেও তাই ভয়টা যেন হরিণের পিছনে বাঘের তাড়া হয়ে ফিরছিল। একটা সময় ভয়টা ঠিক তাকে ধরে ফেলবে। তারপর আর তার রেহাই নেই। রবারের নলের মতো থলথলে দুর্বল গলাটাকে পিষে দিতে কতটুকুই বা সময় নেবে দানোটা।

ভয়টা বড্ড কাহিল করে ফেলেছে ধর্মরাজকে। সারা শরীরটা যেন একটা পচা বট-ফল। এই শরীর কি করে আর বুকের ভেতরের পাখিটাকে আটকে রাখবে। পাখিটারও যেন আর তর সইছে না। এই পচা বাসাটা ছেড়ে কতক্ষণে নতুন বাসায় ঢুকবে তার জন্য ছটফটিয়ে মরছে। জমির পাশের বুড়ো শিরিষের ছায়ায় বসে ধর্মরাজের বুকটা আজকাল আর জুড়াতে চায় না। দখিনা বাতাস সারা শরীর লেপ্টে সোহাগ করলে কেন যেন বারবার মরা মা-টার কথা মনে পড়ে তার। ঘোলাটে চোখের কোণে গোটাদানার মেঘ জমে। বুকের ভিতরটা

ধুকধুকিয়ে কাঁদে। মা মরেছিল অকালে। বুড়ো বাপটা মৃত্যুশয্যায় তার হাত দুটো ধরে বলেছিল, 'ধম্ম, বাপ আমার, মানুষকে ভালোবাসিস্, জমিকে ভালোবাসিস্। কিন্তু মানুষ ভুল বুঝি দুরি সরি গেলেও জমি কোনদিন বেইমানি করেনা জানবি বাপ্।'

বাপের কথা ফেলেনি ধর্মরাজ। মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেনি সে কোনদিন। বাপের রেখে যাওয়া একলপ্তের পাঁচ বিঘা জমিটা শত অভাব অনটনেও হাতছাড়া করার কথা মনে আর্নেনি সে। গঞ্জের দুই মাথা বৈকুণ্ঠ তালুকদার আর পরেশ হাজরা কম বোঝায়নি তাকে। বৈকুণ্ঠ তালুকদার বলেছিল, 'ছেলেরা তোমার পথ নিলনি, যে যার নিজের পছন্দের ধান্দায় লেগে গেল। তুমি আর এ বুড়ো বয়সি কেন এই যখের ধন আগলে বসি আছো বলদিকি? বেচি দাও, ভালো দাম দিচ্ছি।' পরেশ হাজরা বলেছিল, 'ওটুকুইতো তোমার জমি, চোখ বুজলে ছেলেরা দা-কাটারি করবে। তারচে তুমি থাকতে বেচে নিজির হাতে ছেলেদের বুঝ দিয়ি যাও। নইলে উপরি গিয়িও তো শান্তি পাবে না। ভালো দাম দিচ্ছি।'

শুনে ধর্মরাজ সহজ সরল শুকনো হাসি হেসেছিল। সে হাসিতে তার একান্ত অসম্মতি ধরা পড়েছিল। মাথা দুলিয়ে দুজনকেই বলেছিল, 'বাবু আপনার একটা হাত কেও কেটি নিতি চাইলে আপনি রাজি হবেন? ও জমিটুকা আমার আরেক সন্তান বাবু। আমার দুই ছেলি কতা না শুনি আপনাদের কাজে ভিড়িছে ঠিকই কিন্তু এ ছেলি আমার ভারী পয়মন্ত, গুষ্ঠিসুদ্ধ নোকগুলোর ভাতজলের ব্যবস্থা করতিছে। এ সন্তানেরে আমি ক্যামন করি ত্যাগ করি বলেন দিকি। দুই ছেলি যদি দুব্বল দুই হাত হয় তালি ও জমিটুকা আমার বুকের মণি। মণিটুকাই হারায়ে ফেললে এ সমসার যে আঁধার দেকবে বাবু।'

ধর্মরাজের বড়োছেলে সদা বৈকুণ্ঠ তালুকদারের অটো চালায়। দিন গেলে তালুকদার বাবুকে রোজকার পঞ্চাশ টাকা গাড়ি ভাড়া হিসেবে দিয়ে বাকি যা থাকে তার। গাড়ির কোনো গণ্ডগোল হলে সারাবার খরচা তার। এমন দিনগুলোয় একরকম শূন্য হাতে ছেলেকে ঘরে ফিরতে হয়। হাতের কটা পয়সা নেশার পিছনে ঢেলে ঘরে ফেরে সে। বউয়ের গায়ে হাতও তোলে কোন্ কোন দিন। ধর্মরাজ তখন ছেলেকে গাল পাড়ে, 'যে হাতে ঘরের নক্ষ্মীকে মারিস সে হাতে পোকা পড়বে তোর সদা।' সদাও বাপের উপর চোট নিয়ে বলে, 'ভাগ যখন বুঝায়ে দেবে না তখন আর অত দরদ দেকানোর দরকার নি।' ধর্মরাজ ছেলের কথায় রা কাড়ে না। রাত দুপুরে কথায় কথা বাড়িয়ে পাড়া জাগিয়ে বদনাম কুড়ানোর লোক সে নয়। সে জানে ছেলেদের সম্পত্তি বুঝিয়ে দিলে উড়িয়ে দিতে দুদিনও সময় নেবে না। মনে মনে সে শুধু প্রতিবাদী হয়ে উঠে। 'জমিকেই তোরা ভালোবাসতি শিখলিনে, ভাগ বুঝি নিতি শিকিচিস্। অমন উর্ব্বরা জমি ফেলি পরের দোরে কাজ জুটায়েচিস্। নজ্জা হয় না তোদের! সম্পত্তি বুঝি নিয়ে গুষ্ঠিসুদ্দু ভাতে মারবার ধান্দা কত্তিছো না?'

দুখী ছেলেদের সংসারের দৈন্য দেখে সইতে পারে না। তার মন পায়রার বুকের মতো নরম। ঝগড়া বাঁধলে সে ছেলেদের পক্ষ নেয়। বলে, 'যাদের জন্যি সম্পত্তি আগলে রাকা তারাই যদি চোকের উপরি না খেয়ি থাকল আমি মা হয়ি কি করি সই বলদিকি।' বউয়ের কথায় ধর্মরাজ রুখে দাঁড়ায়, 'কাজ জুটায়ে সব তালেবর হয়িছে, গঞ্জের মেয়ে জুটায়ে এনে ভিন্ন হয়ি গেল। ওদের সুখ ওরা বুঝি নিতি পারল আর আমরা দু'জনায় কি গাঙের জলে ভেসি যাব!'

জমিটুকু খড়কুটোর মতো আঁকড়ে আছে ধর্মরাজ। বুকে আঁকড়ে থাকতে থাকতে বুকের পাঁজর-ই হয়ে গেছে কবে। সংসারে হাঁ-মুখ বাড়ছে। পাঁচ বিঘা জমির চালে সারা বছর হতে চায় না। মুরোদ দেখাতে ছেলেরা ভিন্ন হলে কি হবে, যেদিন হাঁড়ি চড়ে না, বউ দুখী লুকিয়ে-চুরিয়ে চাল-তেল-নুন ছেলেদের ঘরে পৌঁছে দেয়। সব টের পায় ধর্মরাজ। সারা বুকটা

তখন তার আফশোসে ছেয়ে যায়। বড়ো সখ ছিল ধর্মরাজের, ছেলেরা পাশে দাঁড়ালে বছরভর চাষবাস করবে। অভাব ঘুচবে। খেয়ে পরে কিছু জমাতে পারলে আরেকটু জমি কেনার আকাঙ্ক্ষা ছিল তার। অত খাটুনি একার শরীরে দেয় না। শীতের তরিতরকারি আর গ্রীষ্মের ফুটি-তরমুজের দিনগুলোয় জমিটা খাঁ খাঁ করে। রক্তে তার সে তেজ নেই। শীতের দিনের শীতলতা সারা শরীর জুড়ে। তাই শীত পড়তে না পড়তে কাবু শরীরটা গুটিয়ে মানুষটা এতটুকু হয়ে যায়। আর গ্রীষ্মের তাপে শুকনো কাঠ-পোড়ার মতো পুড়তে থাকে ধর্মরাজ। হাঁপু ওঠা বুক তখন ধুক্‌ধুকায়। ভয় হয় এই বুঝি প্রাণ-পাখিটা শ্লেষ্মার সঙ্গে উবজিয়ে উঠে ফুড়ুৎ করে এই পুরনো ধসা বাসাটা ছেড়ে পালাল। মরে গেলে ছেলেপুলে নাতি-নাতনি ভরা সংসারটা যে ভেসে যাবে। সে যন্ত্রণা ধর্মরাজ উপরে গিয়েও সইতে পারবে না। এই সংসার এই জমি বুকের গর্তে নিয়ে বাঁচার আহ্লাদ ধর্মরাজের।

সদা বাসি পেটে বাংলা গিলে অটোর স্টিয়ারিং ধবে। একটা ঝিম্ ধরা ঘোরের মধ্যে তার দিন কেটে রাত্রি নামে। রাত তাকে আরও বেশি নেশাকাতর করে তোলে। বেসুরো গলায় গান গায়। ঘোলা চোখে সুখের স্বপ্ন ভাসে। প্রতিদিনের হিসাব-নিকাশ সারা হলে বৈকুণ্ঠ তালুকদার মাখোগলায় সদার মন ভেজাবার চেষ্টা করে। সেদিন হাইস্কুল মাঠে মন্ত্রী এল ভোট চাইতে। নামি-দামি বাবুতে ভরে গেল লঞ্চঘাট। লঞ্চঘাট থেকে হাইস্কুল দীর্ঘ পথ। ট্রিপ দিয়ে আর কুলোতে পারছিল না সদা। নেশার ফুরসৎটুকু জোটেনি পর্যন্ত। বৈকুণ্ঠের দোকানে পকেটখালি করেই আবাব স্টিয়ারিং ধরে ভোঁ! একদিনেই চারশো টাকা রোজগার হয়েছিল সদার। নতুন বিয়োন বাছুরের মতো ডগমগ ভাব দেখে বৈকুণ্ঠ সদার আশার পলতেটা একটু উস্কে দিয়েছিল।

হ্যাঁরে সদা, তোর নিজির একটা অটো হোক তুই চাস না।

চাই-চাই-চাই খুব চাই। সদার তখন মুখে ধেনো মদের কুলকুচি। প্রকৃতিস্থ কথার দৈন্যতা। শুধু 'চাই' শব্দটি সে বার বার জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে মনের আকাঙ্ক্ষার জোর প্রকাশ করেছিল। ঘরে তার গঞ্জের মেয়ে। চাষির ঘরের খাটনি আর উনো পেটে দিন পার করে দেওয়া এখন ধাতস্থ হয়নি তার। খালি বাপের বাড়ির সুখের কথা বলতে ভালোবাসে। সদাকে শুনিয়ে আরও বেশি করে বলে। তার রূপবিলাসী মন। মা হয়েও ছানাপোনাগুলোকে পোকার মতো দেখে। এমন হা-ভাতে ঘরে সন্তান বিয়োনোতেও তার ঘৃণা। সুযোগ পেলে ঠোনা দিয়ে কথা বলে। সদার সারা শরীরে তখন জল-বিচুটির জ্বলুনি। তথাপি তেতে উঠতে পারে না সে। উল্টে অক্ষমতায় ছোঁয়া লাগা কেন্নোর মতো গুটিয়ে যায় সে। ভালোবাসার দিনগুলোর রঙ লাগা চোখ ধূসর হয়ে গেছে কবে।

বছর ঘুরতে দিল না বউটা। ভিন্ন হল। তখন ওদের মনে রঙ, চোখে রঙ। এক দেহ আরেক দেহের অভাবে কাতর হয়। ভেবেছিল এমন করেই দিন চলে যাবে। পাঁচ বছরের সংসার জীবনে হাঁ-মুখ বাড়লেও রোজগার বাড়েনি। তাতেই নিত্য অশান্তি।

চাই তো ব্যবস্থা কচ্চিস না কেন? নিজির হলি ডেইলি পঞ্চাশ টাকা গুনতি হয় না। বৈকুণ্ঠ তালুকদার সদাকে বুঝায়।

অত টাকা কোতায় যে ব্যবস্থা করব?

তোর বাপটার তো ভাঙ্গাচোরা অবস্থা। তোরাও নাঙ্গল ধরলি না। জমিটা বেচি দে না। একটা হোটেল বানাতুম। জবর পজিশন্। শহরের বাবু লোকেরা হাওয়া খেতি এসে ভালো হোটেলের খোঁজ করে। একটা হোটেল থাকলি রোজগারের পথ কত। তুইও বাবুদের অটোয় করে ঘুরাতি পারবি। তাদের পকেট উপচানো পয়সা।

তাহলি বাপটা মরি যাবে জ্যাঠা?

বেঁচি থেকিই বা তোদের জন্যি কি করতিছে! এমন বাপ তুই জন্মে দেখিছিস্? তোদের না খাইয়ে নিজে রোজ ভরপেট গিলছে।

বাপের নামে জমি। বেচি সব টাকা আমায় দেবে কেন জ্যাঠা?

আপনি বাঁচলি বাপের নাম সদা। আমার পরামর্শ শোন।

তারপর বৈকুণ্ঠ তালুকদার সদার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে কি সব বলেছিল। গুপ্তকথা সাঙ্গ করে কান থেকে মুখ সরিয়ে বলেছিল, 'তোর নিজিরও একটা হল, সেই সঙ্গি আমার অটোগুলোর সর্দারিও করবি। দু'হাতি পয়সা আসতি থাকলি গঞ্জে ঘর বাঁধতি তোর কদ্দিন লাগবে শুনি? কাল-ই স্ট্যাম্পপেপার কিনতি হবে। উকিল ধরি বয়ানটা লিখায়ে নেব'খন। তবে কাজটা তোকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় হাসিল করতি হবে। তারপর কোর্ট-কাচারি আর সাক্ষী-সাবুদ দাঁড় করানোর সব হ্যাপা মেটাবার দায়িত্ব আমার।'

নেশা করলে জ্ঞান থাকে না সদার। প্রতিদিনের মতো সেদিন রাত দুপুরে এককথায় দু'কথায় লেগে গেল বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া। অশান্তি থামাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ধর্মরাজ। ছেলের উপর দাবড়ে উঠেছিল সে। সদাও মাথা গরম করে গোপন কথাটা ফাঁস করে ফেলেছিল, 'ও পাঁচ বিঘা বিক্রির পুরো টাকাটা আমার চাই। ও টাকায় আমি অটো কিনব। কদ্দিন আর পরের গোলামি করব শুনি? তারপর পকেট থেকে স্বীকার-নামাটা বার করে ধর্মরাজের মুখের উপর নাচিয়ে বলেছিল, 'এর নিচি একটা টিপ-ছাপ দিতি হবে তোমাকে।'

উঠোনে চিৎকার চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বিন্দা আর তার বউর। ভাসুর ঠাকুরের এই অন্যায় আব্দারে ফোঁস করে উঠেছিল বউটা।

শোনলে তোমার গুণধর দাদার কথা? ভিতরে ভিতরে কি মতলব আঁটছে বুঝতি পারলে তো এবার। আমার কথা তো কানে নাও না। নেশার চোটে আসলটা প্রকাশ হয়ি পড়ল না আজ? এখনও সাবধান হও বলি দিলাম।

ও জমি বেচার টাকা বাগাবে আর আমি আকাশির তারা গুনি বেড়াব ভেবিছ? গঞ্জে যদি একটা ঘর না বাঁধতি পারলুম তালি আর কি সুখ হল।

গঞ্জে ঘর বাঁধার কথায় বউটা আহ্লাদি হয়ে উঠেছিল। বিন্দার বুকের কাছে ঘনিয়ে এসেছিল। ছেলের বেয়াক্কেলে দাবিতে ধর্মরাজের বুক ভেঙেছিল। ক্রোধে অন্ধকার মথিয়ে জ্বলে উঠেছিল তার দু'চোখ, 'বাপের সঙ্গি নাঙ্গল ধরি দেকলি না কোনদিন, আজগেরে সে জমি হাতাতি বাপের টিপছাপ নিতি এয়েছ? ও টিপছাপের মুয়ে আমি তিন নাথি মারি। ওরে পরের গোলামিতে যদি এতই নজ্জা তালি কাল থিকে নাঙ্গল ধর আমার সঙ্গি।' মাঝখানে পড়ে দুখী বাপ-বেটার বিবাদ থামাতে পারে না। বাতাসি এসে হাত ধরতে ঠাণ্ডা হয়েছিল ধর্মরাজ। সকালে উঠে বিন্দা সবাইকে শুনিয়ে মায়ের উদ্দেশে বলেছিল, 'ভিটি দাদা নিক্। ও পাঁচ বিঘার টাকায় আমি গঞ্জে ঘর তুলব। রোজদিন এতটা পথ ঠেঙিয়ে কাজে যাওয়া শরীরি দেয় না।'

বলেই আর দেরি করেনি বিন্দা। কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েছিল সে। মালিক পরেশ হাজরাকে সব বৃত্তান্ত খুলে বলতে একপ্রকার লাফ দিয়ে উঠেছিল সে। বলেছিল, 'তুই বিন্দা নামেই আট ক্লাস পাস দিয়িছিস্। ঘটে কিচ্ছুনি। চুপ করে বসি থাকলি হবে? ও জমিটুকার ব্যবস্থা করি দিতি পারলে ওকানে এট্টা কাঠ-চেরাই মেশিন বসাব। তোকে তার ম্যানেজার করি দেব। পজিশানটা জবর —'

স্ট্যাম্প-পেপারের বয়ানটা উকিল রাম হাজরাকে দিয়ে লিখিয়েছিল পরেশ হাজরা। একেবারে পাকা ব্যবস্থা। বিন্দার এখন কাজ শুধু বয়ানটার নিচে বাপটার একটা টিপ-ছাপ নেওয়া। বাকি যা কিছু করার সব পরেশ হাজরা করবে। অবশ্য পরেশ হাজরা বিন্দাকে স্মরণও করিয়ে দিয়েছিল, 'মনে রাখিস তোর দাদার হাতেও এমন একটা স্বীকার-নামা আছে। সুতরাং খুব সাবধান। তক্কে তক্কে থাকতি হবে। যে আগে টিপ-ছাপটা বাগাতি পারবে তারই কেল্লাফতে জানবি।'

সদা এখন নিপাট বেকার। অটো চালানোর কাজটা তার গেল। মদ খেয়ে গাড়ি চালতে গিয়ে এ্যাকসিডেন্ট করল সে। গজপতি হালদারের ছোটছেলে নারাণ কপালজোরে বেঁচে গেল। সে এখন হাসপাতালে। গজপতি সদার বিরুদ্ধে থানায় নালিশ ঠুকেছিল, পুলিশ তার ড্রাইভিং-লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে। বৈকুণ্ঠ তালুকদার অভয় দিয়ে বললে, 'ও লাইসিনের জন্যি তোকে চিন্তা করতি হবে না। যদ্দিন না বার র্করি দিতি পারছি তদ্দিনের মধ্যি তুই টিপ-ছাপটা জোগাড় করি ফেল।'

বিন্দার বউ সব লক্ষ রাখে, ভাসুর ঠাকুর বেকার-ই যদি হবে তালি নিত্য-দিনের কম-বেশি বাজার হাটের ব্যবস্থা হয় কি করি? তার উপরে রাত্রি করি মদ-মাতাল হয়িও ফিরছে। পয়সা আসছে কোত্থিকে। সংশয়ভরা চোখে স্বামীকে বললে, 'তোমার দাদার গতিবিধি ভালো ঠেকছে না বুঝলে। সারাদিন ঘরে থেকি বাপটার তোয়াজ করি যাচ্ছে। বুড়ো মানষির মন একবার গলি গেলি বেগ দেওয়া কঠিন জেনো।'

ঘটনা শুনে পরেশ হাজরা বললে, 'তোর চেয়ি তোর বউয়ের নজর ভালো। বুদ্ধি-শুদ্ধিও আছে। সদাকে টাকা জোগাচ্ছে ওই বৈকুণ্ঠ তালুকদার। তুইও ছুটি নে বিন্দা। মায়না ঠিক পেয়ি যাবি।'

ছেলে দুটোর কাজ নেই। কি করে ওদের সংসার চলে সে চিন্তা মনের কোনায় উঁকি মারলেও খুব বেশি পাত্তা দেয় না ধর্মরাজ। তার তখন ধ্বসে যাওয়া গতর, দুচোখে ঘুমের বালাই নেই। শুধু সে বুঝেছিল জমিটুকু রক্ষা করে রাখলে অভাবের দিনগুলোকে ঠেকা দিতে পারবে। নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারে না সে। ভূমি পূজো করে লাঙ্গলটা একটু হাতে ছুঁইয়ে দেয়। রোজের মজুররাই চাষের কাজ করে। শিরিষগাছের ছায়ায় বসে ধর্মরাজ শুধু দেখভাল করে। দুখী দুপুরের ভাত নিয়ে আসে। ভাত খেয়ে উঠলেই ধর্মরাজের সারারাতের বিনিদ্র চোখ শিরিষের ছায়া আর দখিনা বাতাসের সোহাগে মুদে আসে। ধর্মরাজ বেশ বুঝতে পারে সংসারের সুখ এখন তার এই অপলা সন্তানের কোলে এসে ঠেকেছে। তাই চাষ কিংবা ফসল কাটার কাজ না থাকুক, মন হলেই শিরিষ গাছটার গোড়ায় এসে বসে সে। তার ঠাকুদ্দার বাপের বয়সি গাছটা। মাথায় যেমন ডালপালা ছড়িয়েছে তেমনি ধরিত্রির বুকের গভীরতম প্রদেশকে শিকড় দিয়ে আঁকড়ে নিয়েছে। গাছটাকে বড় সুখী মনে হয় ধর্মরাজের। অন্তত তার মতো মানুষ জীবনের চেয়ে সুখী। সে ভাবে, 'গাছের জীবন মানুষের উল্টো। বয়স বাড়লে গাছের মূল্য বাড়ে মানুষের কমে।' গাছটার খসখসে ত্বকে হাত বুলায় ধর্মরাজ, পাখির গান শোনে, জমি থেকে ঢেউ তুলে উড়ে যাওয়া শালিক-টিয়া-চড়ুইয়ের ঝাঁক দেখে। মেঠো ইঁদুর গর্ত-পথে ফসল লুকায়। ধর্মরাজকে দেখেও যেন দেখে না তারা। চোখ মুদে এলে কোমরের গামছাটাকে দুটি শিকড়ের মাঝের ফাঁকের ভুঁইয়ে পেতে দিব্য ঘুম লাগায় সে। কোন কোন দিন সন্ধ্যা হয়ে যায়। ঘরে ফেরা পাখির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙ্গে তার। আঁশ পড়া চোখে কম দেখে ধর্মরাজ। জ্যোৎস্না পক্ষ হলে তাও কোনরকমে লাঠি ঠুকে ঘরে ফিরতে পারে কিন্তু অমাবস্যার পৃথিবীটাকে ঘোর কালো লাগে তার। একা ফেরার ভরসা পায় না। দুখী এসে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়।

সদা আর বিন্দা এখন একে অপরের পিছনে তক্কে তক্কে থাকে। বাপটার ভালমন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একা পেতে চায়। সেদিন মাঠ থেকে ফেরার পথে ঘোর বৃষ্টিতে পড়ল ধর্মরাজ। এ'বয়সে রোদজলের বাড়াবাড়ি সয় না। জ্বরে পড়ল ধর্মরাজ। সেইসঙ্গে বয়সজনিত নানা উপসর্গ প্রকট হয়ে উঠল। এই যায় সেই যায় অবস্থা তার। মাথার কাছে দুই ছেলে। পায়ের কাছে দুই বউমা। জলপটি আর ওষুধ দিচ্ছিল বাতাসি, দুখী পাখার বাতাস করছিল। সদা-ই কথাটা পাড়ল। 'এই অবস্থায় বাপ-মার আর ভিন্ন থাকা-খাওয়া মানায় না বিন্দা। পাঁচজনে নিন্দেমন্দ করবে। বাপের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি তুই মায়েরটা নে।'

ভাসুরঠাকুরের কথায় অর্থপূর্ণ তির্যক চোখে বিন্দার দিকে তাকাল তার বউ। বউয়ের চোখের কথার সূত্র ধরে বিন্দা বললে, 'বাপ-মা কি ভাগের জিনিস দাদা? মাকে খাওয়াতি পারলি বাপকেও পারব। দুজনাই আমার কাছে থাক।'

সদা বুঝল চালে ভুল হয়ে গেছে। নিজেকে শুধরে নিয়ে বললে, 'তুই পারলি আমিও পারব। দুজনাই আমার কাছে থাক।'

ভেজা চোখ মুছে দুজনেরই বাড়া-ভাতে ছাই দিল দুখী। 'ও বাপ সকল, আগে বাপটাকে বাঁচায়ে তোল তোরা তারপর নয় ভাগ-বাঁটোয়ারা করিস আমাদের।'

পাল্লা দিয়ে টাকা খরচ করে বাপটাকে সারিয়ে তুলল দুই ছেলে। টাকা ঢালল বৈকুণ্ঠ তালুকদার আর পরেশ হাজরা। বাপ-মাকে নিজেদের কাছে রাখার দাবি তুলল দুজনেই আবার। সব শুনে ধর্মরাজ অসম্মতি-সূচক মাথা নাড়ল। ফোকলা গালে মিষ্টি হাসি লাগিয়ে বললে, 'কটা দিন পেটে ওষুধ-পথ্যি পড়ায় গতরটায় বেশ জোর পাচ্ছি বাপ। মনে লয় আরও কটা বছর নিজিদের দেখভাল নিজিরাই করতি পারব। যেদিন গতর পড়বে, বাহ্যি পেচ্চাপের সাড় থাকবে না, শেষের সে সময়টায় তোরা দেখিস বাপ।'

বৈকুণ্ঠ তালুকদার আব পরেশ হাজরা জোর তাড়া লাগাচ্ছে আজকাল। সামান্য টিপছাপের জন্য এতদিন ধরে গুষ্ঠিসুদ্দ বসিয়ে খাওয়ানোর খোঁটা দেয় তারা। নিজেদের অক্ষমতায় কুঁকড়ে যায় দু'জনে। সেদিন বৈকুণ্ঠ তালুকদার সদাকে বললে, 'হয় কাজ বাগা নয়তো খরচার টাকা ফেরত দে।' সেই সঙ্গে এতদিনের খরচার হিসাবটাও শুনিয়ে দিল। এমন ব্যবহারে শরীরটা ঘিনঘিনিয়ে ওঠে সদার। তার ইচ্ছা হচ্ছিল, এতদিনের সব ভাত সামনে উগলিয়ে দেয়। মাথায় রোখ চেপে গেল সদার। যেমন করেই হোক যত তাড়াতাড়ি পারে বাপটার টিপছাপ জোগাড় সে করবেই।

ভাটিখানার অনতিদূরের জগার চায়ের দোকানে বসে বিন্দার আজ মন খারাপ, পরেশ হাজরা ঘা দিয়ে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিল। না! হাজরাবাবুর সঙ্গে বড্ড কথার খেলাপ হয়ে যাচ্ছে। এত করেও কাজটা হাসিল করা গেল না। বিন্দা মনে করে এর জন্য বাপটার প্রতি মা-টার অত টানই দায়ি। ছোটোবোনটাও কেমন পাহারাদারের চোখ নিয়ে থাকে। দুজনে মিলে বুড়োটাকে তোলা তোলা করে রাখে। সে রাত্রের পরে থেকেই এমনটা দেখছে বিন্দা। বাপটা যে জাগা ছিল একদম বুঝতে পারেনি সে। ধর্মরাজ অন্ধকারে ছেলেকে চিনতে পারেনি। যম ভেবে ভয় পেয়েছিল। বাঁচার জন্য আকুতি জানিয়েছিল।

আজকে সন্ধ্যা না হলেও সদাকে ভাটিখানা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে অবাক হল বিন্দা। তার মনের কোনে সন্দেহের ঘোর কালো দানা জমে ওঠে। ভাবলে, 'পিছু নিলি কেমন হয়। আজ তো জ্যোৎস্না পক্ষের রাত। বাপটাকে ঘরে নিতে মা আসবে না। নিজির খেয়াল মতো ঘরে ফিরবে। তার আগেই যদি বাপটাকে শিরিষের নিচে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যায় সদা। তারপর সেই সুযোগে.........।'

ধর্মরাজের জন্য একটা টনিক হাতে পিছু নিল বিন্দা। কয়দিন ধরে বুড়োটার শরীরটা মোটেই ভালো নেই। শুধুমাত্র মনের জোরে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। এতগুলো পথ ঠেঙিয়ে শিরিষের ছায়ায় ঠিক আসা চাই তার। অনেকটা দূরত্ব রেখে গঞ্জ ছেড়ে খোলা প্রান্তর, আর রূপোর বর্ণমাখা অনন্ত আকাশের নিচে এল ওবা দুজনে। পশ্চিমাকাশে ভরা পূর্ণিমার চাঁদ মোষ-রঙা ফুরফুরে মেঘের কাঁথা সরিয়ে ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। বিন্দা তাই এতটাই দূরত্ব বজায় রেখেছে যাতে সদা পিছন ফিরে তাকালেও তাকে চিনতে না পারে।

ভুবনডাঙ্গার মাঠ পর্যন্ত সদা নিত্যদিনের পথ ধরেই এল। তারপর হঠাৎ মাঠটাকে আড়াআড়ি পেরিয়ে ডানদিকের সরু বাদা পথটা ধরল সে। প্রমাদ গুনল বিন্দা। এ পথটা তো সোজা তাদের পাঁচবিঘায় গিয়ে ঠেকেছে। সদা যাতে টের না পায় সেজন্য বিন্দা ভুবনডাঙ্গার মাঠ পর্যন্ত না গিয়ে তার আগেই নাবাল মাঠে নামল। সদাব পিছু নিল সে। তার মাথার উপর চামচিকার ছটফটানি আর শ্বাসের সঙ্গে সারাদিনের রোদ-ক্লান্ত চরাচরের পোড়া গন্ধ।

বৃদ্ধ শিরিষের খোদলে বসে কাল-প্যাঁচা ডাকে, নিম্-নিম্। এখনও সে খাদ্যের সন্ধানে বার হয়নি। শুকনো পাতার উপর সর্ সর্ শব্দ তুলে কি যেন সরে পড়ল। মেটো-ইঁদুর নাকি দাঁড়াস্ বুঝতে পারল না সদা। হয়তো মেটো-ইঁদুরের পিছনে তাড়া করা দাঁড়াসও হতে পারে। শিরিষ গাছটার সবচেয়ে মোটা, উজানো শিকড়ের মাঝের খোদলে বসে ধর্মরাজ। চোখ-মুদে ধ্যান-বৃদ্ধ তপস্বী যেন। কাছে ঘনিয়ে এল সদা। বাপটা তার এখনও অঘোরে ঘুমোচ্ছে না কি। কি বেয়াক্কেলে ঘুম দেখো। নাকি চোখ বুজে মটকা দিয়ে পড়ে আছে। সদা ক' বার ফিসফিসিয়ে কিন্তু গভীর করে ডাকল, 'ও বাপ্! বাপ্!' কোন সাড়া পেল না সে! না! সত্যি ঘুমোচ্ছে বাপটা। এই তো মোক্ষম সময় যায়। চারপাশটা জনমানবহীন দেখে নিল সে একবার। পকেট থেকে স্বীকার-নামা আর কালিটা বার করল। আলতো ছোঁয়ায় বাপটার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটা ধরল। বুকের ভিতরটা তপ্ত লোহা জলে বুড়োনোর মতো ছ্যাৎ করে উঠল তার। ইস্ কী শীতল হাত! সেই ছোটবেলায় ঠাকুরদা মরলে মাথার কাছে বসে এমনই শীতল হাত ছুঁয়ে বসেছিল সে। কিন্তু সদা কেঁদে উঠল না। চিৎকার করে বাপটার মৃত্যু ঘোষণা করল না। বাপটার বুড়ো আঙুলের হিম-ছাপ নিয়ে খর পায়ে ফের গঞ্জের পথ ধরল।

এতক্ষণ বিন্দা অনতিদূরের ডোবাটার গায়ে হেলে পড়া আঁশশ্যাওড়া গাছটার গোড়া জড়িয়ে থাকা ঢোল কলমির ঘুপসিতে লুকিয়ে সদার কাণ্ড দেখছিল। সদা গঞ্জের পথ ধরলে বিন্দা আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। বাপটা তাহলে ঘুমোচ্ছে। ইস্ কি শীতল হাত! ঠিক মরা ঠাকুরদার মতো। ঠাকুরদার প্রাণহীন পাথর শরীরটার উপর ছড়িয়ে ছিল কিছু শুকনো গ্যাঁদা আর কল্কে ফুল। দুচোখে তুলসী পাতা লাগিয়ে ঠাকুরদা যেন একমনে হরির নাম শুনছিল। আজ সেই শীতল হাত কত বছর পরে আবার তার হাতের মধ্যে ফিরে এসেছে। কিন্তু সে-ও কেঁদে উঠল না। চিৎকার করে বাপটার মৃত্যুও ঘোষণা করল না। স্বীকার-নামাটায় শুধু একটা হিম-ছাপ নিল সে। তারপর সদার পথ না ধরে গঞ্জে যাওয়ার অন্য পথ ধরল।

লাউপাখির ডিম

শ্যামল ভট্টাচার্য

রনি, আমার রনি,

এইটুকু লিখে আন্ডারলাইন করে পরি। দোতলার জানালা দিয়ে বিকেলের আকাশ ঢুকে পড়েছে। পশ্চিমকোণে রঙিন মেঘ। ওই রঙে সূর্যের শেষ কিরণ নানা বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। বিছনায় টানটান চাদর আর বালিশের উপর রাইটিং প্যাডের সাদা শরীরে এক অলৌকিক আভা। মনে হয় মেঘের উপহার। এইভাবে কৈশোরের মিষ্টি উদ্বিগ্নতায় সদ্যপ্রস্ফুটিত যৌবন আকাশে রঙের উৎস নিয়ে অনেকেই ভুল করে। পরি সাবধান। চারপাশ দেখে চলে। একটাই তো জীবন।

সমুদ্র আর আকাশে মিশে যাচ্ছে ধ্যানমগ্ন ধূসর পাহাড়। ঘন সবুজ জঙ্গলের হাতছানিতে বুক কাঁপে। নিজেকে মনে হয় রূপকথার বন্দিনী কন্যা। আজকাল মাঝেমধ্যেই এরকম হয়। এক অব্যক্ত অস্বস্তি ওকে স্মৃতি এবং সময়ের দোলায় দোল দেয়।

পিসিমণি নাম রেখেছে অপরাজিতা। ভাইঝিকে জয়ী দেখার ইচ্ছা। ছোটবেলা থেকেই পিসিমণি ওর নিবিড় আশ্রয়। সেজন্যেই কষ্ট হয়। পিসিকে কেউ বুঝলো না। পিসি নিজেও না। ও আগে ভাবত নরম বুঝেই পিসেমশাই.........আজ অন্যরকম ভাবনায় গলা ব্যথা করে। পাগল পাগল লাগে।

ছোটবেলায় পিসেমশাইকেই সবচাইতে বেশি ভালোবাসত পরি। বাবা মা দু' জায়গায় চাকরি করত। ও পিসি-পিসেমশাইয়ের কাছে থেকে পড়াশুনা করত। পিসেমশাই-ই আদর করে প্রথম 'পরি' ডাকা শুরু করে। বলে, বড়ো হলে একদিন সোনালি পাখা গজাবে, পূর্ণিমায় উড়ে গিয়ে বনে বনে কুঁড়ি ছুঁয়ে ফুল ফোটাবে। গল্পের ঘোরে ও তাই বিশ্বাস করে। রোজ সকালে চেটে খাওয়া মধুর মতন গাঢ় সেই বিশ্বাস।

মনে পড়ে সেই দিনগুলির নাচ। টেপরেকর্ডে গান চালিয়ে বন্ধ কামরায় ও আর পিসেমশাই তাক্ ধিনা ধিন। পিসিমণি সুস্বাদু সব খাবার বানায়। গন্ধেই চোখ নাচে। গন্ধেই নাচ থামে। গন্ধেই দরজা খোলে। চেটেপুটে সাবাড় করে পিসেমশাই আঙুল চাটে। রান্নার প্রশংসা করে। আর কাউকে এত তৃপ্তিভবে খেতে দেখেনি পরি। তখন ওরা কত সুখী! পিসেমসাই প্রিয়তম। পাশে না শুলে ঘুম আসে না। কত দেশবিদেশের, জ্ঞানবিজ্ঞানের গল্প। ঘুমপাড়ানি গান। কতদিন তেমন ঘোরে ঘুমায়নি আর পরি।

ক্লাস টু অব্দি গান শুনে ঘুমিয়েছে। তারপরই বাবা দ্বীপপুঞ্জ প্রশাসনে চলে আসে। পঞ্চাশ বছর আগেও বিদেশি প্রভুরা এই পাহাড় ও অরণ্যের একাকিত্বে মারাত্মক দস্যু, খুনি অপরাধী ছাড়াও পাঠাত মহান সব বিপ্লবীদের। যাবজ্জীবন নির্বাসন। আর এখন? গিজগিজ লোকবসতি। ঢাউস সুপারমার্কেট। সিনেমা হল। পাঁচতারা হোটেল। কলেজ ও অনেক ক'টা স্কুল। পরির বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও পাল্টে গেছে কত কিছু!

মা কাছাকাছি একটা স্কুলে বদলি হয়ে এলে বাবা আর জ্যাঠামশাই নিজেদের স্বপ্ন মিলিয়ে এই ছোট্ট জাহাজের মতন কাঠের দোতলা বাড়িটি তৈরি করে। জ্যাঠামশাই নিঃসন্তান। শরণার্থী হয়ে পালানোর সময় শত্রুসৈন্যরা জ্যেঠিমণির তলপেটে বন্দুকের বাঁট দিয়ে জোরে মারে। প্রাণে বেঁচে গেলেও সেদিনের নববধূ আর মা হতে পারেনি। জ্যাঠামশাই-ই পরিকে জোর করে এই বাড়িতে নিয়ে আসে। পরি প্রিয় পিসেমশাইকে ছেড়ে আসে কাঁদতে কাঁদতে। পিসেমশায়ের চোখ ছলছল। পিসিমণিও কাঁদে। তবে আজকের মতন এত কান্না নয়। এত কাঁদতে দেখে নি এর আগে পরি।

বাড়ির পেছনে একটা লাউমাচা। ষোলটা বাঁশের খুঁটির ওপর বিশাল মাচা। তিন কোনা থেকে তিনটা লাউগাছ খুঁটি বেয়ে উঠেছে। জ্যেঠিমণি ছাই ছিটিয়ে জল দিয়ে লালন করে। সবুজ পাতায় পাতায় ভরে গেছে মাচা। ডগাগুলি মিলেমিশে একে অন্যের গায়ে জড়িয়ে পড়েছে। কোন্ ডগাটা কার চিনতে পারা যায় না। সেই মাচার কাছেই খটখটে উঠানে দুইমুখো তিনমুখো উনান বানিয়ে দেয় জ্যেঠিমণি। পরি খেলনার হাঁড়ি কড়াই নিয়ে রান্নাবাটি খেলে। শহরে ঘুরতে বেরিয়ে কিছু পছন্দ হলেই আব্দার, পিসেমশাই, ওটা কিনে দাও....। বাবা হেসে বলে, কোথায় তর পিসা?

ওই বছরই আসে আইভি। কী ফুটফুটে! পরি যখনই যায়, কচলে আলুসিদ্ধ পাকায়। জ্যেঠিমণির আড্ডায় প্রতিবেশিনীরা খ্যাপায়—পিসি-পিসেমশাই এখন আইভিকেই বেশি ভালবাসবে! পরি বলে, বাসুক গে! পিসেমশাই ওকে পেলে ভীষণ খুশি। গান গায়, নাচে, সৈকতে বেলুন উড়ায়। পিসি বলে, দূর বোকা, আইভি তো ছোট, সবাই ওকে ভালবাসবে, কিন্তু তুই আমাদের মিষ্টিপরি! সেই শুনে মনে মনে অপেক্ষা জাগে, কবে গজাবে সোনালি পাখা। কোন্ জ্যোৎস্নায় সে উড়ে যাবে ফুল ফোটাতে, এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে।

উড়তে পারেনি তবু দিনগুলি কত সুন্দর! ডানা গজায়নি তবু ঝটপটায় ফুল ফোটানোর স্বপ্ন। দুইবছর পর এক সন্ধ্যায় পিসি আইভিকে নিয়ে জাহাজবাড়িতে আসে। পরি আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু পরে যখন শোনে পিসেমশাই মেনল্যান্ডের কোন শহরে চলে গেছে, আর কোনদিন পোর্ট ব্লেয়ার আসবে না; খুব কষ্ট হয়। কখনও, একজনের অভাবে সমস্ত পৃথিবী জনশূন্য মনে হয়। একা বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদে। অবাক হয়, বড়োরাও এরকম ঝগড়া করে একে অন্যের সঙ্গে আড়ি দিয়ে দূরে চলে যায়।

আইভির জন্য কাঁদে পরি। ও জিজ্ঞেস করে, আমার বাবা কোথায়? পিসিমণি নিমপাতা মুখে নেয়া চেহারা করে বলে, মরে গেছে! আইভি কেঁদে কেঁদে চুপ করে। আর বাবার কথা জিজ্ঞেস করে না। পরি অবাক হয়। পিসিমণি মিথ্যে বলে কেন? এখন বোঝে, হীনমন্যতায় ভুগে জীবনকে মিথ্যেময় করে তোলা একটা বিশেষ শরণার্থী চরিত্র।

বড়ো হয়ে বুঝতে পারে আরো অনেক কিছু। মা জ্যেঠিমার গোপন আলোচনায় আড়ি পেতে ক্রমে অনেক কিছু জানতে পারে। জ্যেঠিমণির কাছেই পিসিমণি বড়ো হয়েছে। ওর কষ্ট তাই জ্যেঠিমণির কাছে হৃদয়বিদারি। দুঃখ করে মাকে সেসব কথাই শোনায় জ্যেঠিমণি। কেমন করে একটি লাউডগা থেকে বেরোয় অনেক কটা আকর্ষ। পিসিমণি কী বোকা! মনের দিক থেকে ভীষণ দুর্বল। কাউকে দারুণ ভালোবাসতে পারেনি। অন্ধকার অথবা শ্যাওলা-জমা বিকালের গলিঘুঁজিতে শারীরিক ছোঁয়া অব্দিই সীমানা।

সেইসব মেরুদণ্ডহীনদের ঘৃণা করে পরি। কেউই পিসিমণিকে ভালোবাসেনি। শরীর ভালোবেসেছে। সেজন্যেই মরসুমি পাখিরা উড়ে গেছে। আসলে শ্যাওলার মতন এই দ্বীপপুঞ্জে ভেসে এসে গভীর প্রোথিত শিকড় খুব কম যুবকেরই রয়েছে। এদের শরীর আছে মন নেই।

ব্যতিক্রম শুধু পিসেমশাই। পিসিমণি চিনতে পারেনি। হয়তো প্রেম ও কামকে মেশাতে পারেনি সঠিক অনুপাতে। পিসেমশাই মনে প্রাণে ভালোবেসেও মন পায়নি। সেজন্যেই হয়তো পরিকে নিয়ে বেশি মেতে থাকে। চলে এলে শীতলতা ক্রমে গ্রাস করে সজীবতাকে। ভারসাম্য টালমাটাল। এই প্রাকৃতিক ঘটনা শুধু অনুভব করা যায়।

অভিজিৎ কাকু পিসেমশাই'র সহকর্মী। ওদের কোয়ার্টারে আসতো। মা জ্যেঠিমণির গোপন আলোচনার ঝটপটানি শুনে মনে হয় — আকর্ষ তখন স্পর্শকাতর। কোনদিন অসময়ে সেই বিচ্ছিরি কম্পন টের পায়। বুঝতে চেষ্টা করে পরি। বিভ্রান্ত আকর্ষ থেকে ঘৃণা সংক্রমিত হয় সমস্ত মাচায়। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে শুরু হয় এক অবক্ষয়ের অধ্যায়। বাইরের সবুজ দেখে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। ভেতরে ভেতরে লাভা ফুটতে থাকে। তাই হঠাৎ একটা দ্বীপ হয়ে পড়ে আগ্নেয়গিরি। অগ্ন্যুদগার ও লাভাস্রোতে সমুদ্র ফুটতে থাকে টগবগ করে। উত্তপ্ত বাষ্পে চারপাশে বাতাস গরম হয়। সেই বাষ্প আকাশে জন্ম দেয় এক বিদঘুটে কালো মেঘের। লক্ষ লক্ষ বজ্রপাতের মতন আওয়াজে পৃথিবী কেঁপে ওঠে। দু'টো দ্বীপ ছিটকে সরে যায় বহু দূরে। প্রবল বৃষ্টিপাতে ধুয়ে যায় দিনরাত। এক সময় আগ্নেয়গিরিও আবার শান্ত হয়ে পড়ে। কিছু বর্ধিত উত্তাপ পরিবেশে থেকেই যায়।

পিসিমণি ওদের বাড়ি এসেই কাজের লোক ছাড়িয়ে দেয়। যেন সবাইকে বোঝাতে চায়, এমনি এমনি পড়ে খাই না — পরিশ্রম করি। পিসি বোঝে না, অর্থনৈতিক নয়, প্রিয়জনের কষ্ট সবার জন্য মানসিক বোঝা। ওদের ডিভোর্স হয়নি। তবু পিসেমশাই টাকা পাঠায়। পরির ইচ্ছে করে চিঠি লিখতে। কয়েকবার লিখে ফেলেও সাতপাঁচ ভেবে ছিঁড়ে ফেলেছে।

একটা সেলাই মেশিন পিসেমশাই কিনে দিয়েছিল। সেই মেশিনে তৈরি হয় সালোয়ার কুর্তা, ফ্রক, সায়া, ব্লাউজ আরো কত কিছু। এবার্ডিন বাজার এলাকার প্রায় সম্ভ্রান্ত মহিলাই পিসিমণির তৈরি পোশাক পরতে ভালোবাসে। সেই সুবাদে রোজগার খারাপ না। তবু ওই ড্রাফ্‌ট পিসিমণির কাছে অনেক মূল্যবান বলে মনে হয় পরির। শক্তি পায়। কোন মাসে দেরি হলে অস্থিরতা। অপেক্ষায় প্রতিদিন ফ্যাকাশে হতে থাকে।

আইভি ভীষণ জেদি ও চঞ্চল। ভালোবাসার ছোঁয়া না পেলে মাচার নতুন ফুলটি হাসতে ভুলে যায়। মুহূর্তে অভিমানে আকাশ কালো করে মেঘ জমতে থাকে। জোরে বাতাস বইলেই বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে পরি। সবাই ওর সব আবদার জানে এই বাড়িতে। একমাত্র পরিই ওকে বুঝিয়ে কিছু মানাতে পারে। আইভি সুন্দর আঁকে — আলপনা লতাপাতা জাহাজ নৌকা শঙ্খ মানুষ জন্তু জানোয়ার। দারুণ নাচে কত্থক। পরীক্ষার ফল খুব একটা ভালো হয় না। কখনো ফেলও করেনি। এবছর হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। প্রথম যেদিন শাড়ি পরে দোল দেখে পরি চমকায়। এ যে লাস্যময়ী মডেলের দোল! পরির শঙ্কা হয়। আদরের বোনটি পিছলে না পড়ে! ওকে সতর্ক করতে হবে। মনে মনে পরি ভাবে কিভাবে কী বলবে! কিন্তু আজও পারেনি। বলা ভীষণ কঠিন! ফেনিক্স বে জেটির বুকে লেগে লেগে দূরে সরে যায় ঢেউ। আবার এসে আছড়ে পড়ে। বাতি ঘরটা এ সময় নিষ্প্রভ, কোলাহলের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে। একটু পরেই অন্ধকারে এই বাতিঘর সবার দৃষ্টি কাড়বে। পরি রনির চিঠিটায় চুমু খায়। চিঠিটা কেঁপে ওঠে। কী সুন্দর হাতের লেখা! ও জেনেটিকস্‌ নিয়ে গবেষণা করছে। পরির গর্ব। এরকম একনিষ্ঠ মানুষের জন্ম হয় সভ্যতার বিরাট কোনও উপকারে আসার জন্যেই।

কলেজে বান্ধবীরা ক্ষ্যাপায়, বেচারি, দেখিস আবার মেম বিয়ে করে না ফেরে! পরি রাগে না। আশঙ্কা জাগে ঠিকই। পরমুহূর্তেই ভাবে, না, আজও ফুল ফোটে, পাখি গান গায়। প্রমাণ রনির চিঠি। গভীর দরদ দিয়ে লেখা প্রতিটি বাক্য ওর চুম্বনে কাগজের রোমসহ

সোজা দাঁড়িয়ে যায় টানটান। কাঁপতে থাকে। পরি নিশ্চিত, রনি ওর বুকেই ফিরে আসবে। ততদিনে পরি এম. এ.-র গণ্ডি পেরিয়ে যাবে। তারপর দু'জনে মিলে এক নতুন সময়।

আজ অব্দি এই দ্বীপপুঞ্জের বাইরে যাওয়া হয়নি। পরি অন্তত একটিবারের জন্য উটের পিঠে চাপতে চায়। আর চায় পূর্ণিমা রাতের ট্রেনে রনির সঙ্গে সারারাত সফর। সেদিনই জবাব লিখে ফেলতে পারতো কিন্তু রনির বাক্যগুলি এত মিষ্টি অনুরণন সৃষ্টি করে!

স্কুলের এক দিদিমণি পিসিকে ডেকে পাঠিয়েছে। পিসিমণি বলে, তুই-ও চল! কলেজ এখন বন্ধ। পরি তৈরি হয়ে নেয়। আইভি কি কোনরকম বাদমাইশি করেছে, নাকি নতুন পরিবেশে কোন ঝামেলা? ওর কথাবার্তায় তো এরকম কিছু মনে হয়নি! আকাশ মেঘে ঢাকা। কেমন একটা গুমোট পরিবেশ!

ওরা টিচার্সরুমে পৌঁছে শোনে মহিলা ক্লাসে। অন্যরা কেউ বলতে পারে না কেন ডেকেছে। কেউ বেশি উৎসাহও দেখায় না। কী দীর্ঘ সেই আধঘণ্টা!

পরিচয় হতেই মহিলা পিসিমণির সঙ্গে নমস্কার বিনিময় করে ওর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, পরি? ও অবাক হয়ে মাথা নাড়ে। মহিলা ওর কাঁধ ছুঁয়ে সস্নেহে বলে, চলো, ক্যান্টিনে গিয়ে বসি! ওর নাম জানলো কেমন করে? স্কুলে কলেজে সবার জন্য ও তো শুধু অপরাজিতা। এইসব ভাবতে ভাবতে যন্ত্রচালিতের মতন পাশাপাশি হেঁটে ক্যান্টিন অব্দি যায়। একটা বারো তের বছর বয়সি ছেলে বসে আছে। মহিলা ওকে চা বানাতে বলে। ওদেরকে একপাশে বসিয়ে টেবিলের অন্যপাশে কাঠের বেঞ্চে মহিলা বসে। পরিকে মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করে, তোমার সাবজেক্ট কী?

- ইংরেজি অনার্স!

— দারুণ! পরি ভাবে, এতে খুশি হওয়ার কী আছে? মহিলা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে পরির হাতে দেয়। — তুমি বইটা দেখ, আমরা কিছু জরুরি কথাবার্তা সেরে নিই! পিসিমণি নড়েচড়ে বসে।

প্রচ্ছদে একটা কাঠ জ্বলছে। যুগ্ম কাব্য সংকলন। কবিদের নাম দেখে পরি চমকায়। এই মহিলাই তো চিরশ্রী! পিসেমশাইয়ের সঙ্গে এর সম্পর্ক? অবশ্য ঘনিষ্ঠ না হলেও যুগ্ম সংকলন হতে পারে। কিন্তু এখানে ঘটনাক্রম সন্দিহান করে তুলছে। কই, জরুরি দূরের কথা, মহিলা কিছুই বলছে না। শুধু, কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম, আইভি ভালো মেয়ে — ইত্যাদি দু-একটা অগোছালো বাক্যের পর টেবিলে মৃদু আঙুল ঠুকছে। যেন মনে মনে গান গাইছে। আর কিছু কি আদৌ বলবে? নাকি অনেককিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে! পিসিমণি একদৃষ্টে তাকিয়ে। মহিলা ছাদের দিকে, ঘূর্ণায়মান পাখার দিকে অথবা একটি টিকটিকির দিকে তাকিয়ে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। থুতনিতে একটা গভীর কালো তিল সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখ সুন্দর। চাহনি চেনা চেনা। কেমন যেন এক বিমর্ষতা মিশে আছে প্রচ্ছন্নভাবে। অবশ্য এই ভূখণ্ডে বড়ো হতে থাকলে সব মানুষই ধীরে ধীরে মুখচেনা হয়ে যায়।

পরি মলাট উল্টে ভেতরে ঢোকে। তারপরই আবার চমকায়। বইটার উৎসর্গ, আদরের মিষ্টিপরি ও আইভিকে —। ছেলেটা চা দিয়ে যায়। কাপে চুমুক দিয়ে মহিলা বলে, নিন চা খান — আসলে বইটা — এমনি তোমাকে কেমন করে ডাকবো? একটু অপ্রস্তুত হাসে। তারপর কী ভেবে আবার বলে, তোমরা আইভিকে মিথ্যে শিখিয়েছ কেন? মহিলার কান লাল। ঠোঁট কাঁপছে মৃদু।

পাখাটা জোরে ঘুরছে অথচ হাওয়া লাগছে না। শব্দটা শুধু দু'কানে চেপে বসে যায় তখুনি। আজ মেঘের ঘনঘটা বেশি। পিসিমণির নাকের ডগা ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পরিও ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠছে। পিসিমণি ভুরু কুঁচকায়, নাক টেনে বলে, পোড়া গন্ধ

আসছে কোথা থেকে? পিসিমণি গন্ধ পাচ্ছে। আর কেউ পাচ্ছে না। পরির হঠাৎ মনে হয় টেবিলের এপাশে ওরা নিচে নেমে যাচ্ছে। মহিলা অপলক। পিসিমণি ওর হাত থেকে বইটা নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে। পিসিমণি কী ভাবছে? থমথমে মুখ। পরির ভীষণ বাজে লাগে। এসময় পৃথিবীতে একটা অঙ্কুরোদগমও সম্ভব নয়। শুধু অথৈ নোনা জল। যত মোছ তত ঘাম। মহিলা কেন ডেকেছে?

হঠাৎ ও জিজ্ঞেস করে, পিসেমশাই কি আইভিকে দেখেছে? — গতকাল, আমিই বলেছি, আজ ও আসবে — হয়তো — মহিলার গজদন্ত দেখা যায়। পিসিমণি উঠে দাঁড়ায়। — আর কিছু বলার আছে? মহিলা যেন প্রস্তুত। শ্লেষসহ বলে, আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে জবাব দিতে পারি।

পিসিমণি আর দাঁড়ায় না। পরির হাত ধরে ঝড়ের মতন স্কুলের চৌহদ্দি পেরিয়ে চৌমাথায় নিয়ে আসে। ওকি তুলতে শুরু করে। বাড়িতে ঢুকে কলতলায় বমি করে। পরি চোখমুখে জলের ঝাপটা দেয়। তারপর কাঁধ ধরে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে পূর্ণগতিতে পাখা চালিয়ে দেয়। তারপর দোতলায় উঠে আসে। সিঁড়িতেই কান্না পেয়ে যায়। না জানি কেন বিছানায় উপুড় শুয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে। দোতলায় এত হাওয়া যে কোনও ঘরেই পাখার প্রয়োজন হয় না। হাওয়ায় উড়তে থাকে পরির চুল। সমুদ্রের শীতল দুরন্ত হাওয়ায় ধীরে ধীরে বাষ্প হয়ে যায় সমস্ত ঘাম এবং চোখের জল। সমস্ত দুঃখে এই হাওয়াই একমাত্র ভরসা। পরী চোখ বন্ধ করে বসে থাকে অনেকক্ষণ।

জ্যেঠিমণি দুপুরে খাওয়ার জন্যে ডাকে। জ্যেঠিমণির কাছে কিছুই গোপন রাখতে মন চায় না। রনির কথাও জানে জ্যেঠিমণি। নিজে খাওয়ার আগে পরি বলে, পিসিমণিকে ডাকি।

জ্যেঠিমণি বলে, তুই খা, ও খাবে না বলেছে, থাক — জ্যেঠিমণির মুখটা বিষণ্ণ। স্বগতোক্তির মতন বিড়বিড় করে, — অনেকে দেখে দেখে শেখে, আর এরা ঠকে, আঘাত দিয়ে, কষ্ট পেয়ে তারপর..... বাইরে থেকে কেউ পথ দেখাতে পারে না.. ..... ।

এক অব্যক্ত কষ্টে পরি ছটফট করে সারা দুপুর। বিকেল হয়। দেখতে দেখতে মেঘের ঘনত্ব বেড়ে কালো হয়ে যায়। হাওয়ার গতি বাড়ে। একটা পাখি এসে কার্নিশে বসে। হয়ত পথ হারিয়েছে। পাখিটা চেনা চেনা, পিঠে ছোটো ছোটো কাঁটা। ঢাউস পেট। হঠাৎ মনে পড়ে — এই তো! এই পাখিই একদিন লাউমাচার সব ফুল খেয়ে গেছে। অথবা এরকম আর একটি পাখি! হঠাৎ দেখে পুতুল খেলায় মগ্ন কিশোরী ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে। জ্যেঠিমণি এসে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু পরে ওদের অগোচরে সব ফুল শেষ করে যায়।

পাখিটাকে দেখে তাই গা শিরশির করে। ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। পাখিটা গ্রীবা বাঁকিয়ে এদিক ওদিক দেখছে। পরির মনে হয় এই মুহূর্তে রনিকে লেখা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা প্রাকৃতিক নিয়মে এগিয়ে যাক। সে লেখে, আমি বীতশ্রদ্ধ, কোনোদিন বিয়ে করতে চাই না—

এগুলি কি মনের কথা? চিঠির দিকে তাকিয়ে চোখ জলে ভরে ওঠে। ও কেন অকারণে মুছে নিতে যাচ্ছে একজনের অমল হাসি। আঁচল দিয়ে চোখ মুছে বাক্য দু'টি কাটে। তারপর আবার লেখে, প্রত্যেকটি মানুষ দ্বীপ হয়ে পড়ছে, দ্বীপগুলি সব দূরে দূরে যাচ্ছে। কাছাকাছি সবুজ দ্বীপটি অনেকদিন হল আর দেখা যায় না — এটুকু লিখেই ভাষা হারিয়ে যায়। কোনমতেই আর একটিও শব্দ জাগে না মনে। পরির কান্না পেয়ে যায়। আজ কী হল ওর? পিসি কেন নাম রেখেছে অপরাজিতা? আজ নিজের মনের কথা ঠিকমতন লিখে উঠতে পারছে না।

রনির চিঠিটা আবার পড়তে শুরু করে। শুধু হতাশা আর অন্ধকার নয়, আমি দেখেছি প্রভাতের দীপ্ত আলোর ছটা......রুপোর মতন উজ্জ্বল ঝর্ণাধারা, শুনেছি তার নিক্কন।

হঠাৎ শব্দ থেমে যায়। বৃষ্টি থেমে যায়। পাখিটা ডানা ঝাপটে জল ঝাড়ে। তারপর উড়ে যায়। কাঠের কার্নিশে পড়ে থাকে একটা ডিম। পরি অবাক। ডিমটা আকারে বাড়ছে। নানা রঙের দীপ্তি। ডিম আকারে বাড়তে শোনেনি কখনও। চোখ কচলায়। না, ঠিক দেখছে। ডিমটা বাড়ছে। ওর সামনে চিঠির প্যাডটা নেই। শূন্য বিছানা। ও প্যাডটা খুঁজতে থাকে।

তখুনি দেখতে পায় দেবদূতের মতন দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রনি। প্যাড হাতে মিটিমিটি হাসছে। দৃষ্টি সম্মোহনী। পরি নড়তে পারে না। রনি ওর রঙিন রাকশ্যাক বিছানায় নামিয়ে চেন খোলে। একটা সিরিঞ্জ বের করে। ডিমটাকে জাদুকরের মতন ধরে নিউক্লিয়াস ও পুরো এলবোমিন শুষে নেয়। পরি রবারের পুতুলের মতন বিছানায় অবশ। রনি আশ্চর্যদর্শন ছোট্ট অণুবীক্ষণের নিচে বিভিন্ন দ্রব্য ও এনজাইমের সঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করে এক আশ্চর্য দ্রবণ। পরি বিস্ফারিত চোখে সব দেখে।

রনি নতুন সৃষ্ট দ্রবণটাকে সিরিঞ্জে ভরে উঠে দাঁড়ায়। পরির ভয় করে। রনি বিছানায় হাঁটু দিয়ে উঠে ওকে জড়িয়ে ধরে। আলতোভাবে গায়ের জামা খুলে নেয়। কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। পরির বগলে, পেট ও পিঠের সন্ধিস্থলে মৌমাছির মতন হুল ফুটতে থাকে একের পর এক। পরি মোহাবিষ্টের মতন পড়ে থাকে। গলা দিয়ে অদ্ভুত গোঙানি। কী মিষ্টি দংশন! শরীর হালকা হয়ে যায়।

কী রকম ভবশূন্য! সে রনিকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মতন। কিশোরী চাঁদের আলো জানালা দিয়ে নিঃশব্দে ঢোকে। রনি ওকে পাঁজাকোলে বারান্দায় বের করে আনে। -- উড়ে যাও, তুমি ছুঁলেই ফুল ফুটবে! তারপরই রেলিং টপকে শূন্যে ছেড়ে দেয়।

পিসিমণি উঠোনে বসে চাঁদের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। পরি উড়ে গিয়ে ছুঁয়ে দেয়। পিসিমণি ফিক্ করে হেসে ফেলে। সেই হাসি নিয়ে পরি উড়ে যায়। উড়তে উড়তে সমুদ্র পেরিয়ে পৌঁছে যায় পার্শ্ববর্তী সবুজ দ্বীপে। সেখান থেকে লঞ্চে করে স্কুল কলেজে আসে অনেকে। চিরশ্রী দিদিমণির খোলা জানালার পর্দা ঠেলে ঢুকে পড়ে। পিসেমশাই চেয়ারে বসে কবিতা শোনাচ্ছে। পরি পিসেমশাইকেও ছুঁয়ে দেয়। পিসেমশাই স্বর্গীয় হাসে। গা-ছমছম-করা নৈঃশব্দে ভেসে ছুঁয়ে দেয় সে অসংখ্য বৃক্ষলতা। স্পর্শে প্রস্ফুটিত ফুলের সুবাসে রোমাঞ্চিত হয় বারবার। তারপর আবার জাহাজবাড়ির দোতলায় ফিরে আসে।

রনি জিজ্ঞেস করে, — লাউফুল খেতে ইচ্ছে করছে? পরি কিছুক্ষণ ভাবে। — কই না তো। রনি কীসের উল্লাসে দু'হাত শূন্যে তোলে। নিজেদের কাঠের রেলিং ধরে পরি দেখতে পায় সবুজ দ্বীপটি এগিয়ে আসছে। দু'হাত তুলে ভেসে যাচ্ছে,ওদের দ্বীপটাও। জ্যোৎস্না। আহা জ্যোৎস্নায় বিশাল বিশাল ঢেউ শূন্যে লাফিয়ে চাঁদকে ছুঁতে চাইছে। অজস্র ফুল ফুটেছে। সৌরভে দু'টি দ্বীপ ঘনিষ্ঠ হচ্ছে।

চা

সিদ্ধার্থ সিংহ

ঠকাস করে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে গজগজ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল রতি, — খালি চা, চা আর চা। উফ্ .....একটা লোক রাখো, বুঝলে, চব্বিশ ঘণ্টা চা বানিয়ে দেবে।

পবন কথাগুলো শুনতে শুনতে খবরের কাগজটা টেবিলের ওপর রেখে কাপটা তুলে নিল। ও কিছুতেই বুঝতে পারে না চা করায় রতির এত অ্যালার্জি কেন। অথচ এক্ষুনি বলো, দুম করে স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবে, এমন পকোরা করবে চেটেপুটে খেতে হবে, আর ওর হাতের আলুর পরোটার তো জবাব নেই।

অথচ চায়ের সময়!

পবন চা-টা একটু বেশিই খায়। সকালে বিছানা ছাড়ার আগে। তার পর মুখ ধুয়ে। খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে। বাজার করার আগে। বাজার থেকে এসে। এ কাজ ও কাজ সারার পরে। স্নান করতে যাবার আগে। আর যেদিন অফিস ছুটি থাকে সেদিন তো কথাই নেই, ঘণ্টায় ঘণ্টায়। যত দিন যাচ্ছে চায়ের প্রতি পবনের আসক্তিও যেন ততই বাড়ছে। আসলে পান বিড়ি তো ছোঁয় না, নেশা বলতে ওই একটাই।

আরেকটা নেশা অবশ্য আছে সেটা হল নাটক। সখেই করে। পাড়ায় একটা দলও গড়েছে। নিজেও চেষ্টা-চরিত্র করে লেখার। সেই সুবাদে দু'চারজন আসে। কেউ কেউ আবার ঘরের লোকই হয়ে গেছে।

তেমনই একজন সুজনদা। সেদিন সুজনদার তাড়া ছিল। দুটো কথা বলেই চলে যাবে। কিন্তু খালি মুখে যেতে দেবে কে? রতি? মুহূর্তে এক কাপ চা নিয়ে এসে হাজির।

— ও খাবে না? চায়ের প্লেট হাতে নিতে নিতে প্রশ্ন করল সুজনদা।

— ওই তো কাপ। এক্ষুনি খেল। এখনও বোধহয় গলা থেকে নামেনি।

— আরে, দেবে দেবে। তুমি চুমুক মারো না। মাঝখানে ফোড়ন কেটেছিল পবন।

— না, সত্যি করিনি। পবনের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে কথাটা উচ্চারণ করেছিল রতি। মুহূর্তে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল পবন। ফ্যালফ্যাল করে একবার রতির দিকে একবার সুজনদার দিকে তাকাচ্ছিল।

— ঠিক আছে বউদি, একটা কাপ নিয়ে আসুন, আমরা ভাগ করে খাই। এই বেলায় এতটা চা খাবো না।

— না না, থাক। পবন বললেও শেষ পর্যন্ত ভাগাভাগি করে দুজনে মিলে ওই চা খেয়েছিল। কথায় কথায় সেদিন সুজনদার কাছে রতি অভিযোগ করেছিল পবনের এই ঘন ঘন চা খাওয়া নিয়ে। — ক' দিক সামলাবো বলুন তো। একটা রান্না ঠিক মতো করবো, তারও উপায় নেই। এই চা.......

— বারবার করেন কেন? একবারে বেশি করে বানিয়ে ফ্লাস্কে রেখে দেবেন। যখন দরকার হবে নিজেই ঢেলে নেবে। আপনার বউদি তো তাই-ই করে।

— তাতে লাভ নেই। তখন দেখবেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা করে ফ্লাস্কে ভরতে হচ্ছে। এত চা খায়.. ..নিজের বুঝটাও বোঝে না, দেখুন কত চুল পেকে গেছে....শুধু সুজনদাই নয়, বিভিন্ন সময়ে আরও অনেকেই বলেছে এই ভাবে ফ্লাস্কে চা রাখার কথা। কিন্তু কে শোনে কার কথা! ফ্লাস্কেও চা করে রাখবে না, আবার কয়েকবার করার পর, ফের চা করতে বললেই তার প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে আছড়ানো দাপড়ানোয়।

যেমন আজ হয়েছে। পবন মাঝে মাঝে ভাবে, সংসারে যদি একটা বাচ্চা-কাচ্চা থাকত, তা হলে হয়তো.... কিন্তু কি আর করা যাবে! দেখতে দেখতে বিয়ের দশ-দশটা বছর কেটে গেল। তখন যদি দুম করে আলাদা না হতাম। ভাবতে ভাবতে পবন চুমুকে চুমুকে চা-টা শেষ করে তড়িঘড়ি ব্যাগটা নিয়ে বাজারের দিকে পা বাড়াল। ঠিক করল, বাজারে যাবার সময় রতি যেগুলো আনার কথা ওকে বারবার করে বলে, এবং যথারীতি ও ভুলে যায়, আর তা নিয়ে কথা শুনতে হয়, সেগুলো ও আজ আগে আগেই কিনবে। সেই মতো ডালের বড়ি, লেটুস পাতা, গ্রামগঞ্জ থেকে আসা বউদের কাছে ঘুরে ঘুরে বকফুল আর নুরুল পাতা কেনার পর ও বাজার শুরু করল।

ব্যাগ উপুড় করার পর রতি কি আর চা না করে পারবে? পাখাটা পাঁচে চালিয়ে হেলান দিল চেয়ারে। এমন সময় রান্নাঘর থেকে কানে এল, — আর দিন পেল না, আজই নিয়ে এল একগাদা বকফুল। এতগুলো ভাজাভাজি করেছি, থাকবে? যোগ নেই জিজ্ঞাসা নেই, দুম করে আনলেই হল। আমাব কী? আমি করে দিচ্ছি। খাও, আর মুঠো মুঠো জেলুসিল গেলো।

পবন দেখল আবহাওয়া খারাপ। স্নান করতে ঢুকে গেল।

অফিসের কাজটুকু তুলে দিয়ে ও সোজা চলে যায় রিক্রিয়েশন ক্লাবে। আজও গেল। চারটে থেকে নাটকের রিহার্সাল। কিন্তু নায়িকার রোলটা যে করছে সে একদম আনকোরা। নতুন জয়েন করেছে অফিসে। ওর সেকশন ওপরে। চারতলায়। ও তিনটের মধ্যে নেমে আসে। না, কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নয়, সত্যিই ওর পার্টটা ও ঠিকঠাক মতো করতে চায়। যাতে কেউ হাসাহাসি না করে। তাই অন্যেরা আসার আগেই পবনের কাছে খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো ও জেনে নেয়।

মাত্র ক' দিনের আলাপেই বেশ খোলামেলা হয়ে গেছে মেয়েটা। মেয়েটা একই দৃশ্য নানান রকম ভাবে করার চেষ্টা করছিল আর বারবার জানতে চাইছিল কোন ভাবে করবে। কিন্তু ওদিকে একদম মন ছিল না পবনের। মাঝে মাঝেই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ মেয়েটাকে বলল, 'একটা কাজ করো, দুটো লাইন লিখে দাও তো....'

— কী?

— বলছি.... বলে পবন গিয়ে দেয়াল আলমারি থেকে তাসের পয়েন্ট লেখার খাতাটা বের করল। ভেতর থেকে একটা পাতা টান মেরে ছিঁড়ে, পাতাটা খাতার ওপর রেখে এগিয়ে দিল। বুক পকেট থেকে পেন। 'চিঠির আকারে লিখবে, বুঝলে?'

— কী লিখবো? মুখ তুলল মেয়েটা।

— লেখো, পবন, পরশু ঠিক তিনটেয়, মনে থাকে যেন। লিখে নিচে নাম আর ডেট দিয়ে দাও।

মেয়েটা লিখতে লিখতে বলল, কী করবেন এটা দিয়ে?

— লেখোই না, পরে বলব।

ঝটপট করে লিখে খাতা কলম আর লেখা পাতাটা এগিয়ে দিল মেয়েটা, 'এবার বলুন।'

মাথা নাড়ল পবন। 'আজ নয়, অন্য দিন।' বলতে বলতে কাগজটা ভাঁজ করে বুক পকেটে গুঁজে রাখল।

পবনদের বাড়িতে ধোপা আসে রোববার রোববার। রতি তখন হাতড়ে হাতড়ে এ আলনা ও ওয়্যারড্রব থেকে শাড়ি-জামা-প্যান্ট টেনে টেনে নামায়। পকেট-টকেট দেখে শুনে শুনে এগিয়ে দেয়।

সেদিন জামার পকেট দেখতে গিয়ে রতির হাতে উঠে এলো সেই চিরকুটটা, যেটা পবনের অফিসের ওই মেয়েটা লিখেছিল।

একমাত্র রোববার দিনই ওরা একসঙ্গে খাবার টেবিলে বসে। এবং একনাগাড়ে বক বক করে যায় রতি। কিন্তু আজ পবনের কথায় হ্যাঁ, হুঁ, না — উত্তর দেওয়া ছাড়া প্রায় মুখই খুলল না সে।

রাতে বিছানায় উঠেও খুব একটা কথাবার্তা বলল না রতি। পবনও অনেকক্ষণ চুপচাপ ছিল। তার পর পাশ ফিরে একটা হাত টান টান করে রতির বুকের ওপর তুলে দিলে।

— আবার আমার দিকে কেন? একটা হাত দিয়ে পবনের হাতটা সরাতে চাইল রতি।

— কী হলো? বুকের ওপর রাখা হাতটা দিয়েই রতিকে আলতো চেপে ঝাঁকি দিল পবন।

— 'কিচ্ছু না?'

— কিচ্ছু না মানে? পবন নিজের দিকে ফেরাতে চাইল ওকে।

— যাদের দিকে যাবার তাদের কাছে যাও। নড়েচড়ে শক্ত হল রতি।

— হ্যাঁ, সেই জন্যই তো তোমার কাছে এসেছি।

— ছাড়ো, আমি সব বুঝি, ভেবেছো ডুবে ডুবে জল খাবে, কেউ টেব পাবে না, না?

— কী বলছো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

— এখন তো কিছুই বুঝতে পারবে না। কাল তিনটের সময় কোথায় যাচ্ছো?

— কোথায়?

— কোথায়? না? সুশ্রী কে?

— সু.....শ্রী.....

— এখন তো চিনতে পারবে না। চিঠিটা দেখাবো?

— ও........., কাল তিনটেয়? তাই বলো. ... হ্যাঁ, সুশ্রী, আমাদের অফিসের ওই নতুন মেয়েটা গো....আসলে আমি ঘন ঘন চা খাই তো, তাই কাল বলছিল, সোমবার দিন আপনাকে আমি চা খাওয়াবো। দেখি, ক'কাপ চা খেতে পারেন। তা আমি বললাম — তুমি তো আবার চার তলায় , চা খাওয়ার জন্য অত সিঁড়ি ভাঙতে পারবো না। তখন ও বলল, ঠিক আছে, আপনি রিক্রিয়েশন রুমে ঢোকার আগে ওই বিহারিটার দোকানে চলে আসুন না. ঠিক তিনটেয়, আমি থাকবো। তা আমি বললাম, যদি মনে থাকে। তখন ও বলল, এটুকু মনে থাকবে না? রুমালে একটা গিঁট দিয়ে নিন, আচ্ছা দাঁড়ান, একটা চিরকুট লিখে দিই। তাহলে মনে থাকবে তো? বলেই খসখস করে ওটা লিখে দিল, কী করি, সামনে তো ফেলা যায় না, তাই পকেটে রেখে দিয়েছিলাম। আর তুমি ভাবছো.....

পবনের দিকে পাশ ফিরল রতি। না, তুমি ওর সঙ্গে চা খেতে যাবে না।

— কেন?

— 'না।' পবনের বুকে মুখ গুজল রতি।

— আসলে চা-টা তো....

— আমি তোমাকে করে দেবো। যখন চাইবে, যত কাপ খাবে, বলবে, আমি করে দেবো, তুমি ওর সঙ্গে চা খেতে যেতে পারবে না।

— ঠিক আছে। শব্দ দুটো উচ্চারণ করল দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো করে। 'তুমি যখন বলছো ....' বলতে বলতে দু'হাতে আকড়ে ধরল রতিকে। পবন টের পেল, বুকের ওপর একটা দুটো জলের ফোঁটা পড়ল। সঙ্গে ঘন ঘন গরম নিশ্বাস। মনে হল, রতি এক্ষুনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।

দেওলা

সুব্রত কুমার রায়

রাত্রির পাতাঝড়ের অবশেষ নিয়ে জেগে উঠেছে ভিটেমাটি-সহ তিনপোতার ঘর। তিনশো বছরের ইতিহাসের নিঃসঙ্গতার কোন সাক্ষী নেই, শুধু ভিটের খুটি চেপে ধরা সাধু আমগাছটা ছাড়া। তবু ক্ষয়ের চিহ্ন তিনপোতার ঘরগুলোয় বিধবার মতো প্রকাশ্য।

উত্তরপোতার ঘরের দরজার শেকল খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন ভুবনমোহন, যিনি বিগত অর্ধশতাব্দীর ভাঙ্গনের কিছুটা সাক্ষ্যপ্রমাণ দিতে পারেন। ভুবনমোহন এই বংশের শেষ সামন্ত ভূস্বামী। যদিও এখন একফালি বিচরাতে বেগুনেব পোকা মারতে কীটনাশক ছেটাতে হয় তাকেই।

তামাকের গুঁড়ো দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে পুকুরের সার্বেকি ঝামা সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা' দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। শ্যাওলারঙ জলের উপর ভাসমান ছোট পানার মধ্যে থেকে একটা ফুলে ওঠা ইটলাল শাড়ির কিছুটা চোখে পড়লো তাব। কোন দুর্ঘটনাস্থল থেকে মর্গে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার পব মৃতদেহের চারদিকে চক দিয়ে আঁকা আউটলাইনটা হঠাৎ চোখে পড়ার মতো এই দৃশ্য। মৃতদেহ নেই, তবু অনেক অনেক দিন আগে ঘটে যাওয়া এরকমই একটা মৃত্যুর কথা মনে পড়ে গেল ভুবনমোহন দাসেব।

— অই ঘরটা তো পরে অয়। আসাম থাকি হাত্তির পিঠো করিয়া সোনাব কাট আনাইয়া। তখন কাটোর দোতালা আচিল।

আয়তক্ষেত্র উঠোনটায় বসে কথাগুলো বলছিল পরানদাদী। পাশে তার বোন বাসন্তী। বসলে একটু দূর থেকে মনে হয় তিন মাথা — দুটো হাঁটু মাথার সাথে ঠক্ ঠক্ করে অবিরাম কাঁপে। এই ছয় মাথার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল তিনঘরের পোলাপানরা।

— তোমার বয়স কতো পরানদাদী?

— বয়অস — তা কতো অইব। ছয় কুড়ি তো অয়বউ। হউ যুদ্ধোর বছর জন্মো। নেউলের গর্তের মতো মুখের ভেতর থেকে কথাগুলো অনেকটা থুতুর সাথে বেরিয়ে এলো।

— বড় ভইচালোর পরর বছঅর রেলোর লাইন বইলো। কতো লোআলক্কর আইলো ইতার ইসাব নাই। কোমপানি আপনারার জমির উফরোউ রেললাইন বয়াইলো। একটু থামলো পরানদাদী। একবার উপরের দিকে তাকিয়ে বেলা ঠাওর কবলো। আরো কয়েকটা পাড়া ঘুরতে হবে। তারপর হয়তো শনের ঝুপড়িতে ফিরে গিয়ে কিছুটা ভাত চড়াতে পারবে। পরানদাদী এই বাড়িতে কাজ করেছে, মুনিষ খেটেছে। তার বোনও বড়বাড়িতে দাসিবান্দিগিরি করেছে।

—তকনো কিছু বদলাইচে না।

শুধু কাঁচা পয়সার ঝন্ ঝন্ শব্দ কমে আসায় দত্তপাড়ার লোকেরা ঘুমুতে পারতো। আর যে সব ভিটেগুলোয় একসময় পুকুর দিয়েছিলেন ভুবনমোহনের বাবা অনঙ্গমোহন সে সব

জায়গায় আবার ভিটে উঠতে শুরু হয়েছিল। আর হাতির শুঁড়ের মতো বড়বাড়ির সিঁড়ির রোয়াকে শ্যাওলা জমতে শুরু হয়েছিল।

—ছোটকর্তাবে ঘোড়াত চড়া শিখাইতে একদিন শিউড়ার মাটে লই গেলাম। তকনো কৃষ্ণগোবিন্দ আইছইন না।

এই বাড়ির সব ছোটরা পরানদাদীর মুখে এই গল্প অনেকবার শুনেছে। পরানদাদী চোখে প্রায় দেখেই না তাই দেখতে পেলো না কখন তার চারপাশ থেকে সব একে একে চলে গেছে। কেউ গেছে জঙ্গলবাড়িতে — কাল রাতের ঝড়ে মাটিতে পড়ে থাকা অজস্র জামরুল তুলে আনতে, কেউ গেছে বিচরাতে কচি লাইপাতা তুলতে, কেউ সুখ ধরে পড়তে। শুধু পরানদাদী আর তার বোন যে আমগাছটায় ঠেস দিয়ে বসেছিল সেই তাদের থেকেও বয়েসি সাধু আমগাছটা শুনে যেতে থাকলো তরাইকান্দির বদলে যাবার গল্পটা।

তরাইকান্দি হয়তো একইরকম থাকতো। যদি না তরাইকান্দি জংসানে একটি মাত্র ট্রেন আসার শব্দের মতো খবরটা ছড়িয়ে পড়তো পুরো গ্রামে। ছড়িয়ে পড়া নয় শুধু, নড়িয়ে দেওয়া। এবং খবরটা ছড়ালোও বড় অদ্ভুতভাবে। বউটুনটুনির মুখ থেকে শাঁকচুন্নির মুখ হয়ে রিটাগাছ থেকে মজা কুয়ো হয়ে বাঁজা রুবীর মুখ থেকে লাউড়া বৈষ্ণব হয়ে হুঁকোর জল থেকে সতীর মাঠ থেকে কলকলিঘাট খুব তাড়াতাড়ি বাতাসে আকাশে মাটিতে খুঁটিতে ছড়িয়ে গেল খবরটা। গ্রাম উজিয়ে সবাই সেদিন ছুটে গিয়েছিল সত্যেন্দ্রচন্দ্র মজুমদারের পেল্লায় বাতাসবাড়িতে।

বাতাসবাড়িই তো — সে-ই বাড়ি যার ঘরের ভেতর সবসময় বাতাসের আকাল। এ ছাড়া বাড়িটার দক্ষিণপূর্ব কোণ দিয়ে ঢুকে ঈশান কোণ হয়ে একটা শরের বাতাসও নাকি রোজ বয়ে যায় ঠিক ত্রিসন্ধ্যাকালে। বিষহরিঠাকুর জওয়াপ নিয়ে জানিয়েছিলেন বাড়ির ঈশানকোণে ভৈরবীর থলা আছে। এই বাড়ির ভেতর দিয়েই ওনার যাতায়াতের পথ। সেদিন বিষহরিঠাকুরকেও দেখতে হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। ভিড় করে এসেছিল গ্রামের সব যুবতী বউ মেয়েরা। বিষহরিঠাকুরকে ভর করার পর তাদের ছুঁয়ে দিলে সব দোষটোষ কেটে যায়। তা বিষহরিঠাকুরকে দেখতে সেদিন হিড়িকই ছিল।

ল্যাংটা সাধু যেদিন এলেন সেদিন তরাইকান্দির জাতীয় উৎসবের দিন। সারা গায়ে ভুষি মাখা ল্যাংটা সাধু বসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের ফটক ঘরের ময়ূরতোলা কাঠের পালঙ্কে। চারদিকে ভিড়। সেই ভিড় সত্যেন্দ্রনাথের কাঠের দাওয়া, বারান্দা, উঠোন, পুকুরপাড়, রাস্তা, ট্রেনলাইন, তরাইকান্দির সীমান্তের পানের বরজ ছাড়িয়ে চলে গিয়েছিল বড়াইল পাহাড় পর্যন্ত, এই পর্যন্ত এসে ভিড় একটু কমেছিল কারণ তা না হলে সেই ভিড়ে বুনো হাতিরপালের রাস্তাও বন্ধ হয়ে যেতো।

গাঁয়ের মুরব্বিরা নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে বলাবলি করছিলেন অনেক সাধু তারা দেখেছেন কিন্তু এরকম সাক্ষাৎ মহাপুরুষ তারা দেখেননি। শেকলবাঁধা পীর, শীর্ষাসনরত ঋষিঠাকুর, মুখ দিয়ে আগুন বেরোনো তান্ত্রিক, বড়শিগাঁথা সাধু, লিঙ্গহীন ব্রহ্মচারী— এরকম অনেক অনেক পীরফকির সাধু আগে তরাইকান্দিতে এসেছেন। কিন্তু এই ল্যাংটা সাধু গ্রামের সীমানায় পা' রাখার সাথে সাথে যে কাকটা তিনপুরুষ ধরে রোজ ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বেল তলাতে অলুক্ষুণে সুরে ডেকে যেত তার ডাক থেমে গেছে, বেলুর আউলা ছেলে ভালো হয়ে গেছে, বাঁজা রুবীর পেট ভারী হয়েছে আর সব চেয়ে বড় কথা ঠিক তখনই ভুবনমোহনের মাথার ঠিক মাঝখানে একটা টিকটিকি পড়ে ডানদিক দিয়ে নেমে গেছে।

তরাইকান্দি যেন এই দিনটারই অপেক্ষা করছিল। গাঁয়ের মাথারা সেদিনই হঠাৎ উপলব্ধি করলেন অবশেষে তরাইকান্দিতে একটা কিছু ঘটতে চলেছে।

ল্যাংটা সাধুকে একপলক দেখার পর সবার মুখে ফুটে উঠেছিল বিস্ময়। এরকম মহাপুরুষ তারা দেখেন নি। এক বিশাল ময়দার দলাকে থেবড়ে থুবড়ে একটা বেঢপ আকার দেয়া হয়েছে। যেন ব্রহ্মার হাতে খুব একটা সময়ও ছিল না। কোমর, পেট, ঘাড় আলাদ করে চেনা যায় না। ঘাড় মাথায় এক, আর সে মাথা মাথা তো নয় কুমোরের চাকে ওঠা মাটির ঘট। কামানো সেই মাথার পেছনে একগোছা চুল। মুখমণ্ডলে অদৃশ্যপ্রায় কুতকুতে চোখ আর সরু নাকের ফুটো চর্বির দু'পরতের নিচে। প্লাস্টার-অব-প্যারিসের-গোলারঙ শরীরে সাদা পৈতে ঢিবি-পেট আর ছিবড়ে ঘাসের মতো লোমশ বুকের উপত্যকা ডিঙিয়ে হারিয়ে গেছে। মুখে দিব্যভাব (এই দিব্য বা ভগবানে ঘোর আপত্তি বসন্ত পাগলের। ভগবানের দোহাই শুনলে সে না বলে পারে না : ভগমান তো তোর বান্দা মাগী। পুন্দো ঘা। থু থু।) আর ল্যাংটা সাধুর শরীরের লক্ষণগুলো অনেকক্ষণ দেখার পর অন্নদা বেশ জোরেই বললেন — সাক্ষাৎ মহাপুরুষ. তারপর চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে যেন আপনমনেই বললেন — ভগবানের অবতার।

ল্যাংটা গোঁসাই এসেছেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে। ঢাকা দক্ষিণ, সিলেট হয়ে অবশেষে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে। আর যে পথ দিয়েই তিনি এসেছেন সেই পথের জনপদও উঠে এসেছে তার সাথে।

এ সেই সীমান্ত পারাপারের কাহিনী। একটা দ্বিখণ্ডিত দেশের মানুষের এপার ওপার হবার গল্প, শেকড় উপড়ে বৃক্ষের জঙ্গম হবার গল্প, যে গল্প ফুরোয়না, যে গল্প ওগ্রামানুষ থেকে চোদ্দপুরুষ হয়ে আজ তরাইকান্দিতে এসেছে। আর এসেছে গোঁসাই-এর গাওয়া গানের এই কলিটা :

চলগো বইনারি
যাইগো হিন্দুস্থান
হিন্দুস্থানের চাম্পাকলা
খাইলে খাইমু আধাখান।

যখন এই গানের ঢেউটা আছড়ে পড়েছিল সত্যেন্দ্রনাথের কাঠের দরজায় তখন তিনি দরজার হুড়কো খুলে দেখতে পেয়েছিলেন — একটা গল্প, দূরে বিন্দু থেকে বিন্দু বিন্দু মানুষের পাবদ বিন্দু এগিয়ে আসছে — ক্রমশ দিগন্তে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর, একফালি সূর্যের আলোর ক্ষীণ কোলাজে হয়তো দাঙ্গার গল্প জমে উঠেছিল তার শেষ রাতভোর চোখে, যেহেতু তখন দাঙ্গার গল্পে রূপকথা জমে উঠেছে লণ্ঠনের চারদিকে পোকার মতো। কিন্তু না, একটু পরেই ভুল ভেঙেছিল তার। বিশ্বাস থেকে অবিশ্বাসে দোদুল্যমান তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন।

এগিয়ে গিয়েছিলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠার দিকে। হয়তো ধূলিধূসরিত সেইসব পায়ে আর্যদের চকিত আক্রমণে দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডাদের তৃণাচ্ছাদিত গৃহকোণ থেকে নির্গত বিসর্পিল রক্তাক্ত আলপনার চিহ্ন ছিল, যে চিহ্ন কোন প্রাক্ ইতিহাসে ঈজিপ্ট থেকে ইহুদিদের সেই উদ্বাস্তু পরিভ্রমণে লোহিত সাগর পেরোনোর লবণাক্ত অশ্রুসিক্ত নাব্যতা নিয়ে হ্রেষাধ্বনি, বলাৎকার, শিশুহত্যায় রক্তস্রোত শতশত সূর্যোদয় শেষে থমকে দাঁড়িয়েছিল আউসভিৎজ, ট্রেবেলিংকা, ডাচাউ, সবিবর হয়ে এই পৃথিবীর উত্তরপূর্ব প্রান্তসীমায়, যেখানে ক্ষুধার্ত, লজ্জাহীন, শেকড়হীন মানুষ, কুকুর আর ইঁদুরে ভরে উঠেছিল দীর্ঘ হা হা প্ল্যাটফর্ম, ভরে উঠেছিল দুই দুইটি দেশের স্বাধীনতার গু'মুতে — এবং তরাইকান্দি সেই নিরাশ্রয়ের একটা আশ্রিত নাম দিয়েছিল — কৃষ্ণগোবিন্দ। গোঁসাই কখন কবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টেদিয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ হলেন তা বোধহয় তরাইকান্দির বৃদ্ধ পিতামহ পেঁচাও জানেন না। তো সেটাও হল একটি মাত্র বাক্যের উচ্চারণে।

সেই গো গো ভিড়ময় নীরবতার মধ্যে হঠাৎ মৌন ভেঙ্গে যখন কৃষ্ণগোবিন্দ বললেন, 'হারু তোর ছিকায় একটা পাকা আম আছে নিয়ে আয়, আমি খাবো।' হারু করজোড়ে সামনেই দাঁড়িয়েছিল। কার্তিক মাসে পাকা আম। হারু প্রথমে ভাবলো, এ দিব্যজ্ঞ মানুষের রহস্য, ইঙ্গিত।

সে বলল, 'আজ্ঞে, আমের চটি আছে, আনবো?'

আমের কথায় যে ভিড় গুঞ্জন তুলেছিল তা এবার একটু নীরব হল, আর লীলা শব্দটা আমের বদলে ছড়িয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

একটু পরে আবার মুখ খুললেন কৃষ্ণগোবিন্দ, 'হারু, আমটা নিয়ে আয়, আমি তো বলছি ছিকায় পাকা আমই আছে।'

হারু পইটার জট খুলতে পারছিল না। সে হাত কচলে বললো, 'ঠাকুর, অন্য কিছু যদি বলেন তাহলে আপনার সেবায়—' কথাটা শেষ হবার আগেই হারুর কথার পিঠে কৃষ্ণগোবিন্দের আদেশের চাবুক আছড়ে পড়লো। 'যা, ঘরে গিয়ে দ্যাখ, তুই আমই পাবি।'

সত্যেন্দ্রনাথ হারুকে আস্তে আস্তে বললেন, 'যাওনা, গুরুদেব যখন বলছেন তখন গিয়ে দেখোনা।'

ডাক্তারকাকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে 'ঠাকুরের লীলা' বলে লীলা শব্দটাকে আরো খেলিয়ে দিলেন বাতাসে । শুধু পর্দার আড়াল থেকে ভুবনমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুলতা একটা ছোট্ট ঢিল ছুঁড়লো ভুবনমোহনের একনিষ্ঠতায় লীলার গাছ — কথাটা শুধু শুধু কৃষ্ণগোবিন্দ এবং ভুবনমোহন শুনতে পেলেন।

হারু একা গেলনা, সঙ্গে সাক্ষীও নিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এলো একটা পাকা আম হাতে।

অনেকেই পরে বলেছে এ আম গ্রামের কোন গাছের নয়। অনেকে এও বলেছে এরকম আম তারা দেশের কোন জায়গায় দেখেনি। দুধ আলতা রং এর সেই আম, যার রসে ডুমো মাছি বসলে আটকে যাচ্ছিল আর যার বিচিটা ছিল সেই বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতো, একবিঘা আমে তিন বিঘা আঁটি। গ্রামের অনেকে বলেছে যে আমটা নাকি নন্দনকানন থেকে পেড়ে আনা (অনেকেই এর আগে স্বর্গের বাগানটার নাম পর্যন্ত জানতো না)।

আমটা খেয়ে কৃষ্ণগোবিন্দ হাত ধুয়ে আমের আঁটিটা পুঁতে দিলেন সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির সিঁড়ির ডানদিকে। সেই সিন্দুরী আমের অবশেষে একদিন খেং বেরোল, খেং থেকে চারা হল, চারা থেকে গাছ। সে গাছে শেষ পর্যন্ত আমও ধরল। তরাইকান্দি গ্রামের পরিবর্তনের আরেক জীবন্ত সাক্ষী হচ্ছে এই সিন্দুরী আমগাছটা। এ গাছের গাছ হয়ে ওঠা আর ল্যাংটা গোঁসাই ঠাকুরের একটুকরো মার্গিন কাপড়ে লজ্জা ঢেকে ধীরে ধীরে কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর হয়ে ওঠার গল্প একই।

ভুবনমোহন এখনও ভাবেন যে সবকিছুর মূলে সেই আম বা আমের মতো কোন না কোন লোভনীয় ফল। বাইবেলে নাকি বলেছে কোন এক নিষিদ্ধ ফল খেয়ে এই যতো আদমের পাল; এমনকি রামায়ণেও ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বলেছিলেন, "সেই ফল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ/সঙ্গে করি লৈয়া যাহ করিব গমন।/মর্ম্ম বুঝ সবে কৃত্তিবাসের সুবাণী/ নারীর ছলনে ভুলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি।।" পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক নিউটন আর সেই আপেলের গল্পও ভুবনমোহন জানেন। এ ছাড়াও ইংরেজরা তো ওই আমগাছের তলায় বাঙালিকে হারিয়ে ভারতবর্ষের রাজা হয়েছিল। ভুবনমোহন ভেবে দেখেছেন তরাইকান্দির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্য ঘুরেফিরে সেই আমই দায়ি।

কিছুদিন আগেও ভুবনোহন জানতেন না যে আম পেতনীদেরও প্রিয়। কিন্তু যেদিন সুলতার দূর সম্পর্কের ভাই (যে শহর থেকে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে বেড়াতে এসেছিল) বিভুর মুখ থেকে জলজ্যান্ত ঘটনাটা শুনলেন তিনি, সেদিনই আমের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আরও বেশি স্থির নিশ্চিন্ত হলেন।

ঘটনাটা এ রকম : গতরাত্রে খুব্ ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। বিভু এর অপেক্ষায়ই ছিল। সে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল, আমগাছের তলায় অনেক অনেক আম পড়ে আছে আর সে কুড়িয়েও শেষ করতে পারছে না। সারারাত একরকম ঘুমোয় নি সে। একটা এডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছিল।

আকাশ ফর্সা হবার আগেই বিছানা থেকে চুপিসাড়ে উঠে গিয়েছিল বিভু। রান্নাঘর থেকে সঙ্গে নিয়েছিল টুকরিটা। তারপর দরজাটা নিঃশব্দে খুলে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। সময় যাকে বলে তখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। একটু ভয় পেল সে। গ্রামের পরিবেশ। সবকিছুই খুব অপরিচিত তার কাছে। কিন্তু যখন ভুবনমোহনের সযত্নলালিত বিচবাটা পেরিয়ে তার চোখ খালিবাড়িটার দিকে গেল তখনই যেন তার চোখে ভেসে উঠলো দৃশ্যটা।

কাল বিকেলেই বাড়িটার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গাছগুলো দেখে রেখেছে সে। কয়েকটা ঝাঁকড়া বিশাল আমগাছ ঝাঁপিয়ে আম, শুধু আম, যেন পাতা থেকেও বেশি। আধা কাঁচা পাকা আমগুলোর ফাঁক দিয়ে আকাশটাকেও তার মনে হয়েছিল মুখ লুকিয়ে আছে। শুনেছে বেড়াটেড়া হীন জায়গাটা পরিত্যক্ত — পোড়ো। সুতরাং চুরিরও প্রশ্ন ওঠে না। প্ল্যানটা তৈরি হয়েছিল তখনই। বাড়ির কেউ জাগবার আগেই ঝুড়ি ঝুড়ি আম এনে চমকে দেবে সবাইকে। সুযোগ যে এতো তাড়াতাড়ি জুটে যাবে ভাবেনি বিভু।

থরে থরে মাটিতে পড়ে থাকা আমের ছবিটা চোখে ভেসে উঠতেই তার চোখ থেকে একই সাথে ঘুম আর ভয়ের রেশটাও হারিয়ে গেল। টুকরিটা নিয়ে বাড়ির সদর রাস্তাটা দিয়ে বেরিয়ে এক পাক ঘুরে খালিবাড়িতে চলে এলো সে। একটু শীত শীত লাগছে। ভেজা পাতা, জায়গায় জায়গায় জমা জল, ভাঙ্গা ডাল, — এর মধ্যেও লুকিয়ে পড়েনি আমগুলো। এতো আম এক জায়গায় জীবনে দেখেনি বিভু। যেন আমের গালিচা — পা' রাখলেই বসে যাবে। পাশে টুকরিটা রেখে আর সময় নষ্ট না করে কুড়োতে বসে গিয়েছিল বিভু। উবু হয়েই আম কুড়িয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে রাখছিল ঝুড়িতে। ঘোরের মধ্যে ছিল সে, আম কুড়োনোর ঘোর। একটু পরেই সে যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে টের পেল তার পেছনে অনেকগুলো মানুষ ছায়ার মতো নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করছে। আর তারপরই হু হু করে উত্তুরে হাওয়ার মতো ভয় তার শরীরের রোমকূপে ঢুকে গেল। মাথাটা প্যান্ডুলাম মোশনে মাটির দিকে নামানোর সময় — তাকাবে না — এরকম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃষ্টি দু'পায়ের ফাঁক গলে পেছনে গেল তার। অন্তত পনরোটা কালো কালো লিকলিকে হাড্ডিসার পেতনি হাত চালিয়ে দিব্যি তার আমে ভর্তি ঝুড়িটা ফাঁকা করে দিচ্ছে। পেতনিগুলোর হাতে লম্বা লম্বা কালো নখ, লম্বা ময়লা রিটেঘষা লালচে চুল।

বিভুর মনে হচ্ছিল তার হৃৎপিণ্ড যে কোনও সময় থেমে যেতে পারে। তবু, নীরবে একই এ্যাকশনে অবিরাম সে আম কুড়িয়ে যেতেই থাকল। কতক্ষণ তার খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হল তখন আকাশ ভরে গেছে ভোরে। সে টের পেল তার পেছন থেকে কখন যেন নিঃশব্দে ছায়া-পেতনিরা সরে গেছে আর তার টুকরিতে একটাও আম নেই।

সেদিন ভোরে বিভুর গল্পটা শোনার পর ভুবনমোহন শুধু বলেছিলেন : এ কি তুই জানিস না, ওখানে ছোট বাচ্চাদের কবর দেওয়া হয়। আর এই কথা বলেই ভুবনমোহনের মনে পড়ে গিয়েছিল তার প্রথম পক্ষের মেয়ে শিমুকে ওখানেই গোর দেওয়া হয়েছে। বিভু

যাদের দেখেছে শিমুও তাদের মধ্যে ছিল না তো। ভুবনমোহন একবার ভেবেছিলেন বিভুকে কথাটা জিজ্ঞেস করেন কিন্তু পর মুহূর্তেই তার খেয়াল হয়েছিল বিভু শিমুকে জীবনেও দেখেনি। এবং তখন, তখনই সেই টনটনে ব্যথার সঙ্গে ভুবনমোহন উপলব্ধি করেছিলেন তার একমাত্র সন্তানের স্মৃতির সাথে সেই আমই জড়িয়ে রয়েছে।

তা সেই আমের আঁটি গ্রামের মাটিতে পোঁতার সাথে সাথে তরাইকান্দির ঘরে ঘরে ঘটে ঘটে আম্রপল্লব হয়ে গেলেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

যে গোপালের আখড়ায় দু'একজন ভিখিরি বৈষ্ণবের নেড়া বাঁধা ছিল সেখানে কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর আসার পর তার নাটমন্দির দালান হল। এতদিন যে নাড়ুগোপাল তরাইকান্দির গ্রামবাসীদের মতো খড়ের দো-চালা ঘরে ছিলেন এবার তার জায়গা হল পাকা ঘরে।

এতদিন একটা ধন্দ ছিল তরাইকান্দির সবার। সেটা হচ্ছে — কৃষ্ণগোবিন্দই গোপাল না গোপালই কৃষ্ণগোবিন্দ। গত ঝুলনে তা-ই নাটুকে ঢং-এ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণগোবিন্দ। মাথায় চুড়ো, হাতে বালা, মুখে মোহনবাঁশী নিয়ে বারবার গোপিকা মোহন — রাধাবল্লব-কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে মূর্ছা গেলে তরাইকান্দির মানুষের বুঝতে বাকি থাকেনি যে কৃষ্ণগোবিন্দের লীলা স্বয়ং গোপালেরই লীলা। এবং তা আরো দৃঢ় হল বসন্ত পাগলের আকস্মিক মৃত্যুতে।

ভুবনমোহনের ঘরের পেছনে যে ডোবাটা ছিল সেখানে পড়ে গিয়ে হাঁসফাস করছিল বসন্ত পাগল — শুধু সেই থু-থু-থু-থু — যেন থুথু ছিটিয়ে নোংরা করতে চাইছিল বড়বাড়ির ডোবার পচা জল। সারারাত ভুবনমোহন আর সুলতা শুনেছেন সেই ঝাপুর ঝুপুর-গোঙানি-কাতরানোর শব্দ। সুলতা অধীর হলে ভুবনমোহন শুধু তার যুবতী বউ এব আমের মতো স্তন ছুঁয়ে বলেছিলেন : ও কিছু না, বসন্ত হয়তো পড়ে গেছে—একটু পরে ঠিক উঠে চলে যাবে।

পরদিন ভোরে আখড়াতে বসন্ত পাগলের লাশটা ঘিরে ভুবনমোহনরা দাঁড়িয়েছিলেন। উপুড় করা মৃতদেহের পিঠে পাঁচটা আঙুলের দাগ নীল হয়ে ফুটে উঠেছিল। ভূতের হাতের ছাপ দেখে শিউরে উঠেছিলেন ভুবনমোহন। কৃষ্ণগোবিন্দ সিঁড়িতে বসে তামাক খেতে খেতে বলেছিলেন : ভগবানে বিশ্বাস যার নেই তাকে ভূতের হাতেই মরতে হয়। পাগলের আবার ভগবানে বিশ্বাস — এই প্রবাদটা তখন থেকেই তরাইকান্দিতে চলে আসছে।

কৃষ্ণগোবিন্দের শিষ্যদল বাড়ছিল ভাটিগাছের মতো। উৎসবে যখন দূরদূরান্ত থেকে শিষ্যরা সব দল বেধে আসতো সে দৃশ্য হতো দেখার মতো। ঘণ্টাবাধা বলদের পিঠে মানুষ, গাধার পিঠে মাথামুড়োনো সঙ, গলা থেকে আয়না ঝুলানো ক্ষৌরকার। বাঁশের মাচায় ঘাটের মড়া, সাপ-নাচানো বেদে আর সাপের মতো হিলহিলে বেদেনী, হিজড়ে ও বেশ্যা, গিলিগিলি বকা জাদুকর, উটের পিঠে বাঁদর নিয়ে চিড়িয়াখানার মালিক, ভাগ্যগণক, গ্রেট মুড়মুড়ে সার্কাস, জড়িবুটির কবরেজ, গর্ভবতী বউ, জিলিপির দোকানি, বত্রিশভাজা, বায়োস্কাপ আরও কত কি। সে শোভাযাত্রা শুরু হতো কিন্তু শেষ হতো না, তার আগে উৎসব শেষ হয়ে যেতো। মূল মন্দিরে উৎসবের এই ক'দিন বাঁদরছাপ কেতন উড়তো। আর ছেলেবুড়ো বাচ্চার দল সারি বেধে খিচুড়ি লাবড়া খেয়ে সারি বেধে ওই জায়গাতেই হাগতো। চারদিন নাটমন্দিরে বেদম অষ্টপ্রহর সংকীর্তন চলতো। মাঝে মাঝে যখন ভাবের ঘোরে নাচিয়েরা নাচতে নাচতে ভাবাবিষ্ট শ্রোতাদর্শকের লাথালাথি শুরু করতো তখন বউ ঝিরা জোকার দিয়ে তাদের থামাতেন। ভুবনমোহনের বিশাল জমিদারীর যে ভাঙ্গন শুরু হয়েছিল অর্ধশতাব্দী আগে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়ে এখন অন্য পাট শুরু হয়েছে। জমির অবশিষ্ট টুকরোগুলো তার মুষ্ঠিবদ্ধ আঙুলের ফাঁক গলে জলের মতো বেরিয়ে যাচ্ছিল।

শুধু বাগা দেওয়া খেত থেকে ভুবনমোহনের বছরের চাল কোনোমতে জুটে যেতো। ভুবনমোহন এখন জীবনের মধ্যাহ্ন পেরিয়ে সায়াহ্নে এসে দাঁড়িয়েছেন। নীলরক্ত পরিশ্রুত হতে হতে কখন লাল থেকে সাদা হয়ে গেছে ভুবনমোহন খেয়াল করেননি। কৃষ্ণগোবিন্দের আগমনে রাতারাতি তরাইকান্দির যে এরকম আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ঘটবে ভুবনমোহন তা স্বপ্নেও ভাবেননি। ভুবনমোহন নিজেও কোনকালে ধার্মিক ছিলেন না কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর আগমনের পর নিজের পরিবর্তনে তিনি সবচেয়ে আশ্চর্য হলেন। তিনি জানেন তার এই বিড়ালতপস্যা অনেকটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মতো। সন্তানহীনতার যে বিষ ক্রমশ তাকে বিষাক্ত করে তুলছিল, কৃষ্ণগোবিন্দের সাক্ষাৎ শিষ্যত্ব গ্রহণের পর এ থেকে তিনি কিছুটা মুক্তি পেয়েছেন। ভুবনমোহন চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি গ্রামের সবার এই হঠাৎ ধার্মিক হয়ে ওঠার পেছনে ভগবানের অপার লীলা ছাড়াও এই কোন না কোন 'অপূর্ণতা পূরণের সহজ পথের' তত্ত্বটা মোটামুটি মেনে নিলেন। অর্থাৎ তিনি ভেবে খুশি হলেন, তার মতোই গ্রামের একটি লোকও সম্পূর্ণ সুখী নয়।

বংশরক্ষার কথা মনে হলেই মাঝে মাঝে ভুবনমেহন কুলুঙ্গি থেকে বের করে জীর্ণ বংশলতিকাটার উপর চোখ বোলান। চোখ বোলাতে বোলাতে তিনি বংশের লতায়পাতায় খেই হারিয়ে ফেলেন। এ যেন নামের জঙ্গল। কতো নাম · দ্বিজমোহন দাস, গিরিবালা দাসী, খিলি (আতুরগৃহে মৃতা), প্রেমময়ী, তীর্থমোহন দাস – তিনি নামের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে পৌঁছে যান তারও চারপুরুষ আগে, যখন কোন এক খাঁ এর কাছ থেকে তার প্রপিতামহ কতো কেদার কতো গণ্ডা নিষ্কর জমি লাভ করে ছিলেন। ভুবনমোহন সেই বাদশাহী শিলমোহর করা পাট্টা খুলে এখনও চোখ বোলান। যদিও অপরিচিত অক্ষরে লিপিবদ্ধ সেই পাট্টার কোন অর্থ তিনি উদ্ধার করতে পারেন না।

ভুবনমোহন কল্পনা করেন — এই পতিত, আকর্ষিত, জনমানবহীন ভূমির কোন এক সুউচ্চ ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে তার সেই পূর্বপুরুষ দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছেন দূরে — আরও দূরে, যতোদূর দৃষ্টি যায় ততোটুকু জমিই তার দৃষ্টির ত্রিসীমানায় অগ্নি, মরুৎ, তেজ, গগন তার — যেন তিনি শুনতে পান তার পূর্বপুরুষের সেই বজ্রনির্ঘোষ — জীবান্, বিসসর্জ্জ ভূম্যান্ — ভূর্ভুবঃ স্বঃ — সেই শব্দে ধীরে গ্রাম জেগে উঠছে — বর্তনের শব্দ, ঘূর্ণায়মান চাকার শব্দ, কুমোরের হাতে মৃত্তিকার শব্দ, দহনের শব্দ, শিৎকারের শব্দ, জন্ম এবং মৃত্যুর শব্দ, কলসের গুব্ গুব্ শব্দ, হলকর্ষণের শব্দ — যেন এক বিশাল নৈঃশব্দের মাঝে আস্তে আস্তে বিন্দু বিন্দু শব্দে পূর্ণ হচ্ছে মহাশূন্যতা — যেভাবে গভীর গভীরতর খননের পর ক্রমে পুকুরের হাঁ ভরে ওঠে জলে, ভরে ওঠে মীনমৎস্যে, শম্বুকে পদ্মপত্রে — যেন সেই খনিজ ইতিহাসের প্রত্নগর্ভে ভুবনমোহন এক অপরিজ্ঞাত অন্ধকারে, ভ্রূণের স্মৃতিবিস্মৃতির মাঝে হারিয়ে যান আর ক্রমশ উত্তরাধিকার রক্তের ছলাৎ ছলাৎ, প্রবল জোয়ারে স্ফীত রক্তমুখী প্রাবল্যে পূর্বপুরুষের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হন ভুবনমোহন।

ভুবনমোহন তার চৌদ্দপুরুষকে খুঁজে বেড়ান বংশলতিকায়, কিন্তু পিছিয়ে যেতে যেতে চারপুরুষের নামে এসে থমকে দাঁড়ান, আর পেছনে যেতে পারেন না। তিনি শুধু কল্পনায় লতাটাকে বাঁশের ঝিপুইর দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তুলে ধরেন। কিন্তু চৌদ্দপুরুষ বংশরক্ষার এই কাল্পনিক আঁককষাকে হাতে কলমে রূপায়ণের কোন পথ তিনি খুঁজে পান না। শুধু মনের সেলেটে আঁকা পরবর্তী সেই কাল্পনিক নয় পুরুষের নাম যেন কোন অদৃশ্য হাত এসে বারবার মুছে দেয়। এক অদ্ভুত অক্ষম রাগ চুলের মধ্যে জল ঢালার মতো তার প্রায় সাদা হয়ে যাওয়া রক্তকে ছলকে দেয়। যদিও দশরথের মতো এক অলৌকিক যজ্ঞ থেকে

'তপ্তকাঞ্চনগঠিত রজতাবরণযুক্ত দিব্য পায়সে পরিপূর্ণ এক বৃহৎ পাত্রীর' অপেক্ষা করেন ভুবনমোহন. যে পুত্রীয়েষ্ঠি অশ্বমেধযজ্ঞের হোতা হবেন স্বয়ং শ্রী শ্রী কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর।

ভুবনমোহন জানেন বীর্যধারণের বয়েস তার পেরিয়ে গেছে। তিনি তার নিস্তেজ যৌনতাকে ক্লীবত্ব বলেই জানেন। অথচ সুলতা যুবতী, তার যৌবনের আঁচে এই সেদিনই তিনি বিচরার লকলকে কুমড়ো গাছটাও ঝলসে যেতে দেখেছেন। (ঘটনাটার পরই তিনি সেই ঝলসে যাওয়া কুমড়ো গাছটার উপর বাঁশ পুঁতে একটা মাটির পাতিলে চূণ দিয়ে সুলতার মতো একটা খান্নস মুখ এঁকে ঝুলিয়ে রেখেছেন -- যেন আর কোন গাছেব উপর সুলতার কুনজর না পড়ে) মাঝে মধ্যে একটা সন্দেহের পোকা ভুবনমোহনের ভেতরে নড়ে চড়ে। বেশি বয়সের কমবয়েসি স্ত্রীর ব্যভিচারের গল্প তিনি অনেক শুনেছেন। সুলতা এখন ভীষণ একরোখা আর বদমেজাজিও হয়ে উঠেছে। যে ভয়ের পর্দায় তার যৌবন আগে ঢাকা থাকতো এখন যে সেটা সরে গেছে। ভুবনমোহনকে এখন সে প্রকাশ্যেই আঁটকুড়া বলে।

তবুও, কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর আসার পর থেকে ভুবনমোহন সেই অলৌকিকের অপেক্ষা করেন। সেই কার্তিক মাসে পাকা আমের মতো কিছু একটা। ভুবনমোহন মাঝে মধ্যে আখড়াতে গুরুদেবের পায়ের কাছে বসে করজোড়ে বলেন, ''আমার ছিকায় আম কবে ধরবে গুরুদেব?''

কৃষ্ণগোবিন্দ তামাক টেনে টেনে উত্তর দেন, 'আম তো গাছে ধরে রে ভুবন, গাছে। ছিকায় তো আমসত্ত্ব থাকে। গাছে বউল ধরলে সেটা এমনি খবর হবে। ঝড় আসবে, গাছের সারা অঙ্গে রস হবে, ডেয়ো পিঁপড়ে বাসা বাধবে। সময় হলে সব হবে।'

ভুবনমোহন সেই সময়ের অপেক্ষা করেন। কিন্তু সময় ভুবনমোহনের অপেক্ষা করেনা। — হিবার গেরামোর সব পাকা ধানো মই দিছলো বইন্যা। থই থই করছিল জগৎসংসার - বড় বাড়ির মাঠাম ছুইছলা মা গঙ্গায় -- গোঁসাই পরে জওযাব দিছলা গঙ্গাপূজা ঠিকমতন আইছে না — আগুথরামোর পূজাও ঠিকমতোন না অইলে মড়ক লাগবো। ইটা আবেক গল্প। আগুথরামোর গল্প — ঠাকুর।

পরানদাদীর গলার স্বর তরাইকান্দির প্রত্যেক ঘর থেকে ঘরে ভেসে বেড়াচ্ছিল। তরাইকান্দির শিশু জন্ম থেকেই — যে গল্প শুনে আসছে, বৃদ্ধ হওয়া পর্যন্ত যে গল্প সে শুনে যায় আর তার মৃত্যুর পরও শ্যাওড়াগাছে, ছাতিমতলায় বসে বসে যে গল্প সে শুনে যাবে।

তা সেদিন চোতমাসের রোদ তখনও ততো তেতে উঠেনি। বাগাইলা সবে সূর্যকে নিয়ে চরতে বেরিয়েছে। কৃষ্ণগোবিন্দ স্নান করে তরু বৈরাগিকে তামাক সাজতে বলেছেন। ডাক্তার কাকা, সত্যেন্দ্রনাথ, ভুবনমোহন আর ধূর্জটি চক্রবর্তী প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে আখড়ায় এলেন।

— বড় রাস্তা থেকে একটা ছাগল দেখলাম প্রথমে। ভাবলাম নিশির সব ধানের হালি খেয়ে নেবে।

তখন নিশুথ রাত। রমেন্দ্রবাবুর মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা চারজন গিয়েছিলেন মোহনপুর। দাহ শেষ করে ফিরতে ফিরতে রাত গভীর। বড় রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা রাস্তায় পা দেবার সাথে সাথে প্রথমে সত্যেন্দ্রনাথেরই চোখে পড়ল ছাগলটা। বেশ বড় নধর রামছাগল। নিশির জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই মিলে হেই হেই —কার ছাগল এত রাতে ছেড়ে রেখেছে — বলতে না বলতেই ছাগলটা একটা গোরু হয়ে গেল। ভুবনমোহন ভাবলেন চোখে ভুল দেখেছেন। কিন্তু সঙ্গের সবাইও প্রথমে ছাগল তারপর গোরু দেখেছেন। ভাবলেন আগে তারা চোখের ভুলে গোরুটাকেই ছাগল দেখেছেন জোছনা রাতে। সাদা গোরুটা নিশির জমি ছেড়ে আখড়ার রাস্তাতেই উঠে এল। আখড়ার এই রাস্তাটাই গ্রামের সিংহদ্বার। যাহোক, সবাই মিলে একটু দূর থেকে দু'একটা ঢিল পাটকেল ছুঁড়ে হেট্-হেট্ বলতেই

গোরুটা তাদের চোখের সামনেই একটা লম্বা কালো মানুষ হয়ে গেল। আর লম্বা — এতো লম্বা মানুষও হতে পারে? মাথাটা গিয়ে ঠেকেছে কালপুরুষের কাছাকাছি। কালো উদলা মানুষটার বুকের পৈতে সেই জোছনার মাঞ্জা দেওয়া ঘুড়ির সুতোর মতো লাগছিল।

— ও — তোরা আমার আগুথরামকে দেখেছিস। গল্পটা শুনে নাদুস, আদুল শরীরে ছোট্ট একটা নিঃশব্দ হাসির ঢেউ তুলে কথাটা বললেন কৃষ্ণগোবিন্দ।

— আমার ভুবনরা আগুথরামকে দেখেছে গো। তোরা কে কোথায় আছিস রে শুনে যা — আমার সত্যেনরা আগুথরামকে দেখেছে গো।

প্রথমে আখড়ার বৈষ্ণব-বৈষ্ণবি, মোহন্তরা ভিড় করে এল। তারপর গ্রামের একজন দু'জন করে সবাই আসতে থাকল খবরটা শুনে।

কৃষ্ণগোবিন্দ যা বললেন তা মোটামুটি এই : আগুথরাম তরাইকান্দির গ্রামদেবতা। ধর্মঠাকুর। সমস্ত বিপদ আপদ থেকে তরাইকান্দিকে এতদিন — আগুথরামই রক্ষা করেছেন। কিন্তু এখন তিনি কোনও কারণে কোপাবিষ্ট — এ কোপ না কমলে এবার গ্রামে মড়ক হবে। আগুথরাম নাকি কাল রাতেই কৃষ্ণগোবিন্দকে দেখা দিয়ে বলেছেন আখড়ায় প্রবেশের মুখে যে হেতাল গাছটার নীচে তার থলা আছে সেখানে বছরে একবার ষোড়শোপচারে পুজোও দিতে হবে।

গ্রামদেবতা বলে কথা। বলা যায় রাতারাতিই গাছের তলাটা পাকা বেদি করে পাথর বসানো হয়েছিল। তারপর গ্রামের সব আওয়া দুধ আর স্তন্যদুধ দিয়ে সে জায়গা ধুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সাদা দুধের ছোট স্রোত আস্তে আস্তে বড়ো হতে হতে মিশে গিয়েছিল ঘাঘরার জলে আর ঘাঘরার জল হয়ে মিশে গিয়েছিল গঙ্গায়, গঙ্গা থেকে পবিত্রতোয়া যজ্ঞময়তীরশালিনী সরস্বতীতে, সরস্বতী থেকে বঙ্গোপসাগরে। সমস্ত নদী নালা খাল বিল সমুদ্র মহাসমুদ্র ছাপিয়ে সে সাদা দুধ ভাসিয়ে দিয়েছিল সমগ্র পৃথিবী। শুধু তরাইকান্দি ভাসছিল সেদিন কচ্ছপের পিঠের মতন। এ সেই দ্বিতীয় মহাপ্লাবন। সে প্লাবনে পৃথিবী অনেক অনেকদিন দুধমগ্ন ছিল।

আশ্রিত এবং আশ্রয়দাতার সংজ্ঞাটা সত্যেন্দ্রনাথ মাঝেমাঝেই গুলিয়ে ফেলেন। একদিন ল্যাংটা গোঁসাইকে এই গ্রাম আশ্রয় দিয়েছিল, এখন তারই আশ্রয়ে সমস্ত গ্রাম। কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর মনের গতিবিধিও তারা ধরতে পারেন না। কোনটা যে কারণ আর কোনটা যে তার ফল এটা একটা রহস্যই।

ভুবনমোহন এবং সত্যেন্দ্রনাথ আখড়াতেই বেশির ভাগ সময় কাটান। ভুবনমোহন চেষ্টা করেন গুরুদেবের কার্যকারণের রহস্যটা ভেদ করতে আর সত্যেন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন গাছ পরগাছার রহস্যটা বুঝতে।

অনেক অনেকদিন পর আজ প্রাচীন পুকুরের ঝামা সিঁড়িতে পা' রেখে ভুবনমোহন ঠাকুরের লীলার কার্যকারণ রহস্যটা যেন কিছুটা আবছাভাবে বুঝতে পারছিলেন। ঘটনাটার সূত্রপাত কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর জওয়াপ থেকে। এরকমই কোনও একদিন ভোরে কৃষ্ণগোবিন্দ নিমীলিত চক্ষু খুলে জওয়াপ দিলেন, শুক্লপক্ষে অষ্টমীতিথিতে নক্ষত্রের তারাশুদ্ধির পর যোগিনী ঈশানে বড়বাড়ির প্রাচীন দেওলা পুকুর থেকে মা মনসার বাসনকোসন উঠে আসবে। দুধকলা দিয়ে নাগপুজো ওই দিনই দিতে হবে।

সারারাত দুঃস্বপ্নে কেটেছিল ভুবনমোহনের। সারারাত একই স্বপ্ন তিনি ত্রিবিংশবার দেখলেন। পুকুর পারের চারিদিকে শত শত প্রদীপের আলো। সেই আলোর রেখা পুকুরের জলে দুলে দুলে উঠেছিল — আর শাঁখ ঘণ্টা জোকারের শব্দে শব্দে নাগের মাথায়

পুকুরের জলের তলা থেকে উঠে আসছিল ঝিক ঝিক কাঁসার বাসন। তারপর সেই কাঁসার বাসন পুকুরের ঝামা সিঁড়ি বেয়ে ঝমঝম শব্দে এগিয়ে আসছিল ঘুমন্ত এই উত্তরপোতার ঘরের দিকে।

বড়বাড়ির ভেতর-পুকুরটা অতিপ্রাচীন এটা ভুবনমোহন জানতেন। এ বাড়ির কেউই পুকুরটায় মুখ ধুতে বা স্নান করতে নামতো না। পুকুরটা নাকি দেওলা, মানুষ খেয়ে ফেলে। অনেকদিন আগে তীর্থমোহনের ভাই-এর একমাত্র ছেলে চলে গিয়েছিল এই পুকুরের পেটে। গ্রামের লোকের কাছে এটা শুধু পুকুরই ছিল না। মাঝে মধ্যে নাকি গভীর রাতে পুকুরের অতল থেকে পদ্মপুরাণের সুরে ওঝাগান ভেসে আসে। ভুবনমোহন জন্মের পর থেকে এসব শুধু শুনে আসছেন।

একবার তিনি জেদ করে পুকুরে ছিপ ফেলেছিলেন। পুকুরটাতে তিনি সব-সময়ই ঘাই শুনেন কিন্তু মাছ দেখেন না, তাই পুকুরটাতে মাছ ধরা তার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল।

অনঙ্গমোহনের নিষেধ সত্ত্বেও সেদিন যুবক ভুবনমোহন পুকুরটাতে ছিপ ফেলেছিলেন। সারাদিন কিছুই লাগেনি ছিপে। নাওয়াখাওয়া ভুলে ভুবনমোহনও বসেছিলেন। যখন প্রায় আশা ছেড়ে দিয়েছেন, হঠাৎ খেয়াল হল ফাতনা ডুবে যাচ্ছে। ছিপটা শক্ত হাতে ধরে ভুবনমোহন মাছটাকে কিছুক্ষণ খেলতে দিলেন। মিনিট কয়েক। কখনও সুতো টেনে ধরেন, কখনও ছাড়েন। ভুবনমোহন পাকা বড়শি বাইয়ে — মাছের নাড়িনক্ষত্র জানেন। বড়শিটা পুরোপুরি গাঁথতে যতোটুকু সময় ততোটুকুই দিয়েছিলেন তিনি, তারপর কেৎরানো একটা হেঁচকি টানে বড়শিটা তুলতে গিয়েই টের পেলেন তার থেকেও অন্তত কয়েকগুণ বড়ো শক্তির একটা কিছু তাকে টেনে নিচ্ছে পুকুরে। ভুবনমোহনের মনে হল মাছ যেন তাকেই বড়শিতে গেঁথে ফেলেছে। পুকুরের জলটা খুব জোরে নড়ে উঠেছিল আর তখনই ভুবনমোহন বুঝতে পারলেন একটা আঁশটে গন্ধে তার শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে।

অনঙ্গমোহন সেদিন তাকে ধরে নেওয়ায় পুকুরে তলিয়ে যাননি ভুবনমোহন। তারপর তিনদিন ধূম জ্বরের মধ্যে ভুল বকেছিল ভুবনমোহন। তিনদিন পর অনঙ্গমোহন ঘটা করে মনসা পুজোর মানত করলে সে জ্বর ছেড়েছিল।

ভুবনমোহন শুনেছেন সিলেটের শাহজালালের দরগায় এরকম একটা দেওলা পুকুর আছে। সেখানে হাজার বছরের প্রাচীন সুবর্ণ আঁশ গজার মাছ ভেসে বেড়ায়। ওই মাছগুলোর বয়েস বাড়তে বাড়তে দেওলা হয়ে গিয়েছিল। ভুবনমোহন তার ঠাকুমার মুখ থেকে শুনেছেন সব কিছুই দেওলা হয়ে যেতে পারে — চেয়ার, টেবিল, গাছ, মানুষ সব। আর দেওলা কোন কিছুর পাশে খুব বেশিদিন কিছু থাকলে তাও দেওলা হয়ে যায়। ঠাকুমার গ্রামে চড়ক পূজার আগের রাতে একটা পুকুর থেকে দেওলা গাছ উঠে—যুগ যুগ থেকে সেটাই তাদের গ্রামের চড়কগাছ।

এসব শুনলে ভুবনমোহনের গা' শিরশির করে। জান্তব একটা পুকুরের ভয় তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

কৃষ্ণগোবিন্দের সেই জওয়াপ ফলেছিল। ঝিক্‌ঝিক্ ঝক্‌ঝকে কাঁসার বাসনে সেদিন ভরে গিয়েছিল বড়বাড়ির দেওলা পুকুরটার পার।

মনসাপুজো ভুবনমোহনের বাড়িতে আগেও হতো। গত কয়েকবছর থেকে বন্ধ ছিল। বন্ধ ছিল কারণ সেই দেওলা পুকুরটা আবার যেন পুকুর হয়ে উঠছিল — ছোট ছোট পানা ভাটফুল আর ফড়িং নুয়ে আসা গাছের ছায়ায় মায়া ধরছিল রাক্ষুসি পুকুরটার আয়নার মতো জলে। যে মাছরাঙা আগে ছোঁ মারতো না, পুকুরের জলে, সে এখন ছোঁ মেরে ধরতে চাইছিল রূপোরঙের মাছ। আর তরাইকান্দি ভুলতে বসেছিল একটা পুকুরের দেওলা হবার ইতিহাস।

কৃষ্ণগোবিন্দ শুধু সেই প্রাচীন গা' ছমছম ইতিহাসটাকে আবার জাগিয়ে দিলেন। সেদিন তরাইকান্দির এ মাথা থেকে ও মাথায় ছড়িয়ে গেল কথাটা : দেওলা পুকুর জাগি উঠছে গো — দেওলা পুকুর মানুষ খাইবো গো — হো হো— তোমরা শুনছো নি গো — দেওলা পুকুর আবার ঘুম থাকি জাগি উঠছে গো — হো হো — ও রে বা — ও — ও। আর সেই ডাকে একটা করাল জান্তব ছায়া তার ডানা গুটিয়ে আনছিল বড়বাড়ির উপর।

সেবার বড়বাড়ির মনসাপুজোর প্রায় নয়মাস পর ছিল আখড়ার উৎসব আর উৎসবের পরেই ঘটল ঘটনাটা। তা ঘটনার আগেও তো ঘটনা থাকে।

ভুবনমোহনের কাছে বিশ্বাস হচ্ছে সেই জিনিস যা একবার হারিয়ে গেলে ফিরে আসে না, অনেকটা বংশগৌরবের মতো। ভুবনমোহনের বংশগৌরব যেরকম হারিয়ে যাচ্ছিল সেরকমই সুলতার উপর তার বিশ্বাসও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছিল। আবার অন্যদিকে কৃষ্ণগোবিন্দের উপর ভুবনমোহনের বিশ্বাস যেরকম শক্ত হচ্ছিল, সেরকমই কৃষ্ণগোবিন্দের উপর তার স্ত্রীর বিশ্বাসও হারিয়ে যাচ্ছিল, হারিয়ে যাচ্ছিল না, বলা উচিত হারিয়ে গিয়েছিল। কেন, সেটা একমাত্র সুলতাই জানে।

সুলতাকে একটা ব্যাপার খুবই ভাবাতো। কৃষ্ণগোবিন্দ আসার পরই তরাইকান্দির এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন সে বেশ সন্দেহের চোখেই দেখে। তার প্রায়ই মনে হয় সমস্ত গ্রামটা যেন গড় গড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে দেওলা হয়ে যাচ্ছে আর সে, সেই দেওলার হাত থেকে পালাতে চাইলেও পালাতে পারছে না। একটা ভয় তার যুবতী শরীরে দোষি বাতাসের মতো ঘুরে ওঠে। কৃষ্ণগোবিন্দের লীলাখেলার সেই প্রথম দিনে সুলতার মুখ ফস্কে বেরোনো 'লীলার গাছের বিষফল' ততদিনে ধরে গেছে গোঁসাই আর ভুবনমোহনের মনে। সবচেয়ে বড়ো কথা ভুবনমোহনের মনও তখন সন্দেহের বাঘে খাচ্ছিল — গাছকোমর দিয়ে রোয়াকে সুলতার এক্কা দোক্কা খেলা, তার প্রকট ঢলাঢলি, তার গতর ভরা যৌবন। তার উপর ভুবনমোহনের সামনেই তার পরমআরাধ্য গুরুদেব কৃষ্ণগোবিন্দকে সুলতা প্রায়ই বিদ্রুপ করতো। ভুবনমোহনের মনে হতো সুলতা তাকেই বিদ্রুপ করছে। আর তখনই ধমনীতে নীলরক্তের জোয়ারের শব্দ তিনি শুনতে পেতেন।

যেদিন কৃষ্ণগোবিন্দ জিউর সুলতাকে আখড়ায় ডেকে পাঠালেন সেদিন ভুবনমোহন বুঝতে পারলেন অবশেষে ছিকায় আম ধরবে। কিন্তু সেদিনই লীলার গাছের বিষফল নিয়ে যখন সুলতা ফিরে এল এবং ভুবনমোহনের প্রশ্নে যখন নিঃশব্দ কান্নায় ভাসানের মাটির পুত্তলির মতোই ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ল, ভুবনমোহন শুধু অনুমান করতে পারলে এই — আমগাছে কোনদিনও বউল আসবে না।

অথচ তারই কয়েকমাস পর যখন জোয়াল-বাঁধা-মুখে-ফোপা-আঁটা বলদ ঘুরে ঘুরে উঠানে ধান মাড়াই করছিল আর সেই শব্দের তালে তালে ভুবনমোহন যখন ১০৮ বীজমন্ত্র জপ করছিলেন, তখন সুলতার গর্ভ ভরে ওঠার চাপা অথচ দুঃসহ শব্দে তিনি টের পেলেন, অদ্ভুত উচাটনে কোন ভূতেধরা নারীর শরীর থেকে আমগাছের একটি ডাল ভেঙ্গে পুরুষভূতের চলে যাওয়ার পরেকার অদ্ভুত নিস্তব্ধতা তার সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে নিচ্ছে।

ঘরের সোনারু কাঠের খুঁটিগুলিতে এরপর ক্রমশ নীলরক্তবাহী শিরাগুলো স্পষ্ট হতে থাকল। উত্তরপোতার ঘরের নীচে স্তিমিত জলের কল্লোল হাপুর হাপুর করতে শুরু করল। লণ্ঠনের ছায়ার নিচে। এবং ভুবনমোহন অনুভব করলেন দেওলা পুকুরটার মতো তিনিও জেগে উঠছেন। একটি জান্তব ইতিহাসের সরীসৃপ-ক্রমে গা' মোচড় দিয়ে উঠছিল ভুবনমোহনের গভীরে।

ভুবনমোহন এতদিন যে অলৌকিকের কামনা করছিলেন তা-ই সত্যি সত্যি ঘটে যাবার পর তার মনে হল এই অলৌকিকও অনেকটা কচ্ছপের পিঠে পৃথিবীর মতো ব্যাপার। তিনি অনুভব করলেন যে আমগাছটিতে অলৌকিক আমটা ধরেছে তার শেকড় কখন যেন ছড়িয়ে গেছে সন্দেহের মাটিতে। অতএব আবারও মাছশিকারের সময়কার অনুভূতিটা ফিরে এল তার। ভুবনমোহনের মনে হল সুলতার শরীরের আঁশটে গন্ধ তাকে টেনে নিয়ে যাবে দেওলার দিকে।

সুলতা ঘুমিয়ে যাবার পর প্রায় রাতেই তার পেটে কান পাতেন ভুবনমোহন। যেন শুনতে চেষ্টা করেন ভ্রূণের রক্তের কোলাহলের শব্দ — রক্তের কথামালা। ঘরের সেই ঘন অন্ধকারে দৃষ্টির রঞ্জনরশ্মিতে চিনতে চেষ্টা করেন ভ্রূণের রক্তের রঙ।

সেদিন বাইরে ছিল ঝড়ের ওঝানৃত্য। গভীর রাত্রে ভুবনমোহন ডাকিনী অন্ধকারে একা বংশলতিকা খুলে বসেছিলেন মেহগেনিকাঠের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা চেয়ারটাতে। কাঠের আঁশের নিচে চেয়ারের মাংসপেশির সংকোচন ও প্রসারণে এক প্রগাঢ় জৈববোধ ক্রমশ আচ্ছন্ন করছিল তাকে। রাত্রির সেই অতন্দ্রপ্রহরে তার মনে হচ্ছিল তিনশো বছরের পাথরের মানুষটা আজ, এতদিন পর, জীবন্ত ও জান্তব ভুবনমোহনে বদলে যাচ্ছেন। ঝড়ের মধ্যে সেদিন তার ভেতরে তিনশো বছরের ইতিহাসের নৈঃশব্দ গম গম করে বেজে উঠছিল, যেন শূন্য কুয়োতে মুখ দিয়ে তিনি নীরবে চিৎকার করে উঠলেন — ভুবনমোহন — ভুবনমোহন — আর সেই শব্দই যেন বা ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে, একটি গ্রাম্য কুয়োর আত্মহত্যার স্মৃতিতে — কুয়োর জলজ অন্ধকারে, তাকে ডেকে নিচ্ছিল।

ভুবনমোহন মনে মনে বংশলতিকায় অনঙ্গমোহনের নামের নিচে তার নিজের নামটা লিখলেন। তারপর ভাবতে চেষ্টা করলেন পরের জারজ নামটি। হয়তো বা কল্পনা দিয়ে স্পর্শ করতে চাইলেন অভূমিষ্ঠ সেই নবজাতককে। আর তার পরই এক অদৃষ্ট গাঢ় ঘন তাজা লাল রক্তের গভীর আবর্তে তিনি ডুবে যেতে দেখলেন তার সমস্ত পূর্বপুরুষকে। তার কানে ভেসে এলো তিনশো বছরের খাঁজে খাঁজে হারিয়ে যাওয়া চাবুকের শব্দ — ভেসে এল কালান্তরের কান্নার শব্দ — তিনি যেন সেই বিপুল যন্ত্রণাদীর্ণ শব্দের মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলেন ইতিহাসের অভিশপ্ত রক্তের করাল মুখবিবরের ছবি। দেখতে পেলেন এক লালরক্তের পিণ্ড তার শতভুজায় পেঁচিয়ে ধরেছে উত্তরপোতার সমগ্র ঘরটাকে—তিনশো বছরের প্রাচীন রক্তচক্ষু এক খড়গের নিচে এই রক্তস্নান — ভুবনমোহনের বুকে মন্দির — মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি আর বীভৎস কলতান জেগে উঠল।

ভুবনমোহন অনুভব করছিলেন তার রূপান্তর ঘটছে। তিনি যেন প্রজাপতি থেকে গুটিয়ে গিয়ে শুঁয়োপোকা হয়ে যাচ্ছিলেন। বংশলতিকায় পূর্বপুরুষদের নামের উপর হাত বোলাতে বোলাতে চারপুরুষের নীলরক্তের জোয়ারে তার সমস্ত সত্তা প্লাবিত হচ্ছিল। ভুবনমোহন যেন কখন দ্বিজমোহন-তীর্থমোহন-কামদামোহন-অনঙ্গমোহনে বদলে গিয়েছিলেন।

— ইটা এক আশ্চরিৎ দিশ্য — শয়তানের চেয়ারা বদলাইবার মতন। ক্ষণে হাসেন— ক্ষণে কান্দেন — ক্ষণে চোক ঠিকরাইয়া বারই যায়।

পরানদাদী বাসন্তীকে কুনই দিয়ে একটা খোঁচা দিল।

— ও বইন — ঘুমাই গেলায় নি।

পরানদাদীর চারদিকেআবারও ভিড় জমে উঠেছে। তরাইকান্দির বদলে যাবার গল্প শুনতে।

সুলতা জেগে উঠেছিল। প্রথমে ভেবেছিল ভূমিকম্প — কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারল সমস্ত ঘরটার কড়িকাঠ, খুঁটি, বর্গা, এমনকি তার কাঠের খাটটাও একটা জান্তব

গোঙানি নিয়ে জেগে উঠছে। সেই অমানুষিক গোঙানি ও জান্তব হা হা হা শব্দের মাঝে সুলতা দেখল ভুবনমোহন অথবা ঠিক ভুবনমোহন না — সাদাকালো ফটোতে দেখা অনঙ্গমোহন অথবা ঠিক অনঙ্গমোহনও নন — এরকম বীভৎস বহুরূপী এক অ-মানুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

সুলতা আধো তন্দ্রার মাঝে, বিমূঢ়, বিস্ময়ে পরিচিত ও অপরিচিতের মাঝে রঙ বদলানো সেই অ-মানুষটার দিকে তাকিয়ে ছিল। কিন্তু, একটু পরই, সুলতা কিছু বুঝবার আগেই একটা শ্বাপদ নখদন্ত নিয়ে সুলতার শরীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুলতা সমস্ত শক্তিতে ঠেলে উঠতে চাইল কিন্তু একটা পশুশক্তি তার বাঁ হাত দিয়ে ততক্ষণে সুলতাকে জীবন্ত খাটটায় চেপে ধরেছে আর অন্য হাত ছিঁড়ে ফেলছে তার ব্লাউজ-সায়া সব।

সুলতার মনে হল সে একটা জীবন্ত বনরুই বা কাট্টয়ার পিঠে শুয়ে আছে আর তার শরীরেব উপর একটা অপরিচিত বীভৎস জন্তু চরে বেড়াচ্ছে। চেনা ঘাম আর অচেনা স্বাদের গন্ধের ভেতর এক খসখসে সরীসৃপ তপ্ত শ্বাস আর লকলকে জিহ্বা নিয়ে সুলতার শরীরেব বাস্তুভিটায় বাস্তুসাপের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটা আঁশটে পিচ্ছিল হাতের মুঠোয় তার দু'টো স্তনের নিষ্পেষণের ধ্বনিগুলো নিয়ে লোফালুফি করছিল সমগ্র ঘরটা।

উরু আর জঙ্ঘার উপর প্রচণ্ড পাথরের মতো চাপে যখন যোনিতে একটা কইমাছ সুলতার শেষ প্রতিরোধ ভেঙ্গে ঢুকে পড়ছিল, যখন সমস্ত ঘরটা গণধর্ষণের শীৎকারে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তখন সুলতা চোখ খুলে জীবনে প্রথমবারের মতো দেওলা দেখল।

তাবপর পাঁচ দশে পঞ্চাশটা আঙুলের দাগ নিয়ে ঝড়বৃষ্টি ধোয়া সুলতার ছিন্ন ভিন্ন শরীরটা গড়িয়ে গেল সেই দেওলা পুকুরটায়।

সুলতার শরীরটা পুকুরে গড়িয়ে দেওয়ার পরই ভুবনমোহন দেখলেন পুকুরের চারদিকে শতপ্রদীপের ঔজ্জ্বল্য, দেখলেন শাঁখ ঘণ্টা জোকারের শব্দে শব্দে গর্ভবতী সুলতার শরীর বুরবুরি তুলে পুকুরটায় আস্তে আস্তে ডুবে যাচ্ছে। ভুবনমোহনের মনে হল তিনি কোন দুঃস্বপ্নের শেষটা দেখলেন।

পরদিন ভোরে শুধু একটা লাল শাড়ির অংশ সবুজ পানার মধ্যে ভেসে উঠেছিল। — গলফো এখনও শেষ অইছে না।

পরানদাদী একনাগাড়ে বলে হাঁপিয়ে উঠেছে। আরেকবার চোখে হাত দিয়ে দেখল বেলা কয় দণ্ড হল। একদলা কফ এ্যাক থু বলে ছুঁড়ে দিল বড়বাড়ির মাটিতে। ভুবনমোহন তখন ওই পুকুরটার পারে দাঁড়িয়েছিলেন। ভেসে ওঠা লাল শাড়িটার দিকে আবারও চোখ গেল তার। মাঝখানে এতকাল কেটে গেছে তিনি যেন ভুলেই গেলেন। একবার শুধু অস্ফুটে কী যেন বললেন। তারপর ঝামা সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে গেলেন দেওলা পুকুরটায়।

বায়ু তরঙ্গের বাজনা

সোহারাব হোসেন

— 'মা হিসু'।

রোজকার মতো মাঝ রাত্তিরের এই অমোঘ উচ্চারণ শুনতে পায় প্রেমহরি। শোনামাত্রই সে তৈরি হয়। কাঁধের বন্দুকটা নামিয়ে রাখে ছোট্ট চারফুট বাই চারফুট পাহারা ঘরের দেয়ালে। দু-হাত ওপরের দিকে তুলে 'পোজ' নেয়। চোখের দৃষ্টি সেঁধিয়ে দেয় তার সাহেবের জানলায়। সে জানে এরপর ছ'বছুরে ধাঙড় ছেলের পেচ্ছাপের ধারা ছড়ছড় করে নিচে পড়বে। পড়েও। আর পড়ামাত্রই জেলার শান্তিরক্ষা বাহিনীর দণ্ডমুণ্ড এস. পি. সাহেবের বাড়ির বিশেষ নিরাপত্তা-রক্ষী প্রেমহরি তার দ্বিতীয় পর্বের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে দেয়। তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে এতক্ষণ ধরে উপরে তুলে রাখা হাতদুটো মাটিতে নামিয়ে পা-দুটো উপরে তুলে দেয়। হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ।

প্রেমহরি জানে রাত এখন একটা থেকে দুটোর ঘরে চলছে। রাত্রির এই অংশটা পার করাই বড়ো দুঃসহ। কিছুতেই সকাল হতে চায় না। তরতর করে বিরক্তি বাড়ে। উর্ধ্বমুখো সেই বিরক্তির গালে অ্যায়সা এক থাপ্পড় কষিয়ে হেঁটমুণ্ড উর্ধ্বপদ হয়ে প্রেমহরি তার পাহারাগিরির নতুন পর্ব শুরু করে। পা আকাশে তুলে হাত দিয়ে হেঁটে হেঁটে প্রেমহরি তার সাহেবের বাড়ির পুরো চৌহদ্দিটা একবার ঘুরে আসে। আজও যথারীতি সেই উদ্দেশ্যে পাল্টি-হাঁটা শুরু করল সে। ঠিক সেই মুহূর্তেই জানালা দিয়ে ছড় ছড় করে পড়তে থাকা পেচ্ছাপের ধারা হঠাৎই চমকে গেল। সেই সঙ্গে শিশুকণ্ঠের ভয়ার্ত চিৎকার — ' মা কালো হনু'। তারপর ভয়ার্ত দমকা কান্না। তারপর ন্যাকা গলায় মেয়েলি কণ্ঠস্বরের ভীতি — 'দ্যাখো দ্যাখো চোর। ভূত। উল্টো হাঁটছে।' তারওপর তার সাহেবের মহড়া-দেওয়া গলার বাজখাঁই আওয়াজ — 'প্রেমহরি!'

প্রেমহরি ততক্ষণে হেঁটপদ উর্ধ্বমুণ্ড হয়ে হয়ে গোবেচারি নিরাপত্তা-রক্ষী। কাঁধে বন্দুক। মাথায় টুপি। অতন্দ্রপ্রহরী। সাহেবের চিৎকারের সঙ্গে সমানে তাল রেখে পাল্টা বলে যায় — 'জী ছার! কিছু গোলমাল আছে?'

পটাপট ঘরের, বারান্দার, আলো জ্বলে ওঠে। সাহেব সিঁড়ি ভাঙেন। সাহেবের সাদা পরির মতোন বউ দু-হাত-কাটা নাইটিসমেত সিঁড়ি ভাঙেন। পিছনে আজকের ঘটনার প্রথম দর্শক সাহেবের বাচ্চা হাতির মতোন দামাল ছেলেটি সিঁড়ি ভাঙে। পিছে পিছে বাড়ির ঠাকুর-চাকরেরা সিঁড়ি ভাঙে। সবাই ছোটে মূল ফটোকের কাছে। প্রেমহরির মুখোমুখি দাঁড়ায়।

হোক না মাঝরাত্তির, সাহেবের ঢিলেঢালা পা-জামা-পরা খালি গা, তবু প্রেমহরি কেতামাফিক কপালে হাত তুলে বুট ঠুকে একটা বিরাশি সিক্কার স্যালুট জানায়। টানটান দাঁড়ায়। তারপর বলে — 'কোনো গড়বড় হয়েছে ছার?' সাহেবের চোখে বিস্ময়। খানিকটা রাগ। তিনি বলেন—'তুমি ঠিকঠাক সজাগ ছিলে তো?'

— হ্যাঁ ছার।

— কিচ্ছু দেখতে পাওনি?

— না ছার।

— কিচ্ছু না? কাউকে চৌহদ্দির মধ্যে দ্যাখোনি?

প্রেমহরি একটু ভাবে। সময় নেয়। তার মধ্যেই সাহেব-গিন্নি প্রশ্ন রাখেন — 'কোনো মানুষ! মানে ভূতটুত?' চোখ ঘুরিয়ে প্রেমহরি মেমসাহেবের নগ্নবাহুর পেলবতা দেখে। সেখানে টিভির নায়িকাদের মতো ধারালো আলোর চলকানি। বিদেশি সাবানের বিজ্ঞাপনে দেখা ফোঁটা ফোঁটা জলের পিছলে পড়ে যাওয়া। মাথাটা চক্কর খায়। ঘোর লাগে। সেই ঘোরে সে বলে — 'তা কিছু দেখেছি মেমসাব্!'

প্রেমহরির মুখের কথা খসেছে কী খসেনি অমনি সাহেব হুঙ্কার ছাড়েন — 'তবে গুলি করলে না কেন?'

— পাপ হবে ছার -— প্রেমহরি খুব নিচু স্বরে উত্তর দেয়।

— পাপ হবে? চোপ্ যাও! — সাহেবের গলায় পালিশ করা পুলিশি ঝাঁঝ।

— হ্যাঁ ছার। রাতচরা জীব। ধম্মে সবে না।

— তার মানে বাড়ির মধ্যে চোর ঢুকবে আর তুমি তা দেখে ধম্ম করবে?

— চোর না তো ছার!

— তবে ভূত? — সাহেবগিন্নি ভীত-কৌতূহলী গলায় জানতে চায়!

— না।

— তবে?

— দুটো প্যাঁচা, তিনটে বাদুড় আর মেমসাহেবের পুষি বিল্লি। চৌহদ্দিতে ঘুরছিল ছার। ওদের গুলি করলে তো পাপ হবে ছার।

প্রেমহরির গলা কাঁপছে না, বরং অদ্ভুত দৃঢ়তা তার গলায। সে সাহেবের দিকে পিটপিট কবে তাকায়। সেখান থেকে মেমসাহেবের উদোম বাহুতে। চকচকে বাহুতে ব্লেডের ধার। ছুঁলেই স্যাটাস্যাট হাত যাবে ফালাফালা হয়ে। প্রেমহরি ফের তার সাহেবের দিকে তাকাতেই সাহেব হুঙ্কার ছাড়েন — 'তুমি নিশ্চয় ঘুমুচ্ছিলে। ডিউটি ফাঁকি দিচ্ছিলে। আমরা সবাই দেখলুম, তুমি দেখলে না?'

— না ছার আমি ঠিক ঠিক ছিলুম!

— আচ্ছা বলোতো একটু আগে বাড়িতে কী কী ঘটেছে?

— বলছি ছার। মিনিট পনেরো আগে আপনার শোবার ঘরের মাথার ওপর দিয়ে একটা বাদুড় উড়ে গেছে, তার দু'মিনিট বাদে ছার মেমসাহেবের পুষি বিল্লি ডাকতে ডাকতে ছাদের কার্নিস বরাবর হেঁটে গেছে — ঠিক ছার সার্কাসের ব্যালান্স খেলার মেয়েগুলোর মতোন।

— নিকুচি করেছে তোমার সার্কাসের। বলছি কোনো মানুষ দেখেছো?

— না ছার। কেউ তো ঢোকেনি।

— মিথ্যে কথা। আমি নিজে চোখে দেখেছি।

— না ছার আমাকে বলতে দিন, পুষি বিল্লি চলে যাবার পাঁচ মিনিট পর খোকাবাবু জানালা দিয়ে ছড় ছড় করে হিসু করল। তারপর ছার মেমসাব বেশ জোরে আপনাকে ডাকলেন।

— তারপর কী দেখলে?

— কিছু না ছার। আমি তো জেগেই আছি।

—তবে আমরা ভুল দেখলুম? একটা জলজ্যান্ত মানুষ মাথা নিচু করে পা আকাশে তুলে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

— ভুল ছার। মনে হয় স্বপ্ন দেখেছেন।

— স্বপ্ন?

— তা না হলে ছার সত্যি সত্যিই দেখেছেন তবে তা মাটিতে নয়। আকাশে।

— আকাশে? কী আবোল-তাবোল বকছ? এই প্রেমহরি নেশাটেশা করনি তো? — সাহেব ফের হুঙ্কার ছাড়েন।

— না ছার। আসলে ছার এটা তো ইন্টারনেট — কেবল লাইনের যুগ। দিনরাত্তির সব সময় বিদেশ থেকে কত কিসিমের ছবি সব আমাদের বাতাসে ভেসে আসছে। হয়তো ছার কোথাও জিমন্যাস্টিক-ট্যাস্টিক হচ্ছে। আর তাই উড়ে যেতে যেতে বাইচান্স আমাদের বাড়ির বাতাসে ভেসে উঠেছে। আপনার ঘরে তো ছার অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে। বিজ্ঞানের যুগ ছার, কোন্ মেশিন কোন্ সঙ্কেত যে ধরে ফেলে তা বলা যায় নাকি?

প্রেমহরির কথা শুনে অত বড়ো পুলিশ অফিসারের মুখও বন্ধ হয়ে যায়। সাবানের বিজ্ঞাপনের দেশি সুন্দরীদের নগ্নবাহু থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে যাবার মতো তার চোখ থেকে রাগ ঝরে গেছে। বিনিময়ে সেখানে জড় হয়েছে পাখির নীড়ের থেকে চোখতোলা বনলতা সেনের মতো অপার বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের ঘোরেই যেন তিনি বলেন — 'তাই নাকি! এরকম হতে পারে?'

—'পারে ছার' — বলেই প্রেমহরি তার মেমসাহেবের ব্লেড-ধার বাহুর উপর আবার চোখ ফেলে— 'মেমসাহেবকে না হয় জিজ্ঞাসা করুন ছার।' সাহেব নিজ স্ত্রীর দিকে তাকান। সেখানেও শহরের রাস্তার চিটেল কাদার মতো বিস্ময়ের লেই। তিনি কিছু বলার আগেই সাহেবের ছ'বছরে ছেলে বলে ওঠে — 'হতে পারে বাপি। সেদিন ওরকমই একটা অ্যাডভেঞ্চার দেখেছি আমি'। বাচ্চা হাতির শুঁড় নাড়ার মতো এস পি সাহেবের ছেলে হাত নেড়ে বাপকে বহুজাতিক টিভি চ্যানেলে দেখা কোনো ছবির বর্ণনা দেয়। তারপর সে তার মায়ের হাত টেনে বলে — 'তুমিই বলো না মাম্মি। দারুণ অ্যাডভেঞ্চার তাই না?'

— 'হ্যাঁ বাবুসোনা ঠিক বলেছো, তুমি তো আমার বিদ্যাসাগর'। — মায়ের দু'গালের টেবোতে হাসির বৃষ্টি। মা তার স্বামীকে নগ্ন কনুয়ের ঠেলা মারে -- 'শুনছো! বাবুসোনার মেরিটটা দেখছো, সেই কবে 'অল টাইম থ্রিলিং' চ্যানেলের অ্যাডভেঞ্চার দেখেছে! মুহূর্তে মাংসের গায়ে মশলা মাখানোর মতো হাসি-লাগা টেবো দুটোকে ছেলের দিকে ফেরায় মা — 'তারপর বলোতো সোনা অ্যাডভেঞ্চারে কী কী হয়েছিল?'

— ক্যানো, একটা লোক ঐ রকম উল্টো হেঁটে হেঁটে শয়তানদের রাজ্যে চলে গেল।

— বাহ্, তারপর?

— শয়তানরা তখন টিভিতে খারাপ ছবি দেখছিল। মদ খাচ্ছিল। লোকটা ওদেরকে ন্যূড করে শাস্তি দিল।

— গুড বয়! তারপর?

— তারপর লোকটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। আর হিরোইনরা তাকে স্বর্গ থেকে কোল্ড্রিংস এনে খাওয়াল। জেলার পুলিশ-কর্তাকে এত সময় কে যেন সম্মোহিত করে রেখেছিল। তার সামনেই যেন হাজারো রঙ-রঙিলা তরঙ্গদৈর্ঘ্য মারফৎ বেড়াতে আসা পৃথিবীর নানা দেশের বিচিত্র থ্রিলার-অ্যাডভেঞ্চাররা তার পাঁচিল-ঘেরা চৌহদ্দির মধ্যে জীবন্ত হচ্ছে। তারপর তারা তার সামনে নিজের নিজের পার্ট অভিনয় করছে এবং চকিতে সুড়ুৎ করে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের

মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। আর তার রেশ থেকে যাচ্ছে এস পি সাহেবের বউ-ছেলের বাহুতে-গলায়। ছেলে বলছে — 'মাম্মি আমিও লোকটার মতো হবো।'

— হবে বৈকি সোনা — মা ছেলের উৎসাহে বাতাস দেয়।

— হিরোইনরা আমাকে কোলড্রিংস দেবে তো?

— দেবে বৈকি বাবা! — মা'র গলায় হাসির সন্দেশ।

এস পি সাহেব নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেন না। তিনি তাঁর আমলাতান্ত্রিক গলার দপ্তরি-হুঙ্কার এই মাঝরাত্তিরে দিয়ে ফেলেন — 'তোমরা থামবে? আমাকে পাগল বোঝাচ্ছো নাকি? জলজ্যান্ত দেখলুম একটা মানুষ উল্টো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে! সব ফল্‌স্‌?' এরপর পুলিশসাহেব কটমট করে প্রেমহরির দিকে তাকান — 'তুমি সতর্ক ছিলে তো ঠিক ঠিক?'

— হ্যাঁ ছার! — প্রেমহরি আবার বিরাশি-সিক্কার স্যালুট ঠোকে দৃঢ়তার সঙ্গে।

— আমার তো এতো ভুল হয় না।

— হয় ছার। ঘুমের ঘোরে দেখেছেন তো? চোর যদি ছার আসবে তবে সে উল্টো হাঁটবে কেন? প্রাণের ভয় নেই তার?

প্রেমহরির যুক্তিতে এস পি সাহেব এবার ঘায়েল হয়ে পড়েন, ভাবেন — বটেই তো, চোর হলে সে উল্টো হাঁটবে কেন? এস পি সাহেব যেন ঘোরের মধ্যে পড়েন। সেই ঘোরের আঁচে প্রেমহরি সজোরে বাতাস দিতে থাকে — 'ঘরে যান ছার। ঘুম দেন কষে। সারাদিন নানান ফন্দি ফাঁস আপনার মাথায় খেলে। মাথাটা গরম থাকে। ঘুম দরকার ছার। ঘরে যান, মাথা ঠাণ্ডা করুন।'

সাহেব তার দলবল নিয়ে পিছন ফেরেন। প্রেমহরি সেই তড়কে ফিসফিস করে শোলোক গায় -- 'প্রেমহরিতে খেল্‌ দেখাল। / বড়া সাহেবের নিদ্‌ ভাঙিল।।/ বাপ তোর পায়ে নমস্কার। / প্রেমা নামের গোলকধাঁধায় সাহেব ধাঁধে যেন বারবার।।' শোলোকের গা দিয়ে ঠিকরে বেরচ্ছে হাসি। সেই হাসির ডানায় চড়ে প্রেমহরি তারপর তার চারফুট বাই চারফুট আস্তানায় ঢুকে পড়ে। কেতামাফিক।

দুই

এত সময় ছিল না। এখন সাহেব চলে যাবার পর প্রেমহরির দেহে কাঁপন এল। সাহেবের কাছে ধরা না পড়ার যাবতীয় কৌশলে নিজেকে ব্যস্ত রাখায় বোধহয় শরীরের ভিতরে চাগিয়ে উঠেছিল যে কাঁপন তা প্রকাশ পায়নি। এখন এই উত্তর-মাঝরাত্তিরে তার নিজস্ব কক্ষপথে লটকে যাওয়ামাত্র প্রেমহরি বুঝল তার মন কাঁপছে। সেই কাঁপনের ফলে সৃষ্টি হচ্ছে কিছু তরঙ্গ। তরঙ্গে বাজছে কিছু কথা। প্রেমহরি কাকে শোনাবে সেই বাজনা? বউ সজনীকে? সে তো দূর-অঞ্চলের এক কামরা ঘরে ঘুমে ঘুমে কাদা। তবে? রোজকার মতো আকাশের কালপুরুষকে শোনাবে? প্রেমহরি চারফুট বাই চারফুটের ঘেরাটোপের বাইরে এসে আকাশের দিকে তাকায়। তাকিয়ে চমকে ওঠে — শিকারি কুকুরটাকে নিয়ে কালপুরুষ উধাও। তবে?

প্রেমহরি অসহায় এখন। চোখ বোজে। একটু ভাবে। তারপর বলে — ''কেউ যদি শোনার না থাকিস তবে বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি আমার কথা। যে ইচ্ছা সেই শোন্‌। শোন্‌ হে কেবল-তরঙ্গে কানপাতা মানুষ — আমি জেলার পুলিশ-সুপারের খাস পাহারাদার। সারারাত চারফুট চারফুটে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। সাহেব-মেমসাহেব খায়-দায়-খেলা করে, হুল্লোড় করে। আলো জ্বালায় আলো নেভায়। ঘুমোয়। জাগে। আবার ঘুমোয়। কিন্তু আমি ঘুমোতে পারি

না। আচ্ছা ঘুম না হয় নাই হল কিন্তু আমার সময় কাটে কেমন করে বল্ তো মানুষ? এক একটা আস্তো রাত সোজা-সাপটা জেগে কাটানো কি মুখের কথা! তোরাই বল, কাজ নেই কম্ম নেই এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি কেমন করে? পা ব্যথা করে চোখ টন টন করে। তাই মনের দুখে রাত্রির সঙ্গে লড়াই করি আমি। এক একটা প্রহর আসে -- আমি তারে গলা ধাক্কা দিয়ে পার করাই। কেমন করে? শোন তবে! প্রথম রাত্রে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া উড়োজাহাজের গতিপথ লক্ষ করি। রাত আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ক'টা জাহাজ দমদম থেকে উড়ল, কটাই বা নামল তা হিসেব করি। যেমন ধর, আজ দমদম থেকে উঠে আমার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে ১৩টা বিমান আর নেমেছে মোটে ৭টা। সেই সঙ্গে গেটের বাইরের রাস্তা দিয়ে কটা জিপগাড়ি, ক'টা ট্যাক্সি, ক'টা মোটরসাইকেল এর মধ্যে গেল তারও হিসেব রাখি। আজ মোটরসাইকেল গেছে রেকর্ড পরিমাণ -- ৭৪ টা। ট্যাক্সি পঁচিশটা। জিপ দু'টো। শুধু তাই না, গুনে গুনে দেখেছি সামনের রাস্তা দিয়ে স্টেশন মুখো গেছে ৩৭৭ জন পুরুষ, মেয়েমানুষ ২৩৩ জন — ঐ আটটা থেকে বারোটার মধ্যেই।

বুঝলি মানুষ, এইভাবে রাত সকালের দিকে ঘাড় কাৎ করলে আমি ব্যায়াম-যোগ-জিমন্যাস্টিক শুরু করি। ততক্ষণে শহর নিঝুম হয়ে পড়ে। কেউ কোথাও থাকে না। এই সময়টা বড়োই দুঃসহ ঠেকে। আগে তো সময় পার হতেই চাইত না। পরে যখন ব্যায়াম শুরু করি, শরীরচর্চা শুরু করি তখন থেকে রাত কেটে যায় তর তর করে। তো আজ আবার বাধল বিপত্তি। কী করি বলতো মানুষ! কাল থেকে আবার নতুন ধান্দা বের করতে হবে। সাহেব বড্ড হুঁসিয়ার মানুষ। লুকিয়ে নজর রাখবে। বেচাল দেখলে কলমের একটা খোঁচায় কিম্বা এ কে ফরটি সেভেনের একটা গুলিতে আমার ছুটি হয়ে যাবে চিরজন্মের মতোন।'

প্রেমহরির ভাবনা বাতাসে বাজতে বাজতে জেলা-শহরের আবহাওয়া মণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ছিল। গাছের গায়ে, দেওয়ালের গায়ে, ঘাপটি মেরে স্তব্ধ থাকা বাসের গায়ের ধাক্কা খাচ্ছিল। হঠাৎ কারেন্ট অফ। চরাচর অন্ধকার। প্রেমহরির মাথা থেকে বিপ্ বিপ্ করে বের হওয়া তরঙ্গরাও স্তব্ধ। তার চোখ আপনা থেকেই বুজে যায়। আবার খোলে। খোলার সাথে সাথে প্রেমহরি এবার যেন অন্ধকার-ফোঁড়া কিছু আলো দেখতে পায়। তবে কি রাত্রির গর্ভ থেকে সকালের জন্ম হবে এবার? হ্যাঁ সমস্ত লক্ষণই প্রকট। প্রেমহরি কান পাতে। হ্যাঁ বোল্ডকার মতো পুব আকাশকে বাজতে শোনে সে। 'কাঁচা তেঁতুল পাকা তেঁতুল / যত দিবি তত খাবো / কলকাতায় গে ঝাড়াই করবো' — বলতে-বলতে হাসনাবাদের ডিজেল ট্রেনটা আসছে। মানে রাত এখন সাড়ে চার। প্রেমহরি জানে সামনের রাস্তাটা এবার জেগে উঠবে। পর পর যাবে সব — সবজির ভ্যান, দুধের ক্যান নিয়ে গোয়ালা, ভোরের শিফ্‌টে কাজ ধরার জন্য জোন-মজুরি শ্রমিকরা। তারপর যাবে বুড়োরা — ফিনফিনে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি-পরা বুড়োরা সামনের কাছারি-মাঠে চক্কর খাবে। তারপর একে একে আসবে লাফিং-ক্লাবের সদস্যারা, সমবেত হাসবে — হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তবে তার আগেই আসবে তার ভোরের বন্ধু উজান। উজান মণ্ডল। নামটা অদ্ভুত। প্রথমটায় বিশ্বাস করেনি প্রেমহরি। ভেবেছিল লোকটা ঠাট্টা করছে। তাই বলেছিল — 'মজা মারছো নাকি? উজান কারো নাম হয় আবার?'

— হয় হয়। — উজানের মুখে ছিল মিচমিচে হাসি।

— ধুস্।

— ধুস্ ক্যানো? এই দ্যাখো। —বলেই উজান তার সামনে তড়াক করে পাল্টি খেয়েছিল হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ। দু-হাতে তরতর করে হেঁটে গেছিল তার সামনে দিয়ে। প্রেমহরি চোখ বড়ো করে দেখেছিল তার বয়সি লোকটির আজব কাণ্ড। সেই সঙ্গে দেখেছিল পঞ্চাশের

কাছাকাছি বয়স পাওয়া উজানের আঁটোসাটো দেহটাকে। হবে না? রোজ পনেরোটা করে পাক খায় কাছারি-মাঠে। তারপর শুরু করে রকমারি শারীরিক কসরত্। সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সে কসরত একনাগাড়ে চলে। গেটের এপার থেকে প্রেমহরি সব দেখে আর চমক খায়। সেই চমকের ভেলায় চড়ে কথায়-বার্তায় প্রেমহরি উজানের অন্দরমহলটাকে জানতে চায়। জানেও। সে জেনে ফেলেছে, হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ তার এই বন্ধুটি একদা তামাম মানুষের মুক্তির জন্য আগুনের মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছিল। সেই আগুনের শিখাকে তারা কুসুমে পরিণত করতে পারেনি বরং আগুনের আঁচে উল্টে তাদের সারাদেহ্ পুড়ে গেছিল। সেই পোড়ার বদলা নিতেই কি উজান নিয়ম করে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়? কী জানি!

রাস্তা দিয়ে হাজার লোক যায়। কেউ কখনো তার দিকে টানা নজর রাখে না। বোধহয় রাখতে সাহস করে না। পুলিশ কর্তার গার্ড বলে কি? হয়তো। কিন্তু এই উজান মণ্ডল একদম অন্যরকমের। সেই যে একদিন শুরু করেছিল, তারপর থেকে তার ডিউটির দিনগুলোর ভোরে গেটের কাছে এসেই সে হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হবেই। উল্টোভাবে হেঁটে যেতে যেতে সেইসঙ্গে 'সে কিছু কথাও প্রেমহরির সাথে বলে নেয়। আজও তার ব্যত্যয় ঘটল না। হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ উজান প্রশ্ন ছোঁড়ে — 'কী বন্ধু মনটা মরা মরা কেন? কী ব্যাপার?'

— ব্যাপার ভালো না। মহাবিপদ। আজ প্রায় ধরা পড়ে গেছিলুম। তোমার ফন্দি আর খাটবে না। কাল থেকে নতুন কিছু ভাবতে হবে বন্ধু।

— তাই নাকি?

— হ্যাঁ। তুমিই ভরসা।

হঠাৎ উজান চলা থামায়। দু-হাতে ভর রেখে স্থির দাঁড়ায়। পা আকাশে। সোজা। প্রেমহরিরর দিকে আড় চোখে চায়। তারপর বলে -- 'ভারি চিন্তার কথা তো!'

– তুমিই ভরসা। তুমিই উদ্ভাবকর্তা। পথ বলে দাও। নইলে সারারাত কাটাবো কী করে?

— শোনো।

- বলো -- প্রেমহরি গেটের ওপর থুতনি রেখে ওপারে নজর করে ঘনিষ্ঠ হয়।

— বুঝলে কাল থেকে তুমি শিকারি হয়ে যাও। শিকার ধরো।

— শিকারি হবো? শিকার ধরবো? কী ধরবো? এটা কি সুন্দরবন নাকি?

— হ্যাঁ শিকারি হবে! শিকার করবে মানুষ।

— মানুষ? — চমকে ওঠে প্রেমহরি — কী বলছো তুমি?

— ঠিকই বলছি। রাত বারোটার পর তুমি শিকারে বেড়িয়ে পড়বে।

— ধ্যাৎ তালে ডিউটি কে করবে? সায়েবের বাড়ি ছেড়ে তো কোথাও বেরোনো যাবে না বন্ধু! ধরা পড়লে চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

— নান্না, কিচ্ছু হবে না। শোনো না বুদ্ধিটা। তোমাকে কোথাও যেতে হবে না। তোমার সাহেবের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই থাকবে তুমি। খালি হাতে শিকারে বেরোবে।

— কী মতলব বলো তো? খালি হাতে শিকার হয় নাকি? — প্রেমহরি বিরক্ত হয়।

— হয়। তুমি শিকার করবে তোমার সাহেবকে, মেমসাহেবকে, তার বাচ্চাহাতি ছেলেকে, তার ঠাকুর-চাকরকে। এই বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ওদেরকে ধরবে। এক এক করে। এক এক জনারে ধরবে আর গলা টিপে মারবে। যত জোর আছে তোমার হাতে ততটা জোরেই গলা টিপে ধরবে নইলে মরবে না কিন্তু।

— কিন্তু সাহেবরা তো দরজা বন্ধ করে ঘুমায়। বাইরে পাবো কী করে? অত রাত্রে ওরা বাইরে আসবে কেন?

— ধ্যাৎ হাঁদারাম। ওরা বাইরে আসবে কেন? আর সত্যি সত্যিই তো তুমি ওদের মারছো না — মারা-মারা খেলবে, ভাবনায়। বাস্, তালে দেখবে নিমেষের মধ্যেই রাত কাবার হয়ে যাবে।

আর দাঁড়ায় না উজান। হেঁটমুণ্ড মানুষটা অতি দ্রুত কাছারি মাঠের দিকে এগিয়ে যায়। সোজা হয় না। প্রেমহরি নজর-ভরে দেখে উজান ঊর্ধ্বপদ হেঁটে যাচ্ছে তরতর করে। প্রেমহরির গলা শুকিয়ে আসে। একটু জল খেতে হবে। সে জলের জগকে 'টার্গেট' করে শিকারে বেরোয় চারফুট বাই চারফুটের কুঠরি ঘরের উদ্দেশ্যে।

তিন

গত সপ্তাখানিক ধরে রাত দুটোর পর থেকে প্রেমহরি খুনি হয়। সফল খুনি। লম্ফ-ঝম্ফ নেই, সাবধানতা নেই, চোরাগোপ্তা দৌড়াদৌড়ি নেই, শুধু তার চারফুট বাই চারফুট ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক খুন করে যাওয়া। বন্ধু উজান মণ্ডলের কথা মতো নিত্যদিন নিত্য-নতুন কলাকৌশলে প্রেমহরি তার সাহেবকে, মেমসাহেবকে মায় তার পুষি বিল্লিটাকেও খুন করে। তার হাতের দু'তালু তখন জাঁতা হয়ে যায়। আঙুলগুলো হয় তার খাঁজ। সেই জাঁতার প্রবল পেষণে দম আটকে পাটকাঠির মতো সপাসপ মাটিতে পড়ে যায় তারা। যদিও খুন হওয়ার আগে তারা সবাই প্রাণ বাঁচাতে মরণপণ দৌড় লাগায়। পালায়। পালিয়ে বেড়ায় পুরো চৌহদ্দির মধ্যে। কিন্তু প্রেমহরির চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবে কোথায়? পালাতে পারে না কেউ। মাঝরাত্তির থেকে একটার পর একটা খুন করতে করতে খুনের সিঁড়িতে চড়ে বসে সে। সিঁড়ি চলে তরতর তরতর। সে সিঁড়ি যেন নেশার খৈনি। খৈনির ঘোর। সেই নেশার সিঁড়ি তারপর কখন সকালে পৌঁছায় প্রেমহরি তা খেয়াল করতে পারে না। তখন একঘেঁয়ে ডিউটির বিরক্তি পাকা পাতার মতো টুপ করে ঝরে যায় তার দেহ থেকে। ফলে রোজ সকাল আটটায় ডিউটি-বদলের পর বেজায় খুশি মনে বাড়ি ফেরে সে। তার খুশির সিঁড়ি তখন বউ সজনীর বুকে গিয়ে ঠেকে। বউও খুশি হয়। বলে — 'মনে যে ক'দিন বড়ই ফুর্তি দেখি। কী ভাব?'

— ভাব আবার কী? কিছু না!

— না বললে শুনছি না। আমার চোখকে তো তুমি ফাঁকি দিতে পারবে না। বলো না কী ব্যাপার? বউ সজনীর রান্নার হাত খুব ভালো। গ্যাসের ওপর ট্যাংরা মাছের ঝাল চাপিয়ে সে আদুরে গলায় স্বামীকে বলে — 'আমায় লুকিয়ো না। বলো না, উপরি কিছু হোলো নাকি?'

বাড়ি ফাঁকা। দুছেলে-মেয়ে স্কুলে। এমন সময়-সুযোগ পেলে প্রেমহরি সজনীর সঙ্গে একটু রঙ্গ-তামাশা করে থাকে। আজও করল। রয়ে-সয়ে রসিয়ে-রসিয়ে বউয়ের আদর খেল। বউ ক্রমশ তাদের যৌথ-ঘনিষ্টতার স্পর্শবিন্দুতে চলে গিয়ে ফের শুধোয় — 'কীগো চুপচাপ যে?' প্রেমহরি, এবার সক্রিয় হয়। মুখে বলে — 'হুঁ!'

— হুঁ কী? খুলে বলো না!

— বলব। —প্রেমহরি সংক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। তারপর সে আর দাঁড়ায় না। সোজা স্নানঘরে ঢুকে পড়ে। দরজায় ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে ঠাট্টা করে — 'ফাউ ফ্রাউ শুনবে? দুপুরে খাজনা দিয়ো তবে বলবো!' — খাওয়ার পর বিছানায় পিঠ দিয়েই সজনী স্বামীর বুকে গুঁতো মারে — 'কী হল বল?'

— কী বলবো?

— মনে এতো খুশি কেন?

— না তেমন কিছু না। এখন রাতগুলো তরতর করে কেটে যায়। বিরক্তি লাগে না।

— আমি রাতের কথা জিগ্গেস করেছি নাকি? বলছি উপরি কিছু পেলে?

— না এখন সাহেবের বাড়ি ডিউটি চলছে — উপরি হবে কোথা থেকে? -- প্রেমহরি উদাসীন থাকে।

— তাহলে এ মাসেও আমার পেস্ট-মশ্‌লা হবে না? — সজনীর গলায আক্ষেপেব রেণু।

— না।

— তোমার মেমসাহেবের কী সুখ বলোতো? বাটনা নেই, কোটনা নেই, হাত জ্বালা কবা নেই, কোনো ঝক্কি নেই। শুধু টিউব টিপে মলমের মতোন খানিকটা তরকারিতে দাও। ব্যস্‌।

— তা সত্যি। বিজ্ঞানের যুগ। ইন্টারনেটের খেল্‌। ওদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। সেই তুলনায়.... ! কথা শেষ করতে পারে না প্রেমহরি। তার কথা কেড়ে নিয়ে সজনী যেন একটা ঝাপটা মারে — 'আমার কপাল! ভাগ্যি কবতে হয় ভাগ্যি। হয়েছি কনস্টেবলেব বউ। তার উপব তোমার মুখেই তো শুনেছি, তাব সাজগোজের কী বাহাব! সুইচ টিপলেই বাতাসেব কাঁধে চড়ে নাকি টিভির পর্দায় মডেলরা এসে হাজিব হয। তাবা নাকি দিন বুঝে, মানুষেব মন বুঝে, সকাল-বিকেলের বঙ দেখে পটাপট বলে দেয় কেমন সাজলে কী বঙেব শাড়ি পড়লে কীবকম মেকআপ নিলে সে মুহূর্তে ভালো দেখাবে — সক্কলের মাঝখানে টেক্কা মারা যাবে?'

-- হু উ! তা ঠিক্‌! — প্রেমহরির মাথায় পাথবের ভাব চাপে।

— হুঁ কী? তুমি তো শুধু ড্যাব ড্যাব করে দেখেই খালাস। কোনো দিন সখ-আহ্লাদ করেছো আমারে নিয়ে? ভেবেছো সজনীরে একটু পাটে রাখি? — সজনী ডুকরে কেঁদে ওঠে। অমনি বাতাস বাজতে থাকে। বিদেশি কোনো টিভি কোম্পানির বিশেষ চ্যানেলের তবঙ্গ এসে ঢুকে পড়ে প্রেমহরির বিছানায়। প্রেমহবিব মুখস্থ এসব — এসব তরঙ্গের খিদে সে জানে। এরা সব খায। মানুষ খায়, মাটি খায, বাতাস খায়। প্রেমহবি বুঝে ফেলে, যেমন করে এরা তার মেমসাহেবকে খেয়েছে, মেমসাহেবের বাচ্চাহাতি ছেলেকে খেযেছে তেমন করে সজনীকে খেতে আসছে। সে দেখতে পায সজনীর মনে সেই খিদেব ঢেউ লেগেছে। এটাকে বাডতে দিলে বিপদ। তাড়ানো দরকার। প্রেমহরি উঠে পড়ে ধড়মড় করে। ঘরেব কোণে রাখা ঝাঁটাটা খোঁজে। পায় না। পরিবর্তে পায় বিছানা-ঝাড়া ফুলঝাড়ু। প্রেমহবি তাই দিয়ে ঝাঁটাতে থাকে — 'যা যা, বিদেয় হ'! এলোপাথাড়ি ঝ্যাটায় সে। কিন্তু তবুও বাজনা থামে না। অচেনা চ্যানেলের বাজনা বিপ্‌ বিপ্‌ করে অবিরাম সঙ্কেত দেয — 'দাস-দাসী হাজির! কী চাই ম্যাডাম কী চাই?'

বাতাসের অবিরাম শব্দে প্রেমহরির মগজেব বিন্যাস পাল্টে যায়। মাথায় ঘিলুতে টনটনে ব্যথা চাগিয়ে ওঠে। সে বউকে বলে — 'ওঠো সজনী ওঠো। শুয়ে থেকো না। হারামজাদি ঐ তরঙ্গরে ছুঁড়ে ফ্যালো। নইলে ও সবাইরে খাবে, — তোমারে খাবে, আমারে খাবে — ছেলেমেয়ে সব খাবে। ওঠো!'

প্রেমহরি সজনীকে পাঁজিয়ে ধরে। তার মুখের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। কিন্তু বউয়েব কোনো ভাবান্তর থাকে না। প্রেমহরির পলকহীন মুখের উপর ভিনদেশি পেস্টমশালার স্বপ্ন-দেখা তার বউ কেটে কেটে জবাব দেয় — 'না'। বড় লোভি, বড় জেদি সে উচ্চারণ।

চার

বিগত দিন পনেরো খুব মসৃণভাবে রাত কাটিয়েছে প্রেমহরি। যেমন করে জোনাকির পিছনে মন্দাক্রান্তা ছন্দে আলো জ্বলে তেমনিভাবে রাতের প্রহরগুলোকে নিয়ে একবার জ্বালিয়েছে আবার নিভিয়েছে সে। কোথাও কোনো বিপত্তি ঘটেনি। কিন্তু গতকাল থেকে তার মাথার জোনাকি পোকারা আলো দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যে খুন-খুন খেলায় মেতে উঠত প্রেমহরি তাতে বাধা পড়েছে। গতকাল সারারাত অভিযান চালিয়েও সে তার মেমসাহেবকে খুন করতে পারেনি। তীব্র ঘাতকের খিদে নিয়ে নিত্যদিনের মতো একেবারে প্রথমে সাহেবের দোতলায় মার্বেল-মোজাইক বাথরুমের পাশে ঘাপচি মেরে বসে থেকেছে। রোজকার মতো ভাতঘুমের ঘণ্টাখানেক পরে নগ্নবাহু মেমসাহেব বাথরুমে ঢোকামাত্রই প্রেমহরি তার অপারেশন শুরু করেছে। লোহার শিকের মতো শক্ত দু'হাত বাড়িয়ে মেমসাহেবের গলা টিপে ধরতে গেছে রুটিনমতো। এবং অন্যান্যদিনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই মেমসাহেব ডুকরে চিৎকার করে ওঠার মুখে প্রেমহরি তার মুখ চেপে ধরে পাঁজাকোলে করে নিচের বাগানে নামিয়েছে। বাঁচার আকুতি জানাতে জানাতে মেমসাহেব পিছু হটতে শুরু করেছে। প্রেমহরি স্থির-নিশ্চিত প্রত্যয় নিয়ে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ছন্দে মেমসাহেবকে তাড়াতে শুরু করেছে। বাড়ির সামনে থেকে পিছনে, দেবদারু গাছের গুঁড়ি ঘিরে, জিমন্যাসিয়ামের দেয়াল ঘুরে, ঠিক তার চারফুট বাই চারফুটের সামনে সে মেমসাহেবের গলায় অন্তিম চাপ যেমনি দিল অমনি অঘটনটা ঘটেছিল।

প্রেমহরি অবাক হয়ে দেখল মেমসাহেব শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবার পবিবর্তে সড়াৎ করে পিছলে গেল তার হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে বাজনা বাজল — 'বিপ্-বিপ্'। মুহূর্তে প্রেমহরির মাথায় উঠল তার অনুরণন — পারবে না পারবে না। কিছু সময় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে। তারপর ত্বরিত সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখে — মেমসাহেব ফিরে যাচ্ছে তার বিছানায়। অমনি সোঁ করে দৌড়ে গেল প্রেমহরি। পুনরায় মেমসাহেবের গলা টিপে ধরল। ধরামাত্রই ফের বাতাসে বাজনা বাজল — বিপ্ বিপ্। সঙ্গে সঙ্গে যেন চুয়াল্লিশ হাজার ভোল্টের ঝাঁকুনি খেল সে। ঝটকা খেয়ে পড়েও গেল। আবার উঠল। এবার মরিয়া চেষ্টা। মেমসাহেবের নাইটি ধরে টান দিল। অমনি নাইটিটা পেয়াজের খোসার মতো ছাড়িয়ে এল তার হাতে। আর একসঙ্গে হাজারটা জোনাকি বিপ্ বিপ্ করে জ্বলে উঠল মেমসাহেবের দেহে। প্রেমহরির চোখ ঝলসে গেল। ধাঁধাঁ লাগল চোখে। তবে কি সে আজ পারবে না? খুন-খুন খেলায় তার পরাজয় ঘটবে? মাথায় রক্ত উঠে যায় তার। দৌড়ে চলে আসে তার চার বাই চারের ঘরে। হাতে তুলে নেয় নিরাপত্তা রক্ষার বন্দুক। চকিতে মেমসাহেবের দিকে তাক করে।

নগ্নদেহা মেমসাহেবের সারা গায় আগুনের চোখের মতো জোনাকি পোকারা জ্বলছে। সেই আলোয় মেমসাহেবের শরীর আরো মোহময় হয়ে উঠেছে। কেমন যেন সেক্সি-সেক্সি। হঠাৎ একবার সজনীর কথা মনে আসে। না সে-দেহে আলো ঝরে না কোনোকালে। প্রেমহরি কালবিলম্ব করে না আর। বন্দুকের ট্রিগারে চাপ দেয়। ছর্‌রা মেরে গুলি বেরোয় একঝাঁক। অমনি বাতাস বেজে ওঠে কোরাসে — বিপ্ বিপ্ বিপ্ বিপ্! সে বাজনার ক্যানভাসে বিদেশি কোনো টিভি চ্যানেলের ছবি ভেসে ওঠে। হাজারটা নগ্নদেহা নারী যেন পর্দা হয় — ঢাল হয়। গুলি লাগে না মেমসাহেবের দেহে। প্রেমহরি পুনরায় বন্দুক তাক করে। গুলি করে। সে গুলির সব ধাক্কা পিঠ পেতে শুষে নেয় নগ্ন ঐ সব জোনাকিরা। প্রেমহরির চোখের

সামনে মেমসাহেবের গায়ের জোনাকিরা এবার কোল্ডড্রিংস খাওয়া সুন্দরী নারী হয় — ছাতার মতো ঢাল হয়। তাদের সামনে বন্দুকের গুলিগুলো পুষি বিড়াল হয়ে যায় একটার পর একটা। এমনটা চলে সারারাত। গলদঘর্ম হয় প্রেমহরি। যত ঘামে সে তত তার দেহে বিদেশি চ্যানেলের বাজনা ওঠে। সেই সব সেক্সি-সেক্সি বাজনা প্রেমহরিকে খুনি হতে দেয় না। অবসাদে নেতিয়ে পড়ে প্রেমহরি।

সকালে ডিউটি বদলের সময় একটা খবরে সে আরো বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। পাল্টা ডিউটি নিতে নিতে অন্যজনে বলে — 'কী ব্যাপার বস? ডিউটি ফাঁকি দিচ্ছ কেন? তোমার নামে রিপোর্ট গেছে যে!' প্রেমহরি চোখ বড়ো বড়ো করে শোনে শুধু। কিছু বলে না। এতে বিষাদ বাড়ে। সেদিন বাড়িতে গিয়েও কেমন যেন ঝিমিয়ে থাকে। সে সব খেয়াল করে না সজনী। সে রান্না করতে করতে জিজ্ঞাসা করে — আচ্ছা বলোতো ঐ পেস্ট-মশলাগুলোর রঙ কেমন? লাল? নীল? ঘিয়ে? দুধে-আলতা?

— কী জানি! — প্রেমহরি উদাসীন উত্তর দেয়।

— তবে? তবে কি আমাদের কলিজার মতো স্বপ্নিল?

প্রেমহরি কোনো উত্তর দেয় না। কিছু সময় গুম মেরে থাকে। তারপর বউয়ের খুব কাছে গিয়ে বলে — সজনী তুমি জোনাকি হতে পারো?

— জোনাকি? — সজনী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

— হ্যাঁ জোনাকি। বিদেশি টিভির ল্যাংটো ল্যাংটো জোনাকি! তুমি ওদের মতো বাতাসে বাজনা তুলতে পারো?

স্বামীর কথা একবর্ণও বুঝতে পারে না সজনী। সে আন্দাজে বলে — 'কী ব্যাপার বলোতো? উল্টোপাল্টা কী সব বলছো? বলি সাহেবের বাড়ি থেকে নেশাটেশা করে আসো নি তো, হ্যাঁ?'

প্রেমহরি একথার কোনো উত্তর দেয় না। মনমরা ভাব নিয়ে স্নানে যায়। তেমনিই ঘোরের মধ্যে সারাটা দিন কেটে যায়। ফের সন্ধেবেলা ডিউটিতে এসেই সে খুনি সাজে মনে মনে। আজ তাক করে সাহেবকে। মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এসপার কী ওসপার। আজ দু-হাতে জড়ো করেছে জল্লাদের শক্তি। হৃদয়হীন নিষ্ঠুর সেই হাতের ফাঁস। স্থির সংকল্পে এগিয়ে যাচ্ছে সাহেবের গলার দিকে। সাহেবের চোখে তাড়াখাওয়া হরিণের মতো ভীতির কাঁপুনি। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই প্রেমহরির। বাড়ির পিছনে ইউক্যালিপটাস গাছের গোড়ায় ধাক্কা খেয়ে সাহেব পড়ে যেতেই সে তার জল্লাদ ফাঁসের হাত দুটো সাহেবের গলায় চেপে ধরে। ধরেই অন্তিম চাপ দেয়। আজ কোনো সময় নষ্ট নয়। পর পর সবাইকে মারবে সে। তার হাতের প্রথম চাপেই সাহেবের মুখ থেকে একহাত জিব বেরিয়ে পড়ে। সাহেব হাঁফাচ্ছে — সৌখিন বিদেশি কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে সাহেব। চোখ বেরিয়ে আসছে ঠিকরে। প্রেমহরি একবার আয়েশ করে সে-দৃষ্টি দেখে নেয়। দেখে খুশি হয়। হ্যাঁ ঠিক ঠিক গতিতে এগোচ্ছে। গতদিনের মতো কোনো যাদু অন্তত হচ্ছে না। তার চোখের কোণে ফুটে ওঠে কর্তৃত্বের হাসি। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বেপরোয়া টুনটুনি পাখি।

সেই পাখি কিচির-মিচির করে বলে ওঠে — 'শাল্লা বিদেশি নেট-ওয়ার্কের এ্যাতই ক্ষমতা, প্রেমহরি-কনস্টেবলের গুলি আটকে দেবে। হুঁ!' বেপরোয়া টুনটুনির চোখে তাচ্ছিল্যের অট্টরোল। টুনটুনি সুর করে করে বলে — 'প্রেমহরিতে টুনটুনালো যাদুবিদ্যের নাক কাটা গেল।' ছড়ার আমেজে প্রেমহরির হাতে খুন-বিদ্যার ছন্দ নেচে উঠল। গত ক'দিনের পরাজয়ের মাথায় পা দিয়ে সে যেমনি সাহেবের গলায় মোক্ষম ফাঁস চেপে দিল অমনি বাতাস বেজে উঠল — বিপ্‌বিপ্‌। বিপ্‌বিপ্‌। মুহূর্তে সাহেবের দেহটা কঠিন হয়ে গেল। লোহার মতোন।

চারদিকের বাতাসও লোহার মতোন শক্ত হয়ে যায়। সেই শক্ত বাতাসের পর্দায় ভেসে ওঠে কোনো বিদেশি চ্যানেলের ছবি — স্বর্গের থেকে নেমে এসেছে ল্যাঙট-পরা ডানাকাটা সুন্দরীরা। তাদের হাতে রঙিন কোল্ড-ড্রিংসের বোতল। তাদের চোখে পেটেন্টের ফাঁদে পড়ে বিদেশি হয়ে যাওয়া বাসমতি চালের গন্ধ। তারা এগিয়ে আসে। প্রেমহরিকে কোল্ডড্রিংস অফার করে। প্রেমহরির বগলে বসে দাপনা বাজায় সেই টুনটুনি পাখি। প্রেমহরির গায়ে ড্রিমি ড্রিমি নাচের মাদক। সে হাত বাড়িয়ে ঠাণ্ডার বোতল নেয়। হিরোদের মতো তাতে সেক্সি-সেক্সি চুমুক মারে। এবং প্রথম চুমুকের পর সে দেখে তার সাহেব মানুষ হয়ে নিজের বিছানার দিকে চলে যাচ্ছে।

প্রেমহরি অমনি সেদিকে ছোটে। শুরু হয় সাহেবের সঙ্গে খুনোখুনি খেলা। এবার বন্দুক নিয়ে এগোচ্ছে সে। সাহেবকে তেড়ে-তাড়িয়ে গুলির রেখা বরাবর আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। রাত বাড়ছে হু-হু করে। একনাগাড়ে সাহেবকে তাড়াতে তাড়াতে সে আন্দাজ করে নিতে পারছে রাত চারটের বিদেশগামী বিমানটা এইমাত্র তার মাথার উপর দিয়ে পূবদিকে উড়ে গেল প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে। তার মানে আজকেও কি সে ব্যর্থ হবে? প্রেমহরি আর দেরি করে না। সে বন্দুকের ট্রিগারে আজও চাপ দেয়। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে যায় সাহেবের দিকে। এবার নিশ্চয় সাহেবের খেল খতম! কিন্তু না তেমনটি হল না। প্রেমহরি থ হয়ে দেখল—বন্দুকের নল দিয়ে গুলি না বেরিয়ে বেরিয়েছে বহুজাতিক কোম্পানির সেই সব নক্সাদার পেস্টমশলার টিউব। রঙবাহারি টিউবগুলো সাহেবের দেহের খাঁজে খাঁজে আঁটকে গেল। তা দেখে প্রেমহরির চোখ ছানাবড়া। সে সেই চোখে দেখল সাহেব সেই পেস্টমশলাগুলোকে রান্নাঘরের তাকে সাজিয়ে রাখলেন।

দর দর করে ঘামছে প্রেমহরি। বাতাস বাজছে বিপ্‌বিপ্ করে। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। আর একটা ব্যর্থ রাত কাটল তার। সে কেমন যেন বোবাদৃষ্টিতে সাহেবের ঘরের মেনগেটের দিকে তাকিয়ে রইল। একসময় সেই দৃষ্টির পর্দা কেটে ফুটে উঠল ইউনিফর্ম পরা তার সাহেবের জীবন্ত দেহটা। নিচে দেখল — গাড়ি নিয়ে ড্রাইভার তৈরি। তার মানে সাহেব এই কাকভোরে কোথাও যাবেন। চোখের পলক পড়তে না পড়তেই গাড়ি এসে পড়ল গেটের সামনে। প্রেমহরির সম্বিত ততক্ষণে নিরাপত্তারক্ষীর চেহারায় মূর্ত হয়ে গেছে। কাঁধে বন্দুক। সে গেট খুলে দেয়। আড়চোখে দোতালায় নজর ফেলে। সেখানে নগ্নবাহু মেমসাহেবের বিহ্বলতা। সব কিছু স্বাভাবিক। হুস করে গাড়ি চলে যায়।

গেট বন্ধ করতে গিয়েই প্রেমহরির নজরে পড়ে দুলকি চালে দৌড়ে আসছে বন্ধু উজান মণ্ডল। সে গেটের উপর ঝুঁকে পড়ে — 'দাঁড়াও ভাই উজান।' উজান দাঁড়ায়। তবে ক্ষণিকের জন্য। মুহূর্তে সে পাল্টি খায়। হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়। দু'হাতে হাঁটতে শুরু করে — 'কেন আবার কী হল?'

— বিপদ। খুব বিপদ ভাই।

— কী বিপদ?

— মরছে না। যতবার গলা টিপে ধরি শালা ততবারই পিছলে যায় সাহেব-মেমসাহেব।

— তাই নাকি? — হেঁটমুণ্ড উজান ধীর গতিতে এগোতে এগোতে প্রশ্ন করে?

— হ্যাঁ। এমনকী বন্দুকের গুলিও করলুম কিন্তু সব ওলোটপালোট হয়ে যাচ্ছে। কী যে করি। মাথাটা ঘুরছে উজান। — প্রেমহরির গলায় যেন আতঙ্ক।

— এখন ওটাই নিয়ম।

— মানে? আর কোনো বিকল্প নেই? দোহাই তোমার। তুমি তো আগুনের পুত্র। আর একটাবার পথ বলে দাও তুমি!

— পথ তো নেই!

— তবে?

— তবে কী? নিজেরে শুধোও!

উজান কোনো কথা বলে না। যেমন যাচ্ছিল হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে তেমনই চলে যায়। যেতে যেতে একবার প্রেমহরির দিকে তাকাল। বলল — 'এখন সোজা করে তাক করলে বন্দুকের গুলিতে কাজ হয় না বন্ধু। উল্টো ধরে কল টেপো — ঠিক গুলি বেরোবে!' একটু হাসল কি লোকটা? বোধহয়। ভারি অদ্ভুত লাগল প্রেমহরির। উল্টোমুণ্ড মানুষের হাসি কখনো দেখেনি সে। উদ্ভট উদ্ভট।

প্রেমহরির চোখেব উপর হঠাৎই পাল্টি খেয়ে সোজা হল উজান। দু' পা হাঁটল। তারপর আবার এতদিনকার রীতি ভেঙে ফের হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ হয়ে হাঁটতে শুরু করে দিল। হাঁটতে হাঁটতে উজান তার হাঁটার গতি বাড়ায়। প্রেমহরি ঘাড় বাঁকিয়ে দেখে। মিলিয়ে যাচ্ছে উজান — এতদিনকার মুশকিল আসান! প্রেমহরি ঘামতে থাকে। বিনবিন করে। মাথাটা শূন্য শূন্য মনে হচ্ছে। ঘুরছে মাথা। বন্দুকটা উল্টো রেখে একবাব পবীক্ষা করে দেখবে নাকি? গলা শুকিয়ে কাঠ। একটু জল দরকার। হঠাৎ বাতাস বেজে ওঠে -- বিপ্-বিপ্ বিপ্-বিপ্। প্রেমহরির কাঠ-গলা আশান্বিত হয়। বিদেশি চ্যানেলের হিরোইন কী কোল্ডড্রিংস হাতে এগিয়ে আসবে এক্ষুনি? চাতকেব মতো অপেক্ষায় থাকে প্রেমহবি।

আকণ্ঠ পিপাসা-বুকে দূরে তাকায়। হেঁটমুণ্ড ঊর্ধ্বপদ লোকটা নেই!!

জেনা

নীহারুল ইসলাম

'শুধু রোজগার আর খাওয়া-দাওয়ায় তো বাপু জীবন নয়। জীবনকে বুঝতে হলে জগৎকে বুঝতে হবে। জগৎস্রষ্টাকে বুঝতে হবে।....' মগরিবের নামাজের পর হুজুর হাভাতা গ্রামের মানুষজনের কাছে বক্তব্য রাখছেন। গ্রামবাসীরা সব মন দিয়ে শুনছে তাঁর কথা। কিন্তু তাঁর বলার আগে জগৎ কিম্বা জগৎস্রষ্টাকে বুঝতে পারছে না কেউ। সবাই শুধু ভাবছে আর ভাবছে!

বিজলির রোশনাই — হুজুরের মুখ-চোখ চক্‌চক করছে। যেন তার মুখ-চোখ থেকেই রোশনি উপচে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘন সাদা দাড়ি-গোঁফের আড়ালে হুজুরের লালটুকটুকে ওষ্ঠ আবার কখন ফাঁক হবে, তখন সবাই জানতে পারবে জগৎ কী, জগৎস্রষ্টাই বা কে? কিন্তু এর ফাঁকে বিরতির এই এক চিলতে সময় যেন কতকাল। ভিতর ভিতর কারো আর তর সইছে না। মেয়েরাও অন্ধকারের আড়ালে বসে আছে ধর্মকথা শোনার জন্য।

সেই 'কুন মূলক' থেকে হুজুর এসেছেন তাদের ধর্মান্ধতা ঘোচাতে। আজ চোদ্দ'শো বছর পার হয়ে গেল ইসলামের। ইসলাম আজ এত বিস্তীর্ণ। অথচ তার নীতি বিক্ষিপ্ত খুব। যে যেমনভাবে পারছে ইসলামকে ব্যবহার করছে। তাই হুজুর নেমেছেন সঠিক রাস্তা দেখাতে। তিনি গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মানুষের শুভবুদ্ধির জন্য। ধর্মবোধের জন্য। ধর্ম বিচ্ছিন্ন মানুষের কি গতি হয়, কমিউনিজিমের পতন দিয়ে এই দশকে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এসব কথাও নাকি হুজুর গ্রামে-গ্রামে মানুষকে বুঝিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর এসব কথার জন্যই নাকি তিনি খুব জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয়তা গ্রাম-গঞ্জ ছেড়ে গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে দিনকে-দিন। তিনি এ-শতাব্দীর নতুন অবতার হয়ে যাবেন কি না — সে পর্যন্ত মানুষের চিন্তা প্রসারিত হয়েছে শুদ্দ। আগামী দু-মাসের প্রোগ্রাম তাঁর ঠিক হয়ে আছে, কোথায় কোথায় যাবেন তিনি। তবু তাঁর চাহিদা খুব। সবাই চাইছে তাঁকে পেতে আজ বাদে যেন কাল না হয়। আবার যারা তাঁকে পেয়েছে তারা আক্ষেপ করছে 'এমন হুজুরের সাক্ষাৎ তারা আগে কেন পায়নি' বলে।

হাভাতা গ্রামে হুজুরের আগমন এখনও চব্বিশ ঘণ্টা পার হয়নি। এর মধ্যে কত দূর-দূরান্তে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, কত দিক্‌কার লোক ছুটে এসেছে। কেউ-কেউ আবার হুজুরকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব রাখছে। কিন্তু হুজুর কাউকে কথা দিচ্ছেন না। এমন কী তিনি এ-গ্রামে ক'দিন থাকবেন, তাও জানে না কেউ। সব নির্ভর করছে হুজুরের মর্জির উপর।

হুজুর বলে চলেছেন, জীবন কী? সবাই হাঁ করে শুনছে তাঁর কথা। আর ভাবছে তাদের এতদিনের জানাটা কত ভুল ছিল না জানি! তাতে কত পাপ হয়েছে! তৌবা-তৌবা!

এদিকে হুজুরের জীবন-প্রসঙ্গ শেষ হতে না হতেই এবার নামাজের আজান ভেসে এল। যার জন্য উপস্থিত জনমনে ঢেউ খেলে গেল। বেশ তো শুনছিল, এর মধ্যে আবার ব্যাগড়া কেনে! সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এটাও বুঝল তারা যে নামাজ হল ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি, তাকে অমান্য করা যায় না।

দুই

হুজুরের আস্তানা হাকিম সাহেবের বাংলোয়। এখন আর হাকিম সাহেব বেঁচে নেই। কিন্তু হাকিম সাহেবের বাংলোটি আছে। এতদিন ফকির-দরবেশ, চোর- ছ্যাচোড়দের ডেরা হয়েছিল সেটা। গাঁয়ের মানুষ রাতেরবেলা ভয়ে সে মুখো হত না। অথচ আজ, হাকিম সাহেবের গত হবার পর এই প্রথম জায়গাটি আগের জেল্লা ফিরে পেয়েছে। আগরবাতির গন্ধে চাবিদিক ভরপুর। হুক লাগানো বিজলিবাতির রোশনা। জঙ্গল ঝাল সব পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন সামনের পুষ্করিণীটাও দৃশ্যমান। এতদিন জঙ্গল-ঝালে ঢাকা ছিল। স্বভাবতই এই একদিনে জায়গাটি খানিকটা আশ্রম গোছের হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে এবার নামাজ শুরু হয়ে গেল। বাংলোবাড়ির পুরো আঙিনায় লোকে ভর্তি। এত লোক এ-গ্রামে জুম্মার নামাজেও একসঙ্গে দাঁড়ায়নি বোধহয়।

নামাজ শুরুর আগে 'সেরাব মুন্না' নামে এক ব্যক্তি, কোনো নামাজ-ই যেন কারো হাতছাড়া না হয় তার জন্য শপথ নেওয়ার কথা বলেছে সবাইকে। সেই শপথ নিয়ে নামাজ পড়তে শুরু করেছে সবাই।

নামাজ শেষে একে-একে হুজুরের পা কদমবুসি করে বিদায় নিতে শুরু করল। এতে হুজুরের পা-জোড়া ব্যথা হয়ে যাওয়ার জোগাড়। তবু তিনি সহ্য করছেন, শুধু হুজুর হয়েছেন বলেই। একটা সময়ে এটা তাঁর খুব ভালো লাগত। কিন্তু এখন যন্ত্রণা।

পর পর হুজুরের খাওয়া-দাওয়া। গাওয়া ঘি-এ ভাজা পরোটা, ডিমের হালুয়া, মুরগির গোস্ত, তাছাড়া দু চার কিসিমের মিষ্টি। হুজুর যা খেলেন তার চেয়ে অনেক বেশি পাত্রেই থেকে গেল। সেগুলি নিয়ে শিষ্যরা এখন কাড়াকাড়ি করবে। কে কতখানি ভক্ষণ করে কতখানি পুণ্যিসঞ্চয় করতে পারে, তার লড়াই শুরু হবে। এ-লড়াই অবশ্য হুজুরের সামনে হবে না। হবে হুজুরের সামনে থেকে পাত্রগুলি উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর। আগে সামনেই হত। কিন্তু হুজুর হঠাৎ একদিন নিয়ম বেঁধে দিলেন, নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে যাতে সেগুলি বণ্টন করে দেওযা হয়। কিন্তু নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সেগুলি বণ্টন হবে না। দুনিয়ায় কার পুণ্যির লোভ নেই! হুজুরও সেকথা জানেন।

গঙ্গাব ওপারের একটি গ্রাম। সেও বিশ-বাইশ ক্রোশের কম নয়। সেখান থেকে গোরুরগাড়ি চড়ে হুজুর এসেছেন এই গ্রামে। শরীরে তাঁর ক্লান্তি। তাই তিনি শরীর এলিয়ে দিয়েছেন বিছানায়। দু-জন ছুটে এসেছে তাঁর সেবার জন্য। তাদের সেবা গ্রহণ করছেন তিনি। যদিও পুরুষ মানুষের সেবা তাঁর পছন্দ নয়। সেকথা সেরাব মুন্নাকে আগেই জানিয়ে রেখেছেন। সেরাব মুন্না তাই তার বৌ রাবিয়াকে আনতে গেছে বাড়ি।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা এসে গেল। রাবিয়াকে দেখে হুজুরের মনের অশান্তি কাটল। কেননা রাবিয়া মনপসন্দ হবে কি-না, মনে সংশয় ছিল তাঁর।

সেরাব আর রাবিয়াকে আসতে দেখে এতক্ষণ যে দু-জন হুজুরের সেবা করছিল, তারা বিদায় নিল। রাবিয়া নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করছে। গাঁয়ে এত মেয়ে থাকতে নিজে হুজুরের সেবা করতে পাওয়ায়। রাবিয়া মন দিয়ে হুজুরের পা টিপতে শুরু করল। আরামে হুজুরেব চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। সেরাব মুন্না চুপচাপ বসে বসে দেখছিল। তার চোখে-মুখেও ক্লান্তির ছাপ। তার শরীরেও কম ধকল যায়নি। হুজুবকে নিয়ে আসার ব্যাপারে তার তদ্বির-ই ছিল সবচেয়ে বেশি। অতএব আরামের প্রয়োজন তারও। সেরাব মুন্না সেখানে আর বসল না। রাবিয়াকে হুজুরের সেবায় রেখে বাড়িমুখো হাঁটতে শুরু করল। তার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়িতে একা আছে।

রাবিয়া ভাবছিল একটু পরে সেও বিদায় নেবে। কিন্তু তা আর হল না। হুজুরের চোখের পাতা ফাঁক হল আবার। আর তাঁর হাত আশীর্বাদের নামে রাবিয়ার মাথা থেকে সারা শরীরে খেলতে আরম্ভ করল। রাবিয়া হুজুরের এই সন্তুষ্টিকে এক-ধরনের সেবা মনে করে চুপ করে রইল।

তিন

হাভাতা গ্রামে হুজুরের পদার্পণ চারদিন পার হতে চলেছে। গ্রামবাসীরা খুব গর্বিত হুজুর আশপাশে এতদিন কোথাও কাটাননি বলে। সবার অনুমান নিশ্চয় খোদার রহমত আছে এই গাঁয়ের উপর। না-হলে তিনার এখানে এতদিন থাকার হেতু কি? এতে যে এলাকায় তাদের গাঁয়ের মর্যাদা বাড়বে, তাতে তাদের সন্দেহ নেই। কেউ কেউ আবার এও ভাবতে শুরু করেছে যে, হুজুর যদি এই গাঁ-কে ভালবেসে তাঁর শেষ সময়টা এখানেই কাটিয়ে মারা যান, তাহলে এ-জায়গাটা একদিন আজমির কিম্বা পাথর চাপড়ির মতো হবে না, তাই বা কে বলতে পারে। যদি হয় তাহলে আর হাভাতা গ্রামে ভাতের অভাব হবে না। এরকম পাঁচমিশেলি ভাবনা দিনকে-দিন গ্রামবাসীদের মনে বেড়ে চলেছে। সেই সঙ্গে ধর্মকর্মও। বাড়িতে বাড়িতে মিলাদ। আট-দশ বছর থেকে শুরু করে বুড়ো-বুড়ি পর্যন্ত সবারই পাঁচওয়াক্তের নামাজ পড়া। আগে মসজিদ ফাঁকা পড়ে থাকত। মসজিদের বারান্দায় কুরবানির খাসি বাঁধা থাকত। সেই বারান্দা পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়নি কোনোদিন। যে সংখ্যক নামাজির পায়ের ধুলো পড়ত মসজিদে, তার সংখ্যাও হাতে গোনা ছিল। কিন্তু এক হুজুরের আগমনে সব রাতারাতি পাল্টে গেল। এখন ওয়াক্তিয়ার নামাজেই মসজিদে জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। বারান্দা ধরেও না। এ-ছাড়াও বারান্দালাগা জঙ্গলা জায়গাটা ঝোপঝাড় কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। যাহর থেকে মাইক আনা হয়েছে ভাড়া করে, আজানের জন্য। যাতে মাঠঘাট থেকে গ্রামবাসীরা আজান শুনে নামাজ পড়তে আসতে পারে। অশিক্ষিত গ্রামবাসীরা শুনে শুনে যাতে কিছুটা পুণ্যি সংগ্রহ করতে পারে, তার জন্য এখন ফজরের আর মগরিবের নামাজের মাইকে কেতাব পাঠ করা হয়। ছেলেমেয়েদের ইস্কুলের পড়াশুনোর একটু-আধটু ক্ষতি হচ্ছে এতে, তা হোক। ইস্কুলের পড়াশুনো তো আর পরকাল ফর্সা করতে পারবে না। পরকালের জন্য ওসব শুনতে হবে। বাপ-মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরাও জেনে গেছে এ-কথা।

চার

এভাবেই হাভাতা গ্রামের মানুষ ভাতের কথা ভুলে, শিক্ষার কথা ভুলে হুজুরকে নিয়ে মেতে রইল। হুজুরও মেতে রইলেন মহান খোদার ব্রতকথা শুনিয়ে মানুষকে অনন্তজীবনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। এমন সময় একটা ঘটনা ঘটে গেল গ্রামে। হুজুর না থাকলে হয়তো এ-ঘটনা জনমনে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পার: না। এমন ঘটনা গ্রামে আগেও ঘটেছে। কিন্তু এক হুজুরের আগমনে এই ঘটনায় সবাই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়ল।

তবু অনেক ভেবেচিন্তে সবাই ঠিক করল ঘটনাটি হুজুরকে জানানো হোক।

যথারীতি হুজুরকে জানানো হল। হুজুর ধর্মকথার আসরে অপরাধীদের ডাকলেন। একজন পুরুষ, একজন মহিলা। অবিবাহিত দু-জনেই। মুখ নিচু করে এসে তারা হুজুরের সামনে দাঁড়াল। হুজুর চারখানা বাঁশের কঞ্চি একজনকে আনতে বললেন। তারপর হুজুরের নির্দেশে অপরাধীদের হাত পিছু মোড়া করে বাঁধা হল। এবারে হুজুর উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে হুজুর যাকে বাঁশের কঞ্চি আনতে বলেছিলেন, সে কঞ্চি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। হুজুর সেগুলি

হাতে নিলেন। তারপর জনগণের উদ্দেশ্যে বললেন, ভাই সকল আপনারা সবাই জানেন জেনার শাস্তি এক-শো কশাঘাত। এটা আমার আপনার কথা নয়, কেতাবের কথা। সেই কেতাবের কথা মতোই আমি অপরাধীদের শাস্তি দিব। চারটা কঞ্চি একসঙ্গে ধরে পঁচিশবার মারলে এক-শো ঘা হবে। এখন আপনারা কেউ উঠে এসে কেতাবের নির্দেশ পালন করেন।

হুজুরের কথায় কেতাবের নির্দেশ পালন করার লোকের অভাব হল না সেখানে। অনেকেই উঠে দাঁড়াল। তাদের একজনকে ডেকে হুজুর হাতের কঞ্চি তুলে দিলেন তার হাতে।

ওরা (অপরাধীরা) চটপটালো না, আঃ কি উঃ পর্যন্ত করল না। শুধু কুঁকড়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল। আঘাতে না লজ্জায় — কেউ বুঝতে পারল না।

এর পর হুজুর অপরাধীদের বাবা মাকে ডাকলেন। ছেলের বাবা সেখানেই ছিল। মেয়ের আবার বাবা নেই। মা আছে, সেও বাড়িতে। বাড়ি থেকে তাকে ডেকে আনা হল। হুজুর ওদের বললেন, অপরাধীদের আমি বিয়ে দিতে চাই।

শুনে মেয়ের মা বলল, হুজুর আমার কিছু বলার নাই। সেয়ানা মেয়ে ঘরে রেখে আমার চোখে ঘুম ছিল না। নিজের কিছু নাই যে বিয়ে দিতাম। এত চোখে চোখে রেখেও শেষ পর্যন্ত এই কেলেঙ্কারী। এখন আপনি যা ভাল বুঝবেন করেন হুজুর।

ছেলের বাবা বলল, ছেলে যখন ভুল করেছে তখন ভুলের মাশুল তাকে গুনতেই হবে হুজুর। আপনি যা বলবেন তাই হবে।

হুজুর জনসমক্ষে বিয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করলেন। বিয়েতে যা-যা দরকার সব ব্যবস্থা করতে বললেন ছেলের বাবাকেই। যেহেতু তার অবস্থা ভালো।

নিমেষে এত বড়ো ঘটনার শান্তিপূর্ণ সুরাহা দেখে উপস্থিত জনগণ অভিভূত হয়ে গেল। সত্যি হুজুরের মতো হুজুর।

ততক্ষণে হুজুর শুরু করেছেন 'জেনা' প্রসঙ্গে আলোচনা — আপনারা এতক্ষণ যা দেখলেন, এ তো গেল এই দুনিয়ার শাস্তি। কিন্তু জেনা করলে দোজখে যে শাস্তি পেতে হয়, তা কি আপনারা জানেন?

কেউ কিছু বলছে না। সবাই চুপ করে আছে দেখে হুজুর আবার বলতে শুরু করলেন, দোজখে বড়ো বড়ো কাঁটাওয়ালা একটা দীঘল গাছ আছে। তার কাঁটাগুলিন খুব বিষাক্ত। জেনা করলে অপরাধীদের উলঙ্গ করে সে গাছে ছ্যাঁচড়ে ওঠানামা করাবে খোদা।

উপস্থিত মানুষজনের মধ্যে অনেক মৌলভী-মৌলানা আছেন, হুজুরের কথায় তাদের কারো মনে খটকা না-লাগলেও, একজনের লাগল। সে কেতাবের কোথাও এমন কথা দেখতে পায়নি। তবে কি হুজুর ভুল বললেন? কিন্তু হুজুর ভুল বলবেন কেন? তাছাড়া তাঁর জানার পরিধি অনেক, কোথাও হয়তো এটা পেয়েছেন। কিন্তু কোথায় পেয়েছেন সেটা জেনে নিতে হবে।

পাঁচ

এবার নামাজ শেষ হয়েছে। যদিও হুজুর নামাজের ভঙ্গিতে বসে তখনও তসবি গুনে চলেছেন। এমন সময় শুনলেন, হুজুর একটা কথা জানবার ছিল।

হুজুর তসবি গোনা বন্ধ রেখে বললেন, বল কি জানতে চাও?

— আপনি যে বললেন জেনার শাস্তির কথা তা কোন কেতাবে আছে?"একটু বলেন যদি! হুজুর ঘুরে তাকালেন এবার প্রশ্নকর্তার দিকে। একটু হাসলেন। তারপর বললেন, ওসব কেতাবের কথা নয় মৌলভী। কেতাবে যা আছে তা দিয়ে মানুষকে আর পাপ থেকে বিরত

করা যায় না। তাই ওসব মনগড়া কথা বলতে হয়। না হলে মানুষকে আল্লাহর রাস্তা দেখানো যাবে না। কারণ মানুষের চরিত্র হচ্ছে এমন, যেটা যত বেশি নিষেধ করবে সেটার প্রতি তার আগ্রহ বাড়বে তত। যদি ভালো কাজ নয় বলে নিষেধ করো, তোমাকেই জ্ঞান দিয়ে ছাড়বে। হুজুরের কথায় প্রশ্নকর্তার একজনের কথা মনে পড়ে গেল তৎক্ষণাৎ। লোকটা তাদের গ্রামের, নাম ঝাবরা। দিন-রাত নেশা করে থাকে। ঘর-সংসারের খোঁজ রাখে না। তার স্ত্রী এ-বাড়ি, সে-বাড়ি কাজ করে ছেলেমেয়েদের পেট ভরায়। এসব দেখে প্রশ্নকর্তা — মৌলভীর খুব খারাপ লাগে। তাই একদিন ঝাবরাকে রাস্তায় পেয়ে সে বলেছিল, ঝাবরা ভাই পাপের রাস্তা ছেড়ে ঘর-সংসারের প্রতি নজর দাও।

ঝাবরা জিজ্ঞাসা করেছিল, কোনটা পাপের রাস্তা মৌলভীসাহেব?

ওই যে তোমার নেশাভাঙ করা।

নেশাভাঙ বন্ধ করলে বাঁচব কি নিয়ে শুনি।

কেন নামাজ-রোজা নিয়ে।

নামাজ-রোজা! হাঃ হাঃ হাঃ। ও দিয়ে আর যাই হোক মৌলভী, পেট ভরে না। কিন্তু নেশাভাঙ-এ পেট ভরার সাথে আর একটা কাজ হয় মৌলভী, সেটা হল মনে কষ্ট থাকে না। হাঃ হাঃ হাঃ।

মৌলভী, ঝাবরার কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি সেদিন। ভেবেছিল নেশার ঝোঁকে আবোল-তাবোল বকছে বোধহয়। কিন্তু এখন হুজুরের কথা শুনে মনে হচ্ছে, মানুষ সম্পর্কে হুজুরের ধারণাই ঠিক। মানুষকে হেদায়েত করার জন্য এ-ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই।

ছয়

হুজুরের খাওয়া-দাওয়া হল। এবার বিশ্রামের পালা। তার আগে একটু সেবাগ্রহণ। আজ দশ বছরের অভ্যাস প্রায় নেশার মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে আসার আগে বেশ কয়েকটি গাঁয়ে ভাগ্যে তাঁর সেবা জুটেনি। মনে খুব কষ্ট ছিল। এখানে এসে সেটা অবশ্য পুষিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাবিয়া আজ এত দেরি করছে কেন? সেরাবের যাওয়া তো অনেকক্ষণ হল। হুজুর ধৈর্য রাখতে পারছেন না। এমন সময় ঘরের দরজা ফাঁক হতে দেখলেন হুজুর। ভাবলেন, ইন্তেজার শেষ হল বুঝি! কিন্তু না, ঘরে ঢুকল সেরাব একা। সঙ্গে রাবিয়া নেই।

হুজুর রাবিয়ার শরীরটা আজ বড্ড খারাপ। আসতে পারলে না। আপনি যদি বলেন, আমি আপনার সেবা করছি।

না। দরকার নেই। তুমি যাও। আরাম করোগে।

সেরাব চলে গেল। হুজুর উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে আবার বিছানায় শুলেন। আজ তাঁর ঘুম আসবে না। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন তিনি।

পরের রাতেও একই ঘটনা ঘটতে চলেছিল। রাবিয়া কিছুতেই আসবে না। সে নানান অজুহাত খাড়া করছে। সেরাব সেটাকে হুজুরকে সেবা করার মহৎ পুণ্যির কথা বলে তুচ্ছ করে দিচ্ছে। এভাবেই যখন রাবিয়া স্বামীর বিশ্বাসের কাছে নিজের শারীরিক অজুহাত দাঁড় করাতে পারল না তখন অগত্যা তাকে যেতে হল হুজুরের ঘরে।

রাবিয়াকে দেখে হুজুর খুশি হলেন খুব। জিজ্ঞাসা করলেন, কাল কেন আসিসনি-রে রাবিয়া? রাবিয়া কিছু বলছে না। একপাশে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হুজুর তাকে কাছে ডাকছেন। কি হল রে, ওখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? এদিকে আয়।

রাবিয়ার চোখে তখন ভাসছে বিষাক্ত কাঁটাওয়ালা গাছ। বড়ো বড়ো কাঁটাওয়ালা দীঘল গাছ। সে শিমুলের গাছ নয়। তার চাইতেও ভয়ঙ্কর। সেই গাছের কাঁটায় অপরাধী মানুষের রক্ত মাংস লেগে আছে। রাবিয়া এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

কী ভাবছিস, এগিয়ে আয়-না-রে রাবিয়া।

একদিকে হুজুরকে সেবা করার পুণ্যি, অন্যদিকে দোজখের বিষাক্ত কাঁটাওয়ালা গাছ। রাবিয়া কি করবে, ভেবে পাচ্ছে না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে! অগত্যা সে ছুটে যায় হুজুরের কাছে। আছড়ে পড়ে হুজুরের পায়ের উপর, ওই পাপের কাজ আমি করতে পারবো না হুজুর। আমাকে মাফ করেন আপনি।

কে বলল পাপের কাজ। বলে হুজুর জড়িয়ে ধরলেন রাবিয়াকে।

রাবিয়া কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে বলল সে, আপনি তো কাল বলছিলেন হুজুর যে, জেনা করা পাপের কাজ। এই পাপ করলে দোজখের কাঁটাওযালা দীঘল গাছে আল্লা ছ্যাঁচড়ে ওঠানামা করাবে।

রাবিয়াব কথায় হুজুর এবারে হাসতে শুরু করলেন। তারপর হাসি থামিয়ে রাবিয়াকে বললেন, ধুর খেপি, সে গাছের কাঁটা আব আছে নাকি। এতদিনেব দুনিয়ায় কত মানুষ এল গেল। কত মানুষ এমন পাপ করলে — তাদের শাস্তিতেই সে গাছের কাঁটা ক্ষযে গাছের সাথে মিশে গেছে। তাতে না হয় আল্লা একবাব ছ্যাঁচড়ে ওঠানামা কবালেই বা।

রাবিয়া এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিল।

একথা শুনে হঠাৎ বলল, কিন্তু যার কাঁটা আছে?

বলেই সে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল হুজুরের দিকে। এবং হুজুর এই প্রথম এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। রাবিয়া এবার হুজুরকে ইশারায ডাকল কাছে। হুজুর, আসুন — বলেই রাবিয়া, দু-হাত বাড়িয়ে ক্রমে নিজের থেকে বড়ো হয়ে যেতে লাগল। অবাক ধর্মপ্রচারব দেখলেন এই প্রথম দোজখেব দীঘল কাঁটা গাছ তাঁর সামনে। তার কাঁটাগুলি ধারালো, লম্বা। হুজুর দু-হাতে মুখ ঢেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

কাঁটাগুলি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছিল।